আল-কোরআন দ্য চ্যালেঞ্জ
মহাকাশ পর্ব-২

কাজী জাহান মিয়া

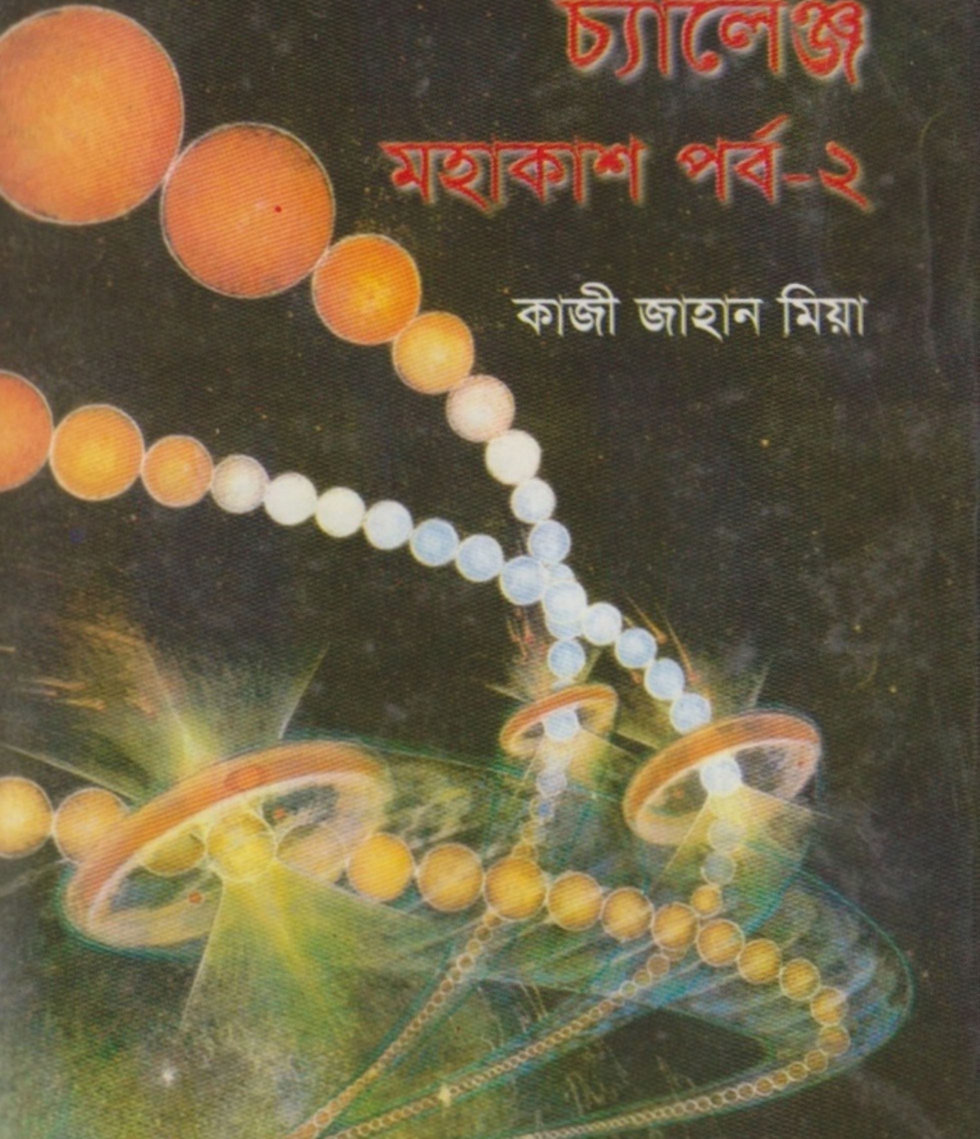

আল-কোরআন
দ্য
চ্যালেঞ্জ
মহাকাশ পর্ব-২

কাজী জাহান মিয়া

Al-Quran
The Challenge
Mohakash Porba-2
Kazi Zahan Miah

মদীনা পাবলিকেশন্স

www.pathagar.com

আল-কোরআন দ্য চ্যালেঞ্জ
মহাকাশ পর্ব-২
কাজী জাহান মিয়া
৩০১/২ টালী অফিস রোড, রায়ের বাজার, ঢাকা-১২০৯

প্রকাশক
মদীনা পাবলিকেশন্স-এর পক্ষে
মোর্তজা বশীর উদ্দীন খান
৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৪৫৫৫

প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর ১৯৯৭
পঞ্চম সংস্করণ
মার্চ ২০০৩

প্রচ্ছদ নির্বাচন ঃ লেখক
অলংকরণ পরিকল্পনা ঃ লেখক
অলংকরণ ঃ সৈয়দ সাইফুর রহমান
কম্পিউটার গ্রাফিক ১৮, গ্রীন রোড, ধানমণ্ডি, ঢাকা-১২০৭
ফোন ঃ ৮৬৬০০১
বিবিধ সহযোগিতায় ঃ আশরাফুল আলম পিনটু

কম্পিউটার কম্পোজ
আবু তাহের, সাইফুল আলম
কম্পিউটার গ্রাফিক ১৮, গ্রীন রোড, ধানমণ্ডি, ঢাকা-১২০৭
ফোন ঃ ৮৬৬০০১

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মদীনা প্রিন্টার্স
৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

সমালোচনা ও ত্রুটি পাঠাবার ঠিকানা ঃ
পোঃ বক্স নং-১০০৪৫
মোহাম্মদপুর হাউজিং এস্টেট পোস্ট অফিস
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

www.pathagar.com

"উহারা কি স্রষ্টা ব্যতীতই সৃষ্টি হইয়াছে?
অথবা নিজেরাই উহারা নিজেদেরকে সৃষ্টি করিয়াছে?
অথবা তাহারা গগনমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছে?
এই পৃথিবী পরিভ্রমণ (ও অনুসন্ধান) কর
এবং প্রত্যক্ষ কর অবিশ্বাসীদের কি পরিণাম ঘটিয়াছে।

তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাহাদিগকে আহ্বান কর,
তাহারা তো কখনো একটি মাছিও সৃষ্টি করিতে সক্ষম নয়
এই উদ্দেশ্য তাহারা সকলে একত্রিত হইলেও;
বরং মাছি যদি কিছু তাহাদিগের নিকট হইতে হরণ করে
তাহারা তো তাহাও উদ্ধার করিতে সক্ষম নয়!

অন্বেষক ও অন্বেষিত কতই দুর্বল!"

—আল-কোরআন

www.pathagar.com

উৎসর্গ

তিনি ছিলেন আমার 'মা'।
খানম জুহেরা খাতুন
তাঁর নামাজ ও ইবাদত
তাঁর জীবন, কর্ম ও মৃত্যু
সবই ছিল শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যেই।

আজ আমার সমস্ত অনুভব তাঁরই আদর্শে
তাঁরই অর্পিত দায়কে মাথায় তুলে নিতে চায়।
ভাবতে চায়— আমার জীবন কোরআন আর
মানুষের সেবার জন্যেই শুধু।

www.pathagar.com

ম্যাসিক মদীনা সম্পাদক
মাওলানা মুহিউদ্দীন খানের অভিমত

আল্লাহর অশেষ অনুগ্রহ এবং আলোড়ন সৃষ্টিকারী তরুণ লেখক কাজী জাহান মিয়ার অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে আল কোরআন দ্য চ্যালেঞ্জ মহাকাশ পর্ব-২ প্রকাশিত হয়েছে দেখে আমি যার পর নাই আনন্দিত এবং আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি।

পবিত্র কোরআন আল্লাহর বাণী। আল্লাহর কিতাব। আল্লাহর বিধান। মানব জাতির জন্য আল্লাহর সর্বাপেক্ষা বড় দান। প্রথম মানব এবং মানবজাতির আদি পিতা হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে শেষনবী হযরত মুহম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত যেসব আসমানী প্রত্যাদেশ নাযিল হয়েছে, সে ধারাবাহিকতার শেষ ও চূড়ান্ত গ্রন্থই আল-কোরআনুল করীম। এরপর আর কোন কিতাব নাযিল হবে না এবং তার প্রয়োজনও দেখা দিবে না। কোরআন নাযিল হয়েছে আনুষ্ঠানিক লেখাপড়া বা জ্ঞান-চর্চার সাথে সম্পর্কহীন উম্মী নবীর (সাঃ) উপর। এ ব্যবস্থার দ্বারা আল্লাহপাক তাঁর পবিত্র গ্রন্থকে যে কোন প্রকার পূর্ব-ধারণার সংস্পর্শ থেকে মুক্ত রেখেছেন। আবার পৃথিবীর প্রলয়কাল পর্যন্ত সময়সীমার মধ্যে আগত-অনাগত সকল জাতি-গোষ্ঠীর মানব সমাজের সামনে এ মর্মে চ্যালেঞ্জ দিয়ে রেখেছেন যে, কোরআন অনন্য এর রহস্যময়তা অনতিক্রম্য। এর বিকল্প সৃষ্টি করা মানবীয় মেধা ও প্রজ্ঞার আওতাবহির্ভূত। প্রলয়কাল পর্যন্ত মানুষের উদ্ভাবনী শক্তি যত অগ্রসর হবে, কোরআনের অশেষ রহস্যাবলীও সে পরিমাণেই মানুষের সামনে উন্মুক্ত হতে থাকবে। প্রতিটি প্রজন্মের মানবগোষ্ঠীর সামনে পবিত্র কোরআনের সেসব রহস্যময়তার দ্বার একে একে উন্মুক্ত করার জন্যও আল্লাহ্ তায়ালার একদল নিবেদিতপ্রাণ বান্দা নিয়োজিত থাকবেন। এটা মহান আল্লাহরই একটি চমকপ্রদ ব্যবস্থা।

বর্তমান কাল বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষতার যুগ। আসলে সার্বিক বিচারে প্রচলিত বিজ্ঞান কতটুকু উৎকর্ষতার স্তরে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছে, সে প্রশ্ন পাশ কাটিয়ে বলা যেতে পারে যে, জ্যোতির্বিজ্ঞান, বিশেষতঃ মহাকাশের অনন্ত রহস্যাবলীর দ্বার কিছুটা উন্মুক্ত হওয়ার প্রেক্ষাপটে একাধারে যেমন মানবীয় বুদ্ধি-বিবেক থ' হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে, তেমনি দেখা যাচ্ছে, আজকের বিজ্ঞানগর্বী মানুষ এ পর্যন্ত যা কিছু আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে, এমন কি যেসব প্রশ্নের জবাব অনুসন্ধান করতে গিয়ে মানুষের অনুধাবন শক্তি নির্বাক হয়ে আছে, সেসব জটিল প্রশ্নেরও জবাব পবিত্র কোরআন প্রায় দেড় হাজার বছর আগেই অত্যন্ত নিখুঁতভাবে বলে দিয়েছে। কিন্তু বিপত্তি দাঁড়িয়েছে, বিজ্ঞান চর্চায় যাঁরা নিজেদের নিবেদিত করে

www.pathagar.com

রেখেছেন, তাদের পক্ষে কোরআন পাঠ করা বা কোরআনের প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি করা অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না। তাছাড়া কোরআন ঠিকমত বুঝবার জন্য যেরূপ পবিত্র তন্মনের পূর্বশর্ত রয়েছে, ঈমানবিহীন বিজ্ঞান-চর্চাকারীরা তা থেকে বঞ্চিত। অপরদিকে কোরআনের ব্যাখ্যা ও তফসীরের ক্ষেত্রে যারা নিজেদের উৎসর্গ করে রেখেছেন, তাঁদের অধিকাংশেরই আধুনিক বিজ্ঞানের, এর পরিভাষার এবং এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সাথে পরিচিতি নিতান্তই ক্ষীণ। যে কারণে সাধারণ্যে এমন একটা ধারণা ক্রমেই বদ্ধমূল হচ্ছে যে, কোরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী দুই দিগন্ত। কিন্তু অন্ততঃ হিজরী হাজার সাল পর্যন্ত এমনটা ছিল না। সে যুগের তফসীর গ্রন্থগুলি পাঠ করলে বুঝা যায় যে, তখনকার কোরআন গবেষকগণ সমকালীন বৈজ্ঞানিক ধ্যান-ধারণার সাথে শুধু পরিচিতই ছিলেন না, বরং আরও অগ্রসর চিন্তাধারায় সমৃদ্ধ ছিলেন।

আমরা অত্যন্ত আনন্দিত ও গর্বিত এজন্য যে, বাংলাদেশের তরুণ গবেষক কাজী জাহান মিয়াকে আল্লাহপাক তওফীক দিয়েছেন, জ্যোতির্বিজ্ঞানের সর্বশেষ কতকগুলি জটিল উদ্ভাবনকে কোরআনের আলোকে ব্যাখ্যা করে তিনি দেখিয়ে দিতে সমর্থ হয়েছেন যে, বিজ্ঞানময় কোরআন মানুষের উদ্ভাবনী ক্ষমতারও কত সম্মুখে অবস্থান করছে! আল-কোরআন দ্য চ্যালেঞ্জ মহাকাশ পর্ব —১ এবং মহাকাশ পর্ব—২ গ্রন্থ দু'টি তারই বাস্তব প্রমাণ।

অনন্য প্রতিভাধর কাজী জাহান মিয়াকে আমি দীর্ঘদিন ধরে জানি। আমাদের এ জাতির দুর্ভাগ্য যে, তারা প্রতিভার কদর করেন না। ইতিহাসের এ চিরন্তন সত্যের ধারাবাহিকতায়ই গবেষণামূলক এ গ্রন্থ রচনা করতে গিয়ে কাজী জাহান মিয়ার উপরও নেমে আসে দুর্ভোগ ও দুর্ভাগ্যের পর্বতসম বোঝা। আর এ আলোড়ন সৃষ্টিকারী কাজটির জন্য কোন প্রশংসাতো নয়ই উপরন্তু বাধ্য হয়ে তাঁকে ত্যাগ করতে হয় অতি গুরুত্বপূর্ণ চাকরীটিও। সে দুর্ভাগ্যের ইতিহাস যেমন দীর্ঘ তেমনি এখানে উল্লেখ করাও সমীচীন নয়। শুধু এটুকুই বলা যায় যে, এ বইগুলো বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হলে তিনি বাংলাদেশের জন্য বিরাট গৌরব বয়ে আনতে সক্ষম হবেন। চিন্তার ক্ষেত্রে সংযোজন হবে নতুন মাত্রা। আমি দোয়া করি আল্লাহপাক এ গ্রন্থ রচনা করতে গিয়ে তাকে যে মানসিক নির্যাতন ও যাতনার মুখোমুখী করেছেন একদিন অবশ্যই আল্লাহ পাক তাঁকে তাঁর এ মহৎ কর্মের মহা-পুরস্কার দান করে তেমনি গৌরবান্বিত করুন। তাঁকে তাঁর কর্মে আরো দৃঢ়পদ হওয়ার তৌফিক দিন। আমীন।

বিনয়াবনত

মুহিউদ্দীন খান

সম্পাদক মাসিক মদীনা, ঢাকা।

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

আল–কোরআন দ্য চ্যালেঞ্জ, মহাকাশ পর্ব–২ প্রকাশ পেলো— দয়াময়ের কাছে তাই অনন্ত শুকরিয়া। বইটির জন্য বহুদিন আমরা সকলেই অপেক্ষা করে ছিলাম।

মহাকাশ পর্ব–১ ছিল একটি অতুলনীয় গবেষণা কর্ম। মহাকাশ পর্ব–২ দীর্ঘদিন পরে হলেও এক মনোমুগ্ধকর সংযোজন। প্রকৃতপক্ষে একটি পুস্তক একসাথে এতগুলো বিস্ময়কর আবিস্কার ও স্বাদের স্বকীয়তায় পরিপূর্ণ— এই বইটি না পাঠ করা পর্যন্ত কোনো ভাবেই উপলব্ধি করা সম্ভব নহে। নিজের প্রকাশিত পুস্তক না হলে অকপটে বলতাম— মহাজাগতিক বিদ্যা ও কোরআন সম্পর্কে অন্বয় ও বিরোধ নিয়ে বর্তমান জ্ঞানের প্রেক্ষাপটে সারাবিশ্বে এর চাইতে অগ্রগামী আর কোন পুস্তক নেই। বইটি নিঃসন্দেহে এক আবিস্কারের কৃতিত্বে উদ্ভাসিত হয়েছে। পৃথিবীর আর কোনো দেশে আর কোনো ভাষায় এর সমকক্ষতায় অন্য কোনো গবেষনাকর্ম খুজে পাওয়া যাবে না তা কোনো প্রকার দ্বিধা না রেখেই বলা যায়। আরও বলা যায়, বইটি ইংরেজী কিংবা অন্য কোনো আন্তর্জাতিক ভাষায় অনুবাদ করা হলে তা পৃথিবী জোড়া সুনাম অর্জন করবে, এ হলো অনেক বিজ্ঞ জনেরই অভিমত।

মহাকাশ পর্ব–১ সম্পর্কে অনেকেই জানতে চেয়েছেন বইটি কোনো বিদেশী লেখকের অনুবাদ কিনা। বিনীতভাবে বলতে চাই, এই পুস্তক কোনো বিদেশী গবেষণার অনুবাদ নয়। এদেশেরই একজন নাম না জানা লেখকের একটি সাধারণ গবেষণাপত্র মাত্র। আমরা জানি, বিদেশী পুস্তক ঘরে রাখা কিংবা বিদেশী লেখকের বই পড়া একটি 'প্রেস্টিজিয়াস' ব্যাপার। এ পুস্তকটি এমন কোনো চাহিদা পূরণ করতে সৃষ্ট নয়।

এই গবেষণা পুস্তকের গুণগত দিক নিয়ে আলোচনার প্রসঙ্গটি আমি এড়িয়ে যেতে চাই। একজন প্রকাশকের জন্য নিজ পুস্তকের বিষয়ে অধিক বক্তৃতা সচরাচর দুর্বলতারই প্রকাশ। ইনশাল্লাহ্, আমরা মহাকাশ পর্ব–২ এর বিষয়ে যথেষ্ট আশাবাদী, এটাই বলতে পারি।

বইটি কি এ বৎসরের, না এ দশকের নাকি এ শতাব্দীর— এ বিষয়ে রায় দেবেন জ্ঞানী পাঠক সমাজ। আমি শুধু এইটুকু বলতে চাই, প্রথম পর্বটি হাজারো পাঠকের মনে দ্বিতীয় পর্বের ক্ষুধা সৃষ্টি করেছিল। আমরা অনেকটা আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম। লেখককে বারবার অনুরোধ করেছি। তিনি তাঁর চাকরি সীমাবদ্ধতার কথা বলেছেন। তিনি জানিয়েছেন, প্রথম পর্ব প্রকাশিত হবার পর লেখক কুমিল্লা সেনানিবাস হতে খুলনায় (কোর্স), খুলনা হতে আমেরিকায় (কোর্স), আমেরিকা হতে সাভার সেনানিবাস, সাভার সেনানিবাস হতে যশোর সেনানিবাস, যশোর সেনানিবাস হতে আবার সাভার সেনানিবাস, সাভার

www.pathagar.com

সেনানিবাস হতে লাইবেরীয়ায় জাতিসংঘ মিশনে, সেখান হতে ঢাকা সেনাসদরে বদলী হয়ে আসেন। প্রতিটি বদলীর স্থায়িত্বকাল এত স্বল্প ছিল যে একটি সরকারী বাসস্থান পাবার অপেক্ষাকাল ছিল সচরাচর তার চাইতে বেশি। অতএব, বলা যায়— তিনি ছিলেন ভাসমান মানুষ। মহাকাশ পর্ব–২ লিখবার জন্য চাই অবস্থানের স্থায়িত্ব, পরবর্তী বদলীর উৎকণ্ঠা হতে মুক্ত মন, পড়ালেখার সুযোগ ও প্রয়োজনীয় তথ্যের উৎসের সান্নিধ্য। ধরে নেয়া যায়— সবগুলোই ছিল লেখকের বৈরী অবস্থানে।

সেনাবাহিনীর নিজস্ব প্রশাসনিক বিষয়ে আমরা কোনো মন্তব্য করতে প্রস্তুত নই। লেখক শুধু আমাদেরকে তাঁর নিজের অনুভব আর মতামতটি জানিয়েছেন। জানিয়েছেন, কর্তৃপক্ষ তাঁর 'কমপেশনেট গ্রাউণ্ড'–এ বদলির একটি আবেদনও নামঞ্জুর করেছেন। মহাকাশ পর্ব–২ সম্পন্ন করার জন্য লেখকের ঢাকায় বদলি হওয়া জরুরী ছিল। তিনি তাঁর দীর্ঘ ১৭ বছরের সেনা জীবনে ঢাকায় শুধুমাত্র একটি বদলী পান এবং এই নিয়োগ হতেই দুই দুইবার মহাকাশ পর্ব–২ সম্পন্ন করার প্রয়াসে বার বার ব্যর্থ হবার কারণে নিদারুণ দুঃখ নিয়ে স্বেচ্ছায় চাকুরী হতে অব্যাহতির প্রার্থনা জানান— যাদের দুটিই মঞ্জুর হয়। পরিণামে পরবর্তী পদোন্নতির মাত্র কিছুদিন আগে তিনি চাকুরী ইস্তফা দেন। আমরা যতদূর বুঝি — মেজর কাজী জাহান মিয়া (অবসরপ্রাপ্ত)–কে একটু সুযোগ দিতে পারলে তিনি কল্যাণকর কিছু করবার সামর্থে ছিলেন। অন্ততঃ কোনরূপ সন্দেহ ছাড়াই বলা যায় ইনশাল্লাহ্— তাঁর লিখিত গবেষণাকর্ম আল–কোরআন দ্য চ্যালেঞ্জ মহাকাশ পর্ব–১ ও ২ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নয় শুধু— সারা বিশ্বের প্রেক্ষাপটে একটি প্রথম সারির পুস্তক। বইটি ইতিমধ্যেই সীমার সীমাবদ্ধতা ছাড়িয়ে উর্ধ্বে উঠে এসেছে। আমাদের দেশ ও প্রশাসনে কখনো এ বোধোদয় হবে কি যে— ক্ষতির দিকের আবেদন দ্রুত মঞ্জুর হয়, কল্যাণের দিকের আবেদন উপেক্ষিত হয় বছরের পর বছর। এতে সামগ্রীক ক্ষতির দায়ই বাড়ে। মহাকাশ পূর্ব–২ ও তার লেখক দারুন ভাবে এই হীন প্রভাবের শিকার হয়েছেন যা দুঃখজনক।

মহাকাশ পর্ব–২ এ বিস্ময়কর তথ্যের জোয়ার এসেছে। তথ্যগুলি অভাবিত, মনোমুগ্ধকর ও শিহরণ জাগায় এমন। কোরআনের রত্নভাণ্ডার যে কত সীমাহীন সম্পদে পূর্ণ, মহাকাশ পর্ব–২ আবারো তার একটু স্পর্শ দিয়ে গেলো। পুস্তকটি নাস্তিকবাদ ও মঙ্গলপ্রদীপ–জ্বলা মুসলমানদের ঘরে জন্ম নেয়া বুদ্ধিজীবীর তালিকায় নব নাস্তিকদের মুখে হতাশার কালোমেঘ ছড়িয়ে যাবে। মহাকাশ পর্ব–২ যে সত্যের মণিমুক্তা বিছিয়ে গেলো, তাকে অতিক্রম করার সাধ্য তাদের রয়েছে কি— এ বাস্তবটিকে একটি চ্যালেঞ্জ হিসাবেই তাদের সামনে এনে দাঁড় করিয়েছে এই গবেষণাটি।

লেখক ব্যবসায়ী হতে চলেছেন— এ তথ্যটুকু আমাদের জন্য উৎসাহব্যাঞ্জক নয়। তবে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন সঠিক সময়ে সঠিক ব্যবস্থাটি নিয়ে থাকেন— এটাই দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

কোরআনের সত্যের আলো দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ুক এই কামনায়।

মোর্তাজা বশিরউদ্দিন খান

www.pathagar.com

৫৪১৩১৮৩

বিজ্ঞপ্তি

ঘোষণা করা যাচ্ছে যে আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী কোরআন ও মহাজগৎবিদ্যার সম্পর্ক নির্ণেয়ক পুস্তক *আল-কোরআন দ্য চ্যালেঞ্জ মহাকাশ পর্ব*- ২ এর প্রকাশ, মুদ্রণ ও পুনঃমুদ্রণের জন্য একমাত্র মদীনা পাবলিকেশন্স, ৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ কে অনুমোদন প্রদান করলাম। যে কেহ পুস্তকটিতে প্রস্তাবিত তত্ত্ব ও উদঘাটিত তথ্যসমূহের ব্যবহার করবেন, তিনি অবশ্যই উপরোল্লিখিত পুস্তকের উদ্ধৃতি প্রদান করবেন। মদীনা পাবলিকেশন্স ভিন্ন অন্য কোনো উৎস হতে বিশেষভাবে অন্য কোনো দেশে বইটির বে-আইনী মুদ্রণ, বাজারজাতকরণ ও সীমান্ত অতিক্রমপূর্বক বাংলাদেশে প্রেরণের ঘটনা ঘটলে কপিরাইটের আইনে বিপুল ক্ষতিপূরণ দাবি করা হবে। বহিঃবাংলাদেশে এই পুস্তকের বাজারজাত ও বিক্রয়ের জন্য যথাবিহিত চুক্তি সম্পাদন অত্যাবশ্যক।

no 1704 date 25-11-97

SYED SERAJUL HUDA
Notary Public
38/1, Dhanmondi R/A,
Road No-2, Dhaka.
Phone- 500955

25/11/97

মেজর কাজী জাহান মিয়া (অবঃ)

বিঃ দ্রঃ— এই পুস্তকের যাবতীয় আয় The Poor Mans' Hospital -এর প্রাথমিক অর্থ সংগ্রহ প্রকল্পের জন্য নিবেদিত।

www.pathagar.com

সূচী

শুরুর কথা	১১
ছায়া ও দুই তত্ত্বের বিরোধ নিষ্পত্তি	১৯
সেফিড, শিফ্‌ট ও অনন্তের অনন্য তত্ত্ব	৪৯
আকাশযান ও মুক্তিগতি	৭৩
সমুদ্র, নৌযান ও নিদর্শন	৮৫
কালের নির্বাচনে মহাবিশ্ব	১০৬
নিকটবর্তী আকাশ, এসটিরয়েড বেল্ট ও শয়তান	১৩৭
ডেথ টানেল	১৫১
সম্মানিত পৃথিবী	১৭৪
জীবনের সন্ধানে	১৯৯
মহাবিশ্বের ভবিষ্যৎ ও Burst of Creation তত্ত্ব	২১০
কিয়ামত বা মহাধ্বংস	২৩৪
কুন ফা–ইয়াকুন –এর কোয়ান্টাম বিজ্ঞতা	২৩৪
সময়–দূরত্ব–ধারাবাহিকতা ও আপেক্ষিকবাদ	৩১০
শেষের কথা	৩৬৬

www.pathagar.com

শুরুর কথা

আমাকে অনেকেই প্রশ্ন করেছেন— পবিত্র কোরআনে কোয়ান্টাম তত্ত্বের সম্পর্কে কোনো তথ্য রয়েছে কি কিংবা ক্লোনিং সংক্রান্ত বিষয়ে পাঠ করবার সুযোগ আছে কিনা। আমি তাদেরকে কখনোই খুশি করতে পারিনি। একদিকে প্রশ্নকারীগণ ভাবেন, অত্যাধুনিক বিজ্ঞান-সূত্রের বিষয়ে কোরআনে উল্লেখ থাকলে কোরআনের সম্পর্কে কোনো সন্দেহ থাকে না, ফলতঃ তারাও সহজেই দোদুল্যমানতা কাটিয়ে দৃঢ়বিশ্বাসী হতে পারেন। অন্যদিকে আমরা যারা অন্যদেরকে কোরআনের সত্যতা সম্পর্কে বিশ্বাস করাতে প্রয়াস নিয়ে থাকি— তারা ভাবি, একটা ভাল তত্ত্বের সঙ্গে কোনো আয়াতের মিল খুঁজে পেলেই 'ইউরেকা'! তারা আর আমরা— সকলেই মূলতঃ একটা গুরুতর অন্যায়ের সঙ্গে নিজদেরকে জড়িত করি। সময়ের প্রবাহে যে বিজ্ঞান হারিয়ে যায় কিংবা যাবার ভয় থাকে, তেমনি একটি মাপনদণ্ড দিয়ে কোরআনের সঠিকতার মান পরখ করতে চেষ্টা করি আমরা। ঈমানের প্রশ্নে আমরা মূলতঃ কতটা নিচের পর্যায়ে দাঁড়িয়ে রয়েছি— এ গুরুতর জিজ্ঞাসাটি কখনোই আমাদের মনে উদিত হয় না। বিজ্ঞানের যুক্তি দিয়ে বুঝে তারপর সুদৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা হবে— এই চরিত্রটি ঈমানের মৌলিক শর্তগুলির বিপরীতে অবস্থান নেয়। ফলতঃ আমাদের মতো ঈমানদারগণের অবস্থানটি কোনখানে তা আমরা নিজেরাও উপলব্ধি করতে সক্ষম নই। বিশ্বাসী হবার স্থলে 'আমরা শুধু সন্দেহবাদীদের তালিকায় নাম লিপিবদ্ধ করি। আল্লাহ্ বা কোরআনে শর্তহীন বিশ্বাস স্থাপন করার জরুরীতাকে

www.pathagar.com

প্রমাণ সাপেক্ষ শর্তের মধ্যে প্রবাহিত করার অনুকূলে অন্যায় অনুভব আমাদেরকে ঈমানহীন রূপে প্রতিপন্ন করে। ফলতঃ আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি ইহকালে, ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি পরকালেও। কোনোরূপ যুক্তিতর্ক প্রমাণ ছাড়াই কোরআন সত্য— এর বিপরীতে অবস্থান নিয়ে আমরা সূর্যের আলো-কে মোমের কিরণ দিয়ে খুঁজবার কসরৎ করছি! আমাদের মতো হীন ঈমানসম্পন্ন দুর্ভাগ্যের বাহন আর কি হতে পারে? আমি দয়াময় আল্লাহপাকের নিকট এই পুস্তক রচনার জন্য ঈমানের প্রশ্নে যে দুর্বলতায় প্রদর্শিত ও প্রমাণিত হলাম, তার জন্য শর্তহীন ক্ষমা প্রার্থী।

অবশ্য এখানে অন্য আর একটি অনুভবও কাজ করতে পারে। জ্ঞানের তৃপ্তি আনন্দদায়ক— সে অর্থে কোরআনের রত্নভাণ্ডার আমাদেরকে পুলকিত করতে পারে! সে আনন্দ যে দয়াময়ের ক্ষমা ও করুণায় সিক্ত হতে পারে, তা সহজ অনুমান হতেই বলা যায়। সে দৃষ্টিকোণ হতে এ পুস্তকটি পাঠ করবার জন্য শুকরিয়া থাকা চাই। আমি মহামহীম আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের করুণার জন্য বিনীত শির শোকর গুজার করছি। কৃজ্ঞতা মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের যিনি এই পুস্তকে বিস্ময়কর তত্ত্ব ও তথ্য সন্নিবেশিত করার সামর্থে আমার মতো একজন হীনজনকে করুণা করেছেন। আমার কখনোই এমন বিদ্যাবুদ্ধি নেই যা দিয়ে এ পুস্তকের সামান্যও রচনা করা যায়। আমি কেবল তাঁর করুণাই বিস্ময়ের বিস্তৃতিতে অবলোকন করছি মাত্র।

আমরা যে সকল প্রশ্নের জবাব খুঁজি— তার প্রায় সবটাই হলো বাড়াবাড়ি। আমরা অবশ্যই জানি না যে প্রকৃতপক্ষে আমরা কোন কোন প্রশ্ন করার যোগ্যতা রাখি কিনা। Steven Weinberg এর ভাষায়— Just as dogs are not smart enough to understand Newtonian Mechanics, perhaps we're not smart enough to make progress beyond certain point. নির্বোধ কুকুর নিউটনিয়ান

www.pathagar.com

ম্যাকানিক্স বুঝতে পারে না, কারণ তার জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা রয়েছে, আমরা মানুষও তেমনি অনেক কিছু বুঝতে পারি না— বিশেষভাবে কোরআনকে। প্রকৃতপক্ষে নিউটনের ম্যাকানিক্স-এ অনভিজ্ঞ কুকুরের অনুপাতেই আমরা এই সৃষ্টি ও স্রষ্টাকে বুঝতে ব্যর্থ রয়েছি। আমাদের ব্যর্থতা অনেকটা সৃষ্টিগতই।

আমরা আরো অনুভব করি না— কোরআন বিজ্ঞান শেখাতে অবতীর্ণ নয়। তথাপিও বিজ্ঞানের গুরুতর সূত্র ও বিষয় নিয়ে কোরআন যে আলতো স্পর্শ দিয়ে গেছে, সে স্পর্শের ছোঁয়ায় জ্ঞানের যে দীপ্তি প্রকাশ পেয়েছে, আর তার আলোর ছটায় যে উজ্জ্বলতা ছড়িয়ে পড়ছে, তা আজ বিজ্ঞান-মস্তককে অনুভবে ও শ্রদ্ধায় করেছে বিনীত ও বিনম্রশির। বিস্ময়কর যে একটি আয়াতের সার লিখতে যে দলিল দরকার, তা ক্ষেত্র বিশেষে পুস্তক হয়ে যায়। আবার একটি অতিক্ষুদ্র আয়াত হয়তো যে তথ্য ফেলে দিয়ে গেছে, তা একসাথে বিজ্ঞানের অনেক তত্ত্বের সমষ্টি। গাম্ভীর্যে, বৈশিষ্টে, বিজ্ঞতায়, সঠিকতায় ও মর্যাদায় কোরআনের ভাষণের মতো উৎকৃষ্ট আর কোনো বক্তব্যমালা জগতে সৃষ্টি হয়নি। কেউ পছন্দ করুক কিংবা না করুক— কোরআন শ্রেষ্ঠদের শিরে সর্বশ্রেষ্ঠ! এখন সময় এসেছে অর্ন্তদৃষ্টি বদলানোর, 'কোরআন বিজ্ঞানময়'— এটি আর সত্য নয়। সত্য হলো— বিজ্ঞান কোরআনময়। সঠিক বিজ্ঞান শুধুই কোরআনকে তুলে ধরেছে সর্বত্র। বিজ্ঞান আজ কোরআনের অনন্ত মহাবিশ্বের শাশ্বত সত্যের সীমাহীনতায় হারিয়ে গেছে।

আমার ভাষার প্রকাশ ভাল নয়, জ্ঞান অল্প এবং ক্ষেত্রবিশেষে অনেক বাড়াবাড়ি যে করেছি তা অনুভব করি। দয়াময়ের কাছে আমি ক্ষমা চাই তার জন্য। সুধী পাঠকের সমালোচনা ও ভুল শুধরে দেবার কাজটুকুকে একান্ত শ্রদ্ধায় গ্রহণ করব।

এই সেই পুস্তক— যা লিখবার জন্য বহুদিন বহুভাবে আয়োজন

www.pathagar.com

করে নিষ্ফল হয়েছি, কর্তৃপক্ষগণের বিন্দুবৎ অনুকম্পা মিলেনি, এক-পৃথিবী দুঃখ নিয়ে সতেরটি বৎসরকে মিথ্যা করে পদোন্নতি-বোর্ডের মাত্র বারো দিন পূর্বে রাস্তায় এসে দাঁড়িয়ে পড়েছি সহসাই! তারপর দু'দিনেই নিঃস্ব হয়ে পড়েছি আর্থিকভাবে এক অংশীদারি ব্যবসায় নেমে। যে দুঃখগুলি নিয়ে ভাবা যায় না, ঘুমানো যায় না, ভোলা যায় না, ক্ষমা করা যায় না— এমনি দুঃখের সমুদ্রে ডুবে থেকে কখন যে এ পুস্তক রচনার কাজটি অজ্ঞাতভাবেই এগিয়ে গেছে, তা নিজেও জানিনি। যখন ভাবি, নিজেকে কৃতিত্ব দেবার একবিন্দু সম্মতিও পাই না মন হতে। শ্রদ্ধায় মাথা নুয়ে যায় তাঁর প্রতি যিনি নির্গুণ কদলী বৃক্ষকে দিয়ে তাঁর জ্ঞান প্রকাশ করে থাকেন এবং তার চাইতেও হীন হতে হীনজনকে মহাকাশ পর্ব-২ এর কাজটি সম্পন্ন করবার সুযোগ দান করেছেন তিনি— আমি শুধু চারিদিকে তাঁকেই দেখতে পাই।

যে 'সময়' নামক বস্তুটির জন্য প্রায় অর্ধযুগ ছুটাছুটি করেছি, আমার জীবন হতে আজ সে সময় দুর্লভ হয়ে গেছে! হয়তো জীবনে অনেক অর্থই এসে যাবে কিন্তু দুর্লভ সময় যা পড়তে, ভাবতে আর লিখতে সুযোগ দেয়, সে সময়ের জন্য আমারই এ এস সি কোরের দু'জন সম্মানিত ব্রিগেডিয়ার মহোদয়ের নিকট পৌনে দু'টি বৎসর বিনীত প্রার্থনা জানিয়ে কোনো লাভ হয়নি। শেষ পর্যন্তও তাঁদের একজন আমাকে একটি চমৎকার উপহার দিয়েছিলেন। নিষ্ঠুর ও আচরণে হীন সে উপহার আমাকে রাজার সিংহাসনেও ঘৃণা ও দুর্দমনীয় অরুচির যোগান দিয়েছিল। ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে সেনাবাহিনী হতে অব্যাহতি নিলাম। আজ শুরুটি লিখতে গিয়ে এ এস সি কোরের সে দু'জন ডি এস টি-র কথাই মনে পড়ছে আমার! বুকের ভেতরে এক গভীর ক্ষত আর অসহায় যন্ত্রণা আমাকে কষ্ট দিচ্ছে এ জন্য যে— অর্থ নয়, পদোন্নতি নয়, কোনো কৃপা নয় শুধুমাত্র একটি ডেস্ক বদলী করে দেবার কাতর অনুরোধ, আর তা কেবল একটি সৎ কাজ করবার জন্য ; আমার সে প্রার্থনাগুলি

www.pathagar.com

নিষ্ঠুরভাবে লাঞ্ছিত হয়েছে কর্তৃপক্ষগণের কাছে। এদেশে কত বিধি বহির্ভূত কাজই তো হয় ; শুধু হতে কষ্ট যা একান্তই বিধি অনুযায়ী। একটি ডেস্ক পরিবর্তনের জন্য একটি চাকরি ছেড়ে দিলেও কর্তৃপক্ষের হৃদয়ে কোনো অনুভব সৃষ্টি হয় না। কি চমৎকার চাকরি আর কি চমৎকার তার কর্তৃপক্ষ!

সময়ের কারণে শেষপর্যন্ত সম্ভব হলো না কয়েকটি গুরুতর আর্টিক্যালকে এ পুস্তকে সংযোজন করার। স্টিফেন হকিংস কোরআনের চাইতে স্মার্ট নন ; তিনি আইনস্টাইনের 'পেরাডিম' ভাঙার চেষ্টা করছেন— তিনি স্রষ্টার 'পেরাডিম' ভাঙার স্বপ্নেও হয়তো বিভোর। তাঁর স্বপ্ন শুধু স্বপ্নই থাকবে। কোরআন পড়লে তিনি দেখতেন, তাঁর সমস্ত কষ্টের ফসলগুলো কত নিখুঁতভাবে কোরআন মুদ্রিত করেছে বহু পূর্ব হতেই। সম্ভব হলে হয়তো পরে এ নিয়ে ভাবব ইনশাল্লাহ। বাদ দিতে হয়েছে রুবুবিয়াতের উপর কিছু আর্টিক্যাল এবং অনুরূপ আরো কিছু। জীবনে আর সে সুযোগ ফিরে আসবে কিনা যে আমি সর্বান্তকরণে মনোনিবেশ করতে সক্ষম হবো— সে শুধু দয়াময়ই জানেন।

মাত্র চার মাসে লেখার কাজটি সম্পন্ন করেছি, টেবিল হতে সরাসরি প্রকাশকের ঠিকানায়, কোনো প্রকার পুনঃলিখন, পরিমার্জন, পরিশোধন সম্ভব হয়নি। এ পুস্তকের বিষয় ও মান সম্পন্ন একটি গবেষণা কাজের জন্যে অফুরন্ত সময় ও সুযোগ চাই— এ দুয়ের কোনোটাই আমার ছিল না। তাই বইটির ভাষা প্রবাহে ও উপস্থাপনায় দুর্বলতা থাকবে, এই জন্যে আমি পূর্বাহ্নেই বিনীত ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

যাঁকে আজ সবচাইতে বেশি মনে পড়ছে— তিনি আমার জান্নাতবাসিনী মা। এই মর-জীবনেই যিনি দয়াময়ের ক্ষমা ও গ্রহণীয়তার সু-সংবাদপ্রাপ্ত হয়েছেন। আজ বড় করে ভাবতে ইচ্ছে

www.pathagar.com

হয়— তিনি আমাকে জীবনে একটি ভালো কাজ রেখে যাবার নির্দেশ দিয়ে গেছেন। তাঁরই সে নির্দেশে এ দেশের দরিদ্র মানুষের জন্য আমি The Poor Mans' Hospital বা 'গরিবের হাসপাতাল' গড়বার জন্য একটি ইট হলেও গেঁথে যেতে চাই ইনশাল্লাহ। পুস্তকটি প্রকাশিত হবার শুভলগ্নে আমি তাই আমার মায়ের ইচ্ছা ও 'অসিয়ৎ'-এর স্বপক্ষে সুদৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করলাম। এই পুস্তক পড়ে যদি কেউ খুশি হন, তিনি যেন তাঁর এই খুশির আনন্দটি নিয়ে আমার মায়ের এই আদেশ পূরণ করবার সামর্থে যেন পৌঁছতে পারি সে দোয়াটুকু আমার জন্য করে যান— এ দাবি থাকবে।

যাঁর কথা না বললে অবিচার হবে, আমার সেই শ্রদ্ধেয় শিক্ষক জনাব সাদত খান সাহেবের পায়ের কাছে আমি নিজকে সমর্পণ করছি। এই মানুষটির কথা কেন যেন ভোলা যায় না।

শ্রদ্ধা রইল ডঃ আবু আহ্মেদ সাহেবের প্রতি যিনি আমাকে তাঁর জ্ঞান দ্বারা সবসময় সাহায্য করেছেন। কৃতজ্ঞতা রইল কর্নেল নূরুল আযীম আর হংকংস্থ আমার বন্ধু বজলুল কাদের হেলাল-এর প্রতি। আমার দুর্দিনে আমার প্রতি সত্যিই তাঁরা সহানুভূতি দেখিয়েছেন।

একটি ডেস্ক পরিবর্তন করে দেননি কর্তৃপক্ষ। এ দুঃখে যখন ১৯৯৫ সনে চাকরি ছেড়ে দেবার দরখাস্ত করি, তখন যিনি অনেক স্নেহ দিয়ে আমাকে ধরে রেখেছিলেন, সেই শ্রদ্ধেয় জেনারেল আব্দুর রব সাহেব আমার স্মৃতিতে অনেক শ্রদ্ধার আসন নিয়ে থাকবেন এই কারণে যে, সেনাপ্রধানের স্বাক্ষরের পরও তিনি আমাকে চাকরিতে পুনপ্রতিষ্ঠিত করেন এবং আমার ডেস্কটি পরিবর্তন করে দেবার জন্য তাঁর দপ্তর হতে লিখিত নির্দেশ দান করেছিলেন। আমার জন্য দুর্ভাগ্যজনক যে, ডি এস টি মহোদয়গণ তাঁদের সেনাধ্যক্ষের সে আদেশ পালন না করে আমাকে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে 'ডিএডি এসটি-৪' এ কাজ করে যেতে বাধ্য করেন।

www.pathagar.com

শ্রদ্ধেয় হযরত মুহিউদ্দিন খান (সম্পাদক মাসিক মদিনা ও বিখ্যাত মা'রেফুল কোরআনের তফসীর অনুবাদক) আমার প্রতি পর্ব-২ এর রচনায় দেরি করবার কারণে অসন্তুষ্ট হয়ে থাকলেও আশা করি তাঁর স্নেহ হতে বঞ্চিত হইনি। আল্লাহের পথে আমার জন্য তিনি জীবন্ত অনুপ্রেরণা। তিনি চেয়েছেন, আমি সবকিছু নিয়ে এই পুস্তক রচনার কাজে যেন আত্মনিয়োগ করি। হয়তো আল্লাহ্‌পাকের একজন বুজুর্গ ও অলী, আমার জান্নাতবাসিনী মা এবং এদেশের প্রকৃত ইসলাম সেবক হযরত মুহিউদ্দিন খানের দোয়ার বরকতে আজ 'আলকোরআন দ্য চ্যালেঞ্জ মহাকাশ পর্ব-২' আত্মপ্রকাশ করেছে অসংখ্য বৈরিতার মাঝখান হতেও। আমি জনাব হযরত মুহিউদ্দিন খান সাহেবের কাছে কৃতজ্ঞ।

শেষপর্যন্ত যে মানুষটি আমার জীবনের সকল ব্যর্থতার দুঃখময় ভার বহন করে একটি বারের জন্যও আমার প্রতি বিতৃষ্ণা কিংবা অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করেনি, সমস্ত আর্থিক ক্ষতির মুখে আমাকে কোনো প্রশ্নের সম্মুখেও তোলেনি, বরং সান্ত্বনা দিয়েছে,— 'যেখানে যে অবস্থায় আল্লাহ থাকতে দেবেন, সে অবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকব'— সে আমার স্ত্রী, এডভোকেট নাহরীন পারভীন। অসহনীয় পরিশ্রম আর ধৈর্য দিয়ে সে আমাকে অভাব বুঝতে দেয়নি। আমি দয়াময়ের কাছে তার জন্য প্রার্থনা করি যেন তিনি তাকে ক্ষমাপ্রাপ্তদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেন। এই পুস্তক লিখবার সময় চরম দুঃসময় গেছে আমার। আমার দু'সন্তান, শান ও শাবাব আমার চরম দুঃখের মাঝেও আমার চারপাশে হেসে-খেলে আমাকে আদর জানিয়েছে, শক্তি জুগিয়েছে। আমি তাদের জন্যও রাব্বুল আলামীনের কাছে প্রার্থনা করছি যেন তিনি তাদেরকে সৌভাগ্যবানদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেন।

সর্বশেষে যাকে ভোলা যায় না তিনি হলেন সে নিস্ঠুর দয়াময়— আমার সকল অভিযোগ আর সকল সন্তুষ্টি, সকল বিদ্রোহ আর

www.pathagar.com

সকল ভালোবাসা কেবল তাঁর জন্যই ; তিনি যেন আমার এ ক্ষুদ্র জীবনকে কেবলমাত্র তাঁর কোরআন ও তাঁর মানুষের সেবাতেই গ্রহণ করেন। মৃত্যু–আহত এ জীবনে আর কোথাও কোনো সার খুঁজে পাই না। যেদিকে তাকাই, সেখানেই যেন তিনি দৃশ্যের ওপারে অদৃশ্য হয়ে দাঁড়িয়ে যান! কোরআন পড়ে যে জ্ঞান হয়েছে, তার সার হলো— তিনি মানুষকে বড় ভালোবাসেন। তিনি কি জানেন, আমার জীবনের প্রার্থিতা কেবল তাঁর দয়া পাবার জন্য ; আর তা তাঁরই উদ্দেশে তাঁরই মানুষের মাঝে বিলিয়ে দেবার জন্য? তিনি কি আমায় গ্রহণ করবেন?

হায় দুঃখ! আমি যদি কখনো এ প্রশ্নের সঠিক উত্তরটি পেতে পারতাম।

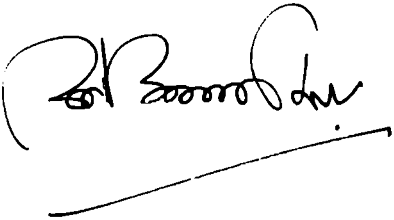

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ মূল পুস্তকে আল্লাহ্, তদীয় রসুল ও আমার মা এই তিনের ক্ষেত্রে সর্বনামে সম্মানসূচক ঁ(চন্দ্রবিন্দু) ব্যবহৃত হয়েছে— অন্যদের বেলায় নয়।

www.pathagar.com

ছায়া
ও
দুই তত্ত্বের বিরোধ নিষ্পত্তি

এক

খ্রীষ্টীয় ধর্মবাদের মূলে প্রোথিত জিয়োসেন্ট্রিক থিওরি এবং কোপার্নিকাসের প্রবর্তিত যুগান্তকারী তত্ত্ব যা বিজ্ঞানকে জিয়োসেন্ট্রিক থিওরির গ্রহণী–অন্ধকার হতে মুক্তিদান করেছিল, সেই হেলিওসেন্ট্রিক থিওরি— এ দুই-এর কোনোটাই যেখানে পরিপূর্ণভাবে সত্য ছিল না —সেখানে ঐ জিয়োসেন্ট্রিক তত্ত্বের যুগে বসে কোরআন আজকের উৎকর্ষময় বিজ্ঞানের সত্য ও সঠিক জ্ঞানকে অতি সহজ ভাষায় প্রকাশ করে রেখেছিল। কোরআনের প্রস্তাবিত সহজ ও বোধগম্য সত্যটি কেবল উপেক্ষা করে যাবার কারণেই মুসলমানরা কোপার্নিকাসের চাইতেও অধিকতর বাস্তব একটি তত্ত্ব দানের সুযোগ গ্রহণ করেনি। সুধী পাঠক, আপনার বিস্ময়কে তাক লাগিয়ে পবিত্র কোরআন উভয় তত্ত্বের বিরোধের অতি সুন্দর মীমাংসা করে রেখেছে। এই সত্যটি আজ আমাদের এই অধ্যায়ে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পাবেন। একই সাথে দেখতে পাবেন, সামান্য ছায়া যার প্রস্তাবটি অতি সহজ ও সাধারণ— সেই ছায়া-বিষয়ক প্রস্তাবের ভেতর সৃষ্টির কত বড় নিগূঢ় রহস্যের ইঙ্গিত রয়েছে। অনুভব করবেন, কোরআন কেবল স্পর্শ দিয়ে গেছে আর এই স্পর্শ জ্ঞানের এক মহা-বিস্তার দিগন্তের উন্মোচন ঘটিয়েছে।

www.pathagar.com

আমরা সকলেই জানি যে গণিতবিদ পিথাগোরাস পৃথিবী–কেন্দ্রিক বিশ্ব–ব্যবস্থার জন্ম দিয়ে যান। এই বিশ্বাসে মনে করা হতো যে সূর্য, চন্দ্র, জানা ৫টি গ্রহ— এরা সকলেই পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরছে। দার্শনিক এরিস্টটল এসে এই পাল্লাটি আরো ভারী করলেন। মহাবিশ্বের কেন্দ্রবিন্দু হলো এই পৃথিবী— আর তা হলো স্থির এবং দৃশ্যমান আকাশ হলো একটি নিখুঁত ও অনড় গম্বুজ সদৃশ পূর্ণাঙ্গ ও অপরিবর্তনশীল (perfect) সৃষ্টি। তারারা হলো ঐ গম্বুজে এঁটে থাকা বাতি— এই সব শ্রুতিমধুর চিন্তা–ভাবনা দিয়েই মানব

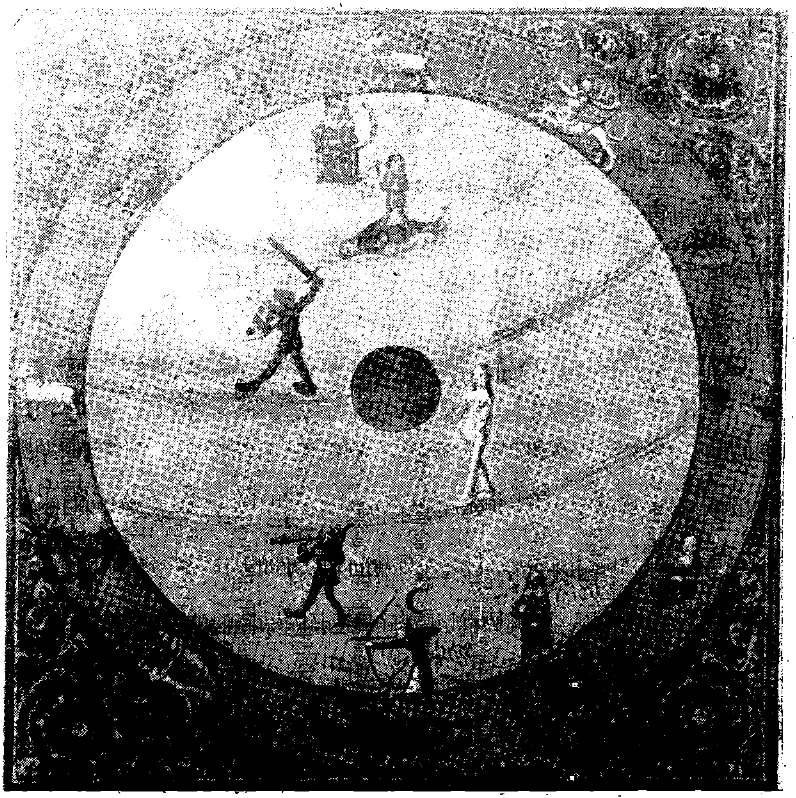

জিয়োসেন্ট্রিক তত্ত্বের রাশিচক্র চিত্র (Zoadic diagram of Geocentric Theory)/ এই তত্ত্বে সূর্য ও অন্যান্য জানা গ্রহসহ নক্ষত্র অধ্যুষিত তথাকথিত মহাবিশ্ব স্থির ও নিশ্চল পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরছে বলে মনে করা হতো।

www.pathagar.com

জাতির মহাবিশ্ব-সংক্রান্ত জ্ঞানের যাত্রা শুর হয়। আর এই শুরুকে বিশেষভাবে পছন্দ করলেন খ্রীষ্টান ধর্মযাজকগণ, যাদের একটা বিশেষ অংশ আজো জিয়োসেন্ট্রিক মতবাদের দোসর হয়ে বেঁচে আছেন। আমরা আজ জেনেছি— এটি শুধু একটি ভুল মতবাদই ছিল না, এটি গ্রহণযোগ্যতার যে কোনো পরিমাপের কাছে বর্জনীয়।

গ্রীক জ্যোতির্বিদ্যার সর্বশেষ ল্যাণ্ডমার্ক টলেমি (১০০–১৭৮ এডি) তার এলেমজেস্ট (Alamgest) পুস্তকে জিয়োসেন্ট্রিক তত্ত্বের ভিত আরো মজবুদ করে দেন। টলেমি শিখিয়ে যান, আকাশ তার গম্বুজের বক্রতলে সূর্য-তারাদের নিয়ে প্রত্যেক রাতে একবার প্রদক্ষিণ করে যায়। এ বিশ্বাসটি প্রচলিত ছিল টলেমি-যুগ হতে আরো ১৫০০ বছর পর্যন্ত। ইতিহাস এই সময়কে জ্যোতির্বিদ্যার গ্রহণকাল অর্থাৎ অন্ধকার সময় হিসাবে চিহ্নিত করেছে। For nearly 1500 years after Ptolemy, astronomy in Europe entered a period of total eclipse— the Dark Age. সুধী পাঠক, এই তথ্যটিকে বিশেষভাবে মনে রাখবেন।

বিশেষ করে মনে রাখতে হবে এ জন্য যে, এই গ্রহণকালের মধ্যেই অবতীর্ণ হয়েছিল পবিত্র কোরআন। খ্রীষ্টীয় সাত শতকে জিয়োসেন্ট্রিক তত্ত্বের দ্বারা বেষ্টিত দুনিয়ায় বসে পবিত্র কোরআন হেলিওসেন্ট্রিক তত্ত্বের চাইতেও অধিকতর সাফল্যজনক এবং চূড়ান্ত তত্ত্ব দান করে যায়। এমনি একটি বিস্ময়কর সত্য আমাদের সামনে অতি অনাদরে অবহেলায় উপেক্ষিত হয়। অথচ সম্পূর্ণ নির্ভুল নয় সেই হেলিওসেন্ট্রিক থিউরিকে বিজ্ঞানের অঙ্গনে রেনেসাঁ এনেছিল বলে ইতিহাসে সম্মান দেয়া হয়েছে।

১৫৪৩ সালে মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে প্রকাশিত পুস্তক On the Revolution of the celestial Spheres এর উদ্ধৃতি কোপার্নিকাসের হেলিওসেন্ট্রিক তত্ত্বের সারবস্তু তুলে ধরে— As if seated upon the royal thorne, the sun rules the family of the planets as they

www.pathagar.com

circle round— রাজকীয় সিংহাসনে বসে সূর্য তার সৌর-পরিবারের সদস্য গ্রহদেরকে নিয়ন্ত্রণ করে —এটাই বক্তব্য। উল্লেখ্য যে কোপার্নিকাস একটি স্থির সূর্যের কল্পনা করেছিলেন। জিয়োসেন্ট্রিক

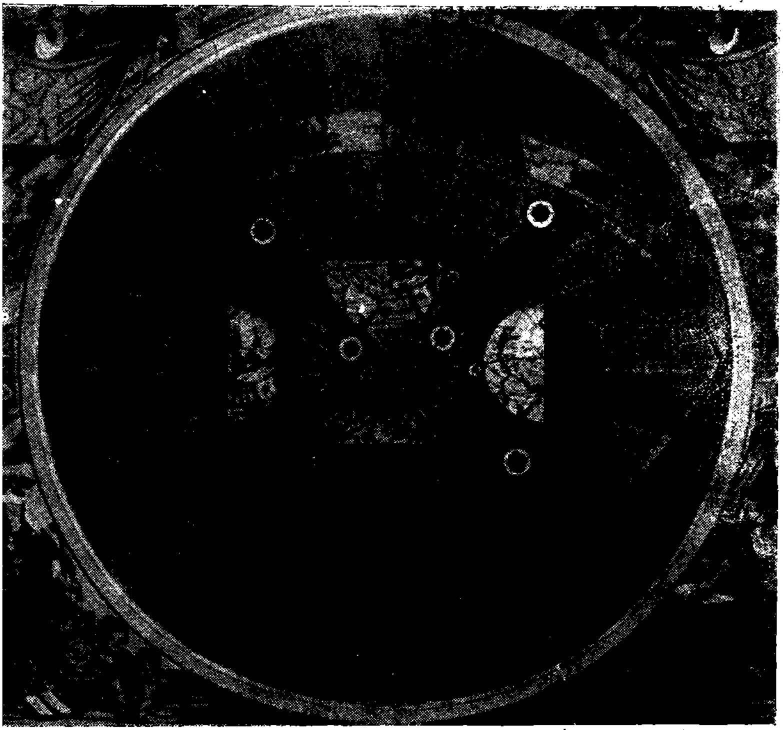

রাজসিংহাসনে বসে সূর্যের মহাবিশ্ব শাসন চিত্র। কখনোই সত্য নয়, তা সত্ত্বেও এই হেলিওসেন্ট্রিক তত্ত্বকেই ধরা হয় জ্যোতির্বিজ্ঞানের মুক্তির তত্ত্ব। অথচ কোরআনের ছায়াতত্ত্ব এর চাইতে শত-সহস্র গুণ স্মার্ট ও বিজ্ঞান বিশুদ্ধ।

তত্ত্বে পৃথিবী স্থির এবং হেলিওসেন্ট্রিক তত্ত্বে সূর্য স্থির— এই মিলটি ছাড়া দুই তত্ত্বে যে বৈপরীত্যটি ছিল, তা হলো পৃথিবী কেন্দ্রিক বিশ্ব-ব্যবস্থা হতে বেরিয়ে এসে সূর্য-কেন্দ্রিক বিশ্ব-ব্যবস্থার স্বপ্ন দেখা। এতে কৃতিত্বটি ছিল এইটুকুই যে, প্রথমটিতে একটি গ্রহ

www.pathagar.com

অন্যান্য গ্রহদের কেন্দ্রবিন্দু— এই মতবাদ হতে দ্বিতীয়টিতে একটি নক্ষত্র গ্রহগুলির কেন্দ্রবিন্দু, এবং পৃথিবীও এই নক্ষত্র-ব্যবস্থায় নক্ষত্রকেন্দ্রিক ঘূর্ণনে নিরত রয়েছে, পৃথিবী মহাবিশ্বের কেন্দ্রস্থল নয়— এই বাস্তবতাটিতে পৌঁছা। শুধুমাত্র এইটুকু বৈপরীত্যের অবস্থানে পৌঁছুতে বিজ্ঞানকে দেড় হাজার বৎসর পর্যন্ত অপেক্ষা করে থাকতে হয়। অথচ খ্রীষ্টীয় সাত শতকে কোরআন একটি সুন্দর তত্ত্ব দিয়েছিল যা উভয় তত্ত্বের চাইতে গ্রহণযোগ্যতর এবং আজকের বিজ্ঞানের যাচাইয়ে পরিপূর্ণ বিশুদ্ধতায় নির্বাচিত। দুঃখের বিষয় যে আজ পর্যন্তও আমরা এই তত্ত্বের সন্ধান জানি না। প্রিয় পাঠক—আমরা এই পাঠে উভয় তত্ত্বের বিরোধ মীমাংসার বাস্তবতাটি প্রত্যক্ষ করব।

আমরা উপলব্ধি করতে বাধিত হব যে দৃশ্যতঃ সামান্য একটি তথ্য যাকে আমরা এত যুগ অবহেলা করে এসেছি, আপাতদৃশ্যে যা কোনো জ্ঞানপূর্ণ প্রতিবেদন বলেই মনে হয় না— তেমনি কোনো প্রস্তাব কত পরিপূর্ণভাবে এই দুই মহাতত্ত্বের বিরোধের নিষ্পত্তি করেছে।

দুই

দৃশ্যতঃ জ্ঞানপূর্ণ নয়— অতি সাধারণ ও জ্ঞানউদ্দীপক মনে হয় না এমনিভাবে কোরআনে প্রস্তাবিত হয়েছে একটি প্রসঙ্গ— তা হলো ছায়া। অথচ এর মাঝে একটি ইতিহাস লেখা হয়ে আছে। ছায়া সম্পর্কে কোরআনে যে কয়েকটি আয়াত এসেছে আপাতদৃশ্যে সেগুলি অতিশয় সাদামাটা। এই সাদামাটা আয়াতগুলি মোটেই কিন্তু ততটা সাদামাটা নয়। এদের মাঝে তথ্য ও তত্ত্ব রয়েছে যা জ্ঞানী ও সূক্ষ্মদ্রষ্টাকে ইঙ্গিত করে যায় এক গভীর অনুভূতির জগতের দিকে। আপনার অনুভবকে অসার করে দিয়ে কোরআন এইসব সাদাসিধে আয়াতে সুগভীর তত্ত্ব পেশ করে গেছে যার সাথে রয়েছে আপনার, আমার অস্তিত্বের সম্পর্ক। চলুন, আমরা আয়াতসমূহের প্রস্তাবগুলি

www.pathagar.com

পর্যবেক্ষণ করি— "তাহারা (অবিশ্বাসকারীরা) কি লক্ষ্য করে না যে, আল্লাহ যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাদের ছায়ারা কিভাবে ডাইনে এবং বাঁয়ে স্থান পরিবর্তন করে? সেজদা করে তাহারা আল্লাহকে যখন তাহারা নত হয়" (১৬:৪৮)। কিংবা "তুমি কি লক্ষ্য কর না কিভাবে তোমার প্রতিপালক ছায়াকে সম্প্রসারিত করেন; তিনি ইচ্ছা করিলে উহাকে স্থির রাখিতে পারিতেন। অনন্তর আমরা সূর্যকে করিয়াছি ইহার নির্দেশক (২৫:৪৫) অতঃপর আমরা ইহাকে আমাদের দিকে ধীরে ধীরে উঠাইয়া আনি" (২৫:৪৬)।

ডানে ও বাঁয়ে ছায়াদের স্থান পরিবর্তনের মধ্যে লক্ষ্য করার মতো গুরুত্বপূর্ণ কি তথ্য থাকতে পারে? তাছাড়া আল্লাহপাকের প্রতি ছায়াদের সেজদাবনত হবার মধ্যে কোন বিশেষত্ব লুকিয়ে আছে— তা সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন হয়ে আসে। তিনি ছায়াকে নিশ্চল রাখতে পারতেন— এই তথ্যই-বা মানুষের জেনে লাভ কী? অন্যদিকে ছায়ার দিশারী তো সূর্যই— তা কোরআন দাবী করুক কিংবা না করুক, এটি একটি সহজ সত্য বৈ কিছুই নয়। এতদসত্ত্বেও কোরআনের পাতায় কোনোরূপ বিশেষত্ব ছাড়াই কি এই প্রস্তাবগুলি মুদ্রিত হয়েছে?

ছায়াদের গতি-চরিত্র নিয়ে কোরআন বিশ্লেষকগণ যে-সব তথ্য দিয়েছেন— তা সবই আমাদের জানা। ড. মরিস বুকাইলি ছায়ার বিষয়ে আলোচনা করেছেন তার বিখ্যাত 'বাইবেল কোরআন ও বিজ্ঞান' পুস্তকে। তার আলোচনার সারাংশে ঐশী মহাবিজ্ঞানের কোনো ইঙ্গিত নেই।।* তেমনি আল্লামা Yusuf Ali তার বিখ্যাত The Holy Quran-এ এই আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা দিতে কোরআনের অনুভূতি হতে অনেক দূরে রয়েছেন। তাদের এই দূরত্বের অবস্থানের মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয় যে কোরআনের মূল্যবান প্রস্তাবকে আমরা হৃদয়ঙ্গম করতে ব্যর্থ হয়েছি। মূলতঃ আমাদের ব্যর্থতার জন্য আমরাই কেবল লজ্জিত হবার শর্ত সৃষ্টি করি— কোরআনকে না

www.pathagar.com

বোঝার ব্যর্থতা আমাদের। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহপাক যথার্থই বলেছেন যে— *"এই কিতাবে কোনো কিছুর বর্ণনাই বাদ দেওয়া হয় নাই" (৬:৩৮)।* ছায়ার প্রসঙ্গটিও বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যদিও আমরা তার প্রস্তাব ও অনুভূতিকে বুঝতে ব্যর্থ হয়েছি।

আমরা এবার ছায়ার প্রসঙ্গে আসছি। ছায়া কেন সৃষ্টি হয়— তা আমরা জানি। ১৬:৪৮ আয়াতে ছায়া ডানে ও বাঁয়ে স্থান পরিবর্তন করে— এই ঘটনাটির প্রতি আমাদের লক্ষ্য করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সকালে ও সন্ধ্যায় ছায়া পূর্ব ও পশ্চিমে স্থান পরিবর্তন করে, প্রলম্বিত হয় এবং এ দুয়ের মাঝামাঝি সময় ছায়ার আকৃতিতে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। কোরআনের বাণী অনুযায়ী এ বিষয়গুলির প্রতি আমাদের লক্ষ্য করার নির্দেশ এসেছে। পূর্ব ও পশ্চিমে ছায়ারা প্রলম্বিত হয়ে থাকলেও কোরআন কেন ডান ও বাঁয়ের কথা বলেছে? পৃথিবীবাসীর জন্য কোনো স্থির দিক রয়েছে কি যেখান হতে ডান ও বাম বলে রেফারেন্স নেয়া চলে?

মনে করুন আমরা কেহই পৃথিবী কিংবা সূর্যের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে সচেতন নই এমন অজ্ঞ মানুষ যাদের বসবাস খ্রীষ্টীয় সাত শতকের কোনো সময়ে যখন কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে। আমরা দেখছি সকালে ও সন্ধ্যায় ছায়া প্রলম্বিত হয় এবং এই দুয়ের মধ্যবর্তী সময়ে ছায়ারা সংকুচিত হয়ে বিভিন্ন আকৃতি ধারণ করে। এমতাবস্থায় কোরআন ছায়া সম্পর্কে পূর্বোল্লিখিত আয়াতগুলি পেশ করেছে। ছায়াদের ডানে ও বামে স্থান পরিবর্তন করার বিষয়ে আমরা যেন দৃষ্টি নিক্ষেপ করি আমরা এই কোরানিক নির্দেশও পেয়েছি।

স্বাভাবিক কারণেই আমাদের মনে প্রশ্ন উদিত হবে— ছায়াদের কেন সকাল সন্ধ্যায় আকৃতির হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে? আমরা দৃশ্যতঃ যা বুঝতে পারি, তা হলো যে সূর্য পূর্ব হতে পশ্চিমে স্থান পরিবর্তন করে— তাই তার অবস্থানের পরিবর্তনের জন্য

www.pathagar.com

ছায়ারা পশ্চিমে ও পূর্বে দিক পরিবর্তন করে। এখানে আমরা প্রকৃতিতে যা দেখি, সে অনুসারে পৃথিবী স্থির, সূর্যই ঘোরে। আমরা জিয়োসেন্ট্রিক তত্ত্বের অভিমত মেনে নিতে পারি যে পৃথিবী অনড় ও সূর্য পৃথিবীর চারপাশে ঘুরছে। এখন আমরা কোরআনের আয়াতের পর্যালোচনা করব— *"সূর্য ও চন্দ্র আবর্তন করে সুনির্ধারিত কক্ষপথে (৫৫:৫) সূর্যের সাধ্য নাই চন্দ্রকে নাগালে পায়, রাত্রির সাধ্য নাই দিবসকে অতিক্রম করে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষে পরিভ্রাম্যমান (৩৬:৪০)। সূর্য তাহার গন্তব্যের (যেখানে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে) উদ্দেশ্যে ভ্রমণে নিরত। ইহা মহাপরাক্রমশালী মহাজ্ঞানীর ব্যবস্থিত নির্ধারণ (৩৬:৩৮)। তিনি চন্দ্র ও সূর্যকে করিয়াছেন নিয়মাধীন। প্রত্যেকেই পরিভ্রমণ করে একটি নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত" (৩১:২৯)।*

৩৬:৪০ আয়াতের রেশ টেনে এ পরিস্থিতিতে আমরা বলতে পারি যে সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবী ইত্যাদি সকলেই নিজ নিজ কক্ষপথে পরিভ্রমণশীল। পৃথিবী নিজ কক্ষপথে চলনে নিরত। প্রতিদিন সূর্য আমাদের পৃথিবীর পূর্ব হতে উদয় হয়ে পশ্চিমে অস্ত যাচ্ছে, ব্যতিক্রম হচ্ছে না। সূর্য হারিয়ে যাচ্ছে না। তার অর্থ হলো পৃথিবী তার চলার পথে অবশ্যই সূর্যকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে এমনভাবে যে স্টিমারের সাথে বাঁধা বোট বা ডিঙ্গিকে যেভাবে মূলযানটি টেনে নিয়ে যায়। ফলতঃ অতিক্ষুদ্র একটি কীট ঐ ডিঙ্গি কিংবা স্টিমারের অবস্থানের সম্পর্কটিকে এক ও অভিন্ন দেখবে যেমন আমরা সূর্য ও পৃথিবীর পারস্পরিক সম্পর্ককে প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ করি। আমরা যেহেতু কোরআন হতে প্রত্যেক বস্তুর সঞ্চালনের তথ্য সম্পর্কে অবগত রয়েছি এবং সূর্যকে পৃথিবীর চারদিকে প্রদক্ষিণ করতে দেখতে পাই, সেহেতু আশা করতে পারি যে— পৃথিবী যদি আদৌ কোনো কক্ষপথে সঞ্চালনশীল হয়, তবে অবশ্যই সূর্যকে ডিঙ্গিনৌকার মতো টেনে নিয়ে যাচ্ছে, ফলতঃ প্রতিদিন সূর্য–পৃথিবীর অপরিবর্তনশীল সম্পর্ক বজায় থাকছে।

www.pathagar.com

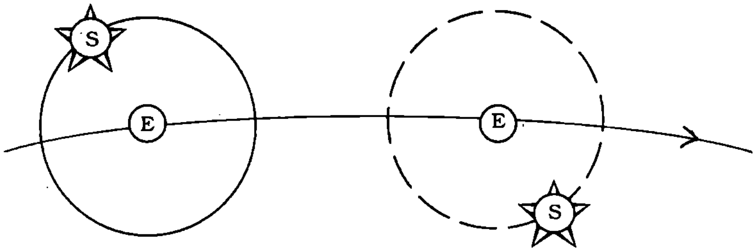

অবলোকন অনুসারে সূর্য পৃথিবীর চারপাশে ঘুরে একই সময়-দূরত্বের অনুপাতে। এটাই ছিল অতীতে বিশ্বাস। কোরআনের তথ্য অনুসারে সূর্য ও পৃথিবী উভয়ই নিজ নিজ কক্ষে পৃথক পৃথক ভাবে সঞ্চালিত হবার কথা। পৃথকভাবে সঞ্চালনশীল সূর্য ও পৃথিবী পরিণামে পরস্পর হতে হারিয়ে যাবার কথা। যেহেতু সময় ও দূরত্বের একই অনুপাত বজায় রয়েছে, সেহেতু আশা করা যায় যে, সূর্য পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরছে আর পৃথিবী সূর্যকে ডিঙ্গি নৌকার মতো সাথে টেনে নিচ্ছে।

সিদ্ধান্তটি অবশ্যই আমাদেরকে পরিতৃপ্ত করবে— কারণ প্রকৃতিতে যা ঘটছে তার অবলোকনের সঙ্গে এই সিদ্ধান্তের কোনো বিরোধ নেই। ভাবধারাটি জিয়োসেন্ট্রিক তত্ত্বকে অনুমোদন করে।

এখন আমরা কোরআনের ৩৬:৩৮ আয়াতের দিকে তাকালে একটু ভিন্নতর প্রস্তাব প্রত্যক্ষ করি— *"সূর্য তাহার গন্তব্যের উদ্দেশ্যে ভ্রমণে নিরত। ইহা মহা পরাক্রমশালীর সুনির্ধারিত ব্যবস্থা"*। এই আয়াত আমাদের পূর্ব সিদ্ধান্তকে (পৃথিবী কেন্দ্রিক ধারণাকে) সম্পূর্ণরূপে বাতিল করে দেয়। সূর্য তার নিজ কক্ষপথে পরিভ্রমণ করে থাকে এ তথ্য আমরা আয়াত ৩৬:৪০ হতে পেয়ে থাকি। আয়াত ৩৬:৩৮-এ সূর্যের আরো একটি বাড়তি গতির তথ্য সম্পর্কে জানতে পাই—সেটি হলো তার গন্তব্য বা مستقر এর উদ্দেশ্যে ভ্রমণের তথ্য। তাহলে আমরা দেখছি যে পূর্বের ধারণা, অর্থাৎ পৃথিবী সূর্যকে টেনে নিয়ে যাবার তথ্যটি ভুল। এখানে আমরা সিদ্ধান্ত পাই যে, সূর্যই একটি গন্তব্যের পানে ছুটে চলেছে— আর এই ছুটে চলার সময় সে পৃথিবীকেই টেনে নিয়ে যাচ্ছে পূর্বের কথিত ডিঙ্গি নৌকার মতো। সূর্য পৃথিবীকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে— আমরা এ

www.pathagar.com

তথ্যটি প্রাকৃতিকভাবেই পেয়ে থাকি; কারণ প্রতিদিন একটি অনুপাতে আমরা পৃথিবী, সূর্য ও অন্যান্য গ্রহদের অভিন্ন সম্পর্ককে বিদ্যমান থাকতে দেখি।

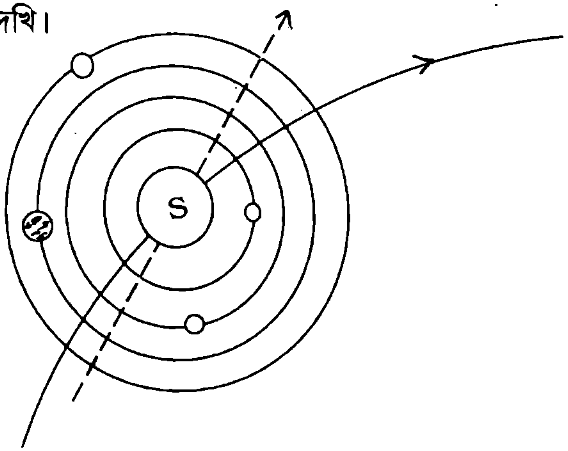

৩৬:৩৮ আয়াত অনুযায়ী সূর্য একটি গন্তব্যের দিকে ভ্রমণে নিরত রয়েছে। অন্যদিকে ৩৬:৪০ আয়াত অনুসারে সূর্য তার নিজ কক্ষপথেও ভ্রাম্যমান। সুতরাং আশা করা যায় যে, সূর্য পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ ব্যবস্থাসমেত গন্তব্যের পানে ছুটছে আর পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহরা সূর্যকে কেন্দ্র করেই ঘুরছে। অন্যথায় পৃথিবী, সূর্য ও সকল গ্রহের মধ্যে রক্ষিত স্থান-কালের অনুপাত ঠিক থাকা সম্ভব হতো না। উল্লিখিত দু'টি আয়াত বিস্ময়করভাবে বিজ্ঞানের দুই মহাতত্ত্বের চাইতে অধিকতর পূর্ণতায় ও শুদ্ধতায় বৈশিষ্ট্যময়।

সূর্য ও পৃথিবী ব্যবস্থাটিতে স্থান-কালের যে অপরিবর্তিত সম্পর্ক ও অনুপাত বজায় থাকছে প্রতিদিন, তারই নির্ণেয়ক হলো ছায়া। ছায়া একটি সুনির্দিষ্ট আনুপাতিক মান বজায় রেখে নীরবে আমাদেরকে আমাদের অবস্থানের বিষয়ে গুরুতর তথ্য দিয়ে যাচ্ছে যা মানুষ অবগত নয়। এই ছায়া-চিত্রটি আমাদের কাছে একটি অতিশয় মূল্যবান তথ্য— শুধু পাঠকের কাছে এটি হোক একটি মনে রাখার বিষয়।

উপরের বক্তব্যের প্রেক্ষাপটে আমরা আর জিয়োসেন্ট্রিক তত্ত্বের কথা অনুমোদন করতে পারি না।

www.pathagar.com

এ পর্যন্ত এসে আমরা কোরআন হতে যে সকল তথ্য পেয়েছি, তা নিম্নরূপ ঃ

ক) পৃথিবী ও সূর্য উভয়েরই নিজস্ব কক্ষপথ আছে।

খ) প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষপথে সদা চলমান।

গ) সূর্যের জন্য একটি গন্তব্যস্থল রয়েছে— সূর্য সে গন্তব্যের উদ্দেশ্যে সব সময় ছুটে চলছে।

এই তথ্যসমূহকে সম্ভাব্যতার ছকে সাজালে আমরা সহজেই পেয়ে যাই যে— যেহেতু পৃথিবী ও সূর্য সম্পর্ক একটি অপরিবর্তিত অনুপাতে বিদ্যমান, **সেহেতু উভয়ই নিজ নিজ কক্ষে সন্তরণরত এবং যেহেতু সূর্য একটি গন্তব্যের দিকে ছুটে চলছে, সেহেতু পৃথিবীর কক্ষ অবশ্যই সূর্য কেন্দ্রিক, সূর্য পৃথিবীকে কেন্দ্র করে নয়-- আর এই শর্তটি পূরণ না হলে লক্ষ্যের উদ্দেশ্যে চলমান সূর্য পৃথিবী হতে হারিয়ে যেত।** এখানে এসে সূর্য কাকে কেন্দ্র করে ঘুরছে সে প্রশ্নটিও উত্থাপিত হয়। সূর্য নিজ কক্ষে কোন অজানাকে কেন্দ্র করে ঘুরছে এবং গন্তব্যের উদ্দেশ্যে ভ্রমণে নিরত রয়েছে— এমন তথ্যগুলি কোপার্নিকাসের সূর্য ব্যবস্থার Royal thorne বা রাজকীয় সিংহাসনের উচ্ছেদ ঘটায়। এই আয়াতসমূহ জিয়োসেন্ট্রিক ব্যবস্থাকে যেমন নাকচ করে দেয়, তেমনি মহাবিশ্ব হেলিওসেন্ট্রিক নয় সে ধারণার জন্ম দিয়ে যায় যা রেনেসাঁ সৃষ্টিকারী হেলিওসেন্ট্রিক তত্ত্বের অনেক অনেক অগ্রে অবস্থান নেয়। এ ছাড়াও সুনির্দিষ্ট গন্তব্যের উদ্দেশ্যে ভ্রমণে নিরত সূর্যের অবস্থানিক মান এই সৃষ্টির কেন্দ্রটি যে অজেয় ও অজানা সে তথ্য প্রকাশ করে যায়। খ্রীষ্টীয় সাত শতকে কোনো কোরআন গবেষক যদি মাত্র দু'তিনটি আয়াতকে সত্যতায় বিশ্লেষণ করতেন, দেখতেন পবিত্র কোরআন প্রচলিত জ্ঞানের কত সম্মুখে অবস্থান করে।

"তাহারা কি সতর্কতার সঙ্গে কোরআনকে অনুধাবন করে না? আর যদি উহা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাহারো নিকট হইতে আসিত,

www.pathagar.com

তবে অবশ্যই তাহারা উহাতে বহু অসামঞ্জস্য ও অসঙ্গতি প্রত্যক্ষ করিতে (৪:৮২)। ইহা তো মানুষের জন্য এক বার্তা, যাহা দ্বারা উহারা সতর্ক হয় এবং জানিতে পারে যে, তিনিই একমাত্র উপাস্য, যাহাতে বোধশক্তিসম্পন্নরা উপদেশ গ্রহণ করে" (১৪:৫২)। আমাদের আলোচনা সুস্পষ্টতঃ তুলে ধরে যে— **আল কোরআন যে ব্যবস্থার অনুমোদন দিয়েছে, তা জিয়ো এবং হেলিওসেন্ট্রিক তত্ত্বের বাইরে একটি পৃথক তত্ত্ব যার মধ্যে বিবেচনা হলো যে পৃথিবী বা সূর্য কেহই স্থির নয়, সূর্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবী ঘুরছে এবং সূর্য বা পৃথিবী কেহই মহাবিশ্বের কেন্দ্র নয়। সূর্য চলমান তার নিজস্ব কক্ষপথে এবং একই সাথে সে একটি গন্তব্যের দিকে অগ্রসারমান। বিস্ময়করভাবে আজকের বিজ্ঞান যোগ্যতায় আমরা এখানে প্রত্যক্ষ করি যে কোরআন সূর্যের ছায়াপথ কেন্দ্রিক কক্ষ–গতি ও সোলার এপেক্স অভিমুখী যাত্রার কথাই অতি সুস্পষ্টতায় প্রস্তাব করে যাচ্ছে** (মহাকাশ পর্ব–১, সঞ্চালনশীল সূর্য দ্রষ্টব্য)। কোরআনের এই অতিক্ষুদ্র আয়াতের পরিসরে বিস্ময়কর মহিমাময় প্রকাশ কেবল কোরআনের আয়াতকেই ডেকে আনে— *"যদি তোমরা সন্দিহান হও আমার বান্দার উপর অবতীর্ণ বাণী সমূহের সম্বন্ধে— তবে ইহার অনুরূপ একটি আয়াত তৈরী করো যদি সত্যবাদী হও (২:২৩)। যদি না সক্ষম হও এবং কখনোই তাতে সক্ষম হইবে না— তবে ভয় করো সেই অগ্নিকে যাহার ইন্ধন হইবে মানুষ এবং প্রস্তর পিণ্ড" (২:২৪)।*

তিন

খ্রীষ্টীয় সাত শতকের অজ্ঞানতার অন্ধকারে বসেও পূর্বেকার আলোচনায় আমরা পৃথিবীর একটি কক্ষপথ সম্পর্কে অবহিত হয়েছি। আমরা জেনেছি কোরআন যে তথ্য দেয়, তা হলো সূর্য নয়— পৃথিবীই সূর্যের চারদিকে পরিভ্রমণ করে। এখন আমরা আলোচনাকে ছায়া বিষয়ক প্রশ্নের নিষ্পত্তির দিকে নিয়ে যাব।

www.pathagar.com

পৃথিবীর কক্ষের গতি–মূলকে সামনে নিয়ে দাঁড়ালে দেখা যাবে যে সকাল ও সন্ধ্যায় ছায়ারা ডানে ও বামে প্রলম্বিত হয়। আমরা কোরআনের আয়াতকে পাশাপাশি দাঁড় করালে দেখতে পাই যে, সূর্য কখনোই পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে না— ফলতঃ সূর্যকে প্রতিদিন সকালে পূর্বদিকে উদিত হতে ও পশ্চিম দিকে অস্ত যেতে দেখার ঘটনাটি একটি দৃশ্যতঃ সত্য বলে মনে হলেও কোরানিক তথ্যের ভিত্তিতে এর কোনো স্বীকৃতি নেই। কোরআন কখনোই সূর্যের পৃথিবী কেন্দ্রিক উদয়–অস্তকে অনুমোদন করে না। **অর্থাৎ আমরা যে সকাল ও সন্ধ্যায় ছায়াদের প্রলম্বন দেখে থাকি, তা সূর্যের ঘূর্ণনের কারণে ঘটছে না, বরং অন্য কোনো কারণে ঘটে থাকছে-- এই হলো কোরআনের তথ্য নির্ভর অনুমোদন।** কি হতে পারে সে কারণটি?

আমাদের এ প্রশ্নের কেবলমাত্র একটি উত্তর থাকতে পারে। সূর্য ও পৃথিবী ব্যবস্থা যা কোরআন অনুমোদন করে এবং ইতিপূর্বে আমরা যার বিশ্লেষণ দিয়েছি, তাতে দেখেছি যে সূর্য পৃথিবীকে নিয়ে উড়ে যাচ্ছে আর পৃথিবী নিজ কক্ষে থেকে সূর্যকে পরিভ্রমণ করছে। আমরা সুস্পষ্টভাবেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারি যে পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরার সময় কেবলমাত্র একটি পিঠে চিরকালই রাত থাকা উচিৎ ছিল। কিন্তু কার্যতঃ তা হচ্ছে না। আমরা দেখছি দিন ও রাত ধীরে ধীরে আসে ও ধীরে ধীরে বিগত হয়। একই সাথে ছায়ারা ধীরে ধীরে ছোট ও ধীরে ধীরে বড় হয়। কে ঘুরছে— এ প্রশ্নের অন্ততঃ এ উত্তরটি আমাদের জানা আছে যে সূর্য প্রতিদিনের দিনরাত ঘটাচ্ছে না, কারণ সকাল ও সন্ধ্যায় যেভাবে সূর্যকে উদয়–অস্ত যেতে দেখি— সে কাজটি কখনোই সূর্য করছে না! তাহলে কেন দিনরাত ও ছায়াদের আকৃতি পরিবর্তনের ঘটনা ঘটছে— যেখানে কেবলমাত্র পৃথিবীর প্রদর্শিত পৃষ্ঠে স্থির সূর্য কিংবা স্থির ছায়া ব্যবস্থা হবার কথা ছিল?

এর উত্তর আমরা প্রশ্ন হতেই পেয়ে যাই যা হলো, পৃথিবীর নিজস্ব বলয়ে এমন একটি গতি থাকতেই হবে যে গতিটি কক্ষপথের চলন

www.pathagar.com

হতে ভিন্ন এবং যে গতির কারণে পৃথিবীর প্রত্যেক পৃষ্ঠে ধীরে ধীরে আলো প্রকাশিত হয় এবং ধীরে ধীরে অন্ধকার হয়। এই গতিটি হতে হবে প্রতিদিনের। বার বার পুনরাবৃত্তি ঘটাবার মতো একটি ঘূর্ণির গতি যা প্রতিদিনের সকাল সন্ধ্যা সৃষ্টি করে ও ছায়াদের আকৃতির হ্রাস বৃদ্ধি ঘটায়। মূলতঃ এই একটি মাত্র সিদ্ধান্ত ছাড়া এখানে আর কোনো সিদ্ধান্তই তৈরী করা সম্ভব নয়। কোরআন আমাদেরকে বিকল্পহীনভাবে গ্রহণ করতে নির্দেশ দেয় যে, কক্ষগতির বাইরে পৃথিবীর আরো একটি গতি থাকতেই হবে যা পৃথিবী কক্ষের ডানে কিংবা বামে প্রবাহমান ! এই বাড়তি গতিটির কারণেই ছায়াদের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে, দিন রাতের পরিবর্তন আসে। **অর্থাৎ কোরআন পৃথিবীর আহ্নিক গতির প্রতি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়ে যায়। সাত শতকের মানুষ যদি কোরআনের আয়াতকে সতর্কতার সাথে বিশ্লেষণ করত-- তবে তারা পৃথিবীর কক্ষ-গতি ও সোলার এপেক্সের দিকে পথ চলার তথ্যের সাথে সাথে পৃথিবীর যে আরো একটি বাড়তি গতি রয়েছে যাকে আজ আমরা আহ্নিক গতি বলে জেনেছি, তারও সন্ধান লাভ করতে সক্ষম হতো।** পৃথিবীর যে একটি অক্ষ ঘূর্ণি থাকতে পারে, তার আরো একটি তথ্য কোরআন পেশ করেছে আরো একটি ভিন্ন আয়াতে—*"চলমান রাতের শপথ (৮৯:৪), চিন্তাশীল মানুষের জন্য ইহা একটি তথ্যপূর্ণ শপথ নয় কি?"* (৮৯:৫)

আমরা দিনকে চলমান দেখতে পাই কারণ সূর্যের স্থান পরিবর্তন হয়, ছায়ারা দৈর্ঘের তারতম্য ঘটায়। কিন্তু রাত চলমান হয় কিভাবে? রাতের আকাশে নক্ষত্রদের অবস্থানের চিত্র দেখে এখানেও আমরা অনুভব করতে পারি যে রাতটিও চলমান।

কোরআনের আয়াত পৃথিবী কিংবা সূর্য সৃষ্টির কেন্দ্র নয় এই তথ্যকে যথার্থ বলিষ্ঠতায় প্রকাশ করেছে। আয়াতগুলিকে পাশাপাশি সাজিয়ে আমরা ইতিমধ্যেই জেনেছি যে— কোরআন কেবল পৃথিবীর জন্য সূর্য-কেন্দ্রিক ঘূর্ণনের ব্যবস্থাটি অনুমোদন করেছে। অর্থাৎ সূর্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবী ঘোরে— এই শর্তটি পূরণ না হলে গন্তব্য পথে

www.pathagar.com

চলমান সূর্য কখনোই পৃথিবীর সাথে স্থান-কালের অপরিবর্তিত সম্পর্ক রাখতে সক্ষম হতো না। যে মুহূর্তে আমরা এ তথ্যটি পেয়ে যাই, তার পাশেই ছায়ার প্রস্তাবগুলি আমাদেরকে বলে যে, নিজ কক্ষে চলার সময় পৃথিবীর নিজ বৃত্তটিও একটি নিজস্ব ঘূর্ণিতে অব্যাহত রয়েছে বলে ছায়াদের প্রলম্বন ও সংকোচনের দৃশ্যটি সৃষ্টি হতে পারে। এর পাশে যখন ৮৯:৪-৫ আয়াত দু'টিকে এনে বিবেচনা করি— তখন আমরা তথ্য পাই, রাতটিও চলমান; এই চলমান রাত পূর্ব আকাশের নক্ষত্রদেরকে পশ্চিমের দিকে সঞ্চালিত হতে দেখায়; অন্যদিকে চলমান দিন ছায়াদেরকে উদয়ের কালে পশ্চিম দিকে প্রলম্বিত দেখায় এবং অস্তকালে এই প্রলম্বনকে দেখায় পূর্ব দিকে। তথ্যগুলি পাশাপাশি সাজালেই সহজে বোঝা যায় যে, পৃথিবীর নিজস্ব শারীরিক ঘূর্ণি আছে, আর এই ঘূর্ণির গতি হলো পশ্চিম হতে পূর্বের দিকে। ফলতঃ দিনে ছায়া হচ্ছে আর ছায়াদের বিদায় নেবার পর রাত হচ্ছে, রাতকে চলমান মনে হচ্ছে— এই দৃশ্যমান তথ্যগুলির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার সূত্র বিরাজ করছে, এই তথ্যগুলিই মূলতঃ ১৬:৪৮ ; ২৫:৪৫ ; ৮৯:৪ ও ৮৯:৫ আয়াতসমূহ মানুষের অনুভবের দুয়ারে পৌঁছে দিতে চেয়েছে। আমরা বলতে পারি— কোরআন একসাথে মাত্র গুটিকয়েক আয়াতে যে সব সন্ধান দিয়েছে, তা হলো ঃ

ক। সৃষ্টির সকল বস্তু নিজ নিজ কক্ষপথে পরিভ্রমণ করে।

খ। চন্দ্র, সূর্য ও পৃথিবীর নিজস্ব কক্ষপথ রয়েছে। যেহেতু তাদের কক্ষপথ রয়েছে, সেহেতু তারা কোনো না কোনো কেন্দ্রকে মধ্যে রেখে তার চারপাশে ঘোরে।

গ। সূর্য নিজ কক্ষে ঘোরার সময় আরো একটি বাড়তি চলনের সাথে সংশ্লিষ্ট যা সম্প্রতি আবিস্কৃত হয়েছে এবং সূর্যের গন্তব্য বা 'মুশতাকারের' বর্তমান বৈজ্ঞানিক পরিচয় হলো সোলার এপেক্স বা আলফা লাইরী নক্ষত্রপুঞ্জের দিকে।

ঘ। পৃথিবী সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘোরে।

ঙ। পৃথিবীর একটি নিজস্ব অক্ষ-চলন আছে যা পশ্চিম হতে পূর্বে গতিমুখী।

www.pathagar.com

চ। পৃথিবীর এই অক্ষ–গতিটি প্রতিপালন ব্যবস্থার সাথে বিসংশ্লিষ্ট।

কোরআনের আলোচ্য আয়াতগুলিকে চিত্ররূপ দান করলে আমরা যা পাই তা হলো ঃ

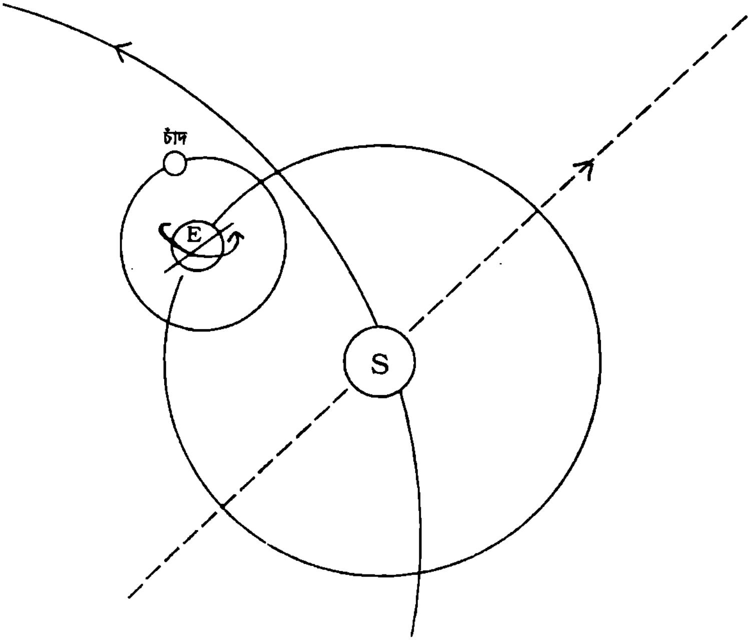

সূর্য ঘুরছে ছায়াপথকে কেন্দ্র করে। ঘুরবার সময় সাথে নিয়ে যাচ্ছে পৃথিবী ও গ্রহ পরিবার। একই সাথে ঘূর্ণিকালে তার কক্ষের সরণ বা drift ঘটছে একটি সুনির্দিষ্ট দিকে। বিজ্ঞানীগণ খুঁজে পেয়েছেন, সূর্যের এই সরণ বা চলন আলফা লাইরী কনসস্টেলেশনের দিকে (সোলার এপেক্স)। সেখানে তার জন্য ধ্বংস অপেক্ষা করে আছে। সেই হলো তার 'মুস্তাকার'।

বিস্ময়করভাবে বিজ্ঞানের সকল প্রাপ্তিই এই কোরানিক মডেলের সাথে সম্পূর্ণ এক ও অভিন্ন!

কোরআনের এই জ্ঞান–গাম্ভীর্য আমাদেরকে আবারো স্মরণ করিয়ে দেয়— *"এইগুলি কোরআনের নিদর্শন, যাহা তোমার প্রতিপালকের*

www.pathagar.com

নিকট হইতে তোমার প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহা সত্য (১৩:১) বল তোমরা কোরআন বিশ্বাস কর আর নাই কর— যাহাদেরকে ইহার পূর্ণ জ্ঞান দেওয়া হইয়াছে, তাহাদিগের নিকট যখনই ইহা পাঠ করা হয়, তখনই তাহারা সিজদায় লুটাইয়া পড়ে" (১৭:১০৭)।

চার

মহাবিশ্বের পরিমাপে চাঁদ হলো আমাদের সবচাইতে নিকটতম সহোদর। চাঁদ ও পৃথিবীর মধ্যে পার্থক্যটুকু এই যে চাঁদ একটি গ্রহকে আবর্তন করে যেখানে পৃথিবী সূর্যকে কেন্দ্র করে প্রদক্ষিণ করছে। এইটুকু পার্থক্য ছাড়া সূর্য হতে দূরত্বে কিংবা প্রকৃতিতে (Charcteristics) কিংবা সাদৃশ্যে চাঁদ পৃথিবীর অতি নিকটবর্তী সদস্য। আমরা জানি যে ক্ষুদ্রতম গ্রহের চাইতে চাঁদের ব্যাস বেশি— অর্থাৎ প্লুটোর চাইতে চাঁদ বড়। চাঁদকে কোনোমতে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ বলয় হতে ঠেলে দিতে পারলে চাঁদ একটি গ্রহ হিসাবে তার অবস্থান সুদৃঢ়তায় গড়ে নিতে সক্ষম।

চাঁদের 'লক–ইন মোশন' সম্পর্কে আমরা অনেকেই হয়তো জেনে থাকব। চাঁদ আজীবন পৃথিবীর প্রতি একটি মুখ প্রদর্শন করে আছে। চাঁদের যে পিঠটি আমরা দেখতে পাই— সবসময় তাকেই দেখি, এবং কখনো সম্ভব নয় যে চাঁদের অন্য পিঠটিতে কোনো পৃথিবীবাসীর দৃষ্টি নিক্ষেপ করা।

চাঁদের এই গতিটি যদি পৃথিবীকে দান করা হতো— তবে যা ঘটত তা হলো যে, চাঁদের মতো পৃথিবীর আলোকিত পৃষ্ঠটি চিরদিন সূর্যের প্রতি মুখ করে থাকত। ফলতঃ এই আলোকিত পৃষ্ঠে ক্রমে ক্রমে উত্তাপ পুঞ্জিভূত হতে থাকত। এই উত্তাপের প্রকৃতি এমন হতো যে ক্রমে ক্রমে তা বেড়েই চলত। এই ক্রমবর্ধিষ্ণু উত্তাপ হয়তো পৃথিবীর মাটিকে পুড়িয়ে তামার মতো করে ফেলত—

www.pathagar.com

পদার্থরা টগবগ করে ফুটত ফুটন্ত পানির মতো। আর সেখানে একটা ঘটনা ঘটত— বস্তুর ছায়া সেখানে হতো স্থির। এমতাবস্থায় সকাল কিংবা সন্ধ্যা বলতে কিছুই থাকত না। সবসময় হতো ভর দুপুর।

মহাশূন্যের নিকষ-কালো অন্ধকারে আমাদের অনুভূতির অগোচরে ঘুরছে পৃথিবী নিজ অক্ষে পশ্চিম হতে পূর্ব দিকে। এ কারণেই ছায়ারা সকালে ও সন্ধ্যায় যথাক্রমে পশ্চিম ও পূর্ব দিকে প্রসারিত হয়। কোরআনের ছায়া বিষয়ক তথ্য পৃথিবীর ঘূর্ণি ও গতি প্রকৃতির চিত্রই তুলে ধরে এবং এর সাথে আরো অনেক।

স্থির ছায়ার এই জগতে কেবল মৃত্যু ছাড়া অন্য কিছু প্রত্যক্ষ করার সুযোগ থাকত না। বুঝি হয়তো এমনি কোনো বাস্তবতার প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে কোরআন ছায়ার প্রসঙ্গকে ডেকে এনেছে। বলতে চেয়েছে— "*তুমি কি দেখ নাই কিভাবে তোমার প্রতিপালক ছায়াকে বিস্তৃত করেন? তিনি ইচ্ছা করিলে ইহাকে নিশ্চল রাখিতে পারিতেন (২৫:৪৫)।*" চাঁদের বাস্তবতার প্রতি ইঙ্গিতবহ এই আয়াত মূলতঃ

www.pathagar.com

আমাদেরকে আমাদের সব চাইতে প্রধান ও নিকটতম প্রতিবেশীর উদাহরণটি হতে শিক্ষা নেবার প্রতি ইঙ্গিত দেয়। জানিয়ে যায়— যে 'লক ইন মোশন' চাঁদকে দেয়া হয়েছে, যদি তা-ই পৃথিবীকে প্রদান করা হতো, তবে পৃথিবীর ছায়ারা ডানে কিংবা বাঁয়ে আর দিক পরিবর্তন করত না। এর ফলাফল হতো ভয়াবহ। জীবন নামক দুর্লভ বস্তু চিরদিনের জন্য পৃথিবী হতে উবে যেত। সম্ভবতঃ এই সত্যের প্রতি দৃষ্টি রেখে মানুষ কৃতজ্ঞ হোক— এটাই আল্লাহ চান। তিনি মানুষকে বাস্তব প্রমাণ দিয়ে দেখিয়ে দিতে চান যে পৃথিবীর প্রতিটি অস্তিত্ব, যারা ছায়া প্রকাশ করে— তাদের ছায়ারা ডানে কিংবা বামে স্থান পরিবর্তন করার ভেতর দিয়ে প্রতিপালকের প্রতি সেজদাবনত হয়, অর্থাৎ ছায়ারা এই পৃথিবীর জীবনময় দুর্লভ পরিবেশ বজায় থাকার বিষয়ে একটি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপক প্রকাশ কিংবা নিদর্শন হিসাবেই আত্মপ্রকাশ করে। ছায়াদের প্রতিটি স্থান বদলানো যেন মূলতঃ এক একটি কৃতজ্ঞতার স্বীকারোক্তি এজন্য যে, একটি দুর্লভ ব্যবস্থায় ব্যবস্থিত হবার কারণেই কেবল ছায়ারা একটি সূক্ষ্ম পরিমাণগত স্থান পরিবর্তনের নিয়ম পালন করে থাকে। পৃথিবীতে ছায়াদের স্থান বদলানোর ঘটনা যেখানে বিরাজমান, সেখানে এর সব চাইতে নিকটরর্তী সহোদরের জন্য স্থির ছায়ার ব্যবস্থাই হলো প্রাকৃতিক ঘটনা। চাঁদে যা ব্যবস্থিত রয়েছে পৃথিবীতে তা নেই— এই করুণার কৃতজ্ঞতাপাশে বাঁধা পৃথিবীর প্রতিটি জড় পদার্থ ও উদ্ভিদ যেন ছায়াদের পরিবর্তনের সাথে সাথে স্রষ্টার কৃতজ্ঞতাই প্রকাশ করে কিংবা এদের প্রতিটি মুহূর্তের স্থান পরিবর্তন যেন প্রতিটি মুহূর্তেই স্রষ্টার প্রতি বিনীত কৃতজ্ঞতার পরিমাপক। আর এই তথ্যটিই যেন ১৬:৪৮ আয়াতটির বাণীগাম্ভীর্যে প্রতিফলিত হয়। এই প্রতিফলন মানুষের অনুভূতিতে প্রোথিত হোক পরম জ্ঞানে ও শ্রদ্ধায়, সে কারণেই বুঝি দয়াময় মানুষকে জানাতে চান— *"সেজদা করে তাহারা আল্লহকে যখন তাহারা অবনত হয়"।* সৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠ ও বুদ্ধিদীপ্ত মানুষ এই জীব ও জড়ের সেজদার প্রতি লক্ষ্য করে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুক অনুভূতি আর প্রকৃত জ্ঞানের মাত্রায়, এই আয়াত প্রকারান্তরে আমাদেরকে এই নির্দেশটিই দিয়ে যায়।

www.pathagar.com

এখানে এই ঘটনার সাথে আরো একটি বিশেষত্ব জড়িয়ে রয়েছে যা প্রকাশ পেয়েছে ২৫:৪৫ আয়াতে। ছায়া যেভাবে সম্প্রসারিত করা হচ্ছে— তার সাথে আল্লাহতায়ালা নিজকে প্রতিপালক হিসাবে পরিচয় দান করেছেন। ছায়াদের স্থান পরিবর্তন ব্যবস্থার সাথে যে জীব ও উদ্ভিদ জগতের— তথা সমস্ত জীবকুলের প্রতিপালনের শর্তটি জড়িয়ে রয়েছে— এই আয়াত তারই প্রকাশক।

বলা দরকার যে পৃথিবীর দিন–রাত্রি সংঘটিত হচ্ছে তার আহ্নিক গতির কারণে; যে গতিটির জন্যই ছায়া সৃষ্টি হয়। এই গতির কারণে পৃথিবীর সকল অংশে একটি সুষম ও সুনির্দিষ্ট সময় দৈর্ঘ্যের দিন ও রাত্রি সংঘটিত হতে পারে। সৃষ্টির জন্য এই দিনরাত্রি এক সীমাহীন নিয়ামক। এই দিনরাত্রির সৃষ্টি রহস্যে সমস্ত উদ্ভিদ ও জীবকুলের ইতিহাস রচিত হয়েছে। জীবন ও জীবনময় পরিবেশ সৃষ্টির পেছনে এই দিন–রাত্রির সৃষ্টি এক বিকল্পহীন শর্ত (দ্রষ্টব্য মহাকাশ পর্ব–১)। আর এই দিনরাত্রি সূচিত হয় সেই দুর্বোধ্য চলন, আহ্নিক গতির দ্বারা যা প্রকারান্তরে ছায়াসমূহকে ডানে ও বাঁয়ে চালিত করে, কিংবা এদের পরিমাপক হয় এবং এদের হ্রাস বৃদ্ধি ঘটায়। ঘুরিয়ে বললে বলতে হয়— এই ছায়াদের হ্রাস–বৃদ্ধি কিংবা ডানে ও বায়ের সঞ্চালনের মূলে জীবনের সকল রহস্য লুকিয়ে রয়েছে। তাই এই ছায়াদের স্থান পরিবর্তনের বিষয়টি প্রতিপালন ব্যবস্থারই একটা বিধান প্রকাশক বিধায় ছায়া সম্প্রসারণের ভূমিকায় স্রষ্টা নিজকে প্রতিপালক বিধান হিসাবে পরিচয় দিতে পছন্দ করেছেন। তিনি ছায়াকে স্থির না রেখে জীবন ব্যবস্থাকে সুগম করে প্রতিপালকের দায়িত্ব পালন করেছেন এবং এই ছায়ারা তাঁর এই প্রতিপালন ব্যবস্থারই সাক্ষ্য দিচ্ছে। এ সত্যটিই কেবল ২৫:৪৫ আয়াতে তুলে ধরা হয়েছে। *"অনন্তর আমরা সূর্যকে করিয়াছি ইহার নির্দেশক"* এই আয়াতাংশও রুবুবিয়াতের সম্প্রসারিত ব্যবস্থার সাথে বিসংশ্লিষ্ট। আমরা ছায়াদের সম্প্রসারণ বলতে একটি জীবন প্রতিপালন ব্যবস্থার চিত্র পাই; আর এই চিত্রের মূলে যে অস্তিত্বটি সকল জীবনীশক্তির যোগান দেয়—

www.pathagar.com

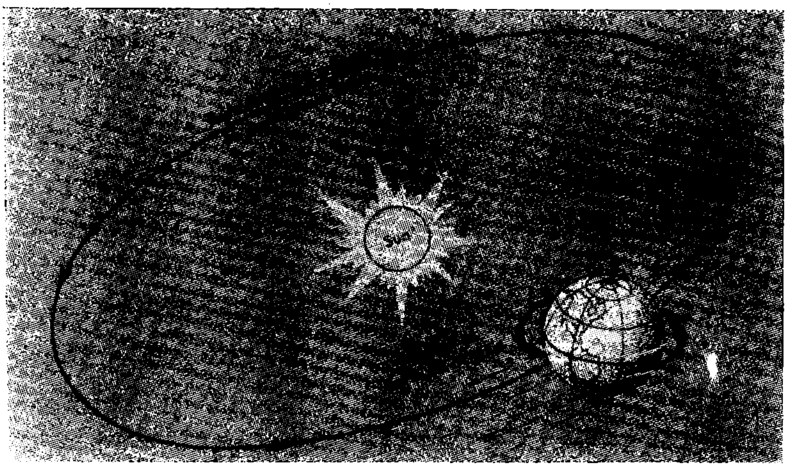

নিজ অক্ষে পশ্চিম হতে পূর্ব দিকে ঘূর্ণায়মান পৃথিবীর চিত্র। কক্ষ চলনের পাশে অক্ষ-ঘূর্ণি হলো একটি বাড়তি গতি যার মধ্যে ছায়াদের সংকোচন ও প্রসারণ, দিন-রাতের পরিবর্তন এবং এই পৃথিবীর যাবতীয় জীবের ভাগ্যের লিখনের ইতিহাস রচিত হয়েছে।

তা হলো কেবল সূর্য ; সালোকসংশ্লেষণে খাদ্য ভাণ্ডার তৈরী না হলে জীবন কখনোই পৃথিবীতে টিকতে পারত না। আর এর পেছনে যত কৃতিত্ব— সবটাই হল সূর্যের। *'অনন্তর আমি সূর্যকে করিয়াছি ইহার নির্দেশক'* । অর্থাৎ সূর্যকে করা হয়েছে ছায়াদের ডানে বামে সঞ্চালিত হবার নির্দেশক, যা মূলতঃ রুবুবিয়াতের প্রতিপালন ব্যবস্থায় আহ্নিক গতির হিসেব করা সঞ্চালনের সাথে খাদ্যভাণ্ডার তৈরীর বিষয়ে সূর্যের ভূমিকার প্রতিও ইঙ্গিতবহ। এই আয়াতাংশ ইঙ্গিতবহ পুরো সালোকসংশ্লেষণ ব্যবস্থার! এই ব্যবস্থার একটি এবং একমাত্র নির্দেশক হল সূর্য, যার কোনো বিকল্প হয় না আর তার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হলো ছায়াদের পরিমিত ও নির্ধারিত স্থান পরিবর্তনের ঘটনা। এই ঘটনায় সামান্য ব্যতিক্রম, সামান্য পরিবর্তন, সামান্য ত্রুটি এই সুন্দর পৃথিবীকে নারকীয় রাজ্যে পরিণত করে

www.pathagar.com

দিতে পারে। প্রতিপালক আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ছায়াদের প্রসঙ্গ টেনে রুবুবিয়াতের মহাজীবন ব্যবস্থার প্রতি সূর্যের ভূমিকার প্রতি ইঙ্গিত করে রেখেছেন— যা অতি বিস্ময়কর প্রকাশ!

"অনন্তর আমরা সূর্যকে করিয়াছি ইহার নির্দেশক"— এই আয়াতাংশ আপনাকে ৩০০ বিসি অতীতে মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া শহরের ছোট্ট একটি ঘটনার দিকেও নিয়ে যাবে। সূর্য ও ছায়ার সম্পর্ক আরো কত সুগভীর ও তথ্যবহুল— তারই একটি ঘটনার উদ্ধৃতি দিচ্ছি এখানে। Eratosthenes নামক একজন জ্যোতির্বিদ, ঐতিহাসবেত্তা, ভূগোলবিদ, দার্শনিক ও কবি হঠাৎ করে একটি তথ্য অবগত হলেন যে— সায়েন (Syene) এলাকার দক্ষিণ সীমান্তের নীলনদ স্পর্শ করা একটি আউটপোস্টে ২১ জুন মধ্য দুপুরে কোনো খাড়া খুঁটি কিংবা অন্য 'ফিচার' হতে কোনো প্রকার ছায়াপাত হয় না। লম্বালম্বিভাবে খাড়া বস্তু ঐ দিন দুপুরে হয়ে যায় ছায়া শূন্য। গ্রীষ্মের অয়নান্ত অবস্থানে (নিরক্ষ রেখা হতে সূর্যের দূরতম স্থানে অবস্থান কাল, ইহা বৎসরের দীর্ঘতম দিন, Summer solstice) যখনই সময় মধ্য দুপুরের দিকে যেতে থাকে, মন্দিরসমূহের স্তম্ভ–ছায়া ক্রমে ক্রমে ছোট হয়ে আসতে থাকে। ঠিক দুপুরবেলা মন্দির স্তম্ভ ছায়াশূন্য হয়ে যায়। ঐ সময়ে কোনো গভীর কূপে তাকিয়ে সূর্যের প্রতিচ্ছবি দেখা সম্ভব হয়। এ সবের অর্থ হলো— সূর্যটি ঠিক মাথার উপর এসে পৌঁছে যায়।

এ ধরনের একটি অবলোকন— হয়তো সহজেই এড়িয়ে যাবার মতো। খুঁটি আর তার ছায়া, মন্দিরের স্তম্ভছায়া, কূপের জলে সূর্যের প্রতিচ্ছবি, সূর্যের অবস্থান ইত্যাদির কোনোটিই কোনো সাধারণ মানুষের অনুভবকে স্পর্শ করার মতো নয়। কিন্তু Eratosthenes এর দৃষ্টিতে এটি এড়ালো না। তিনি একই পর্যবেক্ষণের কাজটি আলেকজান্দ্রিয়ায় করে দেখলেন। তিনি দেখলেন, আলেকজান্দ্রিয়াতে জুন ২১ তারিখের ভর দুপুরে একটি খাড়া খুঁটি ছায়াপাত করে। সায়েন অঞ্চলের মতো ছায়াশূন্য হয় না। একই মাপের খুঁটি একই

www.pathagar.com

দিন-ক্ষণে একস্থানে ছায়া ফেলে— অন্যস্থানে ছায়াপাত করে না। জিজ্ঞাসার কারণ হয়ে এটি দেখা দিল Eratosthenes এর মনে।

খ্রীষ্টের জন্মের পূর্বে তো অবশ্যই এমনকি তাঁর জন্মের পরও মানুষ বিশ্বাস করত— এই পৃথিবী একটি প্রসারিত সমতল ক্ষেত্র ; অন্ততঃ আমরা আজ যেমন করে বুঝি যে এটি একটি গোলাকৃতির পিণ্ড, এমন কিছুই নয়। এরাটোস্থেন্স ভাবলেন— একই সময়ে একই মাপের দুটি খুঁটি একটি আলেকজান্দ্রিয়ায় ও একটি সায়েন অঞ্চলে থাকলেও সূর্য অনেক দূরে ও অনেক বড় বস্তু হবার কারণে পৃথিবীর সকল স্থানই যদি সায়েনের মতো সূর্যের জন্য উল্লম্বতল হয়, তবে সায়েন ও আলেকজান্দ্রিয়ায় একই সময়ে (২১ জুন) একই মাপের খুঁটি একই ফলাফল দেবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সায়েন অঞ্চলের খুটি ছায়াশূন্য ও আলেকজান্দ্রিয়ার খুঁটি ছায়াযুক্ত হবার কারণ নিয়ে এরাটোস্থেন্স ভেবে চললেন। তিনি আরো ভাবলেন, যদি সময়টি ২১ জুন নাও হয়, তবে সায়েন কিংবা আলেকজান্দ্রিয়ায় একই সময়ে সমমাপের খুঁটি সম দৈর্ঘের ও সমান কৌণিক বিস্তারসম্পন্ন ছায়ার জন্ম দেবে। কিন্তু কার্যতঃ এই কৌণিক মান এবং ছায়া দৈর্ঘ্যে পার্থক্য পাওয়া যায়। এর অর্থ— এই পৃথিবী কোনোভাবে সমতলরূপে প্রসারিত নয়— পৃথিবীর পৃষ্ঠটি অবশ্যই বক্রতল। এরাটোস্থেন্সে'র এই এক্সপেরিমেন্ট হতে শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল— পৃথিবী একটি গোলাকার বস্তু। এ আবিস্কারটি ছিল যুগান্তকারী।

"অতঃপর তিনি সূর্যকে করিয়াছেন ইহার (ছায়ার) নির্দেশক"। এই আয়াতাংশ আমাদেরকে আরো গভীরতায় নিয়ে যায়। এরাটোস্থেন্স হিসাব করলেন— আলেকজান্দ্রিয়া ও সায়েন এই দুই অঞ্চলের দূরত্ব পৃথিবীর পৃষ্ঠতলে প্রায় ৭° ডিগ্রী কৌণিক দূরত্বে অবস্থিত যা ৩৬০° ডিগ্রীর পঞ্চাশ ভাগের এক ভাগ প্রায় (যদি ভাবা যায় যে, সায়েন ও আলেকজান্দ্রিয়া অঞ্চল হতে দুটি উল্লম্ব খুঁটি পৃথিবীর কেন্দ্র পর্যন্ত

www.pathagar.com

প্রোথিত করা হয়েছে, তবে তারা পরস্পরকে ৭° ডিগ্রীতে ছেদ করবে)। আলেকজান্দ্রিয়া ও সায়েনের দূরত্ব ছিল ৮০০ কিঃ মিঃ যা এরাটোস্থেন্স জানতেন। তিনি এভাবে সহজেই পৃথিবীর পরিধি ৫০ ৮০০ = ৪০,০০০ কিলোমিটার (২৫,০০০ মাইল) বের করতে সক্ষম হলেন। তিনি কেবল সূর্যের আলোকে ছায়ার-নির্দেশক তথ্যের ভিত্তিতে দুটি বিশাল আবিষ্কার সম্পন্ন করলেন— এই পৃথিবী সমভূমি বা flat নয়; তা একটি গোলক (Sphare) এবং এই গোলকের পরিধি ২৫,০০০ মাইল বা ৪০,০০০ কিলোমিটার। উল্লেখ্য যে এ আবিষ্কার পৃথিবীর অনেক নাবিককে পৃথিবী পরিভ্রমণের জন্য উৎসাহী ও সাহসী করে তুলেছিল। পৃথিবী গোল— সুতরাং অনন্তে হারিয়ে যাবার ভয় নেই, পথ ভুল করে হলেও ফিরে আসবার পথ খোলা থাকবে— এই বিশ্বাসটি দুঃসাহসী নাবিকগণ বিশেষভাবে Christopher Columbus কে আমেরিকা আবিষ্কারের পথটিও দেখিয়েছিল যা মাত্র সেদিনের কথা!

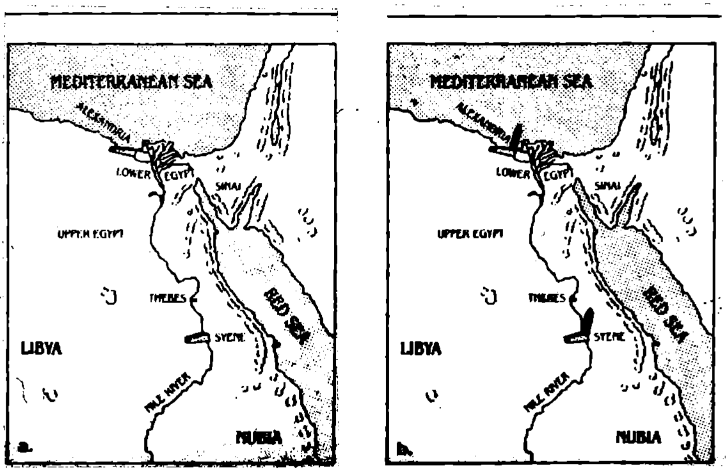

রেখচিত্র a আলেকজান্দ্রিয়া ও সায়েন অঞ্চলের ভৌগোলিক দৃশ্য প্রদর্শন করে। খ্রীষ্টীয়বাদের Flat পৃথিবীতে উভয় অঞ্চলে লম্বালম্বিভাবে প্রোথিত খুঁটি ২১ শে জুন মধ্য দুপুরে এই চিত্রে প্রদর্শিত উভয় অঞ্চলের খুঁটির মতো ছায়াশূন্য হবার কথা ছিল। কিন্তু

www.pathagar.com

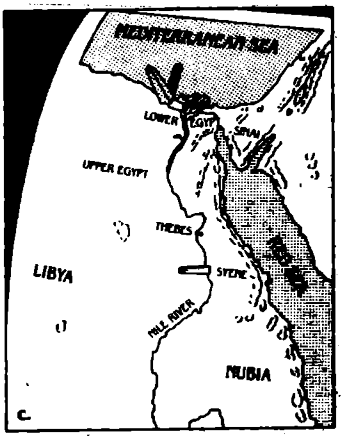

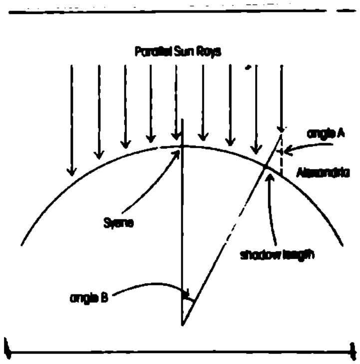

প্রকৃতপক্ষে বাস্তব ঘটনাটি ঘটে চিত্র b এর মতো (২১ জুন ব্যতীত)। ২১ জুন মধ্য দুপুরে উভয় অঞ্চলে প্রোথিত খুঁটি চিত্র c এর মতো দেখায়। শেষ চিত্রটি হলো আগের ৩টি চিত্র হতে প্রাপ্ত উপাত্তকে কাজে লাগিয়ে সিদ্ধান্তকৃত ফলাফল যা সায়েন ও আলেকজান্দ্রিয়া এর কৌণিক দূরত্বমানকে ৭° ডিগ্রীতে প্রদর্শন করে। এই ফলাফলকে কাজে লাগিয়ে জানা যায় যে, পৃথিবীর আকৃতি গোল এবং এর পরিধি ২৫,০০০ হাজার মাইল আর সমুদ্রে ভ্রমণকারী নাবিকদের নিরুদ্দেশে হারিয়ে যাবার কোনো ভয় নেই।

অনেকেই হয়তো ফোড়ন তুলতে পারেন— এরাটোস্থেন্স ছায়া, সূর্য ও পৃথিবীর সম্পর্কটি আবিষ্কার করেছিলেন প্রায় খৃষ্টপূর্ব ৩০০ শতকে। আর কোরআনের বাণী আসে তার প্রায় হাজার বছর পর। কোরআন কি ঐ আবিষ্কারের ফলাফলটি দেখে ঐ আয়াতের প্রসঙ্গটি এনেছে? (যদি আমরা পৃথিবীকে Curved Sphare হিসাবে কোরানিক ইঙ্গিতে চিহ্নিত বলে ধারণা করতে চাই)। আমার মনে হয়, এমন সমালোচনাটি আমরা মুখোমুখি হতে পারি এভাবে যে— এরাটোস্থেন্সে'র আবিষ্কারের অনেক আগে পৃথিবীর জন্মলগ্ন হতে সূর্য, ছায়া ও পৃথিবীর সম্পর্কটি বিদ্যমান ছিল এবং অদ্যাবধি তা এমনি রয়েছে। ফলতঃ তা হয়তো কোনো 'ফোড়ন কাটায়' প্রভাবিত হবার মতো নয় এ জন্য যে, এই পৃথিবী, সূর্য ও কোরআনের যিনি

www.pathagar.com

স্রষ্টা, এরাটোস্থেন্স তাঁরই একজন আজ্ঞাবাহী মাত্র! তিনি কেবল প্রকৃতিতে বিরাজমান সত্যের ছবিটিই দর্শন করেছিলেন। সূর্য ও পৃথিবীর যিনি সৃষ্টিকর্তা, তিনিই যে কোরআনের স্রষ্টা— এ সত্যে যখন কোনো দ্বিমত বিরাজ করে না— তখন ছায়ার কার্যকারিতা সম্পর্কে খ্রীষ্টীয় সাত দশকে এসে কোরআনের দাবী করার মধ্যেও কোনো ক্রটি বিরাজ করে না। উল্লেখ্য যে পৃথিবীর আর কোনো ধর্মগ্রন্থ কিংবা বিজ্ঞান নিজেও ছায়ার কার্যকরী ভূমিকা নিয়ে কোরআনের পূর্বে এমনকি দীর্ঘদিন পরেও কোনো মতবাদ প্রচার করেনি— কোরআনই কেবল এ প্রচারণার ক্ষেত্রে অনন্যতার দাবীদার।

ছয়

চলুন, আবার ফিরে যাই ২৫:৪৫ আয়াতে, যেখানে প্রস্তাব হয়েছে— *"তুমি কি লক্ষ্য কর না কিভাবে তোমার প্রতিপালক ছায়াকে সম্প্রসারিত করেন ; তিনি ইচ্ছা করিলে ইহাকে নিশ্চল রাখিতে পারিতেন। অনন্তর আমরা সূর্যকে করিয়াছি ইহার নির্দেশক"।* সুধী পাঠক— আপনি জানেন কি এরই মাঝে আরো কত ভয়ঙ্কর ইঙ্গিত রয়ে গেছে? আপনি জানেন কি যে এর মধ্যে পৃথিবীর জীবনালো নির্বাপনের মহাদুর্যোগময় দুঃসংবাদ গোপনে আপনাকে একটি আতঙ্কে বলে যায়— সাবধান! *"আসন্ন ঘটনা আগত প্রায় (৫৩:৫৭) মহাপ্রলয় তো হঠাৎই উপস্থিত হইবে" (৬:৩১)।*

আয়াত ২৫:৪৫ এর আবেগটি অতিশয় লক্ষণীয়। *'তিনি ইচ্ছা করিলে ইহাকে স্থির রাখিতে পারিতেন'*—এই আয়াতাংশ আমাদেরকে সর্বনাশের কোন ঠিকানার সংবাদ দিয়ে যায়, তা আমরা ইতিপূর্বে সংক্ষিপ্তভাবে দেখতে চেষ্টা করেছি। তারই সাথে *'অনন্তর আমরা সূর্যকে করিয়াছি ইহার নির্দেশক'*— এই আয়াতাংশ তার চাইতেও ভয়ঙ্কর কিছু আমাদেরকে জানিয়ে যায়। আপনারা পরবর্তীতে (কিয়ামত অধ্যায়ে) দেখবেন যে এই পৃথিবীর মহাঘটনা বা ধ্বংস শেষ পর্যন্ত একটি সূর্যগ্রহণের সাথে কিভাবে বিসংশ্লিষ্ট হয়েছে; কিয়ামত

www.pathagar.com

সংঘঠিত হবার ঘটনাতে সম্ভবতঃ সূর্য ও পৃথিবীর মাঝখানে আমাদের প্রিয় চাঁদটি এসে পূর্ণ ছায়াপাত করবে— সৃষ্টি হবে এক ত্রয়ী–বিন্দু শক্তি লাইন (সূর্য–চন্দ্র–পৃথিবী)। আকাশ হতে নেমে আসবে এক ধ্বংসের আগন্তুক, এক অতি উজ্জ্বল কাওকাব (নাজমুস সাকিবুন); ধ্বংস করবে পৃথিবীকে। ঐ সময় পৃথিবী কেবল একটি ছায়ার শিকার হবে; সূর্য থাকবে যার নির্দেশক, চাঁদের ছায়া পৃথিবীতে ডেকে আনবে আলোকের মাঝে একটি ভয়ার্ত অন্ধকারময়তা। ত্রয়ী–বিন্দু শক্তি লাইন সৃষ্টি করবে মহাবিপদ; আর সূর্য ও ছায়া পৃথিবীবাসীর জন্য হবে সে মহাধ্বংসের নির্দেশক। সে ছায়া হবে চাঁদের ছায়া পৃথিবীর উপরে, আর সূর্য হয়ে থাকবে সেদিন সে ধ্বংসের একমাত্র নির্দেশক। শুধুমাত্র আলোর (Light) কারণে নয়— কেন্দ্রভাগে বসে সূর্য যে মহাধ্বংসী অভিকর্ষ প্রভাব ফেলবে ঐ ত্রয়ী–বস্তু–শক্তি লাইনের উপর, সে সময় তাৎক্ষণিকভাবে পৃথিবীর বুকে আপতিত হবে ধ্বংসের তাণ্ডব— আকাশীয় উজ্জ্বল বস্তু যার শক্তির ভেক্টরের গতিমুখ হবে কেবল সূর্যের দিকে। সেই ধ্বংসের নির্দেশক হবে একমাত্র সূর্যই। (সূর্য ও ছায়া শেষ পর্যন্ত পৃথিবীর মহাধ্বংসের সাথে যে বিসংশ্লিষ্ট থাকবে তার বিস্তারিত আলোচনা কিয়ামত অধ্যায়ে করা হয়েছে)।

বিস্ময়করভাবে আল্লাহ্‌পাক একটি ছায়া দিয়ে এই পৃথিবীর অবস্থান ও গতি, সূর্যের গতি ও গন্তব্য, আহ্নিক গতি, বার্ষিক গতি, পৃথিবীতে জীবন ও সূর্যের সম্পর্ক এবং রুবুবিয়াতের বিস্ময়কর প্রতিপালন ব্যবস্থায় এই গতিসমূহের ভূমিকা ইত্যাদি গুরুতর তথ্যগুলি একসাথে প্রকাশ করে রেখেছেন। শুধু তা–ই নয়— এই পৃথিবী Flat নয়, একটি গোলক; আর এর পরিধি হলো ২৫,০০০ মাইল (৪০,০০০ কিঃ মিঃ)— পৃথিবী এমন নয় যে, চলতে চলতে নাবিকগণ হারিয়ে যাবে ইত্যাদি সব তথ্যই এই ছায়া বিষয়ক তথ্যে প্রকাশিত হয়েছে। সৃষ্টি ও স্রষ্টাকে বোঝার জন্য পৃথিবীকে এমনভাবে তৈরী করা হয়েছে যা মানুষের দর্শন ও ভ্রমণ যোগ্যতার একান্ত সাধ্যের মধ্যে— *"পৃথিবী পরিভ্রমণ কর এবং অনুধাবন কর— কিভাবে তিনি সৃষ্টি আরম্ভ করিয়াছেন"* (২৯:২০)। এই

www.pathagar.com

উৎসাহটি যেমন কোরআনে লিপিবদ্ধ রয়েছে, তেমনি সকল কালেই সূর্য–ছায়া সম্পর্কে আমাদেরকে অনুরূপ উৎসাহ জুগিয়ে এসেছে যেন এই পৃথিবী পরিভ্রমণ করে মানুষ জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ পায় এবং প্রকৃতি ও স্রষ্টার সম্পর্কটি বুঝতে পারে।

জিয়োসেন্ট্রিক কিংবা হেলিওসেন্ট্রিক তত্ত্ব যেখানে কেবলমাত্র সূর্য ও পৃথিবীর অবস্থান এবং কে কাকে ঘিরে প্রদক্ষিণ করে এই মীমাংসায় পৌছার প্রয়াসে দুই–ই ব্যর্থ হয়েছে, সেখানে কোরআন সামান্য ছায়ার প্রসঙ্গ টেনে সূর্য–পৃথিবী ব্যবস্থার শুধু সঠিক তথ্যই দেয়নি, তাদের সকল গতি চরিত্রকে বিজ্ঞানের সূক্ষ্মতায় প্রকাশ করে দিয়েছে। শুধু তা–ই নয়— প্রকাশ করছে কিয়ামত আর রুবুবিয়াতের উভয় দৃশ্যকে। ফলতঃ এ হলো অনেকগুলি তত্ত্বের এক সামষ্টিক চিত্র। আমরা এর কোরানিক নামকরণ করতে চাই "ছায়াতত্ত্ব"।

এই ছায়াতত্ত্ব আমাদেরকে জিয়োসেন্ট্রিক ও হেলিওসেন্ট্রিক তত্ত্বের ভুলগুলি কোথায় তা যেমন দেখিয়ে দেয়, সঠিক তত্ত্বটি কি হওয়া উচিৎ তাও জানিয়ে যায়। এই তত্ত্বে আজ হতে ১৫০০ বৎসর পূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল যে, সূর্য বা পৃথিবী এদের কোনটিই মহাবিশ্বের কেন্দ্র নয়, তারা সকলেই নিজ কক্ষপথে ঘুরছে, পৃথিবীর ঘূর্ণি সূর্যকে কেন্দ্র করে, সূর্য ঘুরছে অন্য অজ্ঞাত কেন্দ্রের চারপাশে, সে নিজ গন্তব্যের দিকেও চলছে অদৃশ্যের তাড়নায়। চলছে সে তার সর্বশেষ পরিণতি সোলার এপেক্সে'র পানে, তার জন্য যা হলো 'মুসতাকর' বা গন্তব্য ; এমন এক গন্তব্য যেখানে তার মৃত্যুর ফাঁদ পাতা রয়েছে। (দ্রষ্টব্য— সঞ্চালনশীল সূর্য; মহাকাশ পর্ব–১) এই সাথে 'ছায়াতত্ত্ব' আমদেরকে আরো জানায় যে পৃথিবী কক্ষপথে চলার (বার্ষিক গতি) পাশাপাশি নিজ অক্ষেও ঘুরছে (আহ্নিক গতি); আর তার সূক্ষ্ম পরিমাপ নির্ণীত রয়েছে এই পৃথিবীতে সকল জীবনের অস্তিত্বের সাথে।

www.pathagar.com

ছায়াতত্ত্বের আরো একটা নির্দেশ হলো যে, সৃষ্টিকুল আল্লাহর এই বিশাল করুণার স্বীকৃতি জ্ঞাপন করছে প্রতিটি মুহূর্তে ছায়াদের স্থান পরিবর্তনের সম্ভাব্যতাটিকে প্রদর্শিত করে। এই অবহেলিত বাস্তবের ভিতর আত্মপ্রকাশ করে রয়েছে রুবুবিয়াতের নিখুঁত বুনন-কৌশল! মানুষ যেন বিনীত ছায়াদের দর্শন পূর্বক প্রকৃত বাস্তবটি উপলব্ধি করে আর ছায়াদের মতো বিনীত হয়ে জগৎসমূহের প্রভু দয়াময় রাব্বুল আলামীনের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

"অতঃপর আমি উহাকে (ছায়া) আমার দিকে ধীরে ধীরে উঠাইয়া আনি" (২৫:৪৬)। আমরা ধীরে ধীরে ছায়াদের অন্তর্হিত হতে দেখি— তা আল্লাহপাকের নিজের দিকে উঠিয়ে নেয়ার কথা বলা হলো কেন? আমরা বুঝতে পারি, আল্লাহ্ অদৃশ্যজাত এবং ছায়ারাও অদৃশ্য হয় সূর্যের অস্তগমনের পরে। কিন্তু প্রশ্ন হলো— আমাদের দিকে উঠাইয়া আনি, এই প্রস্তাবের মূল বক্তব্য কি? সম্ভবতঃ এই— আলোকের প্রকাশই পৃথিবীতে বস্তুদের ছায়ার সৃষ্টি করে। ছায়াটি বাস্তব। এই বাস্তবটি কেবলমাত্র আলোকময় পরিবেশেই অবলোকনযোগ্য। অদৃশ্য আল্লাহ্, যিনি রুবুবিয়াতের মহাব্যবস্থাকে এবং যিনি এতবড় ব্যবস্থাপনার সূচনা করেছেন একটি বাস্তব ছায়া ব্যবস্থাকে জুড়ে দিয়ে এবং যে ছায়াটির অস্তিত্ব সমস্ত পৃথিবী জোড়া 'রিযিক' বা সালোকসংশ্লেষণের বাস্তবতার একমাত্র সূচক— সে ছায়াটি যেমন 'আলোক' না থাকলে অবলোকন করা যায় না, তেমনি কোরআনের আধ্যাত্মিক আলো না হলে আল্লাহ্পাকের অস্তিত্বকে হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নয়। জ্ঞান বিহীনতার কারণে মানব মনে আল্লাহ্ পাকের অস্তিত্বটি এমনি বিলীন মনে হবে, যেমন ছায়াদের অস্তিত্ব আলোকের বিদায়ের সাথে সাথে বিলীন হয়ে যায়। ছায়াকে দর্শন করার জন্য যেমন সূর্যের আলোকের প্রয়োজন হয়— তেমনি দয়াময়কে দর্শন করতে হলে হৃদয়কে সত্যের অর্থাৎ কোরআনের আলোকে উদ্ভাসিত করতে হবে একান্তভাবেই।

"কোরআন তোমাদিগের জ্ঞানচক্ষু হিসাবে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে আসিয়াছে— সুতরাং যে ব্যক্তি উহা দেখিতে পাইল সে

www.pathagar.com

নিজেরই মঙ্গল সাধন করিল (৬:১০৫) যখন কোরআন পাঠ করা হয়, উহা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর এবং (সম্মানস্বরূপ) চুপ করিয়া থাক। ইহাতে তোমরা অনুগৃহীত হইবে (৭:২০৪) বল তোমরা কোরআন বিশ্বাস কর কিংবা না কর— যাহাদেরকে ইহার পূর্ণ জ্ঞান দেওয়া হইয়াছে, তাহাদিগের নিকট যখনই ইহা পাঠ করা হয়, তখনই তাহারা বিনীত হইয়া সেজদায় লুটাইয়া পড়ে" (১৭:১০৭)।

আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন

* ডঃ মরিস বুকাইলি কর্তৃক ছায়া সম্পর্কে প্রদত্ত ব্যাখ্যা নিম্নরূপ ঃ

"আল্লাহর সৃষ্ট প্রতিটি জিনিসই তাদের ছায়াসহ তাঁর নিকটে বিনীত হয়ে রয়েছে— এই আয়াতে সেকথা বলার সাথে সাথে এও বলা হয়েছে যে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাঁর ক্ষমতার এই প্রকাশকে ফিরিয়ে নিতে পারেন। তদুপরি এই আয়াতে সূর্যের সাথে ছায়ার সম্পর্কও তুলে ধরা হয়েছে। এই পর্যায়ে একটা কথা অবশ্যই মনে রাখা দরকার। আর তা হলো, মোহাম্মদের (দঃ) আমলে বিশ্বাস করা হতো যে, সূর্যের পূর্ব থেকে পশ্চিমে চলাচলের দ্বারাই ছায়ার নড়াচড়া নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। সেই নীতির নিমিত্তেই সেকালে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময় গণনার জন্য 'সান-ডায়াল' (ছায়াঘড়ি বা সূর্যঘড়ি) চালু হয়েছিল। এখানে দেখা যাচ্ছে, কোরআন ছায়ার নড়াচড়া করার কথা বলছে ঠিকই ; কিন্তু অবতীর্ণ হওয়ার কালে এ সম্পর্কে সাধারণ্যে যে ধারণা প্রচলিত সে সম্পর্কে কিছুই বলছে না। এক্ষেত্রে কোরআনে যদি প্রচলিত সেই ধারণাকে তুলে ধরা হতো, তাহলে মোহাম্মদের (দঃ) পরবর্তী কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত সে ধারণাকে মানুষ সহজেই বিশ্বাসযোগ্য বলে মেনে নিতে পারত। কিন্তু পরিশেষে তা ভুল বলেও পরিগণিত হতো এবং সে ভুল চিহ্নিত করতেও মানুষ দেরি করত না। কিন্তু কোরআন সূর্যের উদয়-অস্ত সংক্রান্ত সে যুগের সেই প্রচলিত ধারণা সম্পর্কে কিছুই বলেনি। বরং ছায়ার প্রশ্নে সূর্যের ভূমিকা সম্পর্কে শুধু এইটুকুই বলেছে যে, সূর্য হচ্ছে ছায়ার ইণ্ডিকেটর বা নির্দেশক মাত্র। সুতরাং এটা খুবই স্পষ্ট যে, আধুনিককালে ছায়ার গতি সম্পর্কে আমরা যা জানতে পারছি, আর কোরআনে ছায়া সম্পর্কে যে বর্ণনা রয়েছে— এই দু'য়ের মধ্যে কোনও বিরোধ নেই।

www.pathagar.com

সেফিড, শিফ্‌ট ও অনন্তের অনন্য তত্ত্ব

এক

সৃষ্টিতে মহাজাগতিক বস্তুদের গতি প্রকৃতি, দূরত্ব সম্প্রসারণ, পদার্থ, আকৃতি, তাপীয় অবস্থা, রঙ, জীবনকাল এবং এমন আরো অতি দুর্লভ তথ্য কোরআনের একটি আয়াতের মাত্র চারটি শব্দে প্রস্তাবিত হয়ে রয়েছে বিগত ১৪০০ বছর ধরে। সৃষ্টির ইতিহাসে এত অল্প ভাষণে এত সুবিশাল বিজ্ঞান আর কোনো উৎস হতে প্রকাশ পায়নি এবং পারেও না। দুঃখ হয়, মুসলমান এই মহামূল্যবান আয়াতটি প্রতিদিন মুখে উচ্চারণ করে— কিন্তু তার মাঝে লুকানো একটি মহাবিশ্বের সন্ধান আজো তারা পায়নি। সুধী পাঠক— কোরআন আপনার জ্ঞানের সকল মাত্রাকে স্তম্ভিত করে কয়েকটি মহাতত্ত্বকে মাত্র চারটি শব্দে আপনার অনুভবের উপকূলে ছড়িয়ে দিয়ে গেছে। আপনি তার সন্ধান নিতে উৎসাহী রয়েছেন কি?

আকাশকে সমুন্নত করা ও সম্প্রসারণের দাবি এনেছে ৫৫:৭

এই পর্যন্ত السماء শব্দটিকে ঢালাওভাবে সমুন্নত কিংবা উঁচু করার অর্থে ব্যবহৃত করেছেন সম্মানিত তর্জমাকারীগণ। এর কারণ, কালপ্রবাহে কোরআনের অর্থকরণের সাথে মানবিক জ্ঞানের আনুপাতিক বিকাশ হলো একটি জরুরী শর্ত। ফলতঃ উল্লিখিত

www.pathagar.com

আয়াতে رَفَعَ শব্দটি একচেটিয়াভাবেই ব্যবহৃত হয়েছে 'সমুন্নত' বা সুউচ্চ করার অর্থে। প্রকৃতপক্ষে এটি হলো এর অনেকগুলি অর্থের একটি। رَفَعَ শব্দের আর যে কটি অর্থ হতে পারে তা হলো— removal, causing to disappear, thinness, urge to a quicker pace, walk apace, come to higher regions, make thinner, disappear এবং আরো অনেক। এই শব্দগুলি অতি আশ্চর্যজনকভাবে মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ চরিত্রের পরিপূরক কিংবা রূপায়ক। মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ প্রতি পলে পলেই এর পদার্থ বিস্তারকে তার পূর্ববর্তী স্থান হতে সরিয়ে নিচ্ছে (remove), দূরবর্তী গ্যালাক্সিরা প্রতিদিন প্রতিনিয়ত গতির অমোঘ প্রক্রিয়ায় দৃষ্টির আড়ালে অদৃশ্য হয়ে পড়ছে (Causing to disappear), সম্প্রসারণের কারণে বস্তু বিস্তার ক্রমশই পাতলা হয়ে যাচ্ছে ও মহাবিশ্ব তার ঘনত্ব হারিয়ে চলছে (thinness/make thinner), মহাবিশ্বের এই সম্প্রসারণ পলে পলেই বেড়ে চলছে (urge to a quicker pace) এবং এই সম্প্রসারণ আমাদের মহাবিশ্বকে প্রতিদিন, প্রতিমাস, প্রতিবৎসর ও প্রতিযুগে তার পূর্বের আকার হতে এক বর্ধিত আকারে প্রবিষ্ট করাচ্ছে, ফলতঃ মহাবিশ্ব ক্রমশই দেহ কলেবরে বৃদ্ধি পেয়ে সময় ও শূন্যতায় (time and void) অনেক বিশাল অঞ্চলের পরিমাপে নিজের অস্তিত্বকে বিকশিত করছে (Come to higher regions)। অন্তত মহাবিশ্বের চরিত্রের সঙ্গে এতটা খাপ খেয়ে যাবার পর বলতে দ্বিধা নিস্প্রয়োজন যে ৫৫:৭ আয়াত সম্ভবতঃ একটি সুউচ্চ আকাশের দাবী না করে হয়তো একটি সম্প্রসারিত মহাবিশ্বের তথ্যই পেশ করছে। আমরা এই দাবীটি জোর দিয়ে গ্রহণ করব এই কারণে যে, কোরআনই মূলতঃ বিজ্ঞানীদের বুঝে ওঠার দেড় হাজার বছর আগে মহাবিশ্ব যে নিঃশর্ত সম্প্রসারণের প্রক্রিয়ায় অনন্তের পানে ছুটে চলছে, সে তথ্য মানুষকে জানিয়ে দিয়েছে এক গুরুতর আয়াতে— *"আমি এই মহাবিশ্বকে সৃজন করিয়াছি শক্তি (energy) দ্বারা, নিশ্চয়ই আমি ইহাকে সম্প্রসারণ করিতেছি (৫১:৪৭)"*। কোরআন এই সম্প্রসারণশীল মহাবিশ্বের পরিবেশে আকাশকে সুউচ্চ

www.pathagar.com

করার কথা বলেনি, অন্ততঃ ৫৫:৭ আয়াতের সব অর্থ-দৃষ্টে আমরা ৫১:৪৭ আয়াতের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সহজেই বুঝে নিতে পারি যে— সুরা আররাহ্মানের ৭ নম্বর আয়াত একটি সুউচ্চ আকাশের পরিবর্তে সুসম্প্রসারিত মহাবিশ্ব ব্যবস্থার দিকেই ইঙ্গিত করে রেখেছে।

আমরা যদি এই যুক্তিটিকে গ্রহণ করি— তবে আমাদের সামনে ৫৫:৭ আয়াতের শেষ অংশটি— *'এবং স্থাপন করিয়াছেন মানদণ্ড'* একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। আমরা যতগুলি তফসির আর যতগুলি অনুবাদ পাব— সকলেই ব্যতিক্রমহীনভাবে এই মানদণ্ডকে মাপনের পাল্লা কিংবা ব্যবসায়িক কার্যে ব্যবহৃত মাপন বিষয়ক যন্ত্রকে স্বীকৃতি দিয়েছে। এক দুর্লভ বৈজ্ঞানিক তথ্য দানকারী এই আয়াত যা মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ সম্পর্কিত বিপ্লব ঘটানো তথ্য দান করেছে, সে মহাসম্প্রসারণের সঙ্গে ওজন মাপার তুলাদণ্ড কিভাবে প্রাসঙ্গিক হতে পারে— তা একটি জিজ্ঞাসার বিস্ময়ে সঠিক অর্থের সন্ধান পেতে চায়। বর্তমানে অর্থকরণের প্রতি কোনরূপ মন্তব্য না করেই এবং কোরআনের মহাজ্ঞানী তরজমা ও তফসিরকারীগণের প্রতি একান্ত বিনীত থেকেই আমি শুধু আর একটি সম্ভাবনার বিষয় নিয়ে কিছু তথ্য পেশ করতে চাই। বিনীতভাবে বলতে চাই— এই আয়াতাংশ ওজন মাপার তুলাদণ্ডের চাইতেও আরো অনেক বেশি গুরুতর তথ্য প্রদানের সাথে সংশ্লিষ্ট রয়েছে। কি সে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য? চলুন আমরা তার সন্ধান করি।

দুই

মহাবিশ্বের যিনি স্রষ্টা, তিনি চান মানুষ তাঁর সৃষ্টির বিশালতা ও এরমধ্যে তাঁর বিসংশ্লিষ্টতা ও নৈপুণ্যকে সার্থক মাত্রায় অনুধাবন করুক। আমরা যদি ধরে নেই যে, কোরআনের স্রষ্টাই এই মহাবিশ্বের স্রষ্টা— তবে খুব সরলভাবেই অনুধাবন করতে সমর্থ হব যে, তিনি

www.pathagar.com

আমাদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে গভীর দৃষ্টি ফেলবার জন্য অনুপ্রাণিত করেছেন। *“আকাশমণ্ডল (মহাবিশ্ব) ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, দিবস ও রাত্রির পরিবর্তনে বোধশক্তিসম্পন্ন মানুষের জন্য নিদর্শন রহিয়াছে (৩:১৯০)। যাহারা দাঁড়াইয়া বসিয়া ও শুইয়া আল্লাহকে স্মরণ করে ও আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা করে— তাহারা বলে— হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি ইহা নিরর্থক সৃষ্টি কর নাই, তুমি পবিত্র” (৩:১৯১)।* আমরা স্পষ্টত অনুভব করি যে, এই সৃষ্টি বিষয়ক চিন্তা ও গবেষণাকে কোরআন অনুপ্রাণিত করে। এই অনুপ্রেরণা দানের পাশাপাশি কোরআন আমাদেরকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যও দান করে যায়। তারই একটি হলো আমাদের এই অধ্যায়ে আলোচ্য দু'খানি ক্ষুদ্র আয়াত।

'The study of Astronomy takes life above farce'— জ্যোতির্বিজ্ঞানের জ্ঞান জীবনকে প্রহসনের উর্ধ্বে তুলে নেয়। এই জ্ঞান মানুষকে তার নিজের অবস্থানের ক্ষুদ্রত্ব বুঝতে সাহায্য করে আর সৃষ্টির বিশালতা কতটা প্রকট তা অনুভব করার সুযোগ দেয় ; ফলশ্রুতিতে আমরা কে, স্রষ্টা কে, সৃষ্টি, স্রষ্টা, ও মানুষের সম্পর্ক কি— এই গুরুতর বিষয়গুলির উত্তর খোঁজার পথকে প্রসারিত করে। এস্ট্রোনমি, কসমোলজি এই জাতীয় জ্ঞান মানুষকে স্রষ্টার অসীমতার মুখোমুখি দাঁড় হবার সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। আর সম্ভবতঃ এমনি কোনো কারণে হয়তো কোরআনের স্রষ্টা ৫৫:৭ ও ৮ আয়াত দ্বারা মানুষকে সরাসরি জ্যোতি-পদার্থ বিদ্যা ও মহাবিশ্ববিদ্যার মাঝ দরিয়ায় নামিয়ে দিতে চান হয়তো এই কারণে যে, সে যেন তার স্রষ্টার সাথে নিজের সম্পর্ক নির্ণয়ে সক্ষম হয়। সুধী পাঠক, চলুন আমরা প্রস্তাবিত দুটি আয়াতের মাত্রা-গভীরতা বিচার করার চেষ্টা করি।

পৃথিবীর অধিবাসীদের বিবেচনায় আকাশের নক্ষত্র-রাজ্য অজ্ঞাত কারণে ঔৎসুক্যে ও প্রাধান্যে সীমাহীন বিবেচনা নিয়ে বিরাজ করছে। তারাজগতের অভ্যন্তরে জ্ঞানের ব্যোমযানে চড়ে মানুষ ভ্রমণ করতে চেয়েছে আদিকাল হতেই। সঙ্গত কারণেই মানুষের মন জ্যোতিস্কদের

www.pathagar.com

দূরত্ব পরিমাপনে উৎসুক হয়েছে। বিশেষভাবে জ্ঞানের এক নব দিগন্ত উন্মোচনের সাথে বিসংশ্লিষ্ট হয়ে পড়েছে জ্যোতি-পদার্থ-বিদ্যাবিষয়ক জ্ঞান এবং সে কারণে জ্যোতিস্কদের দূরত্ব পরিমাপের বিবেচনা জ্ঞান-বিজ্ঞানের শুরু হতেই প্রভাব ফেলেছে বিজ্ঞানের উপর।

জ্ঞানের সহজাত উৎসৌক্য তাড়িত মানুষ-মন চিরকালই আকাশের পানে হতাশ দৃষ্টি মেলে তাকিয়েছে। সৃষ্টিগত সীমাবদ্ধতা এ জানার এক দুর্লঙ্ঘ্য অন্তরায়। এতদসত্ত্বেও মানুষ প্রজাতির DNA -এর মূল কয়েক মহাপদ্ম বৎসর অতীতের মৃত কোন নক্ষত্রের মাঝে প্রোথিত বিধায় নক্ষত্র রাজ্য গ্যালাক্সি অধ্যুষিত এই মহাবিশ্বকে জানার স্পৃহা তার সদা আদিম।

সৃষ্টিতে নিজের অবস্থান ও স্রষ্টাকে বোঝার প্রেষণা মানুষ বহন করে এসেছে সৃষ্টিগতভাবেই। মানুষের DNA মধ্যস্থ তথ্যের প্রবাহ

www.pathagar.com

বিলিয়ন বৎসরের পুরানো— সুতরাং সৃষ্টির আদিক্ষণের সাথে তার সম্পর্ক রয়েছে। সম্পর্ক রয়েছে তার প্রতিটি অসীম দূরবর্তী অঞ্চলে সৃষ্ট হয়ে থাকা জ্যোতিষ্কের সঙ্গে। অতএব ব্যাখ্যাহীন অজ্ঞাত প্রেষণাতেই মানুষের মনে জিজ্ঞাসার সুর উঠতে বাধ্য যে— সৃষ্টি বিন্দু হতে সে আজ কত দূরে কিংবা যে তারাদের জীবন বিসর্জনের ফসল হলো তার দেহটি, সে তারারা কিংবা তাদের সমগোত্রীয়রা কে কোথায়, কত দূরত্বে অবস্থান করছে? আকাশে জ্যোতিষ্কদের দূরত্ব মাপন স্পৃহা মানুষের সহজাত। কিন্তু মানুষের যিনি স্রষ্টা— সম্ভবতঃ তিনি চাইতে পারেন যে, মানুষ অনুভব করতে শিখুক যে এই মহাবিশ্বটি কতটা বিশাল! ফলতঃ সে তার স্রষ্টার বিশালতাকে সামান্য হলেও হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হবে। এমন কোনো প্রত্যাশা স্রষ্টার থাকা অযৌক্তিক নয় ; আর এক্ষেত্রে সঙ্গত কারণেই স্রষ্টা চাইতে পারেন যে মহাজাগতিক মাপন প্রক্রিয়াগুলি যেন মানুষ আয়ত্ত করতে সক্ষম হয়। মানুষের অজ্ঞানতা মানুষকে স্রষ্টার বিষয়ে বিভ্রান্তির পথে পরিচালিত করে। যখনই প্রকৃত জ্ঞানে কোনোব্যক্তি কিংবা ব্যক্তিসমষ্টি উদ্ভাসিত হতে পারে— দ্বিধাহীনভাবে সেই মানুষ-মন সৃষ্টি নৈপুণ্যের অসীম দক্ষতা আর বিশালতার পানে চোখ ফেলে শুধুমাত্র শ্রদ্ধা আর বিনয় প্রকাশ ব্যতীত তার জন্য আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। মানুষ মনের এইটুকু অনুভব প্রাপ্তিই সম্ভবতঃ স্রষ্টা তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের পুরস্কার হিসাবে পেয়ে থাকেন। এখানেই তাঁর তৃপ্তি। কোরআনের ভাষায়— *“যেদিন তোমরা উত্থিত হইবে মহামহিময় আল্লাহর সামনে, সেদিন বিচার্য হইবে শুধু তোমাদের অন্তকরণ, তোমাদের অনুভব*
আল্লাহ তোমাদের পাপ ও পুণ্য সম্মুখে আনিবেন ও প্রত্যক্ষ করিবেন; অতঃপর ইহাদের বিক্ষিপ্ত ধূলায় পরিণত করিবেন” (২৫:২৩); আমরা দেখতে পাই, মানুষের অনুভব আল্লাহর নিকট এক গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা। সম্ভবতঃ আল্লাহ চান, তাঁর সৃষ্টি নৈপুণ্যের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ এই 'মানুষ' জাতি তাঁর সৃষ্টির দক্ষতা, বিশালতা, এককতা ও তুলনাহীনতাকে হৃদয় দিয়ে অনুভব করুক। আর এতেই কেবল তিনি সার্থক স্রষ্টা হয়ে আত্মপ্রকাশ করতে পারেন। একজন শিল্পীর জন্য

www.pathagar.com

যেমন সৃষ্টি–কর্মের পুরস্কার হলো তার স্বীকৃতি জগৎস্রষ্টার জন্যও তাঁর তৃপ্তি হলো তাঁরই সৃষ্টির নৈপুণ্যের প্রতি মানুষের সত্য অনুভব। এই সত্য অনুভবটি প্রকাশের পথে মহাজাগতিক দূরত্ব–মাপনের বিষয়টি হলো একটি বলিষ্ঠ বিবেচনা যা মানুষ আয়ত্তে আনুক— এটাই স্রষ্টা চান।

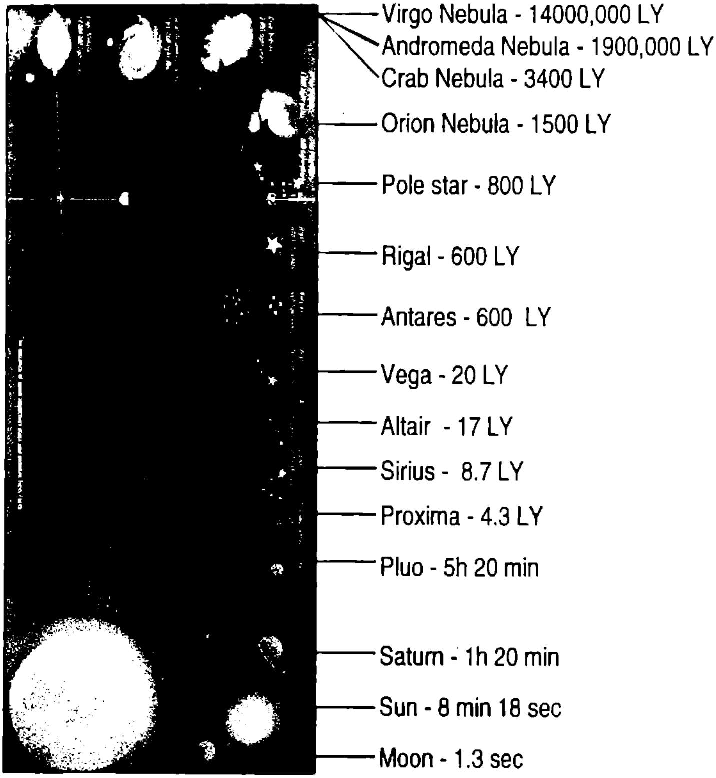

সৃষ্টির প্রতিটি বস্তুতে স্রষ্টা কিছু সহজাত পদ্ধতি এঁটে দিয়েছেন। প্রতিটি সৃষ্টিই তাই তাদের অস্তিত্বের স্বাক্ষর রেখে যায় স্থান–কালের যে কোন প্রেক্ষাপটে। আর শুধুমাত্র এ কারণেই এদের অবস্থান ও দূরত্ব সম্পর্কে জানা সম্ভব। জ্ঞানের বিকাশে স্রষ্টার এই বিপুল দানকে বিজ্ঞান উনিশ সতকে বুঝতে শুরু করলেও স্রষ্টা তার চুলচেরা সূক্ষ্ম তথ্য দিয়ে রেখেছেন সাত শতকে পবিত্র কোরআনের পাতায়— বিজ্ঞান যাকে অতিক্রম করে যাবার সাধ্য রাখে না।

www.pathagar.com

তিন

ভূমির উপর দূরত্ব কিংবা কোনো পাহাড়ের উচ্চতা নির্ণয়ের জন্য প্যারালাক্স পদ্ধতি সমাদৃত অনেক আগে হতেই। এই জন্য দুই নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে দূরের জিনিসকে পর্যবেক্ষণ করে স্থির করা যায় এই বিন্দু হতে অপর বিন্দুতে স্থান পরিবর্তন করার জন্য দূরের জিনিসটা কতটা দিক পরিবর্তন করছে— অর্থাৎ কতটা কৌণিক দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে। এই কৌণিক দূরত্ব যদি জানা যায় এবং পর্যবেক্ষণের দুটি বিন্দুর দূরত্ব যদি জানা থাকে, তবে সহজেই দূরের জিনিসটির দূরত্ব কিংবা কোনো উঁচু জিনিসের উচ্চতা মাপা সম্ভব হয়।

এ প্রক্রিয়ায় আকাশের কিছু কিছু জ্যোতিষ্কদের দূরত্ব মাপা চলে; কিন্তু সমস্যা হলো যে, আকাশের তারাদের অবস্থান এত বিশাল দূরবর্তী অঞ্চলে যে পৃথিবীর এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্তের দুটি বিন্দুর দূরত্ব কোনো কার্যকর কৌণিক মাপ প্রদর্শন করে না, অর্থাৎ এদের পার্থক্য প্রায় শূন্যের কাছাকাছি থাকে। এমনকি পৃথিবীর কক্ষপথের সর্ব প্রান্তিক দুই বিন্দু যা ছয় মাসের ব্যবধানে অবস্থিত এবং দূরত্বের হিসাবে প্রায় ৩০ কোটি কিলোমিটার, তাও কোনো কোনো তারা বা জ্যোতিষ্কের ক্ষেত্রে পাঠযোগ্য দিক পরিবর্তন করে না— অর্থাৎ শূন্যের প্রায় কাছাকাছিতে অবস্থান করে। একটি তুলনামূলক দৃষ্টান্তে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হতে পারে। ৩০ কোটি কিঃ মিঃ দূরত্বকে যদি আমরা ৫ সেঃ মিঃ ভাবি, তবে সর্ব নিকটবর্তী তারার দূরত্ব দাঁড়াবে সাড়ে ছয় কিলোমিটার। এই পাঁচ সেঃ মিঃ বেসলাইনের দুই বিন্দু হতে সাড়ে ছয় কিলোমিটার দূরের কোনো বস্তুর কৌণিক মান নেয়ার চেষ্টা করলে সঙ্গত কারণেই দুই বিন্দু হতে প্রাপ্ত 'রিডিং' একটিই মনে হবে, অর্থাৎ দিক পরিবর্তন/কৌণিক পরিমাপ হবে শূন্য। ফলতঃ প্যারালাক্স পদ্ধতিতে কেবলমাত্র গ্রহদের দূরত্ব ছাড়া অন্য কোনো জ্যোতিষ্কের দূরত্ব সঠিকভাবে মাপা সম্ভব নয়।

www.pathagar.com

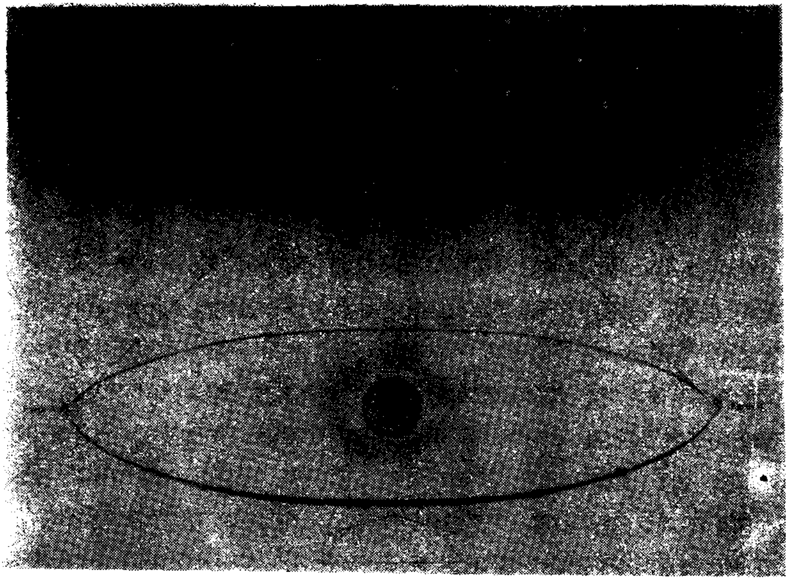

প্যারালাক্স পদ্ধতিতে কেবলমাত্র অতি নিকটবর্তী সামান্য কটি নক্ষত্র এবং গ্রহদের দূরত্বই নির্ণয় করা সম্ভব। মহাবিশ্বের মাপনে এ পদ্ধতিটি একেবারে অচল। সৃষ্টিতে স্রষ্টা যদি এর চাইতে উন্নততর বিবেচনা না রাখতেন— তবে মানুষের জ্ঞান অর্জনের সাধ্য হতো অতিশয় সীমিত।

মানুষের এই মাপন প্রক্রিয়া যে ব্যর্থ হবে— এ বিবেচনা কোরআনের স্রষ্টার রয়েছে— তাই তিনি বিভিন্ন দূরত্বের দৈর্ঘ্যে বিভিন্ন "মাপন সহায়ক" স্থাপন করেছেন এই তারাদের রাজ্যে— আর এর তথ্য প্রদান করেছেন অভিনব সুস্পষ্টতায়— *"তিনি আকাশকে করিয়াছেন সম্প্রসারণমুখী এবং এর মধ্যে স্থাপন করিয়াছেন দূরত্ব মাপন সহায়ক" (৫৫:৭)। তথ্যটি এ জন্য যাহাতে তোমরা এই মাপন নির্ণেয়ক (মিযান) এর অস্তিত্বের বিষয়ে গাফেল বা অনবহিত বা অজ্ঞ না হও" (৫৫:৮)।* ব্যবহৃত ميزان শব্দটির অর্থ balance, measure, metre, rule, method, arithmatical proof, prudence এবং تطغو শব্দটির মূল طغو/طغى এর অর্থ হলো

www.pathagar.com

exceed the bounds, become excessive in refractoriness, rebellion, injustice, unbelief, be seduced, be agitated ইত্যাদি। এই শব্দগুলির অর্থকরণের দিকে তাকালে স্পষ্টতঃ বলা যায় যে, 'মিযান' শব্দটি ঢালাওভাবে এটি তুলাদণ্ড বিষয়ক নির্দেশ নাও হতে পারে। ميزان শব্দটির অর্থ balance ছাড়াও একটি পদ্ধতি (Method /rule) যা দূরত্ব পরিমাপের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য (metre) এবং طغى শব্দটিতে সুস্পষ্টভাবে এই তথ্যটি অতিক্রম না করে যাবার নির্দেশ (exceed the bounds) কিংবা এর অর্থকরণের সময় যেন সঠিক তথ্য ছেড়ে অন্যমুখী না হই (become excessive in refractoriness) তারও ইঙ্গিত সুস্পষ্টতায় পাওয়া যায়। আমরা বলতে চাই— কোরআন এই দুই আয়াতে মহাকাশ সংক্রান্ত দূরত্ব মাপন পদ্ধতি ও সহায়কের বিষয়ে ইঙ্গিত দিয়েছে যার জরুরী সংশ্লিষ্টতা ও অন্বয় রয়েছে এই মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ চরিত্রের সাথে। আমাদের এই প্রস্তাবটি এই জন্য যে, সম্প্রসারণমুখী মহাবিশ্বের সাথে দাঁড়িপাল্লার মাপন প্রস্তাবটি যেমন অসংলগ্ন ও অপ্রাসঙ্গিক— তেমনি বিপরীত দিকে মহাকাশীয় দূরত্বের মাপন সহায়কের প্রসঙ্গটি বিসংশ্লিষ্টতা অধিকতর নিকটবর্তী। ফলতঃ আমরা প্রচলিত অর্থকরণের পরিবর্তে অন্ততঃ এ আলোচনায় বিষয়টিকে উপরে যেভাবে প্রস্তাব করা হয়েছে সেভাবেই অর্থকরণ করব।

চার

১৯০০ সাল পর্যন্ত মানুষ কেবলমাত্র অতি নিকটবর্তী কয়েকটি নক্ষত্রের দূরত্ব প্যারালাক্স পদ্ধতিতে বের করতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু তারপর মানুষকে শুধুমাত্র অনুমানের আশ্রয় নিতে হয়। বিজ্ঞান যখন দূরত্বের বিষয়ে একটি সমাধানকে অতি জরুরীভাবে অনুভব করছিল— ঠিক তখনই Cepheus রাশিচক্রে Delta Cephei নামক এক নক্ষত্রের মধ্যে একটি অতি সুচারুভাবে নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থায় তার ঔজ্জ্বল্যের হ্রাস বৃদ্ধির ঘটনা প্রত্যক্ষ করা গেল। তারাটি যখন সর্বোচ্চ ঔজ্জ্বল্যে পৌঁছায় কিংবা সর্বনিম্ন উজ্জ্বলতায় নেমে আসে,

www.pathagar.com

তখন প্রতিবার এদের উজ্জ্বলতার মাত্রা ও সময়ের সুনির্দিষ্টতায় একটি সুসংহত সামঞ্জস্য মিললো। বিজ্ঞানীগণ অনুরূপ আরো অনেক নক্ষত্রের মধ্যে এই ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করলেন। এদের নাম দেয়া হলো Cepheid Variables কিংবা Cepheids. সৌভাগ্যক্রমে সৃষ্টিতে স্রষ্টা 'সেফিড'দেরকে অন্যান্য নক্ষত্র হতে বিশেষভাবে আলাদা করে সৃষ্টি করেছেন। তারা সাধারণত সূর্য গোত্রীয় নক্ষত্রের তুলনায় বড়, উজ্জ্বল, অধিকতর দীপ্তিময় (luminous)— তারা তাদের উজ্জ্বলতার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটায় এক অতি সুসংবদ্ধ নিয়মে ; সম্ভবতঃ এই নক্ষত্রগুলি অতি নিয়ম-অটল পদ্ধতিতে সম্প্রসারিত ও সংকুচিত হয়। মনে হয় তারা যেন মহাজাগতিক নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাসের প্রক্রিয়া চালিয়ে যাচ্ছে।

বিজ্ঞানীগণ নক্ষত্ররাজ্যের দূরত্ব নির্ণয়ের জন্য এই বিশেষভাবে তৈরী তারাদের বিভিন্ন চরিত্র— বিশেষভাবে দীপ্তিকে কাজে লাগানোর বিষয়ে পরীক্ষা শুরু করলেন। ঘটনাটি এমন যে একটি সরল রাস্তায় একই দীপ্তির সারি সারি আলোক বর্তিকার সর্ব নিকটবর্তী ও সর্ব দূরবর্তী বাতির দীপ্তির মধ্যে পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হবে। সর্ব নিকটবর্তী বাতির তুলনায় সর্ব দূরবর্তী বাতিটি কতটা দীপ্তি হারিয়েছে— তা যদি শুদ্ধ মাত্রায় জানা যায় এবং যদি প্রথম বাতি হতে অবলোকনকারীর দূরত্বটি জানা থাকে— তবে এই দুই উপাত্তকে কাজে লাগিয়ে শেষ বাতির অবস্থানটির দূরত্ব বের করে নেয়ার একটা সূত্র আশা করা যেতে পারে। বিজ্ঞানীগণ এই সম্ভাবনাকে কাজে লাগালেন। বিজ্ঞানীগণ 'সেফিড'দের সংকুচন ও প্রসারণ কালের মধ্যে দীপ্তির একটি সম্পর্ক স্থাপন করতে পারলেন। সহজভাবে দেখা গেল— যে তারার সংকুচন ও প্রসারণ চক্র দুই দিনের— সে সূর্য হতে ২৬০ গুণ বেশি উজ্জ্বল, যদি এই চক্র ১০ দিনের হয়, সে তারার দীপ্তি ১৭০০ গুণ হয় এবং যদি তা ৩৬ দিনর হয়— তবে দীপ্তি সূর্যের তুলনায় ৯৬০০ গুণ বেশি হয়। ১৯১২ সালে Henrietta Leavitt (হার্বার্ড অবজার

www.pathagar.com

–ভেটরি) সর্বপ্রথম ক্ষুদ্র মেজিলানিক ক্লাউড–এ অবস্থিত নক্ষত্ররাজ্যের তারাদের মাঝে প্রাপ্ত সেফিডদের উপর কাল–দীপ্তি রেখা বা period-luminsity carve তৈরী করতে সক্ষম হলেন। এখানে প্রতিপাদ্য সূত্রটি হলো, সেফিডদের কালচক্র তার প্রকৃত দীপ্তির (absolute magnitude) সমানুপাতিক— যার কালচক্র যত বড়, তার প্রকৃত ঔজ্জ্বল্যমাত্রা তত বেশি।

If the cepheids everywhere in the universe behaved as they did in the Small Magellanic cloud (a reasonable assumption), then astronomers had a relative scale of measuring distance, as far out as cepheids could be detected in the best telescopes.— মহাবিশ্বের যে কোনো মাত্রা–গভীরতায় যেখানেই সেফিড পাওয়া যাবে, সেই অবস্থানের দূরত্ব নির্ণয়ের কাজটি বিজ্ঞানীগণের জন্য আর কঠিন থাকবে না। যদি দুটি সেফিডের কালচক্র এক হয়, তবে আশা করা যায় যে তাদের প্রকৃত ঔজ্জ্বল্যও এক হবে। যদি সেফিড A, সেফিড B অপেক্ষা ৪ গুণ উজ্জ্বলতাসম্পন্ন হয়— তবে ধরে নেয়া যায় যে সেফিড় B এর দূরত্ব, সেফিড A হতে কমপক্ষে ২ গুণ। এভাবে সমস্ত দৃশ্যমান সেফিডদের আপেক্ষিক দূরত্বকে নিয়ে একটি Scale map তৈরী করা সম্ভব হলো। এর ফলে শুধুমাত্র একটি সেফিডের প্রকৃত দূরত্ব যদি জানা যায় তবে বাকি সব সেফিডদের দূরত্ব বের করে নেয়া সম্ভব হয়।

পৃথিবীবাসীদের জন্য সীমাবদ্ধতার বিষয় হলো যে নিকটবর্তী সেফিড— ধ্রুবতারাটি আমাদের অবস্থান হতে শত আলোক বৎসরের স্কেলে অবস্থান করে (প্যারালাক্স মেথডে ৫০০ আলোক বর্ষ পর্যন্ত মাপা যায়)। বিজ্ঞানীগণকে অধিক কষ্টসাধ্য ও জটিল পদ্ধতি অবলম্বন করতে হলো— One useable clue was proper motion : on the average, the more distant a star is, the

www.pathagar.com

smaller its proper motion. প্রকৃত সঞ্চালন (Proper motion) নির্ণয়ের জন্য বিজ্ঞানীরা অনেক উপায় ব্যবহার করলেন এবং একটি কার্যকর পরিসংখ্যান পদ্ধতি তৈরী করা হলো। এই পদ্ধতিটি ব্যবহার করে যে ফল পাওয়া গেল— দেখা যায়, যে সব তারাদলে সেফিড রয়েছে, তাদের দূরত্ব সম্পর্কিত যে ফলাফল পাওয়া গেছে, এটি হুবহু প্রকৃত সঞ্চালনের (proper motion) অনুরূপ। এইবার বিজ্ঞানীরা সেফিড ভিত্তিক দূরত্ব নির্ণায়ক পদ্ধতিটিকে 'প্রপার মোশনে'র আলোকে অধিকতর ব্যবহার উপযোগী করার সুযোগ লাভ করলেন। তারা বিভিন্ন তারা–দলে অবস্থিত সেফিডদের মধ্যে প্রকৃত ঔজ্জ্বল্য (absolute magnitude), কালচক্র ও দূরত্বের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনে সমর্থ হলেন। ১৯১৩ সালে ডেনিশ জ্যোতির্বিদ Ejnar Hertzsprung একটি সেফিডের প্রকৃত ঔজ্জ্বল্য (–) 2·3 পেলেন যার কালচক্র পাওয়া গেল ৬৬ পৃথিবী–দিন। লেভিটের কাল–ঔজ্জ্বল্য রেখা (Leavitt's Period-Luminosity Curve) ব্যবহার করে এর পর হতে যে কোনো সেফিডের 'প্রকৃত ঔজ্জ্বল্য' জানবার পদ্ধতি আবিষ্কৃত হলো। কয়েক বৎসর পরে আমেরিকান জ্যোতির্বিদগণ একই সেফিডের উপর পরীক্ষা চালিয়ে অনুরূপ ফলাফল পেলেন এবং পরবর্তীতে আরো পর্যবেক্ষণে তা নির্ভুল প্রমাণিত হলো। সকল ফলাফলের এই ঐক্য বিজ্ঞানীদেরকে মহাকাশীয় দূরত্ব নির্ণয়ে একটি নিশ্চিত পদ্ধতি দান করল। "This agreement was enough to allow astronomers to go ahead. They had their yard stick".

বিজ্ঞানীরা টেলিস্কোপ দিয়ে আজ প্রায় ১১০০০ মিলিয়ন আলোক বৎসর পর্যন্ত দেখতে পায়। দূরত্ব নির্ণয়ের জন্য বিজ্ঞানীরা আজ সৃষ্টিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন mile stone বা সেফিড ব্যবহার করতে শিখেছেন। সৃষ্টিতে যে এরা একটি বিশেষত্ব নিয়ে বিরাজ করছে এবং এরা যে আকাশ তথা এই মহাবিশ্বের মাপন কাজের সাহায্যকারী— তারই সংবাদ এসেছে কোরআনের পাতায় ঃ *"তিনি সম্প্রসারণমুখী*

www.pathagar.com

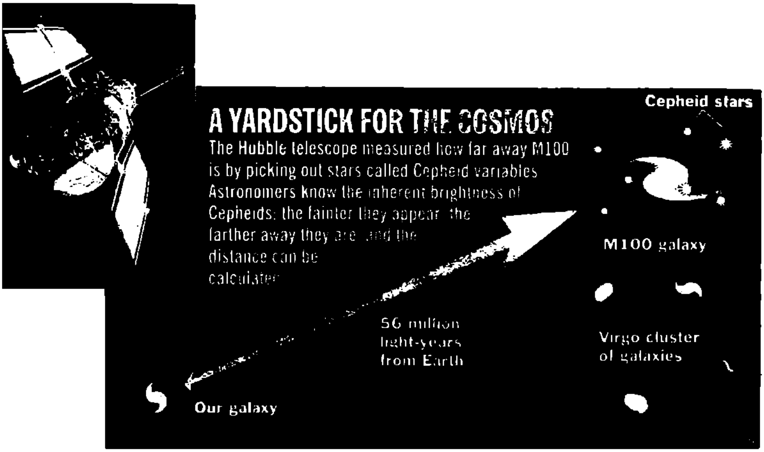

জ্যোতির্বিদগণ সেফিডদের সহজাত উজ্বলতা (Inherent brightness) সম্পর্কে অবগত রয়েছেন বহু পূর্ব হতেই। হাবেল টেলিস্কোপ Virgo-cluster এর মেসিয়ার ১০০ (M 100) গ্যালাক্সির দূরত্ব নিরূপণ করেছে নিখুঁত সঠিকতায়। সেফিড–নক্ষত্রদের নিজস্ব পদার্থ ও গুণাগুণের ভিত্তিতে মহাজাগতিক দূরত্ব নির্ণয়ে হাবেল টেলিস্কোপটি একটি সফলতর সংযোজন। চিত্রে M 100 এর দূরত্ব ৫৬ মিলিয়ন আলোকবর্ষ হিসাবে নিরূপিত হয়েছে হাবেল টেলিস্কোপে। ইতিপূর্বে মানুষ এ পদ্ধতিতে মাত্র কয়েক হাজার আলোকবর্ষের বেশি দূরত্ব মাপতে সক্ষম হতো না।

আকাশে (মহাবিশ্বে) স্থাপন করিয়াছেন দূরত্ব মাপন সহায়ক" (৫৫:৭)। ব্যবহৃত শব্দ وضع অন্ততঃ এ তথ্যেরই সূত্র দিয়ে যায়, যার অর্থ হলো— to lay, put down, to fix, to attach, to affix, to impose, to contrive, to devise, to originate, to lay a corner stone ইত্যাদি। মহাকুশলী স্রষ্টা যে আকাশের বিভিন্ন কন্দরে কিছু কিছু মাইল ফলক (cornerstone) স্থাপন করেছেন (lay, fix) এবং এগুলি যে বিশেষ কোনো উপকারে কিংবা কার্যে মানুষের নিকট বিশেষ কোনো পদ্ধতি হতে পারে (device) এবং এই বিবেচনাগুলি যে প্রচেষ্টা ও সাধনায় সম্ভব এমন কোনো পরিকল্পনার অন্তর্গত (Contrive)— এই সব তথ্যগুলি আমরা পাই।

www.pathagar.com

আমরা অনুভব করার সুযোগ পাই যে— যিনি মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা, তাঁর বিবেচনায় পৃথিবীর মানুষরা যে সাধনার কোনো এক পর্যায়ে মহাকাশের বিভিন্ন বস্তুদের দূরত্ব নির্ণয়ের প্রচেষ্টায় লিপ্ত হবে, তা একটি গৃহীত (accepted) বিবেচনা বই ভিন্ন কিছু নয়। তাই এই দূরত্ব নির্ণোয়করা যে সৃষ্টিতে অবস্থান করে— তার জন্যই তিনি আকাশের সম্প্রসারণ চরিত্রের তথ্য দিতে গিয়ে মিযান ميزان বা আকাশের দূরত্ব নির্ণায়কের সন্ধান দিয়ে মানুষকে প্রকারান্তরে এই তথ্যটিই দিতে চাইছেন যে— মানুষ যেন চেষ্টায় এই মহাবিশ্বের সীমা পরিসীমার সন্ধান পেতে প্রবৃত্ত হয়। ফলতঃ তারা এর মহান স্রষ্টার বিরাটত্ব ও মাহাত্ম্য সম্পর্কে কিছুটা অবগত হতে সক্ষম হবে। *"তোমাদের কি হইল যে, তোমরা আল্লাহর মাহাত্মকে অস্বীকার করিতেছ? (ইহার প্রমাণ তো এই)— তিনি তোমাদেরকে কত সুচারুরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন! (৭১:১৩/১৪) কে উহার চাইতে অধিকতর অত্যাচারী আছে যে আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করে এবং মুখ ফিরায়? (৬:১৫৮) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে অনেক নিদর্শন রহিয়াছে ; উহারা তাহার সমস্তই প্রত্যক্ষ করে কিন্তু তাহারা এই সব বিষয়ের প্রতি উদাসীন" (১২:১০৫)। অথচ "তাঁহারই নিকট পুনরুত্থান" (৬৭:১৫)।*

পাঁচ

আপনার সম্বিৎকে হতচকিত করবে— এমন আরো তথ্য এখনো আমাদের হাতে রয়েছে। চলুন আমরা وضع শব্দটির অন্য একটি বিশেষত্ব নিয়ে আলোচনা করি। ميزان এবং السماء এর সঙ্গে وضع শব্দটি এমনভাবে সম্পর্কিত যে, মহাবিশ্বের বিভিন্ন স্থানাঙ্কে বিধিপ্রদত্ত সাহায্য চিহ্নের মাপকাঠি ব্যবহার করে আমরা মহাবিশ্বের বিশালতাকে অনুধাবন করতে সক্ষম হই। এই وضع শব্দটিতে আমরা 'ইয়ার্ডস্টিক' হিসাবে সেফিডদের চিহ্নিত করার সুযোগ পাই। কিন্তু আমরা যদি আমাদের দৃষ্টিকে আরো একটু

www.pathagar.com

গভীরভাবে প্রসারিত করতে সক্ষম হই তবে— আমরা এই একই শব্দে দূরত্ব নির্ণায়ক কিংবা মহাবিশ্বের বস্তুদের গতি নির্ণায়ক অতিমূল্যবান তথ্যও পেতে পারি। আমরা وضع শব্দের to fix, to attach, to affix ইত্যাদি শব্দগুলির অর্থগুলি পর্যালোচনা করব।

দৃষ্টিকে যদি আমরা সুতীক্ষ্ণ করে তাকাই তবে ৫৫:৭ আয়াতকে ঘুরিয়ে এভাবে পেশ করতে পারি— *"তিনি আকাশকে প্রবাহিত করিয়াছেন সম্প্রসারণ প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়া এবং তাহাতে* میزان *আরোপিত/সংযুক্ত করিয়াছেন"*— আমরা ৫৫:৭ আয়াতকে একটু এগিয়ে নিয়ে এলাম বলে বিরুদ্ধবাদীদের মনঃক্ষুণ্ন হবার কিছুই নেই কারণ আমরা শব্দের বৈশিষ্ট্যে নির্ভরশীল অনুবাদ পেশ করেছি মাত্র। কার সঙ্গে میزان কে বিসংশ্লিষ্ট করা হয়েছে? এ উত্তর হবে— নিশ্চয়ই السما শব্দের সঙ্গে। শব্দটি যে এখানে সামগ্রিকভাবে আকাশ বা মহাবিশ্বকে নির্দেশ করে, অন্ততঃ তাতে কারো কোনো সন্দেহ উদ্রেক হবার কথা নয়। মহাবিশ্ব কি? মহাবিশ্ব হলো অসংখ্য গ্যালাক্সিদের সমষ্টি। আবার গ্যালাক্সিরা হলো অসংখ্য তারাদের সমষ্টি। তাহলে মহাবিশ্বের সাথে میزان শব্দের যে বিসংশ্লিষ্টতা আমরা দেখি, তা প্রকারান্তরে গ্যালাক্সি এবং তারাদের সাথেই ; কারণ মহাবিশ্ব বলতে আলাদা কিছুই নেই— মহাবিশ্ব হলো তারা আর গ্যালাক্সিদের সামষ্টিক ধারণা মাত্র! অতএব আমরা বলতে পারি— ৫৫:৭ আয়াতের میزان শব্দটি মহাবিশ্বের গ্যালাক্সি কিংবা প্রতিটি জ্যোতিষ্কের (তারা, গ্রহ, ব্ল্যাকহোল— যাই হোক) সাথে সম্পর্কিত। এইবার আমরা وضع শব্দের to fix, to attach, to affix, to impose ইত্যাদি শব্দগুলিকে যদি বিবেচনা করি তবে যে সম্বন্ধ পাই তা হতে বিনা দ্বিধায় বলতে পারি যে, প্রতিটি গ্যালাক্সি ও প্রতিটি জ্যোতিষ্কের উপর আল্লাহপাক میزان আরোপ কিংবা সংযুক্ত কিংবা বিসংশ্লিষ্ট কিংবা জুড়ে দিয়েছেন। তখন আমাদের অনুবাদটির চেহারা এই দাঁড়ায় যে— "তিনি মহাবিশ্বকে সম্প্রসারণমুখী করিয়াছেন এবং উহার গ্যালাক্সি ও জ্যোতিষ্কদের

www.pathagar.com

উপর জুড়িয়া দিয়াছেন ميزان "অর্থাৎ, প্রতিটি মহাজাগতিক বস্তুর উপরেই" তিনি ميزان সংযুক্ত করেছেন। কথাটি অন্যভাবে বললে বলা যায় যে, প্রতিটি মহাজাগতিক বস্তু তার নিজের মধ্যেই তার নিজ ميزان বা পরিমাপক কিংবা মাপনদণ্ড (দূরত্ব, গতি–প্রকৃতি, পদার্থ, তাপমাত্রা, ঔজ্বল্য, বয়স ইত্যাদি সংক্রান্ত) বা জ্যোতির্বিদগণের কথিত সে yard-stick ধারণ করে এবং আশ্চর্যজনকভাবেই বিষয়টি তদ্রূপ!

স্পেকট্রাস্কোপি বিদ্যা জ্যোতির্বিজ্ঞানের মুক্তির দ্বার উন্মুক্ত করেছিল। দূরবর্তী জোতিষ্ক হতে আগত আলোককে স্পেকট্রামে ফেললে স্পেকট্রামে বিভিন্ন স্পেকট্রাল লাইন প্রকাশিত হয়। এই লাইনগুলি কোনো নক্ষত্রের বা জ্যোতিষ্কের পদার্থ, রসায়ন, মৌল. উত্তাপ ও দীপ্তি, আবহাওয়া, আকৃতি, চৌম্বকক্ষেত্র এবং এমনকি উহাদের গতি প্রকৃতি সম্পর্কে নিখুঁত তথ্য দেয়। গতি ও উজ্জ্বলতার উপর ভিত্তি করে স্পেকট্রাস্কোপি জোতিষ্কদের দূরত্ব সম্পর্কেও নিখুঁত তথ্য প্রকাশ করতে পারে। আর এই সব তথ্য জ্যোতিষ্কদের বহির্ভাগে যে সব পদার্থ থাকে, তাদের মৌলদের রাসায়নিক পরিস্থিতির কারণে বিকিরণকৃত উত্তাপ ও বিচ্ছুরিত আলো হতে সহজেই স্পেকট্রাস্কোপির মাধ্যমে পাঠ করা যায়। অর্থাৎ প্রতিটি জ্যোতিষ্কই সৃষ্টিগতভাবে একটি পরিমাপক ব্যবস্থা কিংবা ميزان ধারণ করে যার দ্বারা তার আকার, পদার্থ, গতি, দূরত্ব, আবহাওয়া, ভূত ও ভবিষ্যৎ ইত্যাদি সব কিছুই নিখুঁতভাবে জানা সম্ভব। পরিমাপের বা ميزان সম্পর্কে এর চাইতে ভাল দৃষ্টান্ত আর হতে পারে কি?

দূরবর্তী নক্ষত্র, গ্যালাক্সি, কোয়াসার ইত্যাদি যে কোনো জ্যোতিষ্কের দূরত্ব মাপার জন্য 'স্পেকট্রাস্কোপিক টেকনিক'টি বিজ্ঞানীদের কাছে আজ একমাত্র হাতিয়ার। আমরা রেডশিফট ও ব্লুশিফটের কথা জেনে থাকব। যে জ্যোতিষ্ক দূরের দিকে চলে যায়— সে যে তথ্য পাঠায়, স্পেকট্রাল লাইনে তার তথ্য রেডশিফট

www.pathagar.com

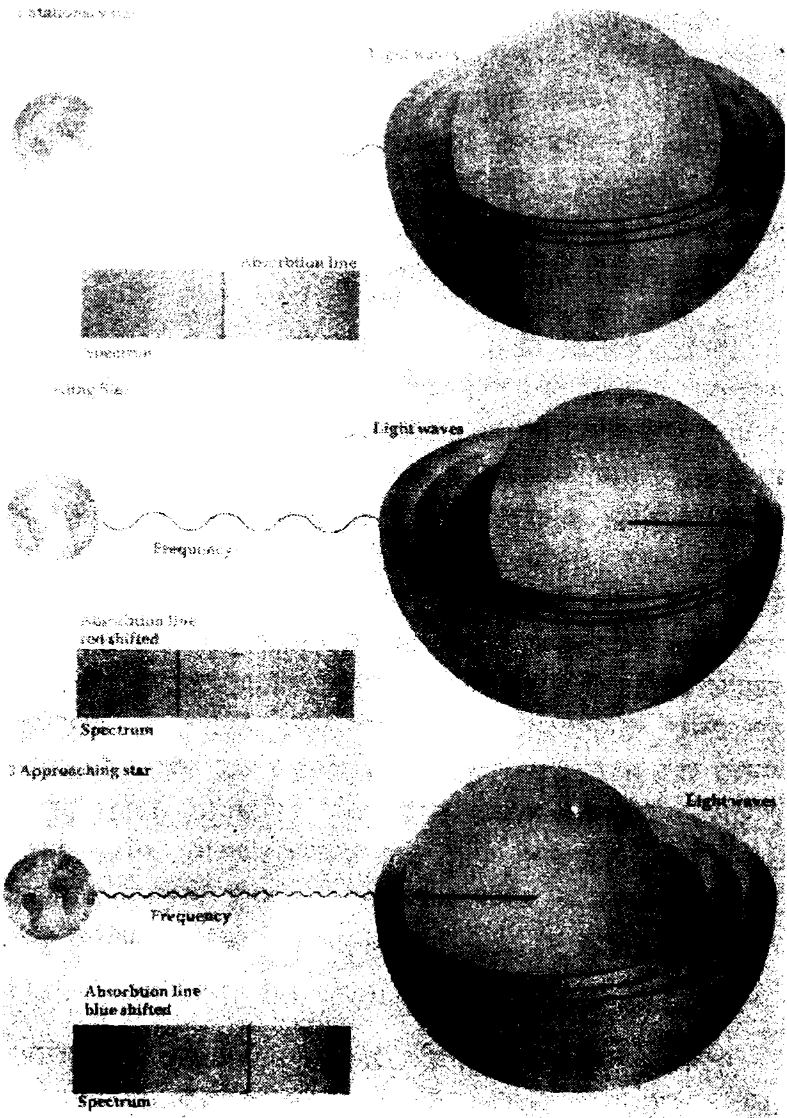

শব্দতরঙ্গের বৈশিষ্ট্য হলো যে— কোনো বিন্দুর প্রতি যদি সে অগ্রসর হয়, তবে ঐ বিন্দুর প্রতি শব্দতরঙ্গগুলি সংকুচিত হয় ; ফ্রিকুয়েন্সি বেড়ে যায়। অন্যপক্ষে শব্দ যখন কোনো বিন্দুকে ছেড়ে যায়— ছেড়ে যাওয়া বিন্দু হতে তরঙ্গগুলির দৈর্ঘ্যের বৃদ্ধি ঘটে

www.pathagar.com

ফ্রিকুয়েন্সি কমে যায়। আলোর বেলাতেও তা-ই ঘটে। পৃথিবী হতে একটি হাইপোথিটিক্যাল স্থির নক্ষত্র (সৃষ্টিতে এমন উদাহরণ নাই) একটি সুষম-আলোক তরঙ্গ প্রদান করবে (উপরের চিত্র)। পৃথিবী হতে যে নক্ষত্র/গ্যালাক্সিরা দূরবর্তী অঞ্চলের দিকে সরে যাচ্ছে— তাদের তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের বৃদ্ধি ঘটছে (মাঝখানের চিত্র) ; লক্ষ্য করুন স্পেকট্রামে কালো দাগটি লাল অঞ্চলের দিকে (ঘনীভূত কালো) সরে আসছে। স্পেকট্রামে সরে যাওয়া পরিমাণ হতে গ্যালাক্সি/নক্ষত্রের গতি ও দূরত্ব বের করা হয়। নীচের চিত্রটিতে কালো দাগটি লালের বিপরীত ও নীলের সন্নিকটে সরে আসছে। আলোর তরঙ্গ সংকুচিত হচ্ছে— ফ্রিকুয়েন্সি বেড়ে যাচ্ছে, তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কমে আসছে। এর অর্থ হলো— বস্তুটি পৃথিবীর দিকে ধাবমান (খুব দুর্লভ ঘটনা)। প্রতিটি আকাশীয় বস্তু সৃষ্টিগতভাবে এই গুণাগুণ বহন করে (ক্যালসিয়াম ও অন্যান্য ইমিশন)। প্রতিটি বস্তুতেই এই ميزان বা মাপন ব্যবস্থা কোরআনের স্রষ্টা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন وضع বা সংযুক্ত করে রেখেছেন। ফলতঃ আকাশীয় বস্তু যত দূরে হোক ; দৃশ্য কিংবা অদৃশ্য হোক— সম্প্রসারণশীল বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত এই মহাবিশ্বের সর্বত্রই এই মহামাপন ব্যবস্থা ব্যবস্থিত হয়ে রয়েছে যা ক্ষুদ্র আয়াতে ৫৫:৭ দ্বারা প্রস্তাবিত এক সুবিশাল বিজ্ঞানবাদের সমষ্টি ছাড়া অন্য কিছু নয়।

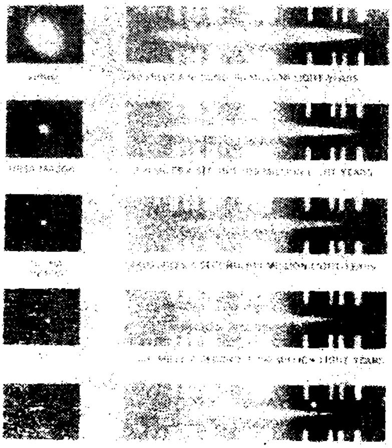

সম্প্রসারণশীল মহাবিশ্বের যে কোনোখানে দাঁড়ালে নিজকে কেন্দ্রে অবস্থিত মনে হবে। যদি এমন একজন দর্শক পাওয়া যেত যার দৃষ্টি টেলিস্কোপ ও স্পেকট্রাস্কোপ— উভয় যন্ত্রের গুণাগুণসম্পন্ন, তিনি দেখতে সক্ষম হতেন যে, পৃথিবী হতে গ্যালাক্সিরা কেবল দূরে দূরে সরে যাচ্ছে। স্পেকট্রামে এদের আলো ফেললে দেখা যাবে যে, আলোকরশ্মি কেন্দ্র হতে লাল-প্রান্তের দিকে সরে যাচ্ছে। যে গ্যালাক্সির যত বেশি দূরত্ব— স্পেকট্রামে তার এই সরে যাবার পরিমাণ তত বেশি। চিত্রে তীরগুলি ৫টি পৃথক পৃথক গ্যালাক্সির প্রকৃত

অবস্থানের সাথে প্রকৃত স্পেকট্রা'র আলোকচিত্র প্রদর্শন করা হলো। সর্বডানে লক্ষ্য করুন। পাঁচটি আলোর বীমের প্রতিটিতে একটি গোল ডট রয়েছে। গ্যালাক্সির দূরত্ব যত বেশি— ডটটির শিফট ততটা ডানে, অর্থাৎ লালের দিকে। এই তথ্যটি একসাথে গ্যালাক্সির দূরত্ব এবং গতি উভয়কে নির্দেশ করে।

হিসাবে প্রকাশ পায়। যে জ্যোতিষ্ক আমাদের দিকে এগিয়ে আসে, তার পাঠানো তথ্য স্পেকট্রাস্কোপিতে নীল লাইনে প্রকাশিত হয়, তাকে ব্লু-শিফট বলে। এই রেড ও ব্লু-শিফট দিয়ে জ্যোতিষ্কের গতি ও দূরত্ব উভয়ই নিখুঁতভাবে মাপা যায়। আর স্পেকট্রাস্কোপি যে সব তথ্য গ্রহণ করে, তাদের সমুদয়ই নক্ষত্রদের দেহে অবস্থিত পদার্থদের পাঠানো আলোক তরঙ্গ ছাড়া অন্য কিছু নয়। **একটি নক্ষত্র কতটা দূরে কতটা গতিতে কোন দিকে চলমান, এ তথ্যগুলি নক্ষত্র নিজেই ধারণ করে, মানুষ শুধু তা পাঠ করে নেবার প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে মাত্র।** তাহলে নয়কি যে وضع শব্দটি আমাদেরকে জানাতে চায় যে ميزان বা মাপন ব্যবস্থাটি সৃষ্টিতে বিপুল বিস্তৃতি নিয়ে প্রতিটি বস্তুতেই এটে দেয়া রয়েছে? *"যেন তোমরা অনবহিত না থাক" (৫৫:৮)*—তে কেবলমাত্র এই সুবিশাল বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটিকে পাঠ করে নেবারই নির্দেশই মাত্র!

আল্লাহ তায়ালাই নিখুঁত পরিমাপের জন্য **সবচাইতে দক্ষ মাপন সহায়ক** ميزان এই মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তুতে **এঁটে দিয়েছেন— এই তথ্যটি** তিনি আমাদেরকে ৫৫:৭ আয়াতে **জানিয়ে যান। ৫৫:৮** আয়াতটি আমাদেরকে বলে— আমরা এই **সৃষ্টিময় মহামাপন ব্যবস্থা** সম্পর্কে যেন 'গাফেল' বা অজ্ঞ বা অনবহিত **না হই— আমরা যেন** তা সনাক্ত করে **সৃষ্টির** মাঝে নিয়মের ব্যবস্থাপনাকে **অনুভব করতে** পারি আর এই মহাবিশ্বের বিশালতা অনুভব করে যেন **আল্লাহপাক** কত মর্যাদাময় তার সামান্যও হৃদয়ঙ্গম **করতে সক্ষম হই। আর** তারই আলোকে দয়াময় ৫৫:৯ আয়াতে আমাদেরকে **শিক্ষা দেন**— যেহেতু সারা সৃষ্টিতে সূক্ষ্ম মাপন ব্যবস্থার এক **মহাঅবস্থান নিয়ে** বিরাজ করে— সেহেতু আমরা মানুষ যেন আমাদের **সমাজ জীবনে** পরস্পরকে প্রতারিত করার উদ্দেশ্যের বশবর্তী হয়ে **সৃষ্টিময় ব্যবস্থার**

www.pathagar.com

সৃষ্টিজুড়ে "মীযান" -কে "ওদা'আ" করার চিত্র। সম্প্রসারণের নেশায় উড়ে যাচ্ছে প্রতিটি গ্যালাক্সি ও মহাবিশ্বসংসার। কিন্তু প্রতিক্ষণ প্রতিটি বিন্দুতে অবস্থানের সময় বলে যাচ্ছে— কি তাদের গতি, কি তাদের দূরত্ব, কি তাদের পদার্থ, কি তাদের উত্তাপ, কি তাদের বৈশিষ্ট্য, কোথায় তাদের অবস্থান, কি তাদের আকৃতি— এই সব। ৫৫:৭ আয়াত শুধু সম্প্রসারিত মহাবিশ্বের চিত্রই পেশ করে না— বলে দেয় সংশ্লিষ্ট যাবতীয় ইতিহাস ; ভূত ও ভবিষ্যৎ। ক্ষুদ্র একখানি আয়াতে সহস্র পুস্তক ও মহাপদ্ম তথ্যের সমষ্টি যেন !

www.pathagar.com

বিপরীতে অবস্থান না নেই। হয়তো এও বোঝাতে চান যে, মহাজাগতিক প্রতিটি বস্তুতে যেমন আল্লাহ্ পরিমাপের চিহ্ন এঁটে দিয়েছেন, তেমনি পরিমাপ মাত্রা অদৃশ্যভাবে হয়তো প্রতিটি মানুষ ও বস্তুতেই ব্যবস্থিত করে রেখেছেন— কারণ বস্তু মাত্রই তথ্যের ভাণ্ডার ও ধারক। আমরা যেন শেষ বিচারের দিনে এই কম মাপ ও ওজন দেবার অপরাধে লজ্জিত না হই— সে বিষয়টিও সম্ভবতঃ শিক্ষণীয় করে এরই মাঝে পৃথিবীবাসীদের জন্য রেখে দেয়া হয়েছে।

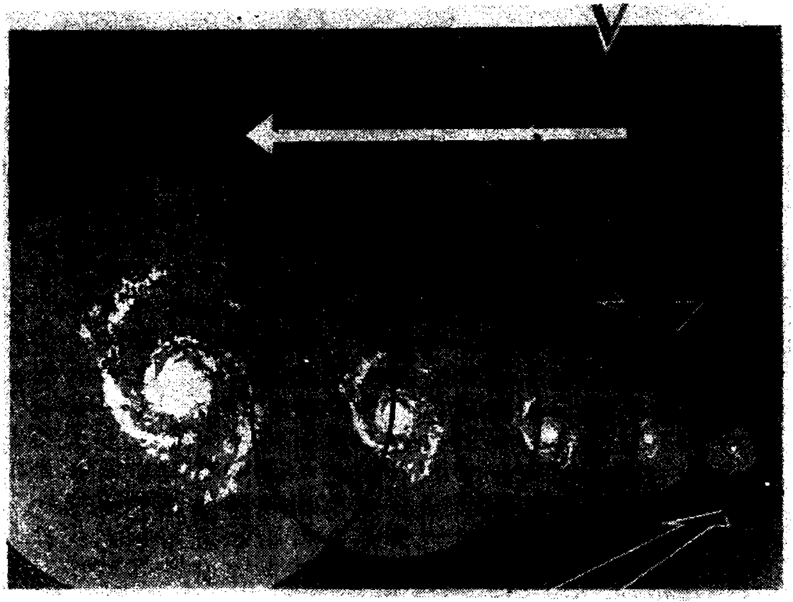

গ্যালাক্সিদের পশ্চাৎগমন (recession)। এটি সম্প্রসারমান মহাবিশ্বের ঘটনা। বিশ দশকে হাবেল হতে এই মহামূল্যবান তথ্যটি জানা যায়। গ্যালাক্সিদের পশ্চাৎগমন অর্থাৎ মহাবিশ্বের সম্প্রসারণের তথ্যটি এসেছিল রেডশিফ্ট (red-shift) বিশ্লেষণ করে। আর এই শিফ্ট বা স্থান পরিবর্তনের তথ্যটি প্রতিটি গ্যালাক্সি তার নিজের পদার্থ-প্রকৃতিতেই বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। স্রষ্টা প্রতিটি মহাজাগতিক বস্তুর গায়ে গায়ে দূরত্ব মাপনের উপায় বিধিবদ্ধ করে রেখেছেন। প্যারালাক্স পদ্ধতি ও সেফিড পদ্ধতির চাইতে অনেক বেশি প্রসারিত এই 'শিফ্ট' মহাবিশ্বের যে কোনো বস্তুর দূরত্ব, গতি, পদার্থ-প্রকৃতি, তাপীয়মাত্রা ইত্যাদি মাপার জন্য স্রষ্টার "মিযান" হিসাবে বিপুলভাবে বর্তমান রয়েছে।

www.pathagar.com

"ওজনের ন্যায্য পরিমাপ প্রতিষ্ঠিত কর এবং ওজনে কম দিও না" (৫৫:৯)। — এই খোদায়ী আদেশ মূলতঃ সৃষ্টিময় মহা পরিমাপ ব্যবস্থার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবার ও সমাজে পরিমাপের ভারসাম্য রক্ষা করার নির্দেশ। ৫৫:৭, ৮ ও ৯ আয়াত তিনটি একত্রে আমাদেরকে বলতে চায় যেন আমরা সৃষ্টিময় মহা পরিমাপের ব্যবস্থাকে প্রত্যক্ষ করি ও অনুধাবন করি, এই বাস্তবকে যেন উপেক্ষা না করি এবং আমাদের নিজেদের জীবনব্যবস্থায় যে পরিমাপের দায়িত্ব রয়েছে, সে দায়িত্বকে যেন লংঘন না করে যাই। আর এভাবেই দয়াময় *"মানুষকে শিক্ষা দিয়াছেন যাহা সে জানিত না" (৯৬:৫) তিনিই তাহাকে শিখাইয়াছেন ভাব প্রকাশ করিতে (৫৫:৫) তৃণলতা ও বৃক্ষাদি সকলেই মানিয়া চলে তাঁহার বিধান" (৫৫:৬)। অতএব "হে জ্ঞানীসমাজ! আল্লাহকে ভয় করিয়া চলিও— যাহাতে তোমরা পরিত্রাণ পাইতে পার (৫:১০০)। আল্লাহ যাহা তোমাকে দিয়াছেন, তদ্দ্বারা আখিরাতের আবাস অনুসন্ধান কর। দুনিয়া হইতে তোমার অংশ ভুলিও না, পরোপকার কর যেমন আল্লাহ্ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন" (২৮:৭৭)।*

আমরা এই মুহূর্তে আমাদের আলোচনাটিকে একটি সংক্ষিপ্ত তত্ত্বে প্রকাশ করতে চাই। আমরা তার নামকরণ করতে চাই কোরআনের "**মিযান তত্ত্ব**"। এই তত্ত্বটি, যা মাত্র ক্ষুদ্র একটি আয়াতের চারটি শব্দে প্রস্তাবিত হয়েছে— তা এক অসাধারণ ক্ষমতায় ও যোগ্যতায় প্রকাশ করেছে মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ ও গ্যালাক্সিদের পশ্চাৎ অপসরণের কথা, হারিয়ে যাবার নেশায় ছুটে চলা গ্যালাক্সিদের গতি, দূরত্ব, পদার্থ, আকার-আকৃতি, অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ, তাপ, রং এবং আকাশে সেফিডদের অবস্থানের কথা। 'মিযান তত্ত্ব' আমাদেরকে বলে যায়— আল্লাহ'র হিসাব হতে হারিয়ে যাবার মতো এই সংসারে কিছুই নেই। যে যেখানে অবস্থান করুক— সে তার নিজের স্বাক্ষর ও কৃতকর্মের সংকেত সৃষ্টিগতভাবেই প্রদান করে যাবে এতটা বাধ্য হয়ে যতটা

www.pathagar.com

বাধ্যবাধকতায় জীব মাত্রই মৃত্যুর কোলে সমর্পিত হয়। সৃষ্টিকুলের কোন কর্ম কিংবা কোন ঘটনাই দয়াময়ের দৃষ্টির আড়ালে নয়— এই তত্ব আমাদেরকে এই সাবধান বানী জানিয়ে যায়।

এই 'মিযান তত্ত্ব' কিন্তু আমাদেরকে আরো একটি ভয়ঙ্কর ইঙ্গিত দিয়ে যায়। এ প্রবন্ধে আমরা অবহিত হয়েছি যে প্রতিটি সৃষ্টি, হোক সে জীবিত কিংবা জড়, অতি ক্ষুদ্র কিংবা অতি বৃহৎ— সে কিন্তু প্রত্যেকটি মুহূর্তেই তার অস্তিত্বের এবং কৃতকর্মের স্বাক্ষর রেখে যায়। আর এই বিষয়টির উপরই কোরআন উচ্চারণ করেছে গুরুতর বাণী— *"সেই দিন আল্লাহ সকলকে পুনরায় উত্থিত করিয়া উহাদিগকে জ্ঞাত করিবেন তাহাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে। আল্লাহ্ উহাদিগকে সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন আর তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে (৫৮:৬) সেই দিন তাহাদিগের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে তাহাদের রসনা, তাহাদিগের হস্ত ও তাহাদিগের চরণ তাহাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে (২৪:২৪) সত্য প্রত্যাখ্যানকারীগণ সেদিন শুধু বলিবে— হায়! আমরা যদি মাটির সঙ্গে মিশিয়া যাইতে পারিতাম" (৭৮:৪০)।*

আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আ'লামীন।

www.pathagar.com

আকাশযান ও মুক্তি গতি

এক

জনৈক আরবী ভাষা-বিশেষজ্ঞ কথা প্রসঙ্গে আমাকে বললেন— 'অনেকেই মনে করেন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) 'জিন্দাবস্তা' কিংবা বাইবেল দেখে কোরআন রচনা করেছেন। আমার মনে হয়, তাদের ধারণা না-ঠিক। হয়তো কোরআন তিনি রচনা করেননি।' বিশেষজ্ঞ সাহেবের কথায় আমি স্তম্ভিত হতাম যদি তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক না হতেন (এমন ধরনের মনোভাব কেবলমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু কিছু শিক্ষকের ক্ষেত্রে বেশি জন্ম নিতে পারে)। কোরআনের একটি আয়াত আমার মনে পড়ল— *"যাহারা আল্লাহর নিদর্শনে বিশ্বাস করে না, তাহাদিগকে আল্লাহ্ পথ প্রদর্শন করেন না" (১৬:১০৪)।* অবশ্য তিনি অকপটভাবেই স্বীকার করলেন যে— কোরআনের বাণী ও বাক্যচয়নে অভিনব কৃতিত্ব রয়েছে যা আরবী ভাষার সকল সাহিত্যরূপ হতে ভিন্ন। তিনি পরিণামে কোরআন একটি ঐশীগ্রন্থ হতে পারে এ মনোভাব প্রকাশ করলেন।

জগৎ জুড়ে যে সত্যের উপর বিন্দুমাত্র সংশয় নেই এমন একটি ঐতিহাসিক তথ্য হলো যে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) লিখতে কিংবা পড়তে জানতেন না। তাঁর এই আক্ষরিক বিদ্যার অভাবটির প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে কোরআনের আয়াতে তাঁকে 'উম্মী' খেতাবে সনাক্ত করা হয়েছে। তখনকার সকল পণ্ডিতগণও পূর্বাহ্নেই অবগত ছিলেন যে, জগতের শেষনবী হবেন একজন নিরক্ষর

www.pathagar.com

মানুষ। মূলতঃ আল্লাহ কোরআনকে কোনো মানবিক কাজ বলে সন্দেহ হতে পারে, হয়তো এ কারণেই 'উম্মী' নবীর অবতীর্ণ করার বিষয়টি বিবেচনা করে থাকতে পারেন। জাগতিক অর্থে এমনি একজন নিরক্ষর মানুষ খ্রীষ্টীয় সাত শতকে বসে একটি যানবাহনের তথ্য দিয়ে গেছেন, যা আকাশে মানুষের পরিবহন হিসাবে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে। তাঁর উপর অবতীর্ণ কোরআন পৃথিবীর মানুষের নিকট পরিবহন কার্যে ব্যবহৃত হবে এমন ব্যোমযানের তথ্যই শুধু দিয়েছে এমন নয়, মানুষ এই পৃথিবীর সীমা অতিক্রম করে বহিঃসীমায় বা বহিঃদুনিয়ায়ও বিচরণ করবে, তার সম্ভাব্যতার প্রতিও ইঙ্গিত দান করে গেছে। সুধী পাঠক, খ্রীষ্টীয় সাত শতকের প্রেক্ষাপট হতে এমন ভবিষ্যৎবাণী এক বিস্ময়কর তথ্য নয় কি?

আমরা আপনাদেরকে এই অধ্যায়ে সহসা ধারাবাহিকতা ভঙ্গকারী দুটি আয়াতের পরিবেশে নিয়ে যেতে চাই। বলা দরকার, সহসা ধারাবাহিকতা ভঙ্গকারী কোরআনের আয়াতসমূহ সচরাচর বড় ধরনের প্রস্তাবের সাথে বিসংশ্লিষ্ট থাকে। সে দৃষ্টিকোণ হতে আমরা এখানে এ দুটি আয়াতের বিচার করতে সচেষ্ট হব। এই আয়াত দুটি হলো, *"আমি উহাদিগের বংশধরগণকে অর্ণবে আরোহণ করাইয়াছি (৩৬:৪১); এবং উহাদিগের জন্য অনুরূপ যানবাহন সৃষ্টি করিয়াছি যাহাতে উহারা আরোহণ করে" (৩৬:৪২)।* ৩৬:৪০ কিংবা তার পূর্বের যে কোনো আয়াতই এই দুই আয়াত হতে পরিপূর্ণভাবে ভিন্ন (৩৬:৪০ কিংবা পূর্ব আয়াতসমূহে চন্দ্র, সূর্য, দিন রাত্রি ইত্যাদি সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে)।

প্রশ্ন হতে পারে— 'অনুরূপ যানবাহন' যা ৩৬:৪২ আয়াতে প্রস্তাবিত হয়েছে, তাই কি ব্যোমযানের প্রস্তাব? প্রিয় পাঠক, একই সাথে আরো একটি প্রশ্ন হতে পারে— তাহলে অতীতকালের প্রেক্ষাপটে এই প্রস্তাব কেন করা হলো, কারণ কোরআন অবতীর্ণ

www.pathagar.com

হবার কালে আকাশযান তৈরী হবার ঘটনাটি ছিল একটি ভবিষ্যৎ মাত্র?

প্রকৃতপক্ষে যদি সৃষ্টির মূল নক্সাটি পূর্বাহ্নে প্রস্তুতকৃত বলে গ্রহণ করা হয় (মূলতঃ যা বাস্তব), তবে সমস্ত প্রকাশই অতীতকালের প্রেক্ষাপটে সঙ্গত। কিন্তু ৩৬:৪২ প্রস্তাবের *'যাহাতে উহারা আরোহণ করে'* তার প্রকাশক মূল ক্রিয়াটিকে যদি বিচার করেন, দেখবেন مايركبون শব্দটি বর্তমান ও ভবিষ্যৎজ্ঞাপক। ফলতঃ মূল সৃষ্টি নক্সায় একটি ব্যোমযানের বিবেচনা থাকলে খ্রীষ্টীয় সাত শতকে অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর (যখন আকাশযান আবিস্কার হয়) পূর্বে এই অর্থকরণ— *"যাহাতে উহারা আরোহণ করিবে"*— এই ভাবধারাটিও গ্রহণযোগ্য হতে পারে। অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় সাত শতকে কেউ যদি ৩৬:৪১–৪২ আয়াত দুটির অনুবাদ করতেন, তিনি এভাবে অনুবাদ করতে পারতেন যে— *"উহাদিগের এক নিদর্শন এই যে আমি উহাদিগের বংশধরদিগকে অর্ণবে (Ship) আরোহণ করাইয়াছি। এবং উহাদিগের জন্য অনুরূপ যানবাহন সৃষ্টি করিয়াছি যাহাতে উহারা আরোহণ করিবে"।*

এখানে বিশ্লেষণের জন্য আরো একটি ক্ষেত্র পাওয়া যায়। ৩৬:৪১ আয়াতে *'উহাদিগকে আরোহণ করাইয়াছি'* এবং ৩৬:৪১ আয়াতে *'উহাদিগের বংশধররা আরোহণ করিবে'* এই দুই ভাবধারায় একটি বংশধরের চাইতে তার পরবর্তী বংশধরগণের কৃতিত্ব ও যোগ্যতার তুল্যমান সাফল্যটি যে উন্নততর হতে পারে তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিতটি পাঠ করা যায়। আমরা সহজেই বুঝতে সক্ষম হই— এই সাফল্যটি বিজ্ঞানের ক্ষেত্র–সংক্রান্ত ; যে ক্ষেত্রটি অর্ণব বা সমুদ্রের জাহাজ কিংবা অনুরূপ যানবাহন তৈরীর সাথে সংশ্লিষ্ট। অর্ণব বা সামুদ্রিক জাহাজের 'অনুরূপ যানবাহন' পরবর্তী বংশধরগণের জন্য সৃষ্টির তথ্যটি খ্রীষ্টীয় সাত শতকে দান করার মাঝে মানুষের বিজ্ঞানে বিবর্তনের ও উন্নয়নের বিবেচনাটি

www.pathagar.com

আল্লাহ্‌পাকের মূল–নক্সায় ইতিমধ্যে তৈরী হয়ে থাকার তথ্যটিই প্রকাশ পায়।

দুই

কোরআনে নৌযান বা অর্ণব বোঝাতে দুটি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে— তাদের একটি فلك (ফুল্‌ফ) ও অন্যটি جوار (জাওয়ার)। ৩৬:৪১ আয়াতের অর্থটি فلك দ্বারা প্রস্তাবিত। শব্দটির মূল فلك (ফাল্‌ক্‌) এর অর্থ হলো— কোনো কিছু গোলাকৃতির। কোরআন বিশেষভাবে একে কক্ষপথ হিসাবে চিহ্নিত করেছে। এই শব্দের আর একটি অর্থ হলো বড় সামুদ্রিক জাহাজ (ফুল্‌ক)। সন্দেহ নেই আয়াতটিতে কেবল সামুদ্রিক জাহাজের কথাই বলা হয়েছে। সাত শতকে কোনো ইঞ্জিনযুক্ত জাহাজ ছিল না বটে— কিন্তু সমুদ্রে বিচরণশীল পালে কিংবা বৈঠায় বড় বড় জাহাজ তখনো ছিল। আয়াতের এই প্রস্তাব তাই সামুদ্রিক জাহাজের কিংবা জলযানের যে কোনো প্রকারকে বোঝাতে ব্যবহৃত হতে পারে।

এই فلك শব্দটির অন্য একটি রূপ فلكى (falakiyy) এর অর্থ হলো আকাশীয় কিংবা আকাশ সম্পর্কিত (heavenly, referring to the sky, astronomical) অর্ণব বা 'ফুল্‌ক' শব্দটির মূল যেমন ফাল্‌ক্‌ , তেমনি 'ফালাকী' শব্দটির মূলও 'ফাল্‌ক্‌'–ই (فلك) ফলতঃ 'ফালাকী' এর রূপ–মূল 'ফুল্‌ক্‌' এর ব্যাপ্তি নিয়ে আমাদেরকে যে বিষয়ে ভাববার সুযোগ দেয়— তা হলো এই যে, সম্ভবতঃ ফুলকী শব্দটির অর্থের মাঝে একটি আকাশীয় সম্পর্ক বিসংশ্লিষ্ট থাকতে পারে। অর্থাৎ ৩৬:৪২ আয়াতে যে অনুরূপ যানবাহনের কথা বলা হয়েছে, সে অনুরূপ যানবাহনটি একটি আকাশীয় যানবাহন হতে পারে, এই বক্তব্যই এখানে প্রচ্ছন্নভাবে পাঠ করার সুযোগ রয়েছে।

আমরা কেন বিষয়টিকে এভাবে দেখতে চাইছি, তার কারণ রয়েছে। সন্দেহ নেই, ফুল্‌কী শব্দে সামুদ্রিক বড় যান বা জলযানের

www.pathagar.com

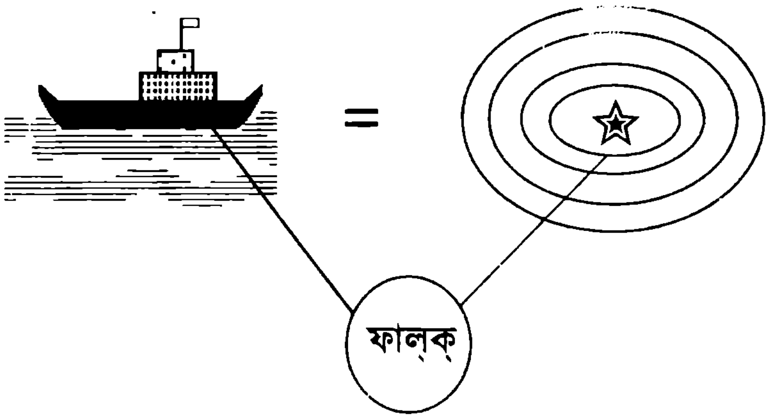

'ফুল্‌কী' শব্দের মূল হলো ফাল্‌ক্‌— আর 'ফাল্‌ক' (فلك) মূলটির বিসংশ্লিষ্টতা রয়েছে কক্ষপথের সাথে। ৩৬:৪১ আয়াতে অর্ণব বা সমুদ্রযান বোঝাতে ব্যবহৃত শব্দ 'ফুলকী' এর অনুরূপ যান (যা ৩৬:৪২ আয়াতে প্রস্তাবিত হয়েছে) কেবলমাত্র এমন একটিই হতে পারে যার সাথে কক্ষপথে অর্থাৎ 'শূন্য' বা আকাশের সম্পর্ক বিদ্যমান।

প্রস্তাব পরিস্কার। ফুল্‌কী শব্দটি বিশেষভাবে বড় অর্ণব বা Large ship এই অর্থে প্রকাশিত (নৌকা নয়)। বড অর্ণব বা Large ship এর অনুরূপ বাহন যা মানুষের আরোহণযোগ্য, সেটি কি হতে পারে? مثله শব্দের দ্বারা আমরা যে অনুরূপতা বুঝতে সমর্থ হই, তা আমাদেরকে অন্ততপক্ষে অন্য কোনো জলযানের দিকে নির্দেশ করে না, কারণ অর্ণব বা সামুদ্রিক জাহাজের অনুরূপ আর কি হতে পারে? সমুদ্রে বিচরণশীল যা-ই হবে, সে-ই 'ফুলকী' নামেই চিহ্নিত হবে। ফলতঃ অনুরূপ যানবাহন কোনো কারণেই আর জলযান হবার সুযোগ থাকে না। বাধ্য হয়েই তা হতে হবে হয় স্থলযান, নয় আকাশযানের কোন একটি।

স্থলযান বিষয়ক প্রস্তাবটি ১৭:৭০ আয়াত দ্বারা যেভাবে প্রস্তাবিত হয়েছে, তা হলো.— *"আমি আদম সন্তানদিগকে মর্যাদা দান করিয়াছি স্থলে ও সমুদ্রে, উহাদিগকে চলাচলের বাহন দিয়াছি"* —এই চলাচলের বাহন এবং ৩৬:৪২ এর "অনুরূপ বাহন" এ

www.pathagar.com

দুইয়ের মধ্যে একটু পার্থক্য রয়েছে। এই পার্থক্যটি ৩৬:৪৩ আয়াতের একটি শব্দ দ্বারা চিহ্নিত হয়েছে। এই শব্দটি হলো نغرقهم যার মূল হলো غرق। প্রস্তাবটির সার চিত্র হলো এই যে, আল্লাহ তা'লা নৌযান বা অর্ণবকে এবং 'অনুরূপ' যানকে ইচ্ছা করলে নিমজ্জিত করতে পারেন এবং নিমজ্জিত করা হলে এ ক্ষেত্রে আরোহণকারীরা কোনো সাহায্যকারী বা পরিত্রাণ পাবে না। অনুরূপ যানটি যদি স্থলযান হয়, তবে نغرقهم শব্দটি তার ক্ষেত্রে ব্যবহার উপযোগী নয়, কারণ একটি স্থলযান কখনো এই শব্দটি দ্বারা প্রস্তাবিত ক্রিয়ার কার্যকারণের শিকার হতে পারে না, কিংবা যা নিমজ্জন ক্রিয়ার অনুরূপ ধ্বংসের আওতাধীন নয়। غرق শব্দটি একটি নিমজ্জন ক্রিয়া, তলাইয়া যাওয়া, পতনজনিত ধ্বংস ইত্যাদি নির্দেশ করে)। অতএব, অনুরূপ যানবাহনটি যে কেবলমাত্র একটি আকাশীয় যান হতে পারে যার মধ্যে পতন, নিমজ্জন ও অনুরূপ বৈশিষ্ট্য বিসংশ্লিষ্ট রয়েছে এবং এই ধ্বংসের সময় আরোহীগণ সর্বৈব অসহায়ত্বে পতিত হতে পারে এই চিত্রটি সহজেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

শব্দ চয়নে আরো একটি ইঙ্গিতবহ নির্দেশ হলো ৩৬:৪১ আয়াতে "উহাদিগের" বংশধরদের সম্পর্কিত তথ্য। এই বংশধরদিগের জন্য ৩৬:৪২ আয়াতে অনুরূপ যানবাহনটির সৃষ্টির প্রস্তাব এসেছে। ৩৬:৪১ আয়াতে যাদেরকে নৌযান বা অর্ণবে আরোহণ করানোর কথা বলা হয়েছে, ৪২ নম্বর আয়াতে তাদেরই বংশধরদের কথা বলা হয়েছে। এখানে একটি সুবিধার দিক হলো যে, এই বংশধররা এক অব্যাহত ধারাবাহিকতায় বিরাজমান এবং ৩৬:৪২ আয়াতটিকে যদি *"উহাদিগের জন্য অনুরূপ যানবাহন সৃষ্টি করিয়াছি যাহাতে উহারা আরোহণ করিবে"*— এই আঙ্গিকে অর্থকরণ করা হয়, তবে এখানে এক অব্যাহত উন্নয়নের ধারাবাহিতা যথার্থভাবেই অনুমোদিত হয় ; অর্থাৎ রাইট ব্রাদার্সে'র খেলনা প্লেনটি হতে শুরু করে আজকের 'জাম্বুজেট' কিংবা আরো পরবর্তী যুগে

www.pathagar.com

যদি প্রযুক্তির ততটা উন্নতি হয় তবে 'ইন্টারস্টেলার জেট' বা আন্তঃনাক্ষত্রিক জাহাজও তৈরী হবার সম্ভাবনাময় ইঙ্গিত এই ক্ষুদ্র শব্দ 'ইয়ারকাবুন' يركبون এর মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় রয়েছে।

অনুরূপ যানবাহন কোনটি? যে কোনো নব আবিস্কৃত জলযানই কোরআনের ভাষায় 'ফুলকী' নামে শ্রেণীভুক্ত হয়ে পড়বে। কোরআন অবতীর্ণ হবার কালে স্থলযান ও জলযান ছিল। ভবিষ্যৎ বংশধরগণের সম্পর্কের সাথে বিসংশ্লিষ্ট, কক্ষপথ বা আকাশীয় শূন্যতার সাথে বিসংশ্লিষ্ট এবং নিমজ্জন সংকটে পতিত হবার আশঙ্কায় অনুরূপ যানটির যে চরিত্র প্রকাশ পায়— তা সর্বোতভাবে একটি আকাশীয় যান ভিন্ন অন্য কোনো স্থলযান হবার কারণ নেই।

ফলতঃ আমরা যথার্থভাবেই বলতে পারি যে ৩৬:৪২ আয়াতের অনুরূপ যানবাহনটি একটি আকাশীয় যান ভিন্ন অন্য কিছু নয়। বলা বাহুল্য যে সামুদ্রিক জাহাজের সাথে ব্যোম-জাহাজসমূহের একটি ব্যবহারিক অনুরূপতা প্রাত্যহিক জীবনেও আমরা প্রত্যক্ষ করি।

www.pathagar.com

তিন

১৬:৭৯ ও ৬৭:১৯ আয়াতে বিহঙ্গকুলের শূন্যে ভারসাম্য প্রাপ্ত হবার বিষয়ে লক্ষ্য করার নির্দেশ রয়েছে। ঘটনাটি আমাদের কাছে এতই স্বাভাবিক যে এর মাঝে লক্ষণীয় বড় কিছু দেখতে পাই না যদিও এখানে একটি লক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। দুর্বোধ্য অভিকর্ষ বলটি বস্তুর আকৃতির সাথে অতিশয় হিসাব করা অনুপাতে বিদ্যমান। আমাদের পৃথিবীর পদার্থ, প্রকৃতি, আকৃতি ইত্যাদি যদি সৌরজগতের যে কোনো একটি বড় গ্রহের সমান হতো— তবে কোনো বিহঙ্গকুলের পক্ষে এত সহজে উড্ডয়ন সম্ভব হতো না। এই পৃথিবীর পরিবেশে পাখিদের উড্ডয়নের বিষয়টি যে বিবেচনা করে রাখা হয়েছে— আমাদের পৃথিবীর মুক্তিগতি তা-ই আমাদেরকে বলে যায়। অন্যদিকে পৃথিবী ছোটও হতে পারত— যেমন প্লুটো বা বুধ ইত্যাদির মতো। সেখানেও একটা বিপত্তিকর বিষয় ঘটতে পারত। চাঁদের কথা ধরুন, চাঁদ কেবল পৃথিবী বলয় হতে বেরিয়ে এসে সূর্য কেন্দ্রিক ঘূর্ণি শুরু করে দিলেই প্লুটোর চাইতে বড় গ্রহ হিসাবে বিবেচনা পাবে। আমাদের পৃথিবী যদি চাঁদের মতো হতো, তবে এর 'মুক্তিগতি'টি হতো অনেক অনেক কম। ফলতঃ সেখানে একটি পাখি ডানা মেলে কয়েকটি ঝাপটা দিলে কেবল সে পৃথিবী ছেড়ে উড়েই যেতে থাকত। আমরা পাখিদের চিন্তাটি বাদ দিয়ে একটি আকাশযান, ধরুন একটি জেট ইঞ্জিনযুক্ত ব্যোমযানের কথা ধরি। এমন অবস্থায় ব্যোমযানটি উড্ডয়নের কিছু সময় পরই তার মাতৃগ্রহকে চিরদিনের জন্য হারিয়ে ফেলত। কারণ মাতৃগ্রহ, ধরুন পৃথিবী প্রতি সেকেণ্ডে ৩০ কিঃ মিঃ বেগে ধাবিত হলে উড্ডয়নের পরপরই অল্প মুক্তিগতির কারণে কিংবা অতি দুর্বল অভিকর্ষের কারণে উড়ন্ত জাহাজটিকে সাথে টেনে নিতে সক্ষম হতো না। ফলতঃ আজকের বিমানগুলি যেমন ৩৫ হাজার ফুট উপর দিয়ে ঘন্টায় ৬/৭ শত মাইল বেগে ধাবিত হয়ে যেতে পারে, পৃথিবী যদি চাঁদের মতো হতো তাহলে কখনোই এমন প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হবার বা মানুষের কল্যাণে আসার সুযোগই থাকত

www.pathagar.com

না। অতএব প্রস্তাবিত দুটি আয়াতে যে স্থিরত্বের প্রতি বা ভারসাম্যের প্রতি নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তা যতই স্বাভাবিক মনে হোক, মূলতঃ এ আয়াত দু'টি' প্রকৃতিতে দুর্লভ সমন্বয়ের প্রতি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে আর বলতে চায় যে, বিহঙ্গকুলের যে স্থিরত্ব দেখবার সুযোগ রয়েছে, তা দয়াময়ের বিশেষ করুণায় ও মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত এক হিসাব করা ব্যবস্থার স্বাক্ষর মাত্র।

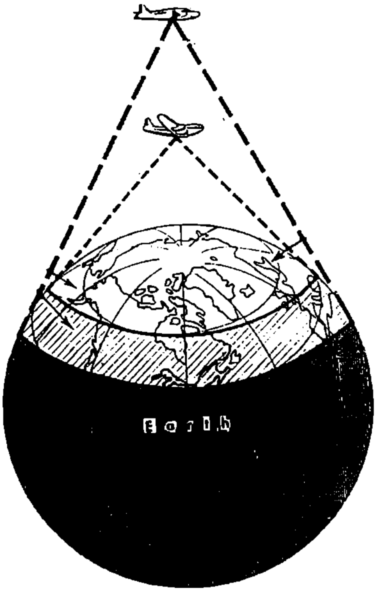

পৃথিবীর মুক্তিগতি বা escape velocity এমন যে যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো আকাশযান প্রতিসেকেণ্ডে প্রায় ১১ কিলোমিটার বেগে না চলবে— ততক্ষণ পর্যন্ত ব্যোমযানটি পৃথিবীর অদৃশ্য অভিকর্ষ গোলকে আবদ্ধ থেকে পৃথিবীর বক্রতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এক স্থান হতে অন্যস্থানে যাতায়াত করতে পারবে। এ হলো এক অদৃশ্য দান যা না হলে আকাশে উড্ডয়মান যে কোনো বস্তু নিমেষেই হারিয়ে যেত। অন্যপক্ষে এই অভিকর্ষ মাত্রা পৃথিবীতে সম্ভব করে রেখেছে জীবনের সকল প্রবাহকে, যার বিশ্লেষণটি জটিল হলেও তার ফলাফল প্রতিদিন প্রতিটি জীব উপভোগ করতে পারে স্বাচ্ছন্দে।

www.pathagar.com

আমরা ৬৭:১৯ নম্বর আয়াতে এসে বিহঙ্গদের ডানা সংকুচন ও প্রসারের প্রতি দৃষ্টি দেবার নির্দেশ লাভ করি। এই সংকুচন ও প্রসারণ ব্যবস্থাটি শক্তি উৎপাদনের কাজে অঙ্গ সঞ্চালনের পুনঃপৌনিকতার প্রয়োজনকে চিত্র রূপ দেয়। মানুষ জাতি যদি আকাশে উড়তে চায়— তবে তার জন্য উড্ডয়নের যন্ত্রে অনুরূপ শক্তি উৎপাদকের ব্যবস্থা থাকা চাই, এই তথ্যটিই সাত শতকের মানুষকে কোরআন জানিয়ে গেছে। আর এই শক্তি উৎপাদনটিও যে একটি সংকুচন ও প্রসারণ ব্যবস্থায় সাধিত হতে পারে, সম্ভবতঃ এরও একটা ইঙ্গিত থাকতে পারে এখানে। অন্ততঃ আমাদের যুগের সকল আইসি/ইসি ইঞ্জিনে এই সংকুচন ও প্রসারণ ব্যবস্থাটিই একমাত্র উপায় যা শক্তির যোগান দেয়। হোক সে জলযান, হোক স্থলযান কিংবা আকাশযান, সংকুচন ও প্রসারণ প্রক্রিয়াই কেবল শক্তির যোগান দিয়ে থাকে। পাখিদের এই ডানা সংকুচন ও প্রসারণ প্রক্রিয়াটির সূত্র মানুষকে শক্তি উৎপাদনে এবং বিশেষভাবে আকাশে আধিপত্য স্থাপনে সাহায্য করবে— সম্ভবতঃ স্রষ্টার এই বিবেচনাটিই এই আয়াতে স্থান পেয়েছে।

চার

৫৫:৩৩ আয়াতটি আমাদেরকে আরো একটি ধাপ এগিয়ে দেয়। মানুষ ও জ্বীন জাতিকে উদ্দেশ্য করে আয়াতটির প্রস্তাব— *"হে জ্বীন ও মানব সম্প্রদায়— যদি সম্ভব করিয়া তুলিতে সক্ষম হও, তবে তোমাদের আঞ্চলিক আকাশ ও পৃথিবীকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পার। তোমরা তা কখনোই সক্ষম হইবে না চরম ক্ষমতা অর্জন ব্যতিরেকে"।* ব্যবহৃত সুলতান سلطن শব্দটির অর্থ হলো চরম ক্ষমতা, প্রভাব, (Absolute power, domination, Violence, ruler, emperor)। অর্থাৎ স্থানীয় আকাশীয় অঞ্চলসমূহ এবং পৃথিবীর অঞ্চলকে অতিক্রম করে যেতে হলে একটি চরম ক্ষমতার প্রয়োজন হবে— এই তথ্যটিই নির্দেশিত হয়।

www.pathagar.com

এই নির্দেশ কিন্তু আমাদেরকে বিজ্ঞানের একটি মূল্যবান বিষয় সম্পর্কে সচেতন করে যা হলো পৃথিবীর escape velocity বা মুক্তি–গতি। আজ আমরা জানি যে এই পৃথিবীর মুক্তিগতি হলো ১১ কিঃমিঃ/সেকেণ্ড, অর্থাৎ কোনো বস্তু যদি এই পৃথিবীর আকাশকে অতিক্রম করে বহিঃবিশ্বে বা সৌরজগতের পথে কিংবা অন্য কোনো তারার জগতে পা ফেলতে চায়, তবে তাকে পরিণামে ১১ কিঃ মিঃ/সেকেণ্ড গতি নিয়ে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ বলয়কে অতিক্রম করে বেরিয়ে যেতে হবে। অন্যথায় সে বাধ্য হয়ে ঘুরে আসবে পৃথিবীতে। পৃথিবীবাসীর প্রযুক্তি ও তার উচ্চমূল্যমানের প্রশ্নে এই মুক্তিগতি অতিক্রম করার শক্তিটি অবশ্যই এক চরম শক্তি। মূলতঃ পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে এটি একটি চরম প্রযুক্তি ও চরম শক্তি। এই চরম শক্তি বা গতির প্রযুক্তি মানুষের হাতে না থাকলে মানুষ কখনো পৃথিবীর এলাকাকে ছেড়ে যেতে সক্ষম হতো না।

পৃথিবীর মুক্তিগতি ১১ কিঃমিঃ/সেকেণ্ড। এ গতি অর্জনের জন্য চাই প্রযুক্তি এবং সম্পদের শক্তিধর ক্ষমতা। একটি রকেটের প্রতিবারের মিশন একদিকে যেমন বিশাল অর্থ–সম্পদের প্রয়োজন ডেকে আনে, অন্যদিকে তার জন্য চাই প্রযুক্তিগত চরম ও সুলতানীয় উৎকর্ষমান!

www.pathagar.com

কোরআন তার বিবেচনায় মানুষের জন্য মহাবিশ্বের দ্বারকে উন্মুক্ত রেখেছে— ৫৫:৩৩ আয়াতটিই তার সুস্পষ্ট প্রমাণ। এই আয়াত মানুষের চাঁদে গমন থেকে মহাবিশ্বের যে কোনো অঞ্চলে গমনের যে কোনো সম্ভাব্যতাকে অনুমোদন করে। এই অনুমোদন খ্রীষ্টীয় সাত শতকে ব্যবস্থিত হয়েছিল, তার ফলাফল আমরা বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এসে প্রত্যক্ষ করছি। কোরআনের এই সম্ভাব্যতার অনুমোদন একটি বিস্ময়কর তথ্য নয় কি?

"আল্লাহ্ তিনি, যিনি উম্মীগণের জন্য তাহাদের মধ্য হইতে একজনকে পয়গাম্বর হিসাবে প্রেরণ করিয়াছেন যিনি তাহাদিগকে আল্লাহর নিদর্শনসমূহ অবগত করেন (৬২:২)। যিনি আয়াতগুলি তোমাদেরকে পড়িয়া শুনাইতেছেন, তোমাদিগের শুদ্ধ করিতেছেন, তোমাদিগকে কিতাব ও জ্ঞানবিজ্ঞান শিক্ষা দিতেছেন এবং তোমাদেরকে অজ্ঞাত বিষয়সমূহ অবগত করিতেছেন (২:১৫১)। উহা মহাসম্মানিত কোরআন (৮৫:২১)। লওহে মাহফুজে সুরক্ষিত (৮৫:২২)। পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে অবশ্যই ইহার উল্লেখ রহিয়াছে (২৬:১৯৬)। বনী ইসরাইলের পণ্ডিতগণ (পূর্ব হইতেই) ইহা অবগত ছিল, উহা তাহাদের জন্য সুস্পষ্ট নিদর্শন নয় কি? (২৬:১৯৭)"।

"ওহে লোকসকল! তোমাদের উপর তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে এক সনদ আসিয়াছে (৪:১৭৪) ইহা মানুষের জন্য এক বার্তা যাহাতে ইহা দ্বারা উহারা সতর্ক হয় এবং জানিতে পারে যে, তিনিই একমাত্র উপাস্য, যাহাতে বোধশক্তিসম্পন্নরা উপদেশ গ্রহণ করে (১৪:৫২) নিশ্চয়ই ইহাতে উপদেশ রহিয়াছে তাহার জন্য যে ব্যক্তি সমীহ করিয়া চলে (৭৯:২৬) এই সব হইতেছে উপদেশপূর্ণ বিবরণ, অতএব, যাহার ইচ্ছা নিজ পালনকর্তার দিকের পথ গ্রহণ করুক" (৭৬:২৯)।

আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আ'লামিন

www.pathagar.com

সমুদ্র নৌযান ও নিদর্শন

এক

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যমযম কূপের পানি দাঁড়িয়ে পান করতেন আর প্রার্থনা করতেন, *'রাব্বি যিদনী ইলমা'* —হে আমার প্রতিপালক, জ্ঞান দাও। প্রকৃতির উদার উৎসের পানি পান করার সময় জ্ঞানের জন্য প্রার্থনা করতেন তিনি। নবীজী হতে সব চাইতে প্রত্যাশিত বিষয়টি ছিল শুকরিয়া কিংবা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার বিবেচনা; তিনি এ বিবেচনাকে অতিক্রম করে জ্ঞানের জন্য প্রার্থনা করতেন, এ বিস্ময়কর অমিলটির মধ্যে আমাদের জন্য শিক্ষণীয় কিছু রয়েছে কি?

আমার জান্নাতবাসিনী মা (যিনি আল্লাহপাকের ক্ষমা লাভের সুসংবাদপ্রাপ্ত হয়েছেন) আমাকে যে ক'টি গুরুতর উপদেশ দিয়েছিলেন, তার একটি ছিল পানি পান করার সময়ে যেন আদব বা বিনয় প্রদর্শন করি। তিনি বলতেন, এ হলো এক গুরুতর সুন্নত। পানি পান করতে হয় বসে বিনয়ের সাথে, আর আল্লাহপাকের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হয় পরম শ্রদ্ধায়। এ সৃষ্টির সর্ব নিয়ামক পানি পান করার মুহূর্তে আল্লাহপাককে স্মরণ করার বিবেচনাটি তাঁর মতে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ এই জন্য যে, পানি হতেই জীবন সৃষ্টি হয়েছে এবং প্রতিপালিত হচ্ছে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে পানির গুরুত্ব প্রকাশ করা হয়— 'পানির অপর নাম জীবন' এই প্রবাদ বাক্যটিতে।

www.pathagar.com

পানির সাথে মানুষের সম্পর্ক পরম কৃতজ্ঞতাবোধের সাথে বিসংশ্লিষ্ট। কিন্তু একটি বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হয়েছে— মহানবী (সাঃ) পানি পান করে জ্ঞানের জন্য প্রার্থনা করেছেন। কিন্তু কেন?

অক্ষরজ্ঞান ছিল না এমন একজন নবীর অনেক অভ্যাস ও কার্য আজ বিজ্ঞানের মূল্যবান তথ্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এগুলোর মধ্যে একটি হলো— যমযম কূপের পানি পান করার সময় তাঁর দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করা, 'হে প্রভু— আমাকে জ্ঞান দাও।'

বিস্ময়করভাবে খনিজ পানি সুপেয়, সুমিষ্ট ও বিশুদ্ধ। এই উৎস বিস্ময়করভাবে অশেষ ও আমাদের সহজলভ্যতার মধ্যে— এর বিস্ময়ময়তার কথা বলছি না। পানি যে সৃষ্টিতে কত বিস্ময়কর কীর্তি এবং সৃষ্টের জন্য এ কত বড় করুণা এবং এখানে কত জ্ঞানের ইতিহাস লেখা রয়েছে তার একটি বিশেষ আলোচনা আমরা 'মহাকাশ পর্ব-১'-এ সামান্য মেলে ধরেছি। জ্ঞানের কথা ও কৃতজ্ঞতার সম্পর্ক আমাদের সেই ক্ষুদ্র আলোচনাতেই শেষ হয়ে যায় না। আমরা এ পাঠে আরো একটু বৃহত্তর পরিসর ও ভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করতে চাই।

লক্ষ্য করুন— *"তিনি ইচ্ছা করিলে বায়ুকে স্তব্ধ করিয়া দিতে পারেন। ফলে নৌযানসমূহ নিশ্চল হইয়া পড়িবে সমুদ্রপৃষ্ঠে। নিশ্চয়ই ইহাতে নিদর্শন রহিয়াছে ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য" (৪২:৩৩)।* এই আয়াতটি এত সাদাসিধে যে এখানে জ্ঞানের বড় কোনো নিদর্শন খুজে পাওয়া ভার যেন। বায়ুকে স্তব্ধ করে দিলে নৌযানসমূহ নিশ্চল হয়ে পড়বে— এটা গ্রহণযোগ্য যুক্তি নয়। কোরআন যে যুগে অবতীর্ণ হয়েছে, সে যুগেও সম্পূর্ণ পাল ও বাতাস নির্ভর নৌযান ছিল, এমন বলা যায় না। তখনও নৌযানে সারি সারি দাঁড় টানার ব্যবস্থা ছিল এবং পরবর্তী যুগে ইঞ্জিনের উদ্ভাবন পালের নৌ-ব্যবস্থাকে প্রতিস্থাপিত করে দিয়েছে। অতএব

www.pathagar.com

সহজেই বলা যায় যে, সময়ের কোনো প্রেক্ষাপটেই বাতাস না থাকলে পাল বন্ধ হয়ে নৌযান স্তব্ধ হয়ে পড়বে এ তথ্যকে অগ্রাহ্যকর মনে হয়। তাহলে কি বিরুদ্ধবাদীরা উল্লসিত হবে যে— কোরআনের তথ্য সত্য পরিহার করেছে?

সম্ভবতঃ আমাদের এই ক্ষুদ্র মানবিক জ্ঞানকে সাহায্য করার জন্য রসুল পাক (সাঃ) তাঁর একটি বিবেচনায় পানি বসে পান করার জন্য নির্দেশ দিতেন (কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে) এবং অন্য একটি বিবেচনায় পানি দাঁড়িয়ে পান করার সাথে সাথে এর বিশেষত্ব সকলের অনুভূতিতে পৌছে দিতেন (সঠিক তথ্য ও উপলব্ধি অর্জনার্থে) এবং এর সাথে যে জ্ঞানের সম্পর্ক রয়েছে, সেই বক্তব্যটি সুস্পষ্টতায় প্রকাশ করতেন। সুধী পাঠক, আপনি জানেন কি যে প্রিয় নবীজীর এই ইঙ্গিত এক সীমাহীন জ্ঞানের দিকে নির্দেশ দিয়ে যায় এবং আমরা পূর্বে যে ৪২:৩৩ আয়াতের উল্লেখ করেছি, তার বাচনীয় সরলতার ভেতরেই এই পৃথিবীর জীবন-বলয়ের এক অস্তিত্বের ইতিহাস লেখা রয়েছে? চলুন, আমরা জ্ঞানের এক অজানা দিগন্তের পানে অগ্রসর হই।

দুই

কার্বন-মৌল সমৃদ্ধ এই পৃথিবীর জীবন ব্যবস্থাটিকে সৃষ্টি ও আজকের দিন পর্যন্ত লালন করতে স্রষ্টাকে সীমাহীন সূক্ষ্মতার ও সময়ের বিবেচনার আশ্রয় নিতে হয়েছে। আমরা প্রথম পর্বে আলোচনা করেছি যে কোরআনের স্রষ্টা যে ছয়টি কাল-পর্যায় বা 'ইয়াওম' (يوم) এ এই মহাবিশ্ব ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, তার বিভাজন মূলতঃ পদার্থ ও শক্তির অবস্থাগত বিবেচনা নির্ভর। কোরআনের প্রস্তাবিত ছয়টি কাল-পর্যায়ের শেষটিতে আমরা অবস্থান করছি, বিজ্ঞান যাকে 'স্টেলার ইরা' হিসাবে চিহ্নিত করেছে। এই স্টেলার ইরাতেই বিশ্ব সৃষ্টির মূল রসদ হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম এক

www.pathagar.com

সৃষ্টিগত ও বিধিবদ্ধ অনুপাতে নক্ষত্রদের মহাজাগতিক রন্ধনশালায় 'কুক্‌ড' হয়ে জন্ম দিয়েছে এই পৃথিবীতে প্রাপ্ত যাবতীয় মৌল–বিস্তার যারা জীবনের উন্মেষ ও প্রতিপালনে সাহায্য করে। বলা দরকার, মহাবিশ্ব সৃষ্টির ক্ষণে হাইড্রোজেন–হিলিয়াম ব্যতীত আর কোনো মৌলিক পদার্থ তৈরী হয়নি। এরা তৈরী হয়েছে সময়ের বিভিন্ন পরিসরে চাপ ও তাপীয় ভিন্নতায় বড় বড় নক্ষত্রদের অভ্যন্তরে। ঐ সব নক্ষত্ররা একসময় সুপারনোভা বিস্ফোরণের শিকার হয়েছে। তারা উৎক্ষিপ্ত করেছে মহাবিস্তার মেঘ–ধূলি–পদার্থ কণা, যারা ছড়িয়ে পড়েছে দিগ্বিদিক। মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর এদের বেগবান পদার্থ–মেঘ চলতে চলতে পৃথিবী যার সদস্য এমন কোনো সৌর ব্যবস্থায় অভিকর্ষ–বন্দী হয়েছে। তারপর প্রবাহিত হয়েছে তার কেন্দ্রের দিকে অভিকর্ষের কারণেই। কেন্দ্রের নিকটবর্তী গ্রহরা মাখিয়ে নিয়েছে ঐ সব বিস্ফোরণজাত জঞ্জাল— যা মূলতঃ ছিল আশীর্বাদ। এর মধ্যে যে গ্রহটি গতি, দূরত্ব, আকৃতি, তাপীয় অবস্থায় ও পরিমাপের সূক্ষ্মতায় সবচাইতে সুবিধাজনক অবস্থানে বিরাজ করেছে— তার জন্যে জীবনের ক্ষেত্র রচনা করা সম্ভব হয়েছে। এই প্রক্রিয়াটি মিলিয়ন বিলিয়ন বৎসরের ধারায় অব্যাহত থেকেছে ; আর তার জন্য প্রয়োজন পড়েছে একটি নয়— হয়তো অসংখ্য সুপারনোভা বিস্ফোরণ; আর এক একটি বিস্ফোরণ এক একটি প্রস্ত (set) মৌলের সরবরাহ নিশ্চিত করেছে এক একসময়। সেখানেও রয়েছে সূক্ষ্মতার বিবেচনা! বিবেচনার এই সূক্ষ্মতা এতটা নাজুক যে তারতম্যের ফলশ্রুতি জীবন প্রতিপালনের স্থলে নিধনের প্রক্রিয়ায় পর্যবসিত হতে পারত। ফ্রেড–হয়েলের একটি হিসাবের উদ্ধৃতি এখানে দেয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ উদ্ধৃত করা যায় যে— হিলিয়াম–৪ ও বেরিলিয়াম–৮ (helium-4 and beryllium-8) এর একত্রিভূত শক্তিমাত্রা হতে কার্বনের শক্তিমাত্রা ৪% কম। অনুরূপ একটি ঘাটতির কথা অক্সিজেন উৎপাদনের ক্ষেত্রে উল্লেখ করা যায়। যখন কার্বন–১২,এর নিউক্লিয়াস ও হিলিয়াম–৪,এর নিউক্লিয়াসে কেবলমাত্র পরিমাণ মাত্রার অনুকম্পন (resonance) সম্পন্ন হয়, কেবল তখনই

www.pathagar.com

উভয় নিউক্লিয়াস 'ফিউজ' হয়ে অক্সিজেন উৎপন্ন করে। কিন্তু নিকটবর্তী অক্সিজেন-১৬ এর শক্তিমাত্রা উভয় নিউক্লিয়াসের যৌথ শক্তিমাত্রা হতে ১% কম; আর এই ১% কম মাত্রা-মানই কেবল অক্সিজেন-১৬ এর 'রানওয়ে রেইট' উৎপাদনকে প্রতিহত করে। সন্দেহ নেই, Stellar nucleosynthesis বা নাক্ষত্রিক মহাচুল্লিতে পদার্থ সংশ্লেষণ প্রক্রিয়াতেই কেবল অক্সিজেন-১৬ এর উৎপাদন সম্ভব, তবে তা কার্বনের তুলনায় অল্প পরিমাণেই সীমিত থাকে। *If that oxygen energy level were ১ (one) percent lower, then vertually all the carbon made inside stars would be processed into oxygen, and then (much of it) into heavier elements still. Carbon-based life form like ouselves would not exist.* সূক্ষ্ম তার সামান্য হেরফের হলে আমাদের মতো জীবনের অস্তিত্ব টিকে থাকত না।

আমাদের মতো কার্বন নির্ভর জীবন বেঁচে থাকার এক অদ্বিতীয় শর্ত হলো পানি। কিন্তু এই পৃথিবীর সঙ্গে জীবমণ্ডলের শুধু একটি সহজ সরল সম্পর্ক নয়— অতি অসাধারণ সূক্ষ্ম পরিমাণগত ও জটিল সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে। আমাদের জানা আছে যে, প্রকাশিত তলের হিসাবে পৃথিবীর তিন চতুর্থাংশেই জলের বিস্তৃতি। এই তিন চতুর্থাংশ পানির প্রসারিত তল প্রতিটি জীবের অস্তিত্বের সাথে কতটা ওতপ্রোতভাবে জড়িত তা এখনই আমরা আলোচনা করছি।

আমাদের পৃথিবী নিকষ কালো অন্ধকার শীতল পরিবেশে হারিয়ে যাওয়া একটি গ্রহ, যার একটি দুর্লভ গুণসম্পন্ন বায়ুমণ্ডল রয়েছে। বায়ুমণ্ডলটির নির্বাচনী গুণ এমন যে সূর্য হতে প্রাপ্ত তাপমাত্রার প্রায় ২০% এটি ধরে রাখতে সক্ষম। এ সক্ষমতা দান কার্যে যাদের অবদান রয়েছে, তাদের মধ্যে জলীয় বাষ্প একটি অনন্য উপাদান। যদি রাতের বেলায় এই ২০% তাপমাত্রাকে আটকে না রাখার ব্যবস্থা থাকত, তবে-২৭০° কেলভিন তাপমাত্রার পরিবেশে পৃথিবীতে

www.pathagar.com

দুপুরের সূর্যের অব্যাহতির পরপরই যে তুষার তাপমাত্রা নেমে আসত, তা সমস্ত পৃথিবীর জলজ অঞ্চলকে পর্যবসিত করত একটি প্রকাণ্ড বরফের টুকরায়। পরদিন একই নিয়মে সূর্যতাপ দিয়ে আর সেই বরফ টুকরাকে গলানো সম্ভব হতো না। আর একই কারণে নৌযানদের সমুদ্রে বিচরণ করার সুযোগ থাকত না কখনোই। সমুদ্রে মানুষের জন্য প্রসারিত ও অফুরন্ত খাদ্যভাণ্ডার ও উপকারী উপ্করণ সংগ্রহের বিবেচনা আকাশকুসুম স্বপ্ন হতো। সমুদ্র বলতে থাকত মরুভূমির ন্যায় বিরান তুষার ভূমি! আর ঐ সব তথ্যকেই মনে করিয়ে দেয়ার জন্য কোরআনের স্রষ্টা মানুষকে জানিয়েছেন—*"তাঁহার অন্যতম নিদর্শন হল সমুদ্রে চলমান পর্বত সদৃশ নৌযানসমূহ (৪২ঃ৪৩)। তুমি কি লক্ষ্য কর না যে আল্লাহর অনুগ্রহে নৌযানগুলি সমুদ্রে বিচরণ করে, যদ্দ্বারা তিনি তোমাদিগকে তাঁহার নিদর্শনাবলীর কিছু প্রদর্শন করেন? ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য" (৩১:৩১)।*

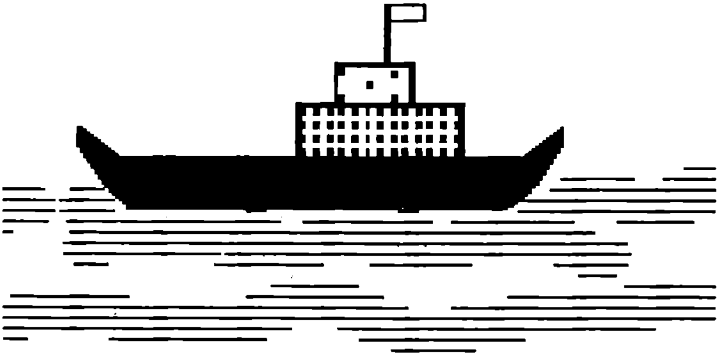

সমুদ্রে বিচরণশীল পোত–যান স্রষ্টার কৃতিত্বের নিদর্শন হয় কিভাবে? এ প্রশ্নটি সঙ্গতভাবেই এসে যায়। কোরআনের স্রষ্টা একে কেবল নিদর্শন হিসাবেই চিহ্নিত করছেন না ;. তাকে অন্যতম নিদর্শন বলে আখ্যায়িত করেছেন। আমরা এর মাঝে বড় কিছু নিদর্শন খুঁজে পাইনি আজ পর্যন্তও! অথচ কোরআনই সত্য যে এর মাঝে এমন নিদর্শনের বাণী ব্যক্ত রয়েছে— তাতে সমস্ত জীবকুল ও জীবনময় পৃথিবী অস্তিত্বের ঋণে আবদ্ধ। সমুদ্রে প্রতীক নৌযান আমাদেরকে স্রষ্টার শ্রেষ্ঠত্বের মহামহিমা আর জীবকুলের কৃতজ্ঞতার ঋণের সর্ব–দায়ের ইতিহাস বলে যায়।

www.pathagar.com

দুটি আয়াতেই যে আবেগটি প্রস্তাবিত রয়েছে— তা হলো সমুদ্রে নৌযানের চলাচলের ঘটনাটি। *"যদ্দ্বারা তিনি তোমাদিগকে তাঁহার নিদর্শনাবলীর কিছু পরিদর্শন করেন"*— এ আয়াতাংশ অবশ্যই কোনো না কোনো বিশেষত্বের দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করে। সে বিশেষ-ত্বটি যে শাব্দিকভাবে নৌযানগুলোর চলাচলের কিংবা বিচরণের ঘটনাটি তা বুঝে নিতে আমাদের বিন্দুবৎ অসুবিধা হয় না। কিন্তু প্রশ্ন এসেই যায়— একটি স্বাভাবিক চলাচলের ঘটনা কি কারণে একটি 'অন্যতম নিদর্শন' হতে পারে? বিরুদ্ধবাদীদের অনেকেই কোরআনের এই সব অতি গুরুতর তথ্য সম্ভারকে শুধু না বুঝতে পারার জন্য হাস্যরস করতেও ছাড়েন না— অথচ তারা জানেন না, এই সব আয়াতের তত্ত্বের নিগুঢ়তায় ঐ হাস্যরসকারীর জীবনের মহা দায় ও গুরুতর ঋণ লিখা রয়েছে যেমন— রয়েছে সমুদ্রে বিচরণমান নৌযানের বিষয়ে খোদায়ী দাবী 'অন্যতম নিদর্শন' এর তথ্যে সমস্ত জীবজগতের অস্তিত্বের ঋণের বোঝাটি! পবিত্র কোরআন স্পষ্টতই ইঙ্গিত দিয়ে বোঝাতে চেয়েছে যে— মানুষ সমুদ্রে নৌযানের চলাচলই দেখছে না; তারা দেখছে সৃষ্টিতে কারুকার্যতা ও স্রষ্টার শ্রেষ্ঠত্বের এক অন্যতম নিদর্শন; কারণ কার্যতঃ সমুদ্রটি একটি মহাবিস্তৃত বরফের টুকরা হয়ে থাকার কথা ছিল। যদি এমনটি হতো, তবে কখনোই জীবনের উন্মেষ এবং তার পালন সম্ভব হতো না; হলেও দু দণ্ড টিকে থাকতে পারত না। এটা হওয়াটাই ছিল অতি স্বাভাবিক এবং সমুদ্রে নৌযানগুলো যে বিচরণ করছে, তা এক অতি দুর্লভ ঘটনারই নামান্তর। *'ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য'*— এই আয়াতাংশ আমাদেরকে কার্যতঃ কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মহা দায়ের কথা মনে করিয়ে দেয়। আমরা বেঁচে রয়েছি, স্বাভাবিক জীবনযাপন করছি এবং সমুদ্রসহ সকল উৎস হতে জীবিকা সংগ্রহ করছি এমন একটি অবস্থান 'পৃথিবী' হতে যার নিজস্ব আবাসটিই হলো সৃষ্টিগত বৈরিতায়— চরম হিমাঙ্কে ও নিখাদ অন্ধকারে নিপাতিত!

অথচ আমরা তার সামান্য ছটাও অনুভব করি না। বিস্ময়কর এই যে, অনুভব করার কোনো পরিস্থিতি এসে গেলে জীবন আর থাকবে না, নিঃশেষে উবে যাবে। তাই নয় কি যে সৃষ্টিকর্তা জানিয়ে

www.pathagar.com

যান— "নিশ্চয়ই আকাশ (মহাবিশ্ব) ও পৃথিবী সৃষ্টির মধ্যে, রাত ও দিনের পর্যায়ক্রম পরিবর্তনে, উপকারী দ্রব্যসমূহ সমেত জলযানের সমুদ্রে চলাচলের মধ্যে, আকাশ হইতে আল্লাহর বর্ষিত পানির মধ্যে, যদ্দ্বারা আল্লাহ মৃত্তিকাকে বিশুষ্ক হওয়ার পর পুনরুজ্জীবিত করেন এবং উহাতে সকল প্রকার জীবজন্তুর বিস্তারের মধ্যে এবং বাতাসের গতিবেগের মধ্যে এবং আকাশ ও ভূমণ্ডলের মধ্যস্থিত পদার্থ বিস্তারের মধ্যে জ্ঞানসম্পন্ন মানুষের জন্য সঠিক নিদর্শন রহিয়াছে" (২:১৬৪)।

তিন

"তিনি ইচ্ছা করিলেই বায়ুকে স্তব্ধ করিয়া দিতে পারেন। ফলে নৌযানসমূহ নিশ্চল হইয়া পড়িবে সমুদ্রপৃষ্ঠে। নিশ্চয়ই ইহাতে নিদর্শন রহিয়াছে ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞ ব্যক্তিদের জন্য" (৪২:৩৩)।

আমাদের পূর্ববর্তী আলোচনার আলোকে আশা করা যায় যে কোনো বিরুদ্ধবাদীরা অন্ততঃ হাস্যরস করা হতে বিরত থাকবেন, তথাপিও প্রশ্ন থাকবে তাদের— বায়ুকে স্তব্ধ করে দিলে নৌযান নিশ্চল হয়ে পড়বে কেন? দাঁড় টেনে পার হয়ে যাবার পথ তো আর বাতাস বন্ধ করে দেবে না!

সুধী পাঠক, অবগতির জন্য পেশ করছি যে, শুধু দাঁড় টেনে নয়— নিউক্লিয়ার রিএক্টর চালিত ইঞ্জিন দিয়েও ঐ নৌযানকে আর সচল করা সম্ভব হবে না যদি কিনা দয়াময় সত্যি সত্যি বাতাস বন্ধ করে দেন। চলুন আমরা সংক্ষিপ্তভাবে এ আলোচনা করছি।

আপনারা নিশ্চয়ই অবগত রয়েছেন যে জলবায়ুর সঞ্চালন বা Air circulation/movement জীবমণ্ডলের জন্য বেঁচে থাকার শর্ত। নিশ্চয়ই আমরা জানি— এ শর্তটি বজায় রাখার আবার শর্ত হলো সূর্য। সূর্য

www.pathagar.com

ঘূর্ণায়মান পৃথিবীর প্রকাশিত তলে তাপ সঞ্চার করে; এই তাপ নীচের বায়ুকে হাল্কা করে দেয়, হাল্কা হয়ে এরা উপরে উঠে আসে। সৃষ্টি হয় শূন্যতা। এই শূন্যতা কখনো কখনো জন্ম দেয় ঘূর্ণিবাত্যা যা পৃথিবী জোড়া তাপীয় সমতা এবং জল সঞ্চালন ও ভাবি খাদ্য মজুদ সৃষ্টির (পরাগায়ন) সাথে বিশেষভাবে বিসংশ্লিষ্ট। আমরা যদি অল্প কথায় নেমে আসি— বাতাসের সঞ্চালন হলো এক অতীব প্রয়োজনীয় শর্ত আর সূর্য হলো এর উৎস, এ তথ্যটি পাই। আপনারা নিশ্চয়ই পৃথিবীর tilt ও torque এর বিষয়গুলি সম্পর্কে জানেন? পৃথিবীর tilt বা তীর্যকতা হলো ব্যাখ্যার অতীত এক মহাবিস্তার করুণা যা পৃথিবীকে এমন একটি তাপগত অবস্থা প্রদান করেছে যে সমুদ্রতলগুলি বরফে পরিণত হয়নি কিংবা মেরু অঞ্চলে বরফের মজুদ গলে যায়নি। জীবনময়তা বজায় রাখার জন্য দুটিই অপ্রতিরোধ্য শর্ত। অন্যপক্ষে torque হলো চাঁদ কর্তৃক পৃথিবীর উপর বিরাজমান একটি ঘূর্ণি নিয়ন্ত্রণ প্রভাব যা পৃথিবীর tilt বা তীর্যকতা বজায় ও অনড় রাখার জন্য সৃষ্টির এক অদৃশ্য উপহার। আমরা আজ যে জলবায়ু ও তাপীয় অবস্থা প্রত্যক্ষ করি— এ হলো tilt ও torque এর কল্যাণ। পৃথিবী তার নিজ অক্ষকে কক্ষের সাথে ২৩ $^{১}/_{২}{}^{০}$ ডিগ্রীর সম্পর্কে স্থাপিত করেছে— আর এর মাঝে লিখিত রয়েছে আমাদের অস্তিত্বের ইতিহাস (দ্রষ্টব্য মহাকাশ পর্ব–১)। এর কারণে মেরু অঞ্চলে কিংবা এন্টার্কটিকা মহাদেশে বরফের স্তূপ সম্ভব হয়েছে। শুধুমাত্র এন্টার্কটিকা মহাদেশেই বিরাজ করে গড়ে ১৬০০ মিটার পুরু বরফের আস্তরণ প্রায় আমেরিকার দেড়গুণ পরিমাণ ভূমির বিস্তৃতি নিয়ে। পৃথিবীর ৯০ ভাগ বরফ জমা পড়েছে ওখানে। যদি এই স্তূপ কখনো গলে যায় তবে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যাবে গড়ে ২১০ ফুট। এর ফলাফল কি হতে পারে তা ব্যাখ্যার কোনো প্রয়োজনীয়তা ডেকে আনে না। সুধী পাঠক, এ তথ্যটি মনে রাখবেন।

সৃষ্টিতে যে সমূহ বিপর্যয়গুলির কথা ভাবা যায়, সেগুলির একটি হলো বড় ধরনের কোনো এসটিরয়েড বা গ্রহাণু— যা চাঁদ কিংবা পৃথিবীতে আঘাত হানতে পারে। পৃথিবীর কক্ষপথকে অতিক্রম করে এমন এসটিরয়েড–এর তালিকায় কয়েক কিলোমিটার হতে কয়েকশত

www.pathagar.com

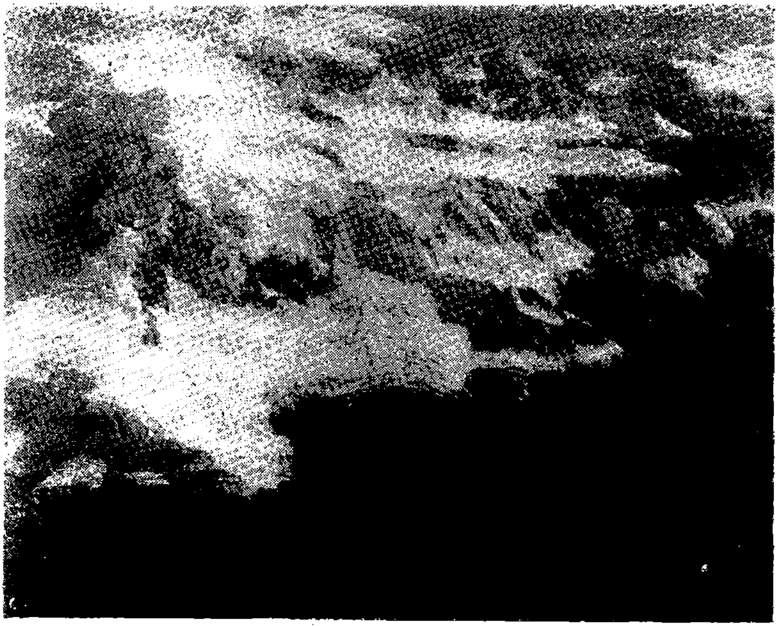

এন্টার্কটিক আইস। পৃথিবীতে সর্বোচ্চ ও সর্বশীতল তুষার মহাদেশের সমুদ্রসংলগ্ন চিত্র। আমেরিকার দেড়গুণ ভূমির উপর প্রায় ১৬০০ মিটার গড় উচ্চতাসম্পন্ন বরফের আন্তমহাদেশীয় টুকরাটি পৃথিবীর জলবায়ু রক্ষণাবেক্ষণে এক অদৃশ্য কল্যাণী ভূমিকা পালন করছে। প্রাগৈতিহাসিক কালের পুরাতন এই বরফ টুকরাটি পৃথিবীর সকল সমুদ্রে 'আইস-ইনফেকশন' সৃষ্টি করার কথা ছিল। দয়াময় পানিতে এক সর্ব ব্যতিক্রম ও বিস্ময়কর অদৃশ্য ব্যবস্থা এঁটে দিয়েছেন বলে আজকের পৃথিবী আজকের পরিচয়ে বিদ্যমান থাকা সম্ভব হয়েছে।

কিলোমিটার ব্যাসসম্পন্ন গ্রহাণু রয়েছে। বড় ধরনের কোনো গ্রহাণু যদি চাঁদকে আঘাত করে তবে গতির কারণে যে ভরবেগের সঞ্চার হবে তাতে চাঁদে ধ্বংসিত আঘাতটি হবে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে— এর ফলশ্রুতিতে চাঁদ ছিটকে যেতে পারে তার বর্তমান কক্ষপথ হতে। হারিয়ে যেতে পারে কিংবা অন্য কোনো গ্রহ-সীমায় বন্দী হতে পারে অথবা নিজে সূর্যের চারপাশে পরিভ্রমণ শুরু করে দিতে পারে। ফলাফল যা ঘটবে— তা হলো, চাঁদের

www.pathagar.com

torque এর প্রভাব পৃথিবী হতে মুছে যাওয়া। পৃথিবীর ঘূর্ণনে কম্পাঙ্ক (oscillation) বেড়ে যাবে অস্বাভাবিক এবং পৃথিবীর উপর অন্যান্য গ্রহদের ধ্বংস প্রভাব (perturbational influence) হবে মারাত্মক।

এরকম একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে পৃথিবীর তাপীয় অবস্থার আমূল সর্বনাশ ঘটবে। আজ যেখানে সঞ্চিত বরফ পৃথিবীর কাঙ্ক্ষিত জলবায়ুকে ধরে রাখার কার্যে নিয়োজিত, সেখানে ঘটবে অন্য জিনিস। বরফের স্তূপটি গলে যাবে অতিদ্রুত। সমুদ্রতল পৃষ্ঠের চাইতে ২০০ ফুট উচ্চতা প্রদর্শন করবে— তলিয়ে দেবে আবাসযোগ্য ভূমিকে। পৃষ্ঠতল বেড়ে প্রায় সম্পূর্ণ পৃথিবীর তল মাত্রার সমান হবে। জলীয় বাষ্পে ঘটবে উল্লেখযোগ্য মাত্রাবৃদ্ধি। এই অতিমাত্রার জলীয় বাষ্প সূর্যের ইনফ্রারেড-রে বা অবলোহিত রশ্মিকে আটকে দেবে গুরুতরভাবে। সূক্ষ্ম পরিমাণগত ভারসাম্য হারিয়ে ফেলবে পৃথিবী। প্রবেশ করবে শীতল ধ্বংসের দিকে। যেইমাত্র infrared-ray এর পরিমাণে বাধা পড়বে— শুরু হয়ে যাবে সারা পৃথিবী জোড়া তাপমাত্রার হ্রাস। পৃথিবীর নিজস্ব জল-বিস্তার পৃথিবীকে উপহার দেবে তারই ধ্বংসের জন্য এক অতি পুরুত্বসম্পন্ন জলীয় বাষ্পময় বায়ুমণ্ডল। উপরে সূর্যরশ্মি বিরাজ করলেও ক্রমাগত নীচের তাপমাত্রা কমতে থাকবে অস্বাভাবিক হারে। এমন একটি পরিস্থিতিতে সত্যি সত্যিই সমুদ্রের বুকে বায়ুর সঞ্চালন সংকুচিত হতে হতে শূন্যের দিকে পৌঁছে যাবার প্রবণতা দেখাবে কারণ ভূ-পৃষ্ঠে বায়ু সঞ্চালনের যন্ত্র সূর্য হয়ে পড়বে অদৃশ্য। পৃথিবীর বুকে তাপীয় পরিস্থিতি ক্রমাগত নীচে নেমে আসার অর্থই হলো বায়ুর সঞ্চালন থেমে যাওয়া। আর এমন পরিস্থিতির ফলাফল হলো, এই— পৃথিবীতে একটি গ্ল্যাসিয়্যাল এডভান্স (galcial advance) সৃষ্টি হওয়া। গ্ল্যাসিয়্যাল এডভান্স আর কিছু নয়— ক্রমে ক্রমে পৃথিবীর জলীয় স্তরকে বরফে পর্যবসিত করার প্রক্রিয়া। স্তব্ধ বায়ুর উল্টা পিঠে একটি গ্ল্যাসিয়্যাল এডভান্সের কথাই চলে আসে শর্তের

www.pathagar.com

মতো। একটি তুষার যুগে কার্যতঃ সমূদ্রের নৌযানকে নিশ্চলই থাকতে হবে— এটা হলো ফলাফলের অবশ্যম্ভাবিতা!

চাঁদের উপর কোনো গ্রহাণুর আঘাত না হয়েও এমন ঘটনা ঘটতে পারে। ধরুন, আমাদের গ্যালাক্সিতে শত শত কিংবা হাজার হাজার আলোকবর্ষ দূরে আজ হতে প্রায় কয়েক লক্ষ বছর আগে একটি সুপারনোভা বিস্ফোরণ হয়ে গেছে যার খবরও আমরা জানি না। জানা প্রয়োজন নয় কিংবা সম্ভবও না। সুপারনোভা বিস্ফোরণের জঞ্জাল সেকেণ্ডে কয়েক সহস্র মাইল গতিতে যুগ যুগ ধরে চলতে পারে যতক্ষণ না সে অন্য কোনো অভিকর্ষ বলয় দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়। আমাদের কিংবা অপর কোনো সৌর ব্যবস্থা, যেখানে আমাদের মতো জীবন আছে এবং স্রষ্টাকে নিয়ে বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের দ্বন্দ্ব রয়েছে, তেমন কোনো জীবনময় গ্রহের রাজত্বে অতি সহসাই এসে হাজির হতে পারে সুপারনোভা বিস্ফোরণের ধূলিঝঞ্ঝা। যদি এরা নিকটবর্তী হয়, তবে ঐ জীবনময় গ্রহ তাদেরকে আকর্ষণ করবে এবং ক্রমে ক্রমে এদেরকে কেন্দ্রের দিকে আপতিত করবে। ফলতঃ গ্রহ ব্যবস্থাটি সুপারনোভা জঞ্জালকে গায়ে মাখিয়ে নেবার মতোই জড়িয়ে নেবে নিজের মধ্যে। পৃথিবী কিংবা অনুরূপ গ্রহ শীঘ্রই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে মাতৃনক্ষত্র সূর্য কিংবা অনুরূপ মিড–সিকুয়েন্স নক্ষত্র হতে। নীচের পৃথিবীতে দ্রুত তাপীয় অবস্থার অবনতি ঘটবে। পৃথিবীর জলবায়ুতে তুষার ধ্বংস অনিবার্য হয়ে পড়বে। এমন পরিস্থিতিতে যারা বেঁচে থাকবে, তারা প্রত্যক্ষ করবে যে বায়ু স্তব্ধ হয়ে পড়েছে এবং সমুদ্রে চলমান নৌযানগুলি ক্রমে ক্রমে বড় বড় বরফের সীটে আটকা পড়ে নিশ্চল হয়ে পড়েছে। তারা দেখবে যে কোরআন সত্য বলেছে যে— *"তিনি ইচ্ছা করিলে বায়ুকে স্তব্ধ করিয়া দিতে পারেন— ফলে নৌযানসমূহ নিশ্চল হইয়া পড়িবে সমুদ্রপৃষ্ঠে। নিশ্চয়ই ইহাতে নিদর্শন রহিয়াছে ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ সম্প্রদায়ের জন্য" (৪২:৩৩)।*

www.pathagar.com

বায়ু প্রবাহিত হয় বলেই পৃথিবীর সকল ব্যবস্থা ও সমুদ্রের জল-ব্যবস্থা সচল রয়েছে। বায়ু স্তব্ধ হয়ে পড়লে সমুদ্রে জাহাজ চলাচলের ব্যবস্থাটি বিকল হয়ে যেত সীমাহীন বরফের মরুভূমি সৃষ্টি হবার কারণে। বায়ুর সঞ্চালন ক্রিয়ার মধ্যে তাই লিখা রয়েছে জীবনের শত শত ঋণ :

উপরের নিশ্চল বায়ুর পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য আরো একটি সম্ভাব্য উপায় হলো গ্যালাক্সির অন্তঃস্থ কোয়াসার বিস্ফোরণ— যা লক্ষ লক্ষ জীবনময় জগৎকে সৃষ্টি হতে মুছে দিতে পারে। কোয়াসার হলো সীমাহীন ভর ও উজ্জ্বলতা বিশিষ্ট সৃষ্টি বিধ্বংসী ব্যবস্থা, যা সুপারমেসিভ ব্ল্যাকহোলের মাঝে পরিণামে সমাপ্তি ঘটাবে। যে পৃথিবী কোনো গ্যালাক্সির প্রান্তিকভাগে অবস্থান করবে— একটি কোয়াসার বিস্ফোরণ সেই পৃথিবীর উপর লক্ষ লক্ষ যোজন দূরবর্তী সুপারনোভা বিস্ফোরণের অনুরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। সে ক্ষেত্রেও একটি 'নিশ্চল বায়ু'র পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে।

তবে সবচাইতে অধিক আশঙ্কাজনক হলো একটি অতিশয় অগ্ন্যুৎপাতের ঘটনা; একসাথে এক বা একাধিক মহা আগ্নেয়গিরি যদি দীর্ঘ সময় ধরে গ্যাস ও ধূলি উদগিরণ করে চলে, তবে ক্রমান্বয়ে সূর্যকে ঢেকে দিতে পারে। তত্ত্ববিদগণ গ্ল্যাসিয়্যাল এডভান্সের কারণ হিসাবে এ হাইপোথিসিসকে সর্বাগ্রে গণ্য করেন।

www.pathagar.com

একটি বড় ধরনের অগ্ন্যুৎপাতের ঘটনা একটি নিশ্চল বায়ুর নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি বই অন্য কিছুই নয়।

চার

সমুদ্রে জলযানের চলাচল একটি অন্যতম নিদর্শন হিসাবে আখ্যায়িত কেন— তার অনুসন্ধান আপনাকে আরো গভীর জ্ঞান ও উপলব্ধির তীরে পৌঁছে দেবে।

ভৌত জগতের ধর্ম হলো যে তাপ প্রয়োগে পদার্থের আয়তন বৃদ্ধি পায় আর পদার্থ হতে তাপ তুলে নিলে পদার্থ সংকুচিত হতে থাকে। সমস্ত সৃষ্টিতে এই নিয়মটির কোনো ব্যতিক্রম নেই কেবলমাত্র একটি উদাহরণ ছাড়া— সে পানি। ভৌত জগতের অতি কঠিন নিয়মগুলি শুধুমাত্র একটি পানি কেন এতটা নির্বাচিত উপায়ে লঙ্ঘন করবে কিংবা করা উচিৎ তার কোনো সঠিক জবাব বিজ্ঞানের কাছে নেই। বিজ্ঞান শুধু এইটুকুই বলতে পারে— নিয়ম মানার জন্য যদি পানি সৃষ্টিতে একটিমাত্র ব্যতিক্রম না হতো এবং আর সব ভৌত পদার্থের অনুরূপ হতো— তবে আজ আমরা কেউ স্রষ্টা ও সৃষ্টির বিতর্ক করার জন্য এই সৃষ্টিতে অবস্থান করতাম না (মহাকাশ পর্ব–১ এ দ্রষ্টব্য)। অজৈব জগতের অলঙ্ঘ্য নিয়ম ও ক্রমকে ভেদ না করে যদি পানি সৃষ্টির নিয়মকেই অনুসরণ করত— তবে এই সৃষ্টি হতো এক তুষারের বিরানভূমি কিংবা পানিশূন্য বরফের ঠাণ্ডা তুষারভূমি। আমরা এই দৃষ্টিকোণ হতেও সমুদ্র এবং নৌযান সংশ্লিষ্ট আলোচনাটিতে প্রবৃত্ত হব।

পানি ঠাণ্ডা হলে কঠিন হয়। কঠিন বরফের একটি চমৎকার ধর্ম হলো যে আয়তনে বৃদ্ধি পায়। এই আয়তনের বৃদ্ধি–গুণটি জীবন ও পৃথিবীকে লালন করার জন্য স্রষ্টার হাতে এক চমৎকার উপায়। এ গুণের জন্য সমুদ্রের গভীরতার যে স্তরেই এবং যে কারণেই বরফ সৃষ্টি হোক, তা ভেসে উঠবেই। ঠাণ্ডা হবার কারণে সে নিজে তাপ

www.pathagar.com

বিয়োগ করবে— এই তাপ হলো বরফ হবার সময় বের হয়ে আসা লীন তাপ যা বিসর্জন না দিলে কোনো পানির ভর বরফে রূপান্তরিত হতে পারে না। সমুদ্রের যে অঞ্চলে বরফ তৈরী হয়— সে অঞ্চলের সমুদ্রবর্তী জীব ও গাছপালা এই লীন তাপের কল্যাণেই বেঁচে থাকতে পারে।

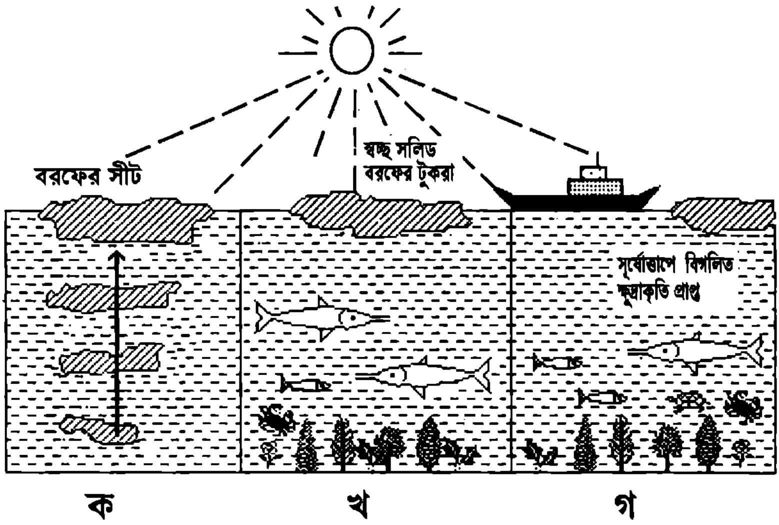

চিত্র–ক ঃ ঠাণ্ডায় জমে যাওয়া পানি আয়তনে বেড়ে গেলে ঘনত্ব হারায়, তাই উপরে ভেসে ওঠে। চিত্র–খ ঃ বরফ হবার সময় পরিত্যক্ত লীনতাপ নীচে জীবনের প্রবাহকে নিশ্চিত হতে সাহায্য করে। চিত্র–গ ঃ ভেসে উঠা বরফের টুকরা পরিবেশের তাপীয় পরিস্থিতি ও সূর্যের উত্তাপে বিগলিত হয়ে আবার পানিতে পরিণত হয়। পৃথিবীর জল–বায়ু পরিস্থিতির সাথে এই চিত্রগুলি নিখুঁত সম্পর্কে বিদ্যমান।

আয়তনে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবার কারণে কোনো আয়তনের বরফই আর নীচে অবস্থান করতে পারে না। যদি পানির এই একটি গুণাগুণ না থাকত, তবে চাঁদ বা পৃথিবীতে এস্টিরয়েড আঘাত না হানলেও, সুপারনোভার জঞ্জাল না পতিত হলেও, কোয়াসার বিস্ফোরণ না হলেও কিংবা অগ্ন্যুৎপাতের ঘটনা না ঘটলেও সমুদ্রে কখনোই নৌযান চলাচল করত না। জল সৃষ্টির এই বিস্ময়কর গুণের প্রতি মানুষ যাতে

www.pathagar.com

কৃতজ্ঞ হয় এবং সে যেন ধৈর্যের সঙ্গে কোন কারণে কৃতজ্ঞ হবে, তার সন্ধান করে সে জন্যই বুঝি ৪২:৩৩ কিংবা ৩১:৩১ আয়াতের প্রস্তাব। আপনি বিস্মিত হয়ে অনুভব করবেন যে, কোরআন সৃষ্টির নিগূঢ় তথ্যের প্রতি আলোকপাত করেছে। যদি পানিকে মানুষ ও জীবমণ্ডলের জন্য বিশেষভাবে ও বিশেষ গুণাগুণসম্পন্ন না করা হতো— তবে আর সব ব্যবস্থা স্থির থাকা সত্ত্বেও পৃথিবীর জীবন বিস্তৃতি অসম্ভব হয়ে পড়ত। যদি পানির ধর্ম অন্যান্য পদার্থের ন্যায় হতো, তবে বরফ হয়ে যাবার পর সমুদ্র নদী, হ্রদ এদের তলদেশে বরফের তলানী স্তূপকৃত হতে থাকত। আর তাতে হয়ে যেত মারাত্মক সর্বনাশ। এন্টার্কটিকা মহাদেশ কিংবা অনুরূপ বরফ বিস্তার যেখানে বিদ্যমান, সেই সব স্থান হতে 'বরফের ছোঁয়াচ' বা glacial infectation শুরু হয়ে গ্ল্যাসিয়্যাল বলয় বৃদ্ধি পেত ক্রমে ক্রমে। পর্যাপ্ত সূর্যরশ্মি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও প্রতিটি নদ-নদী, হ্রদ, সাগর হয়ে পড়ত অভেদ্য ও অভিন্ন একটি একক বরফের স্তূপ। মানুষের জানা কোনো প্রক্রিয়ায় তো নয়ই— এমনকি সৃষ্টিতে বিদ্যমান হাতিয়ার যেমন সূর্য, তার সাহায্যে আরো অনেক নক্ষত্র অথবা অগ্ন্যুৎপাত অথবা লক্ষ কোটি পারমাণবিক বোমা বর্ষণ দ্বারাও এই আন্তমহাদেশীয় বরফের বিন্দুমাত্র ক্ষতিসাধন করা সম্ভব হতো না। অতি কষ্টে ও অতি উচ্চমূল্যে যে পানি তৈরী করা যেত, খুব দ্রুতই তা আবার বরফে পরিণত হতো। আমরা আমাদের প্রেক্ষাপটে যে বরফ-ব্যবস্থার সাথে পরিচিত রয়েছি, তা হতে অতি ভিন্ন একটি চিত্র তখন আমাদেরকে বলত যে কোরআনের বাণী কতটা সত্য! এই আয়াতের বাণীর মর্মকথা কতটা গভীরে প্রোথিত— *''তাঁহার অন্যতম নিদর্শন— পর্বত দৃশ নৌযানদের সমুদ্রে চলাচল" (৪২:৩২)। তোমাদের প্রতিপালক তিনিই যিনি তোমাদিগের জন্য সমুদ্রে নৌযান পরিচালিত করেন, যাহাতে তোমরা তাঁহার অনুগ্রহ সন্ধান করিতে পার। তিনি তোমাদিগের প্রতি পরম দয়ালু" (১৭:৬৬)।* প্রকৃতপক্ষে একজন অনন্য ক্ষমতাধর ও পরম দয়ালু প্রতিপালক না হলে কখনোই হয়তো সৃষ্টির জন্য এতটা দুর্লভ সমন্বয়সাধন করার প্রশ্নই আসত না।

www.pathagar.com

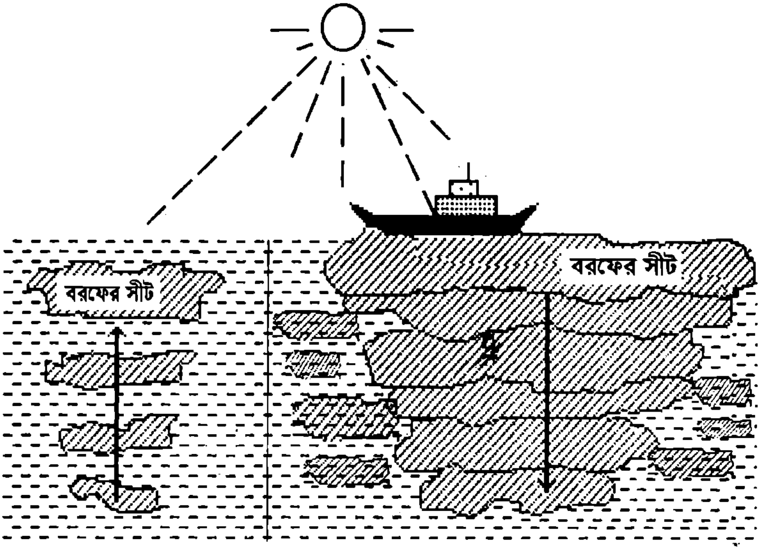

জীবন্ত সমুদ্রের বরফ–জিয়োমেট্রি মৃত সমুদ্রের বরফ–জিয়োমেট্রি

বরফ জিয়োমেট্রি। বাম পাশের চিত্রটি হলো জীবন্ত পৃথিবীতে একটি জীবন্ত সমুদ্রের বরফ–জিয়োমেট্রি। এখানে পৃথিবীর আর সকল পদার্থ হতে পানি একমাত্র ব্যতিক্রমধর্মী হবার কারণে ঠাণ্ডা হবার পর বরফ সংকুচিত হবার স্থলে প্রসারিত হয়ে ঘনত্ব হারায় ও উপরে ভেসে উঠে। শুধু এইটুকু ব্যতিক্রমধর্মী গুণাগুণ না থাকলে পৃথিবী মৃত–গ্রহে পরিণত হতো। ডান পাশের চিত্রটি একটি মৃত পৃথিবীতে মৃত সমুদ্রের বরফ জিয়োমেট্রি। শুধুমাত্র নিয়ম মানার জন্যই যদি পানি পৃথিবীর আর সমস্ত পদার্থের মত হতো— এবং এর কোনো একক ও সর্ব ভিন্ন গুণাগুণ না থাকত, তবে পানি বরফে পরিণত হয়ে আয়তনে সংকুচিত হয়ে পড়ত, বেড়ে যেত ঘনত্ব, ডুবে যেত প্রতিটি বরফের সীট। আর তাতেই হতো সর্বনাশ। প্রতিটি সমুদ্র, নদী, হ্রদ আর পানির উৎস হয়ে যেত চির–অভেদ্য, অজেয়, অনড় ও অপরিবর্তনশীল বরফের স্তূপ। এই পৃথিবীতে পানি বলতে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকত না। তখন সমুদ্রে নৌযান বিচরণ করত না কখনোই।

আমরা আবার ফিরে আসতে চাই— মহানবী (সঃ) এর যমযম কূপের পানি পান করার সময় দাঁড়িয়ে— *'রাব্বি যিদনী ইলমা'*, 'ওগো প্রভু, আমায় জ্ঞান দাও'— এই প্রার্থনার বিষয়বস্তুতে। যে পানি যমযম কূপে আজ সুপ্রাপ্য সে পানিটিই দুষ্প্রাপ্য হয়ে থাকতে পারত— হতে পারত এক অখণ্ড বরফের টুকরা। তখন এই *'রাব্বি যিদনী ইলমা'* বলার আর কেউ পৃথিবীতে অবস্থান করত না। আমরা

www.pathagar.com

সকলেই রয়েছি এবং পৃথিবীতে একটি ত্রুটিহীন অনন্য বিকশিত জীবনব্যবস্থা উপভোগ করার আশীর্বাদ লাভ করেছি যার মূলে রয়েছে পানি; এই মহাব্যবস্থার প্রতি দৃষ্টি রেখে এর মহাবিস্তার ব্যবস্থাপক ও স্রষ্টা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের কৃতিত্ব ও মাহাত্ম্য বুঝবার জ্ঞান চেয়েই নবীজীর প্রার্থনা *"ওগো প্রতিপালক রাব্বুল আলামীন! আমাকে জ্ঞান দাও"*— যেন আমাদেরও নিত্যদিনের প্রার্থনা হয়। আমরা এ প্রার্থনাটি না করলে কেবল আমাদের নির্লজ্জ অকৃতজ্ঞতাই প্রকাশ পায়। বিবেকসম্পন্ন সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষের জন্য তা এক অশোভন অবস্থা ছাড়া আর কি হতে পারে?

আপনারা যারা মহাকাশ পর্ব-১ এ 'পানি ঃ দয়ার এক নিদর্শন' (আর্টিকেল নং ২:১০) পাঠ করেছেন, সেখানে নিশ্চয়ই প্রত্যক্ষ করেছেন যে 'হাইড্রোজেন-চেইন' পানিকে কি বিস্ময়কর ও ব্যতিক্রমধর্মী গুণ দিয়েছে, যে কারণে পানির জন্য 'তরল' অবস্থায় থাকা সম্ভব হচ্ছে। অবস্থাগত কারণে ও মৌলদের নিজস্ব গুণাগুণের জন্য পানি কেবল চিরদিন বাষ্পীয় অবস্থাতেই বিরাজ করার কথা ছিল। এই সৃষ্টিতে একমাত্র পানিই হলো আইন ভঙ্গকারী (outlaw) যৌগ; যার এই আইন ভাঙ্গা চরিত্রটি না হলে কখনোই পানি তরল পদার্থ হিসাবে বিরাজ করত না এবং কোনো রকমের জীবনের উদ্ভব ঘটত না। পানিকেই করা হয়েছে 'জীবনী তরল'। জীব ও উদ্ভিদের দেহে ৭০% পানি, এটা বড় কোনো তথ্য নয়, তথ্যটি হলো জীব ও উদ্ভিদ দেহে পানিই 'প্রাণের' বাহন। কোরআনের ভাষায়, *'এবং প্রাণময় যাবতীয় কিছু সৃষ্টি করিয়াছি পানি হইতে— তবু কি উহারা বিশ্বাস করিবে না" (২১:৩০)?*

বিজ্ঞান আবিস্কার করেছে যে পানির সর্ব-বিশেষ গুণটি হবার কথা ছিল সাধারণ চাপ ও তাপে তা সবসময় বায়বীয় অবস্থায় থাকা। অথচ প্রতিপালক তাকে তরল অবস্থায় বিরাজিত রেখে জগতের প্রতিপালন ব্যবস্থায় নিয়োজিত করেছেন। পানি যে এই উদ্বায়ী গুণাগুণে (উবিয়া যাওয়ার ধর্ম) সৃষ্ট, অথচ তাকে তরল রাখা

www.pathagar.com

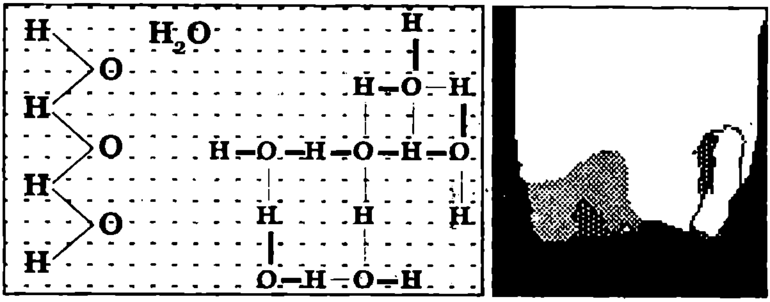

হাইড্রোজেন চেইন— সৃষ্টিতে দয়ার এক মহা নিদর্শন। বামের চিত্রটি হাইড্রোজেন চেইন সমৃদ্ধ দৃশ্যমান জীবনময় সমুদ্র। ডানে হাইড্রোজেন চেইন বিহীন পৃথিবীতে শুষ্ক সমুদ্রের একাংশ। পানিকে আমরা পানির আকারে পাচ্ছি— সৃষ্টিতে এর চাইতে বিস্ময়কর বিজ্ঞান-লঙ্ঘন আর একটিও নাই। অথচ এই লঙ্ঘনই শুধু জীবনের ক্ষেত্র চয়ন সম্ভব করে রেখেছে।

হয়েছে, বিজ্ঞানের এই বিস্ময়কর তথ্যটি কিন্তু পরিপূর্ণভাবেই কোরআন মুদ্রিত করে রেখেছে মানুষ এ তথ্য বুঝতে পারার দেড় হাজার বছর আগেই— *"(ওহে মানুষ), ভাবিয়া দেখিয়াছ কি যদি ভূতলের সমুদয় পানির ভাণ্ডার উবিয়া গিয়া অদৃশ্য হইয়া যায়, তবে কে তোমাদের জন্য আনয়ন করিবে এই ভুবনে জলের প্রবাহ (৬৭:৩০)? আমি তো উহাকে অপসারণ করিতেও সক্ষম" (২৩:১৮)।*

এই অপসারণের জন্য স্রষ্টা শুধু পানির হাইড্রোজেন চেইনটিকে বিলুপ্ত করলেই চলে; হয়তো কিছু সময় কিংবা একটি দিনের মধ্যেই এই পৃথিবীর জলের ভাণ্ডার উধাও হয়ে পড়বে, এই পৃথিবীতে আর কোনোদিন জলের প্রবাহ সৃষ্টি হবে না। অতএব, আজ আমরা যে সমুদ্র, মহাসমুদ্র জুড়ে জল আর জল দেখি, সে অতি দুর্লভ দান আমাদেরকে শিক্ষা দেয় যে, পৃথিবীময় জলের বিস্তৃতি যেখানে আজ পর্বত সদৃশ নৌযান চলাচল করে তা এক দুর্লভ নিদর্শনেরই প্রকাশ! সমুদ্রে জাহাজ চলাচলের ঘটনা সৃষ্টিতে সকল দুর্লভ

www.pathagar.com

ঘটনারই একটি। "তাঁহার অন্যতম নিদর্শন পর্বত সদৃশ সমুদ্রে নৌযানসমূহের চলাচল (৪২:৩২) তিনি তোমাদেরকে বহু নিদর্শন দেখাইয়া থাকেন, অতঃপর তোমরা আল্লাহর কোন নিদর্শনকে অস্বীকার করিবে?" (৪০:৮১)

ভাসমান বরফের রমণীয় দৃশ্য। আপনার কাছে এ দৃশ্যটি যতটাই স্বাভাবিক মনে হোক না কেন— একজন রসায়নবিদের কাছে এ হলো সৃষ্টির সবচাইতে দুর্লভ ও অসম্ভব ঘটনাসমূহের একটি। এক টুকরা ভাসমান বরফ— দয়াময়ের এক পৃথিবী করুণার মহাকাব্য ভিন্ন আর কিছু নয়!

"তাহারা কি পৃথিবী পরিভ্রমণ করে নাই? তাহা হইলে তাহারা জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন হৃদয় ও শ্রুতিশক্তিসম্পন্ন শ্রবণের অধিকারী হইতে পারিত। বস্তুত চক্ষু তো অন্ধ নয়— বরং অন্ধ হইল হৃদয় (২২:৪৬)। (ইসলাম)! ইহা তোমাদিগের পিতা ইব্রাহীমের মিল্লাত! তিনি পূর্বে তোমাদিগের নামকরণ করিয়াছেন মুসলিম এবং এই গ্রন্থেও; যাহাতে রসূল তোমাদিগের সাক্ষীস্বরূপ হয় এবং তোমরা সাক্ষীস্বরূপ হও মানুষ জাতির জন্য। সুতরাং তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে অবলম্বন কর; তিনিই

www.pathagar.com

তোমাদিগের অভিভাবক। কত উত্তম অভিভাবক ও কত উত্তম সাহায্যকারী তিনি (২২:৭৮)! তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নাই, দুনিয়া ও আখিরাতের প্রশংসা তাঁহারই ; বিধান তাঁহারই ; তোমরা তাঁহারই দিকে প্রত্যাবর্তন করিবে।" (২৮:৭০)

আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আ'লামীন।

* (মহাকাশ পর্ব–১ ; 'পানি— দয়ার এক নিদর্শন' প্রবন্ধটি পাঠ করা জরুরী)।

www.pathagar.com

কালের নির্বাচনে মহাবিশ্ব

এক

যে বিতর্কে বাইবেল বিজ্ঞানের কাছে তার সর্বগ্রহণ-যোগ্যতা হারিয়েছে, ঠিক সেই বিতর্কে আল-কোরআন বিজ্ঞানের কাছে আজ স্বর্ণ সিংহাসনের দাবিদার— ব্যাপারটা বিস্ময়কর নয় কি?

সম্মানিত পাঠক, আপনার বিস্ময়কে আন্দোলিত করবে যে খোদ বিজ্ঞানই আজ পবিত্র কোরআনের ভাষায় কথা বলছে। খ্রীষ্টীয় সাত শতকে বিজ্ঞানের শিশুযুগে কোরআন যা বলেছিল— একবিংশ শতাব্দীর দ্বারাগত বিজ্ঞান আজ দেড় হাজার বৎসরের সুতীক্ষ্ণ যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার গাম্ভীর্য নিয়ে সেই সত্যকেই মাথার কিরীট রূপে ধারণ করেছে আর সুদৃঢ় কণ্ঠে জ্ঞানের অনন্য দম্ভ ছড়িয়ে যাচ্ছে। বিজ্ঞান নিজেও জানে না যে এক মহাজ্ঞানী মহাবিস্তার স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অদৃশ্য ইংগিতে সে কেবল তাঁরই বিস্ময়কর সৃষ্টি, জ্ঞান-পুস্তক আল-কোরআনে'র মাহাত্ম্যের কথাই ঘোষণা করছে মাত্র।

সুধীজন, নিশ্চয়ই অবগত রয়েছেন যে, সৃষ্টিকর্মে সপ্তম দিবসে ক্লান্ত 'ঈশ্বর' বিশ্রামের জন্য 'সাবাথ' গ্রহণ করেছিলেন। তার পূর্বে তিনি মোট ৬টি দিবসে স্বর্গ-মর্ত্য সৃষ্টি করেছেন। বাইবেল বর্ণিত এই ৬টি দিবসে সৃষ্টির যে প্রক্রিয়াটি প্রস্তাবিত হয়েছে তা কখনোই

www.pathagar.com

বিজ্ঞান-বিবেচনায় উত্তীর্ণ হতে পারেনি, কারণ পদার্থবিদ্যা বিষয়ক আইনকানুন এই সৃষ্টি-ধারাকে অনুমোদন করে না। বাইবেল বিজ্ঞানের কাছে যে কয়টি বিষয়ে আটকা পড়েছে, এরমধ্যে এটি হলো একটি দুর্লঙ্ঘ্য বিপত্তি। অথচ এই ছয় দিবসের প্রস্তাবটি কোরআনের সত্যতার একটি অনন্য স্বাক্ষর ! সুধী পাঠক, আলোচনায় আপনাকেই বিচারকের আসন পেতে দিচ্ছি। আলোচনার শেষে আপনার রায়টিই আমরা ন্যায্যতায় প্রত্যাশা করব।

এবার চলুন, বাইবেলের পরিধি ছেড়ে আল কোরআনের পাতায় চোখ বুলাই। ৭:৫৪, ১০:৩, ১১:৭, ২৫:৫৯ কিংবা ৫০:৩৮ এর যে কোনো একটি আয়াত তুলে নিন— দেখবেন ছয় দিবসে (ستة ايام) এই মহাবিশ্ব ও পৃথিবী সৃষ্টির প্রস্তাবনা এই আয়াতসমূহের মূল বক্তব্য। গগনমণ্ডল ও পৃথিবীমণ্ডল এবং এতদুভয়ের মাঝে সমুদয় বস্তু-বিস্তার ৬টি দিবসে সৃষ্টি করা হয়েছে— এই দাবিই এসেছে কোরআনের বাণীগুলোতে যা বিজ্ঞান মননে বিস্ময়ের জিজ্ঞাসায় রেখাপাত করে। এই দাবিতে একজন পাঠকের জন্য ২টি বিপত্তিকর সমস্যা রয়েছে। প্রথমটি হলো 'ছয় দিবস' যা বাইবেলের প্রস্তাবের দিন-সংখ্যার সাথে অভিন্ন এবং একইভাবে পদার্থবিজ্ঞানের রায়ে সম্পূর্ণ বাতিলযোগ্য। অন্যটি, মহাবিশ্বকে আমরা যেভাবে জানি, তার ব্যাপকতার তুলনায় পৃথিবী অতিশয় নগণ্য হওয়া সত্ত্বেও সৃষ্টি প্রস্তাবের প্রতিটি ক্ষেত্রেই মহাবিশ্বের সাথে সাথে নগণ্য পৃথিবী সৃষ্টির বিষয়টিও যুগপৎ বর্ণিত হয়েছে যা এমনটি না হলেই সঙ্গত ও মানানসই হতো। তা ছাড়াও সময়ের মানদণ্ডে বিচার করলে দেখা যাবে যে এরা পিতা-পুত্রের ন্যায় সম্পর্কিত। অর্থাৎ, চরিত্রের দিকে দুটি ভিন্ন ভিন্ন সময় ও অবস্থানের পার্থক্যে নির্ণীত মহাবিশ্ব ও পৃথিবীর মূল কালপ্রবাহকে একসাথে সংযুক্ত করে একই সমতলে এনে মাপা হয়েছে যা হবার কথা ছিল না। সুধী পাঠক, এ সমস্যাগুলোর পূর্ণ সমাধান দিয়েই আমরা মূল আলোচনার পথ খুঁজব।

www.pathagar.com

প্রথম প্রসংগটির উত্তর রচনাই এ প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য বিধায় আমরা এখানে দ্বিতীয় প্রসংগটিকে শুরুতেই বিচার করতে প্রয়াস নিতে চাই। কোরআনের বর্ণনায় যেখানেই আকাশ (স্থানভেদে এটি মহাবিশ্ব হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে; কখনো কখনো গ্যালাক্সিদের বোঝাতে এবং কখনো কখনো সৌর আকাশকে নির্দেশ করছে) শব্দটি এসেছে, তার সাথে বিসংশ্লিষ্ট হয়েছে পৃথিবীর প্রস্তাব— প্রায় একটা শর্তের মতই। এর কারণ ও বিশেষত্ব আমরা তলিয়ে দেখতে পারি। মহাবিশ্ব সৃষ্টির ক্ষেত্রটি 'প্লাঙ্ক টাইম' হতে 'স্টেলার ইরা' পর্যন্ত ৭৫% হাইড্রোজেন ও ২৫% হিলিয়ামের অতি সরল আনুপাতিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ। জীবন গঠন ও তাকে প্রতিপালনের জন্য লক্ষ কোটি যৌগ সৃষ্টিকারী মৌলিক পদার্থ সম্ভারের সৃষ্টির সাফল্য কোনোভাবেই Big bang এর কৃতিত্বের ফসল নয়— তা 'বিগ ব্যাঙ' থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী পদার্থ তৈরীর কারখানা— 'সুপারনোভা' বিস্ফোরণের ফসল। 'জায়ান্ট' তারাদের রন্ধনশালায় ধাপে ধাপে তৈরী হওয়া মৌলিক পদার্থের কণাদেরকে পরিবর্তীতে একটি বিস্ফোরণের দ্বারা ছড়িয়ে দেয়া হয়। মহাশূন্যের প্রতিবন্ধকতা ও প্রভাবহীন পরিবেশে এই বিক্ষিপ্ত পদার্থ–ধূলি কোটি কোটি মাইল দূর–দূরান্তের পানে ছুটে যায় সৃষ্টির এক অজ্ঞাত তাড়নায়। এই পথ চলার সময় সূর্যের মতো কোনো 'মীড–স্ট্রীম–স্টার' এর 'গ্রেভিটি' বলয়ে যদি ঢুকে পড়ার সুযোগ পায় এই মৌলিক পদার্থ–ধূলিরাশি, তবে তারা গতিজড়তার স্বাভাবিক শক্তিতে ও সংশ্লিষ্ট নক্ষত্রের অভিকর্ষের টানে কেন্দ্রের দিকে আকৃষ্ট হয়। সুপারনোভা বিস্ফোরণের ফলে মৌলিক পদার্থকণাদের যে ধূলি–সওগাতের কথা আমরা বলছি— তা একটি বিপুল বিশাল ক্রমাগত বহমান মেঘপুঞ্জের মতো, যার ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর কিংবা যুগের পর যুগ। আর এই প্রবাহটি তার নক্ষত্রকেন্দ্রিক যাত্রার পথে নিকটবর্তী গ্রহদেরকে দান করে যায় ভারী মৌলদের আশীর্বাদ— যা এর পূর্বে ঐ গ্রহদের ছিল না। এই আশীর্বাদ পাবার আগে গ্রহদের ভাণ্ডারে পদার্থ বলতে হাইড্রোজেন–হিলিয়াম

www.pathagar.com

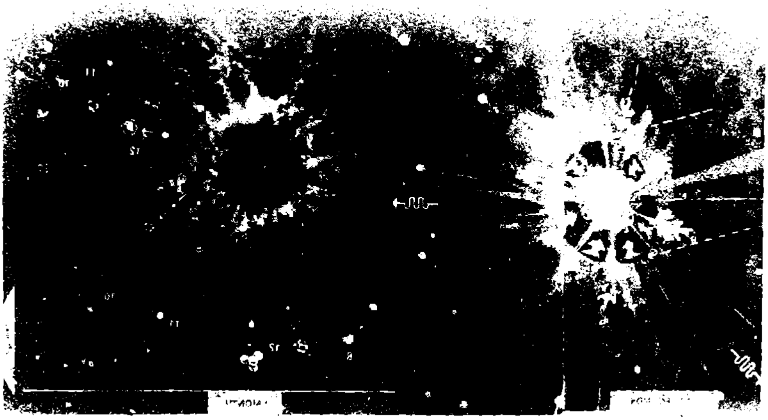

অতি দানব নক্ষত্রের কেন্দ্র যখন লৌহ-মৌল দ্বারা হাইড্রোজেনের স্থলাভিষিক্ত হয়, তখন নক্ষত্রটি নিজ অভিকর্ষ গ্রাসে পতিত হয়ে বৃহৎ বিস্ফোরণ ঘটায়। এই বিস্ফোরণে নক্ষত্রে ইতিমধ্যে তৈরী হয়ে থাকা বিভিন্ন মৌল-বিস্তার প্রতি সেকেণ্ডে কয়েক হাজার কিলোমিটার গতিতে আন্ত-নাক্ষত্রিক মহাযাত্রায় প্রবাহিত হয়। সুপারনোভা বিস্ফোরণের ফলে কেন্দ্রে প্রবল অভিকর্ষসম্পন্ন নিউট্রন স্টার কিংবা ব্ল্যাকহোল জন্ম নেয়। সুপারনোভা বিস্ফোরণের জঞ্জাল প্রবল গতিতে সম্প্রসারিত হতে থাকে চারিদিকে। কেন্দ্র ও চারিদিকে আগুনের হলকা দেখা যায় মাসাবধিকাল কিংবা তারও বেশি। সম্প্রসারিত জঞ্জালে থাকে জীবনের কিংবা জীবনময় পৃথিবী গঠনের সকল সওগাত। এই জঞ্জালই জীবনের বীজ বপন করে।

গ্যাস ছাড়া অন্য কিছুই থাকে না। অথচ যে মুহূর্তে সুপারনোভা হতে আগত ভারী মৌল ঐ হাইড্রোজেন-হিলিয়ামের অঞ্চলে প্রবিষ্ট হয়, সে মুহূর্ত হতেই কেবল নানা ক্রিয়া বিক্রিয়ার দ্বারা ঐ ভারী মৌলগুলি গ্যাসীয় পদার্থকে তরল পদার্থে রূপান্তরিত করতে পারে। এই তরল পদার্থ পরিণামে কঠিন ক্রাস্ট সৃষ্টি না করলে একটি জীবন রক্ষাকারী বায়ুমণ্ডল সৃষ্টির শর্তটি সৃষ্টি হতে পারে না; জীবন সৃষ্টির সমস্ত উপাদান মজুদ থাকা সত্ত্বেও জীবন সৃষ্টি হতে পারে না, সৃষ্টি হলেও তা লালিত হতে পারে না ইত্যাদি। এই মহাবিশ্বে স্রষ্টার কৃতিত্ব দেখা, তাঁকে বিশ্লেষণ করা, তাঁর প্রশংসা করা কিংবা তাঁর অস্তিত্বে অবিশ্বাস অথবা বিদ্রোহ করা এসব কাজগুলি করার জন্য শুধুমাত্র একটি প্রজাতি সৃষ্টি হয়েছে যার নাম মানুষ এবং তাকে এ

www.pathagar.com

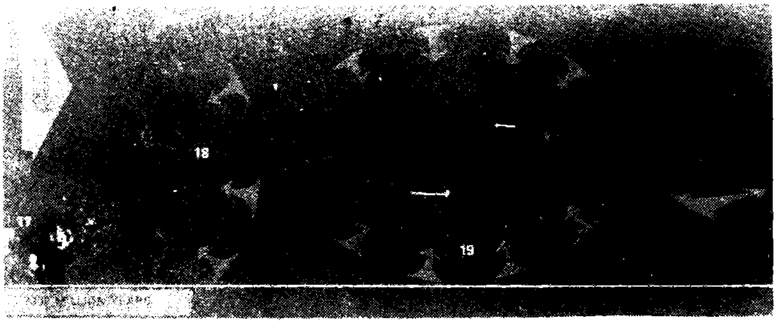

গ্যালাক্সিরা যখন প্রায় ৩০০০ মিলিয়ন বৎসর বয়সে উত্তীর্ণ হয়েছিল— তখন সুপারনোভা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছিল অগণিত ও অসংখ্য। এরা সমগ্র মহাবিশ্বজুড়ে প্রাণের মূল এমাইনো এসিডের বীজ বপন করে রেখেছিল। সূর্য ও গ্রহদের মতো ব্যবস্থা তৈরীর জন্য সুপারনোভা জঞ্জাল ছিল অত্যাবশ্যক। তৈরী হয়ে উঠা মীড-ষ্ট্রীম নক্ষত্র ব্যবস্থার মাঝে নিক্ষিপ্ত সুপারনোভা জঞ্জালই কেবল কঠিন শিলাময় গ্রহদের জন্মকে সম্ভব করে তুলেছিল।

সব কাজগুলি করবার সামর্থ্য যোগাতে তারই সেবার জন্য সৃষ্টি হয়ে রয়েছে আরো প্রায় ৪০০০ মিলিয়ন বুদ্ধিমান প্রজাতির জীব, যাদের সৃষ্টি ও প্রতিপালন কেবলমাত্র এমনি একটি গ্রহ আমরা যাকে 'পৃথিবী' নাম দিয়ে তুষ্ট, তারই মাঝে সমন্বিত হয়েছে; যার সৃষ্টি ও এর মাঝে একটি জীবনময় পরিবেশ বজায় রাখার জন্য একটি মহাবিশ্বের ইতিহাস ছিল অতিশয় অপরিহার্য শর্ত। এই সৃষ্টির প্রায় ১০০% মানুষই এই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠত্বের মূল্যায়ন করতে অক্ষম— তাই দয়াময় আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন এই তাৎপর্যের ও মর্যাদার দিকটি তুলে ধরার জন্যই হয়তো সৃষ্টি-প্রস্তাবের প্রতিটিতেই মহাবিশ্বের সাথে সাথে পৃথিবী সৃষ্টির তথ্যটি তাঁর মহাপ্রজ্ঞাময় গ্রন্থে গেঁথে দিয়েছেন অনেকটা শর্তের মত করেই যেন আমরা অন্ততঃপক্ষে একটি জিজ্ঞাসার মুখোমুখি হতে পারি। সুধী পাঠক, আপনি গ্রহণ করুন কিংবা না-ই করুন, সত্যই মহাবিশ্ব সৃষ্টির চাইতেও জটিল হলো জীবনের সৃষ্টি। আর পৃথিবী হলো মহাবিশ্বের স্রষ্টার সর্বপ্রশংসিত কীর্তিগুলির মধ্যে এক অতি অনন্য কৃতিত্ব। অতএব, আশা করতে পারি যে আমাদের আলোচনায় পৃথিবীর অনন্যতার

www.pathagar.com

বৈশিষ্ট্যের উপর যে আলোকপাত করা হয়েছে, তার সূত্র ধরে বলা যায় যে, আল-কোরআনের পাতায় সৃষ্টির প্রতিটি প্রস্তাবের সাথে একটি শর্তের মতো সংযোজিত 'আকাশ ও পৃথিবী' এর কোরানিক বিবেচনা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ হতে ন্যায্য এবং জরুরীভাবে সঙ্গত। অর্থাৎ প্রাথমিক পর্যায়ে ৬ দিবসে মহাবিশ্ব ও পৃথিবী সৃষ্টির প্রস্তাবের ভিত্তিভূমিটি আমাদের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার দাবি করতে পারে।

পট পরিবর্তন করে এবার চলুন আর একটি আলোচনার প্রসঙ্গে আসি। বিভিন্ন তত্ত্ব হতে আমরা আজ জানি যে সূর্যের জন্মের সময়ই জন্মেছিল পৃথিবী। মাতৃ-নীহারিকা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া একটি গ্যাসপিণ্ড প্রথমে গ্যাসীয় অবয়বে শিশু-সূর্যের চারপাশে ঘুরতে শুরু করেছিল। সময়টা ছিল 'স্টেলার ইরা' এর মহাপ্রশস্ত সময়ের একটি অংশে যা আজ হতে প্রায় ৫০০ কোটি বছর আগে হতে পারে। 'স্টেলার ইরা' হলো মহাবিশ্ব জন্মের মোট ৪টি কালপর্যায়ের শেষ ধাপ যে সময়ে পদার্থ, নক্ষত্র, গ্যালাক্সি জীবন ইত্যাদি সকলই জন্ম নিয়েছে। বিগ-ব্যাংগ এর প্রায় দশ লক্ষ বছর পর হতে ১৫টি মহাপদ্ম বৎসরের প্রায় শেষ অংশে এসে জন্মে সূর্য, তার অংগচ্ছেদ করে কিংবা যুগপৎভাবেই জন্ম হয় পৃথিবীর। সবই 'স্টেলার ইরা'য়। এমনকি পূর্বে আলোচিত সুপারনোভা বিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে জীবনময় পৃথিবীর গোড়াপত্তন— সেও স্টেলার ইরাতেই হয়েছে। আমরা যদি সময়ের বিস্তার, কাল বা ইপকের কথা বলি— বলতে হবে সব কিছুই ঘটেছে 'স্টেলার ইরাতেই'। বিজ্ঞানের এ সত্যটি এখন আমাদের জন্য আরো একটা বিপত্তির জন্ম দেয়। সে হলো, কোরআনের ৪১:৯ আয়াতটির প্রস্তাব— *"তোমরা কি তাঁহাকে অস্বীকার করিবে যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন ২টি সময় কালে* (يومين) মহাবিশ্বের হিসাব চরিত্র অনুযায়ী সকলভাবেই পৃথিবীর সৃষ্টি যেখানে একটি মাত্র সময়কাল 'স্টেলার ইপকের' অন্তর্গত, সেখানে কোরআনের আয়াত ২টি সময়কালের দাবি এনেছে। আমাদের কাছে এর ভাল জবাব আছে কি?

www.pathagar.com

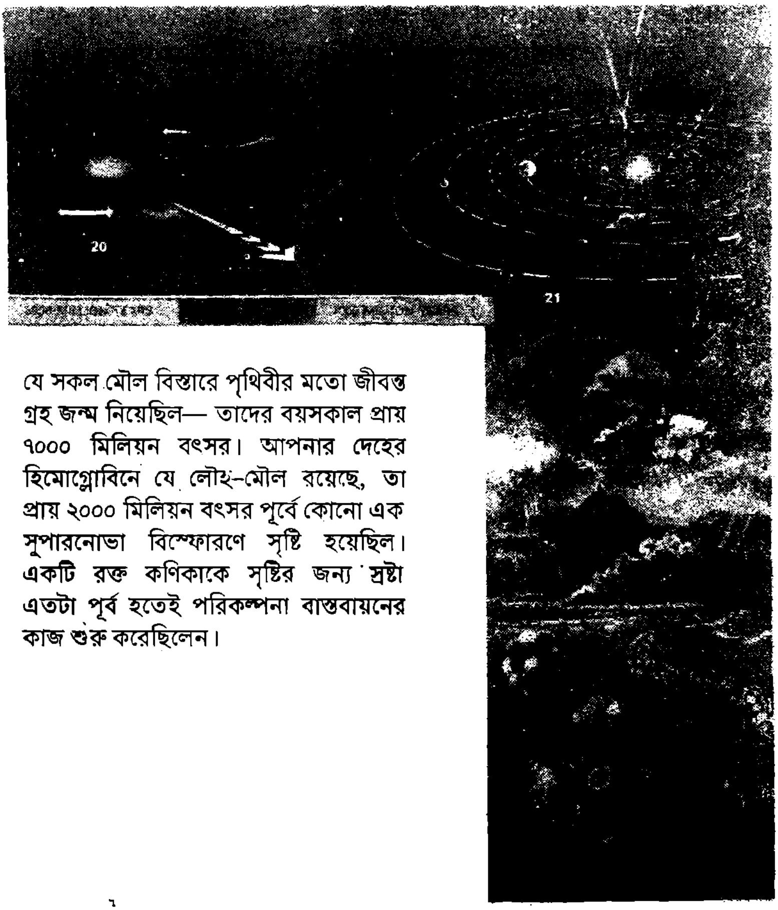

যে সকল মৌল বিস্তারে পৃথিবীর মতো জীবন্ত গ্রহ জন্ম নিয়েছিল— তাদের বয়সকাল প্রায় ৭০০০ মিলিয়ন বৎসর। আপনার দেহের হিমোগ্লোবিনে যে লৌহ-মৌল রয়েছে, তা প্রায় ২০০০ মিলিয়ন বৎসর পূর্বে কোনো এক সুপারনোভা বিস্ফোরণে সৃষ্টি হয়েছিল। একটি রক্ত কণিকাকে সৃষ্টির জন্য স্রষ্টা এতটা পূর্ব হতেই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজ শুরু করেছিলেন।

এ প্রসঙ্গে দেশ-বিদেশের অনেক জ্ঞানী গবেষকগণের লেখা আমি পড়েছি। জ্ঞানীজনদের পদমূলে আমার নিজের অবস্থানকে সমর্পণ করে আমি বিনীতভাবে শুধু সত্যটুকুকে তুলে ধরতে চাই। দুঃখজনকভাবে কোনো ব্যাখ্যাই সত্যের নিকটবর্তী নয় এবং ঐ সব ব্যাখ্যা কোরআন সম্পর্কে বিজ্ঞান বিজ্ঞ জনকে বিশ্বাস স্থাপনে সাহায্যের পরিবর্তে উদাসীন ও আস্থাহীনই করে তুলবে। অথচ আমরা ব্যর্থ হয়েছি— এটাই সত্য ; পবিত্র গ্রন্থ অপূর্ব সত্যতায় প্রকৃত বিজ্ঞানকে মুদ্রিত করে রেখেছে।

www.pathagar.com

জ্ঞানী পাঠক, পূর্ব প্রসঙ্গটির সুস্পষ্ট জবাব দেবার চেষ্টা করছি। ৪১:৯ এর প্রস্তাবটি এককভাবে পৃথিবী সৃষ্টি সংক্রান্ত ; মহাবিশ্ব এর ধারেকাছে নেই। স্রষ্টার কাছে মহাবিশ্ব সৃষ্টির চাইতেও পৃথিবী সৃষ্টির বিবেচনা ছিল অতিগুরুত্বপূর্ণ। কারণটি এই যে— এই পৃথিবীকে সৃষ্টি করার জন্য তাঁকে মহাবিশ্বের গোড়াপত্তন করতে হয়েছে প্রায় ১৫টি মহাপদ্ম বৎসর পূর্বে। এখানে বলা দরকার যে স্রষ্টা সর্বত্র সুকঠিন নিয়মানুবর্তিতার মাঝ দিয়ে তাঁর সৃষ্টিকে অস্তিত্বে এনেছেন এবং একে উপযুক্ত করেছেন। এই নিয়মানুবর্তিতার শাসনে ১৫ বিলিয়ন বৎসর ব্যয় করা সৃষ্টির জন্য অতি জরুরী ছিল। উল্লেখ্য যে এই নিয়মানুবর্তিতা রক্ষা করার জন্য স্রষ্টার ক্ষমতার সর্বময়তার কোনো ক্ষতি হয় না।

স্টিফেন হকিংস বা অন্যান্য paradigmatic scientists রা যে প্রশ্ন তোলেন— 'মহাবিশ্ব সৃষ্টির সময়ে স্রষ্টার আর কিছু করার স্বাধীনতা ছিল কি?' —এই প্রশ্নটি প্রকারান্তরে বলতে চায় যে মহাবিশ্বের স্রষ্টা যদি সর্বময় শক্তির আধার হন, তবে তিনি ১৫টি মহাপদ্ম বৎসর পর্যন্ত অপেক্ষা করে কেন এই পৃথিবী বা জীবনের সৃষ্টি করলেন? কিংবা সৃষ্টির মাঝে কালপ্রবাহে এত দীর্ঘসূত্রীতা কেন? তাদের যুক্তি— স্রষ্টাকে প্রকৃতির উপায় ও অনুগ্রহের জন্যই অপেক্ষা করে বসে থাকতে হয়েছে।

তাদের যুক্তিটি গুরুতর তবে অকাট্য কিংবা দুর্লঙ্ঘ নয়। এই মহাবিশ্বটি কেবলমাত্র প্যারাডাইম সৃষ্টিকারী কোনো বিজ্ঞানীর জন্য তৈরী নয়— এর পূর্বে ও পরে রয়েছে বংশ প্রবাহের ধারাবাহিকতা এবং এদের রয়েছে দীর্ঘসূত্রতার চরিত্র। যাদুবিদ্যার মতো 'ইকরী বিকরী' দিয়ে যে মহাবিশ্ব তৈরীর যুক্তি আসতে পারে— যেখানে ১৫ মহাপদ্ম বছরের বিবেচনা থাকবে না, সেখানে কেবল ছবির মতো একটা দৃশ্যই তৈরী হতে পারে, একটি মহাবিশ্ব নয় যার চারটি ডাইমেনশনের চরিত্র অপরিহার্য— যাদের

www.pathagar.com

একটিকেও বাদ দিয়ে সৃষ্টি সম্ভব নয়। ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে সক্ষম এমন কোনো সৃষ্টি–ব্যবস্থা ও বিস্ময়কর পৃথিবীর জন্ম এমন যাদুবিদ্যা অনুমোদন করে না। অন্যদিকে মহাবিশ্বের সৃষ্টির ইতিহাসে আমরা 'কুন ফা–ইয়াকুন' এবং বিজ্ঞানে যে Big bang এর অস্তিত্ব দেখি— তা 'ইকরী–বিকরী' এর যাদু হতে পার্থক্যময় এ জন্য যে, 'কুন ফা–ইয়াকুন' আদেশটিতে সৃষ্টি হয়েছিল কেবল পদার্থের আদি ভিত্তি শক্তি, পরে শক্তি হতে হিলিয়াম ও হাইড্রোজেন; পরবর্তীতে তাদেরকে প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্টির বিভিন্ন নাক্ষত্রিক রন্ধনশালায় প্রক্রিয়াকরণের মাঝ দিয়ে আজকের জীবনকে সম্ভব করা হয়েছে। সৃষ্টির মাঝে সময় ও স্থানের যে সুবিশালতা আমরা প্রত্যক্ষ করি— হয়তবা স্রষ্টার কাছে তা তুচ্ছ স্থান–কাল–ধারাবাহিকতা হিসাবেই গণ্য হতে পারে। একটি ভাইরাস একটি মানুষকে অসীম গ্যালাক্সির মতই অবলোকন করবে— যেমন আমাদের কাছে মহাবিশ্বটি। আমরা Burst of Creation Theoryতে এমন সম্ভাবনার আভাস পাই। Big bang এর পূর্বে স্রষ্টা কি করছিলেন, তারও জবাব হতে পারে এই যে— তিনি আরো অসংখ্য মহাবিশ্বের প্রতিপালনে সংশ্লিষ্ট ছিলেন যা আমাদের Burst of Creation Theory পূর্ণভাবে অনুমোদন করে (দ্রষ্টব্য ঃ মহাবিশ্বের ভবিষ্যৎ)।

অনেকেই হয়তো প্রশ্ন করবেন যে 'ইকরী বিকরী' বলে যদি একটি মহাবিশ্ব তৈরী না করা সম্ভব হয়— তবে 'কুন' শব্দে কি করে তা সম্ভব হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে 'ইকরী বিকরী' যাদু শব্দটিকে কোয়ান্টাম কার্যকারণে পৌছানো সম্ভব নয়— যেখানে 'কুন' শব্দটি ঐ বৈজ্ঞানিক পরিবেশ সৃষ্টি ও ব্যাখ্যা করে (দ্রষ্টব্যঃ 'কুন ফা–ইয়াকুন')।

যাই হোক— হোক তা 'স্টেলার ইরা'-কিংবা প্লাঙ্ক টাইম (সৃষ্টিক্ষণ) হতে আজকের দিন পর্যন্ত বিস্তৃত ক্ষণটি; শুরু হতে

www.pathagar.com

শেষ পর্যন্ত সবটাই একটি নিরবিচ্ছিন্ন একক সময়-কাল (ইপক)। মূলতঃ তা ছিল 'হাইড্রোজেন হিলিয়ামের' যুগ যা পদার্থবিদ্যা বিষয়ক জ্ঞানে সুস্পষ্টভাবে একটি একক কাল হিসাবে সুচিহ্নিত। অন্যদিকে সুপারনোভা বিস্ফোরণে প্রাপ্ত ভারী মৌলদের নিয়ে পৃথিবীর জীবনযাত্রা সম্পূর্ণ ও পরিপূর্ণভাবে বদলে গিয়ে প্রবাহিত হয় অন্য একটি ধারায় যার বৈশিষ্ট্যে আমরা আজ এ পৃথিবীর অধিবাসী। ফলতঃ এই নতুন ধারাগত সময়প্রবাহটি হলো পদার্থবিদ্যার চোখে আর একটি সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী সময় ধারা বা ইপক; আর এ দুই ইপক মিলেই হলো আজকের সুন্দর পৃথিবী। অর্থাৎ পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে ২টি কালের বৈশিষ্ট্যে— একটি, হাইড্রোজেন-হিলিয়ামের কাল, যার পেছনে প্রয়োজন হয় একটা বিগ-ব্যাংগ এর আত্মপ্রকাশ ও দ্বিতীয়টি হলো ভারী মৌলদের সৃষ্টির যুগ যার পেছনে দরকার পড়েছিল সুপারনোভা বিস্ফোরণের সৃষ্টি-কাঁপানো মহাঘটনার ইতিহাস। এই দুই ইতিহাসেই কেবল পৃথিবীর সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। সুধী পাঠক, আমরা তাহলে বাধ্য হয়েই স্বীকার করছি যে এই পৃথিবী সৃষ্টির ব্যাপক পরিকল্পনায় স্রষ্টাকে ২টি পৃথক পৃথক পদার্থ ও তাপগত পরিবেশ তৈরীর আশ্রয় নিতে হয়েছিল যার ফসল হলো জীবনময় এই সুন্দর গ্রহটি— অনন্যতায় ও বৈশিষ্ট্যে যা মহাবিশ্বের চাইতে অনেক বেশি দামী।

আমাদের আলোচনাকে ঘুরিয়ে এবার চলুন আরো অন্য একটি প্রসঙ্গে। 'ইয়াওম' বলতে আমরা কি বুঝি? বাইবেল যাকে দিবস বলছে, কোরআনের পরিভাষায় তা 'ইয়াওম'— ফলেও অনুবাদকারীগণ তাকে ঢালাওভাবে দিন বা day বলে চালিয়ে যাচ্ছেন। এ বিষয়টা কি ন্যায্য ও সঙ্গত?

বিষয়টি ন্যায্য নয়। কোরআন যাকে 'ইয়াওম' বলেছে— তা কখনো দিবস বা day এর ধারণার সাথে বিসংশ্লিষ্ট নয়। এর মাপের

www.pathagar.com

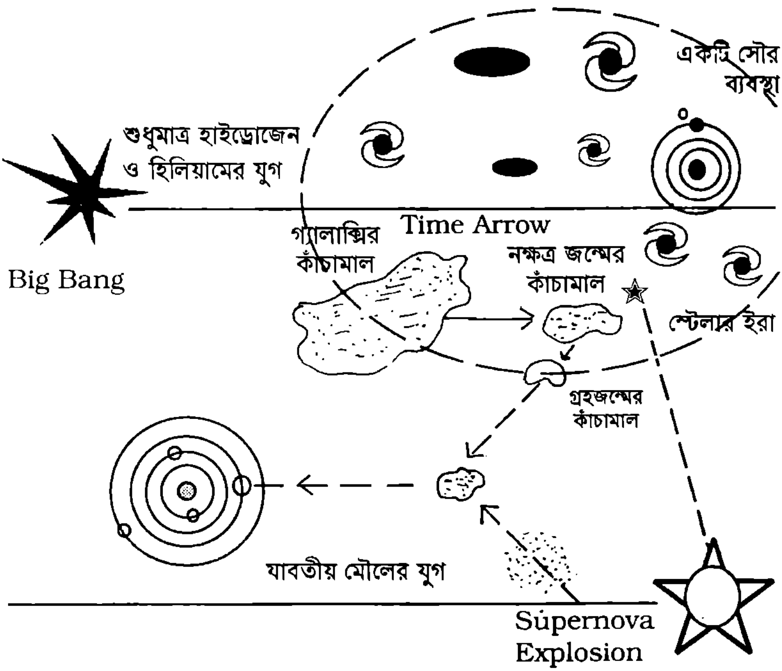

২ টি কাল-পর্যায়ে জীবনময় গ্রহ তৈরী হবার চিত্র

ব্যবস্থাটি মহান স্রষ্টা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন কোরআনের পাতায় অংকন করে রেখেছেন। আরবী 'ইয়াওম' শব্দটির বাহ্যিক অর্থ দিন হলেও কোরআনের পরিভাষায় এটি একটি অনির্দিষ্ট সময়মিতির সুস্পষ্ট ধারণার সাথে বিজড়িত, যার দৈর্ঘ্য হলো একটি অনিশ্চিত সময়কাল এবং তার মান ক্ষুদ্র, মধ্যম ও বৃহত্তম ইত্যাদি সকল অর্থেই প্রসারিত (দ্রষ্টব্য ঃ ছয় দিবসের বিতর্ক, মহাকাশ পর্ব-১)। সুধী পাঠক, আপনার সংক্ষিপ্ত অবগতির জন্য পেশ করছি যে কোরআন 'ইয়াওম'-কে দিন বা 'ডে' অর্থে ব্যবহার করেনি— ব্যবহার করেছে সময়কাল বা 'ইপক' হিসাবে; আর এই ব্যবহারটি বিস্ময়করভাবে বিজ্ঞানের সূক্ষ্মতম জ্ঞানের সাথে সম্পূর্ণ এক, অভিন্ন এবং সত্য!

www.pathagar.com

দুই

কোরআনের ৭:৫৪, ১০:৩, ১১:৭, ২৫:৫৯, ৫০:৩৮ ইত্যাদি আয়াতগুলিতে সৃষ্টির যে প্রস্তাব এসেছে তাতে মোট ছয়টি সময়কালে মহাবিশ্ব ও পৃথিবী সৃষ্টি হবার তথ্য পাওয়া যায়। প্রশ্ন হতে পারে— মহাসমুদ্রের বালিবেলায় হারিয়ে যাওয়া একটি ক্ষুদ্র বালিকণা যেমন কখনোই অবস্থান ও অস্তিত্বের দাবি তোলে না, তার চেয়েও হতাশ করা অনুপাতের এই পৃথিবী, মহাবিশ্বে যা সময় ও সীমাহীনতার গর্ভে হারিয়ে গেছে— তার সৃষ্টির প্রস্তাব কেন এই মহাবিশ্বের সৃষ্টির সাথে শর্ত হয়ে বারবার প্রস্তাবিত হয়েছে? আমরা ইতিপূর্বে এর ন্যায্যতা বিধানের চেষ্টা করেছি যে, এই পৃথিবী সৃষ্টির কলাকৌশল ও তাতে জীবন সৃষ্টি ও লালনের বিস্ময়কর সাফল্য মহাবিশ্বের কৃতিত্বকেও ছাড়িয়ে যায়। প্রসঙ্গটির আর একটি দিক হলো— যদি মনে করা হয় যে কমপক্ষে ১০০ মহাপদ্ম গ্যালাক্সি অধ্যুষিত এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি হবার সময় মাত্র একটি পৃথিবীর জন্ম হয়েছে, তবে এই ধারণাও হবে মারাত্মক ভুল। কারণ, সৃষ্টিতে আমরাই কেবল অনন্য ও একাকী নই। আমাদের মতো এমন জীবনময় পৃথিবীর সংখ্যা রয়েছে অযুত-লক্ষ-কোটি ; সেখানেও আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নির্দেশ অবতীর্ণ হয়। আর এ তথ্যগুলিই কোরআন আমাদেরকে জানাতে চায় তার প্রতিটি সৃষ্টি-প্রস্তাবে। গগনমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি করা হয়েছে ৬টি কালে ; গগন কয়টি আর পৃথিবী কয়টি? السموات। শব্দটি বহুবচন কিন্তু الأرض। শব্দটি কি বহুবচন? যে কেহই এর উত্তর বলবেন 'না'। কিন্তু বিস্ময়করভাবে এই 'না'টি সত্য সাক্ষ্য নয়— কোরআনের পাতায় ৬৫:১২ নম্বর আয়াতে দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখুন— এই الأرض। শব্দটির ব্যবহার বহুবচন হিসাবেও সুপ্রতিষ্ঠিত (দ্রষ্টব্য মহাকাশ পর্ব-১ ঃ ভিন জগতে জীবন)। অর্থাৎ এই মহাবিশ্বে পৃথিবীর সংখ্যা একটি নয়— আর আমাদের পৃথিবী হলো সৃষ্টিতে অগণিত পৃথিবীর একটি। অতএব, সেই দৃষ্টিকোণ হতে সৃষ্টি

www.pathagar.com

প্রস্তাবের বৈশিষ্ট্য হলো যে মহাবিশ্বের বিশালতার সপক্ষে রায় হিসাবে যেমন السموات শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তেমনি এই মহাবিশ্বে অসংখ্য পৃথিবী সৃষ্টি হয়ে রয়েছে, এইটুকু তথ্য জোর দিয়ে প্রস্তাব করার জন্য মহাবিশ্বের পাশাপাশি এই তুচ্ছ পৃথিবীর অস্তিত্বের দাবিটি বারবার উচ্চারিত হয়েছে মহাবিশ্ব সৃষ্টির সমান যোগ্যতা ও গুরুত্বের সমকক্ষতায়!

আমরা ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা করতে প্রয়াস পেয়েছি যে এই মহাবিশ্ব ও পৃথিবী— এই দুইকে কোনো কারণে কোরআনের সৃষ্টি প্রস্তাবে এক সমতলে এনে দাঁড় করানো হয়েছে। আমরা আশা করি যে এর যুক্তি ইতিমধ্যেই আমরা পেয়েছি। তাহলে, সার সিদ্ধান্ত এই যে, মহাবিশ্ব ও পৃথিবী সৃষ্টি মোট ৬টি ইয়াওম বা কাল পর্যায়ের মধ্যে মহাবিশ্ব ও পৃথিবী সৃষ্টির বিবেচনা পৃথক পৃথকভাবে থাকতে পারে যা সমষ্টিগতভাবে ছয়টি পর্যায়ের ফলাফলের সঙ্গে ঐক্যমত পোষণ করবে। পৃথিবী সৃষ্টির জন্য ব্যায়িত কাল পর্যায়ের সংখ্যা ২টি— আমরা এই তথ্য পূর্বেই অবগত হয়েছি। তা হলে মহাবিশ্বের সৃষ্টির জন্য কাল-সংখ্যা অবশ্যই হবে ৪টি। এই চারটি কালের সিদ্ধান্ত কোরআনের সুস্পষ্টতায় সব্যাখ্যাত। আর ঠিক এখানেই এক হয়ে যায় বিজ্ঞানের রায়— According to the cessations of materialization, the evolution of the Universe is divided into four periods : the Hadron era, the lepton era, the photon era and the stellar era. সময়ের এই বিভাজন বিশুদ্ধ পদার্থ -বিদ্যাবিষয়ক বিবেচনায় প্রতিষ্ঠিত, সহজবোধ্য ও দিবালোকের মতই সত্য (দ্রষ্টব্য ঃ মহাকাশ পর্ব-১)।

আমরা দেখছি চারটি ভিন্ন ভিন্ন সময়কালে মহাবিশ্ব ও দুইটি ভিন্নতর সময়কালে পৃথিবীর জন্মকে সঙ্গত কারণেই কোরআন উল্লিখিত আয়াতসমূহের বাণীতে ৬টি সময়কালে এই মহাবিশ্ব ও পৃথিবী সৃষ্ট হওয়ার প্রস্তাব দ্বারা সন্নিবেশিত করেছে যা ন্যায্য ও

www.pathagar.com

পদার্থ বিদ্যার রায়ে সত্য। সাত শতকের অন্ধকার যুগে কোরআনের বাণী কিভাবে একবিংশ শতাব্দীর দ্বারে পৌছে যাওয়া সময়ের সর্বোৎকৃষ্ট প্রযুক্তিলব্ধ জ্ঞানের সূক্ষ্মতম তথ্যগুলিকে এত অগ্রিম প্রকাশ করে রেখেছিল— তা ভেবে বিস্ময়ে দু'দণ্ড থমকে দাঁড়াতে হয়। প্রমাণিত হয়ে যায়— *"এই সেই গ্রন্থ যাহাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নাই (২:২) তোমাদের কি হইল যে, তোমরা আল্লাহর মাহাত্ম্যকে স্বীকার করিতেছ না? (৭১:১৩৬) অবশ্যই ইহাতে নিদর্শন রহিয়াছে পর্যবেক্ষণ ক্ষমতাসম্পন্ন জ্ঞানী ব্যক্তিদের জন্য" (১৫:৭৫)।*

তিন

কোরআন গবেষকগণের কাছে ৪১:৯–১২ আয়াত চতুষ্টয় একসঙ্গে একটি গুরুতর সমস্যা। এই আয়াতগুলি ৭:৫৪, ১০:৩ ইত্যাদি আয়াতসমূহের সাথে মিলিয়ে যখন দেখবেন, তখন আপনি নিজেও এক বিভ্রান্তির বেড়াজালে আটকা পড়ে গেছেন এমন মনে হবে। আমি মহান রাব্বুল আলামীনের পবিত্রতা ও ক্ষমার আশ্রয় নিচ্ছি এবং জ্ঞানী তর্জমাকারীগণ কিংবা গবেষকগণের অসাধারণ জ্ঞানের প্রতি বিনীত শ্রদ্ধা নিবেদন করে সঠিক ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য মহান আল্লাহ পাকের কাছে তাঁর দয়া ভিক্ষা করছি।

৪১:৯ আয়াতে ২ সময়কালে পৃথিবী সৃষ্টির প্রস্তাবের পর ৪১:১০ ও ৪১:১২ এই দুইটি আয়াতে যথাক্রমে ৪টি কাল বিস্তারে পৃথিবীতে জীবের জন্য রিযিক ও বাঁচার অবলম্বন এবং পরের আয়াতে সপ্ত-আকাশে বিধান ব্যবস্থিত করার তথ্য প্রস্তাবিত হয়েছে। এই দুই-এর একটিও প্রকৃতপক্ষে মহাবিশ্ব কিংবা পৃথিবী সৃষ্টির সাথে বিসংশ্লিষ্ট নয়। ৪১:৯ অয়াতটি خلق শব্দ দ্বারা প্রস্তাবিত হয়েছে যা মৌলিক সৃষ্টি তথা পৃথিবী বা মহাবিশ্বের সৃষ্টির সাথে সম্পর্কিত। কিন্তু ৪১:১০ আয়াতটিতে خلق না হয়ে ব্যবহৃত হয়েছে قضى যার অর্থ হলো ভাগ্য বা তকদীর ব্যবস্থিত করা (Decree for, destine

www.pathagar.com

to, render possible, facilitate, fix in measure and quantity and distribute etc). অন্যদিকে ৪১:১২ আয়াতে একইভাবে خلق শব্দটি ব্যবহার না পেয়ে ব্যবহৃত হয়েছে فقضهن যার মূল قضى এর অর্থ হলো নিয়মিত করা, নিয়ন্ত্রিত করা, নির্দিষ্ট করা (decide upon, pre-ordain, order, fulfil ones destiney).

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ৪১:১০ ও ৪১:১২ আয়াত দুইটি কোনভাবেই ৭:৫৪, ১০:৩, ১১:৭, ২৫:৫৯, ৫০:৩৮ কিংবা ৪১:৯ এই আয়াতসমূহের মতো একই গোত্রীয় আয়াত নয়, বরং যেখানে এই আয়াতগুলি মহাবিশ্ব ও পৃথিবীর আদি সৃষ্টির সাথে সম্পর্কিত, সেখানে ৪১:১০ ও ৪১:১২ এই দুটি আয়াত অনেক পরের দৃশ্যপটের চিত্র তুলে ধরেছে যা মূল সৃষ্টি প্রস্তাবের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। মূলতঃ প্রাকৃতির আইনাবলী কিংবা জীবের প্রতিপালনের জন্য সৃষ্টিকে নিয়মিত ও নিয়ন্ত্রিত করার কথাই বোঝাতে চেয়েছে এই আয়াতগুলি যা আদি সৃষ্টির অনেক পরের সময়কে নির্দেশ করে। ফলতঃ মহাবিশ্বের কিংবা পৃথিবী সৃষ্টির ব্যাখ্যায় ৪১:১০ এবং ৪১:১২ আয়াতের কাল-পর্যায়গুলি বিবেচনা করা হলে যুক্তিটি বৈজ্ঞানিক ন্যায্যতা হারায় যা আমাদের লব্ধ জ্ঞানের সাথে বৈপরীত্ব সৃষ্টি করবে। ঠিক এমনি একটি বৈপরীত্বের দোষে দুষ্ট হয়েছে বিখ্যাত পুস্তক Scientific Indications in the Holy Quran এর সৃষ্টি সংক্রান্ত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ (৭:৫৪ আয়াতের ব্যাখ্যায় ১৪১/১৪২ পৃঃ এবং ৪১:৯-১২ আয়াতের ব্যাখ্যায় ৩৯৩/৩৯৪ পৃষ্ঠা)। আমি এর বিষয়ে কিছু যুক্তি ও তথ্য পরিবেশন করছি।

উল্লিখিত পুস্তকে মহাবিশ্ব সৃষ্টির ঘটনাকে ২টি পর্যায়কালে বিভক্ত করে দেখানো হয়েছে, যাদের একটি ছিল ১৫০ মিলিয়ন বৎসর দীর্ঘ এবং বিগ ব্যাংগ হতে গ্যালাক্সি গুচ্ছায়িত হওয়াকে এই পর্যায়ে বিবেচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায় কালকে ১ মহাপদ্ম বৎসর দীর্ঘ নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহদের সৃষ্টির কাল হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

www.pathagar.com

এই তথ্যগুলির যেমন গ্রহণযোগ্য বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই (কারণ বিভাজন পর্যায়গুলি পদার্থের মৌলিক ও তাপগত অবস্থার ভিত্তিতে বিবেচ্য)— তেমনি কোনরূপ কোরানিক ভিত্তি বিবর্জিত। আল–কোরআনের পাতায় কোথাও এমন তথ্য নেই যেখানে বলা হয়েছে যে মহাবিশ্বের সৃজনকাল ২টি। সম্ভবতঃ ৪১:১২ আয়াতের প্রস্তাবকে ভুল বুঝে গবেষকগণ এই ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে থাকতে পারেন। কারণ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত আল–কোরআনুল করীমের বংগানুবাদে এই আয়াতটির অর্থকরণেও একই ভুল করা হয়েছে এবং গবেষকগণ সম্ভবতঃ এই বংগানুবাদকে বিশেষভাবে অনুসরণ করেছেন।

এই ভুল বোঝাবুঝিটি পরবর্তীতে সংক্রামিত হতে দেখা যায় ৪১:১০ আয়াতের ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রেও। এই আয়াতে আল্লাহপাক পৃথিবীতে তাঁর দান ও কল্যাণ ব্যবস্থিত করার জন্য ৪টি সময়ের কথা প্রস্তাব করেছেন— পৃথিবী সৃষ্টির কথা বোঝাতে নয়। কিন্তু গবেষকগণ এই ৪টি সময়কে 'সৃষ্টি' অর্থে বিচার করে ভুল করেছেন। শুধু এখানেই ভুলের রেশ কেটেছে এমন নয়— ভুলটি ছড়িয়ে পড়ছে আরো দূরে ৪১:৯ আয়াতের সৃষ্টি–প্রস্তাবকে ৪১:১২ আয়াতের প্রস্তাবের সাথে যুগপৎ ঘটনা বলে দাবি করা হয়েছে (৩৯৪ পৃষ্ঠা Scientific Indications in the Holy Quran) যা আরো গুরুতর একটি ভ্রম। প্রকৃত প্রস্তাবে ৪১:১০ এবং ৪১:১২ কোনোটিই মৌলিক সৃষ্টি সংক্রান্ত আয়াত নয় আর সেই কারণে ৪১:৯ এর সাথে এদের কোনো বিসংশ্লিষ্টতা নেই। পুস্তকটির প্রস্তাবনা হলো— "In the verses under discussion, creation of earth is mentioned in one verse-41:9, and that of heavens in another verse 41:12. Thus the same 2 phases have been mentioned in two diffrent verses. These phases are to be counted as 2 and not as 4". যা কোনো রকম গ্রহণযোগ্যতার বিবেচনা ছাড়াই বর্জনীয়। গবেষকগণ خلق এবং قضي এর অতি মৌলিক পার্থক্যের কথা

www.pathagar.com

বিবেচনা করলে কখনোই এমন অর্থ করতেন না। আর এই ভুল একদিকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ হতে সৃষ্টির সময় বিভাজন সংক্রান্ত বিজ্ঞানের গ্রহণযোগ্য রায় নেই এমন কিছু তথ্য দ্বারা প্রমাণিত করার চেষ্টা করা হয়েছে যা যুক্তিগ্রাহ্য নয়, অন্যদিকে কোরআনের যে আয়াতসমূহ বিবেচনা করা হয়েছে— সেই সব আয়াতসমূহও এই বিভাজন পদ্ধতিকে অনুমোদন করে না। মূলতঃ কোরআন মহাবিশ্ব ও পৃথিবীর সৃষ্টিকে ছয়টি কাল পর্যায়ে সম্পন্ন হবার দাবি করেছে, তা অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণে একই সময় প্রকৃতির ভিত্তিতে (nature of time) হওয়া উচিৎ, এবং তা অতি প্রাসঙ্গিক কারণেই Astronomical time এর এককে বিচার্য হওয়া প্রয়োজন ছিল। কিন্তু Scientific Indications in the Holy Quran এর প্রবক্তাগণ যেখানে মহাবিশ্বের কাল পর্যায়গুলি মেপেছেন Astronomircal time এর আশ্রয় নিয়ে, সেখানে পৃথিবী সৃষ্টির কাল পর্যায়কে বিবেচনা করেছেন Geological time এর এককে যা অনেকটা একটি পথের দূরত্ব মাপার জন্য গজ–ফুট–ইঞ্চি এর পরিমাপ দ্বারা কিছুদূর মেপে বাকি অংশটুকু হন্দর–কেজি–গ্রাম এর এককে মাপার চেষ্টা করার মতো। আমি শ্রদ্ধেয় গবেষকগণকে বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ রাখছি।

চার

সর্ববিজ্ঞ, সর্বকুশলী ও সর্ববিজ্ঞানী আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন মানুষের জ্ঞানকে সাহায্য করার জন্য আরো অনেক জরুরী তথ্য প্রেরণ করেছেন কোরআনের পাতায়। *"তিনি পৃথিবী পৃষ্ঠে স্থাপন করিয়াছেন অটল পর্বতরাজি আর উহাতে রাখিয়াছেন কল্যাণ এবং চারটি সময়ের–পর্যায়ে ইহাতে ব্যবস্থা করিয়াছেন জীবের যাবতীয় জীবিকা সমভাবে যাচনাকারীদিগের জন্য" (৪১:১০)।* এই আয়াতটি আমাদের দৃষ্টিকে Astronomy'র বিকষ কালো অন্ধকার ও প্রাণহীন অঞ্চল হতে তুলে এনে Geology–এর সবুজ জীবনময়–ভূমিতে নিবদ্ধ করিয়ে দেয়।

www.pathagar.com

৪টি কাল পর্যায় ! কী বিস্ময় ! ! ১৫০০ বৎসর পূর্বে কোরআন ৪টি কাল পর্যায়ের কথা বলেছিল যার সাথে বিসংশ্লিষ্ট রয়েছে জীবদের রিযিকের, তাদের উন্মেষের, তাদের বংশ বিস্তারের আর তাদের অস্তিত্বের ! উনিশ শতকের মাঝামাঝিতে মানুষ কোরআনের এই সত্যকে আবিষ্কার করতে সক্ষম হয় মাত্র। আল–কোরআনের প্রস্তাবের দাবি পূরণ করে আজকের বিজ্ঞান জিয়োলজিক্যাল সময়কে ৪টি পর্যায়েই ভাগ করে দেখিয়েছে যেগুলো হলো— Precambrian era, Paleozoic era, Mesozoic era & Cenozoic era. কত বিস্ময়কর ! *

পাঁচ

"অনন্তর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করিলেন যাহা ছিল ধূম্রপুঞ্জ। অতঃপর তিনি উহাকে ও পৃথিবীকে বলিলেন— তোমরা উভয়ই আস ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায়। উহারা কহিল— আমরা আসিলাম আনুগত্যতার সাথে" (৪১:১১)। সুধী পাঠক, আপনার মনে জিজ্ঞাসা জাগবে— 'আকাশ' হিসাবে যাকে আহ্বান করা হয়েছে তার প্রকৃত স্বরূপটা কি তা জানার। একইভাবে *"অতঃপর তিনি সপ্ত আকাশকে নিয়ন্ত্রিত করিলেন দুইটি কাল পর্যায়ে এবং প্রত্যেক আকাশকে উহার বিধান ব্যক্ত করিলেন' (৪১:১২)*–এর মাঝে প্রস্তাবিত 'সপ্ত আকাশ' ও ২টি কাল পর্যায়কে গ্রহণযোগ্য তথ্য–উপাত্তে বিশ্লেষণ না করা পর্যন্ত আমাদের প্রকল্পটি অপূর্ণ থেকে যাবে। তাই আমরা প্রথমে 'আকাশের' প্রকৃত অর্থটা অনুধাবন করতে প্রয়াস নেব।

কোরআনে ব্যবহৃত যে সকল রহস্যময় শব্দ আমাদের সুগভীর মনোযোগ আকর্ষণের দাবি রাখে তার মধ্যে السموات শব্দটি অনন্য। স্থান–কাল ভেদে এই শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে কোরআনের বিভিন্নখানে। ৪১:১১ ও ৪১:১২ আয়াত দুটিতে এই শব্দের মান এক সংকটজনক পরিধি নিয়ে ব্যবহার পেয়েছে। একটু

www.pathagar.com

মনোযোগ ক্ষেপণ করলে সহজেই ধরা যাবে যে ৪১:১১ আয়াতের পরিবেশটি একটি অতি পরিষ্কার ও সরল সময়মিতি নির্দেশ করে। অন্ততপক্ষে সহজ করে হলেও বোঝার সুযোগ রয়েছে যে, এ সময়টি বেশি দূরবর্তী সময়ের কথা নয়। আজ হতে প্রায় ৫০০ কোটি বছর আগের পরিবেশ যখন ধুম্রপুঞ্জ অধ্যুষিত আকাশে মুলতঃ হাইড্রোজেন-হিলিয়ামের গ্যাসবিস্তার ছাড়া অন্য কিছু ছিল না। সে সময় যুগপৎ ঘটনায় সৃষ্টি হতে চলেছে সূর্য ও পৃথিবী। যেহেতু পৃথিবীকে আহ্বানের বিষয়টি খুব সুস্পষ্ট— সেহেতু অপর অস্তিত্বটি যা আকাশের পরিচয়ে আমাদের সামনে পেশ করা হয়েছে, তা ছিল প্রকৃতপক্ষে সেই মাতৃ-নীহারিকা আদিতে যার দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় অর্ধ-আলোক বৎসর। এই অর্ধ আলোক বৎসর দৈর্ঘ্য জুড়ে বিস্তৃত বিশাল নীহারিকাটি (প্রায় ৩×১০^{১২} মাইল বা ৩ মহাপদ্ম মাইল, মাতৃ গ্যালাকি নয়-সূর্যের কাঁচামাল সমৃদ্ধ গ্যাস বিস্তার বুঝানো হয়েছে) প্রকৃত পক্ষে এত বিস্তীর্ণ ও সুবিশাল যে তা 'আকাশ' নামে অভিহিত হবার দাবি রাখে। কোরআনের পরিভাষায় এই বিশাল অঞ্চল জুড়ে ব্যাপ্ত নীহারিকাকেই 'আকাশ' নামে অভিহিত করা হয়েছে। *"তিনি উহাকে এবং পৃথিবীকে বলিলেন— তোমরা উভয়ই আস, ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায়"* এই বর্ণনাটি আমাদেরকে মহান আল্লাহপাকের সুনিশ্চিত পরিকল্পনার তথ্যটি জানিয়ে যায় যে, এই পৃথিবী সৃষ্টির পেছনে তাঁর সুস্পষ্ট পরিকল্পনা ছিল এবং ব্যাপারটি মোটেই এমন নয় যে দুর্ঘটনাবশতঃ সূর্য হতে বিচ্ছিন্ন না হলে কিংবা মাতৃ-নীহারিকা হতে ছিটকে না পড়লে এই পৃথিবী জন্মাত না। যাই হোক, কোরআনে আমরা যে সুস্পষ্ট তথ্য পাই, তাতে মনে হয় যে, সূর্য সৃষ্টির কাঁচামাল সেই মাতৃ-নীহারিকা হতে নক্ষত্রটির সৃষ্টির প্রক্রিয়া যখন শুরু হয়েছে— একই সাথে গ্রহরাও জন্ম নেয়ার প্রক্রিয়ায় প্রবাহিত হতে শুরু করেছে এবং সেই সুবাদে পৃথিবীও। *"আমরা আসিলাম আনুগত্যতার সাথে"*— এই আয়াতাংশ মূলতঃ সৃষ্টিতে ব্যবস্থিত আইনের সুনিশ্চিতিরই প্রকাশ যা ব্যাখ্যার উর্ধ্বে।

আমাদের সামনে এখন রয়েছে অপর একটি গুরুতর আয়াত— *"অতঃপর তিনি সপ্ত আকাশমণ্ডলীকে দুইটি কাল-পর্যায়ে*

www.pathagar.com

নিয়মতান্ত্রিকভাবে ব্যবস্থিত করিলেন এবং প্রত্যেক আকাশকে উহার বিধান প্রেরণ করিলেন"। এই আয়াতে سبع السموات বা সাত আকাশ বলতে কি বোঝানো হয়েছে? এই উত্তরটি জটিল। যদিও আমাদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও প্রভাবিত হবে, তবু আমরা সাধ্যমত চেষ্টা করে দেখতে পারি। এর জন্য অবশ্যই আমি মহান আল্লাহর জ্ঞানের আশ্রয় কামনা করি। ইতিপূর্বে মহাকাল পর্ব-১ এ سبع السموات বা সাত আসমানকে আমরা অসংখ্য বিশ্ব বা গ্যালাক্সি বোঝাতে প্রয়াস পেয়েছি যা প্রস্তাবের সঙ্গতিতে ও ন্যায্যতায় ছিল যুক্তিগ্রাহ্য। কিন্তু ৪১:১১ আয়াতের প্রেক্ষাপটে ৪১:১২ আয়াতে ব্যবহৃত ন্যায্যতায় এখানে ব্যাখ্যা করা একেবারেই অসম্ভব। কোরআনে একই শব্দের ব্যবহার ভেদে বহুমুখী অর্থ প্রদানের যে ঐশী গুণাগুণ রয়েছে السماء তেমনি গুণাগুণসম্পন্ন একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ শব্দ যাকে কোরআনের বিভিন্ন বর্ণনায় কখনো মহাবিশ্ব, কখনো গ্যালাক্সি, কখনো স্থানীয় আকাশ, কখনো বায়ুমণ্ডলীয় বলয় এবং কখনো নিম্ন আকাশ ইত্যাদি বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। অতএব, ৪১:১২ আয়াতে ব্যবহৃত السموات শব্দটির ক্ষেত্রেও যুক্তির সাথে খাপ খায় এমন একটি অর্থের সাথে মিলিয়ে দেখার সুযোগ আমাদের হাতে আছে। যদি তা-ই হয়, তবে ৪১:১১ আয়াতে বর্ণিত ধূম্রপুঞ্জ যা পৃথিবীর সহোদর বা সমপর্যায়ের বা সমগোত্রীয় হিসাবে চিত্রায়িত করা হয়েছে, তা মূলতঃ সূর্যের কাঁচামাল সেই মাতৃ-নীহারিকা ভিন্ন অন্য কিছুই নয়। আর ৪১:১২ আয়াতে এর বহুবচনের ব্যবহারটি মূলতঃ আরো অসংখ্য সূর্য-নীহারিকারই ইংগিত বা প্রস্তাব মাত্র। আপনারা অবগত রয়েছেন যে আজ হতে ৫০০ কোটি বছর আগে এই মহাবিশ্বে তখন পৃথিবী ছিল না, সূর্যের মতো অন্যান্য 'মেইন সিকুয়েন্স স্টার' যারা সৃষ্টিগতভাবে দীর্ঘজীবন নিয়ে বেঁচে থাকার জন্য জন্মেছে, তাদের সৃষ্টি অনেকটা একই সময়ে যুগপৎভাবে ঘটতে শুরু করেছে। এই মেইন সিকুয়েন্স স্টার না হলে জীবনময় গ্রহের প্রতিপালন সম্ভব নয়; সুতরাং পৃথিবী সৃষ্টির সাথে সাথে আমাদের নিজস্ব অঞ্চলে

www.pathagar.com

যেমন সূর্য সৃষ্টি হয়েছিল, তেমনি দূরবর্তী অসংখ্য অঞ্চলে অসংখ্য সূর্য ও অসংখ্য পৃথিবী যুগপৎ ঘটনায় জন্ম নিয়ে থাকতে পারে। ৪১:১২ আয়াতে হয়তো এমনি ঘটনার তথ্যচিত্র পেশ করা হয়ে থাকবে। অর্থাৎ আমরা বলতে চাই যে, জীবনময় পৃথিবী সম্বলিত সৌর ব্যবস্থা শুধু একক ও আমাদেরটিই নয়— এই মহাবিশ্বে আরো অসংখ্য সৌরজগৎ জীবন নিয়ে সৃষ্টি হয়ে আছে, সেখানেও আল্লাহর নির্দেশ নাজেল হয়— এই বক্তব্যটিই আমরা ৪১:১২ আয়াতের মূল প্রস্তাব হিসাবে চিহ্নিত করতে চাই।

সূর্যের ভরের সমান ভরসম্পন্ন মুক্ত মেঘপুঞ্জ (হাইড্রোজেন–হিলিয়াম) যদি ১/২ আলোকবর্ষ জুড়ে অবস্থান করতে পারে তবে তা একটি সৌর ব্যবস্থায় জন্ম দিতে সক্ষম হয়। ১/২ আলোকবর্ষ ব্যাসসম্পন্ন মেঘাঞ্চল দৃশ্যতঃ-সুবিশাল আকাশ নামে আখ্যায়িত হবার দাবিদার। বলা দরকার যে, একটি গ্যালাক্সিতে নক্ষত্ররা কখনো এককভাবে জন্মায় না— একসাথে গুচ্ছে গুচ্ছে এদের জন্ম হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে দূর দূরান্তে মহাবিশ্বের বিভিন্ন গভীরতায় মেইন সিকুয়েন্স স্টার বা সূর্য–গোত্রীয় নক্ষত্ররা সবচাইতে বেশি হারে জন্ম নিয়ে থাকে। প্রতিটি সূর্য–গোত্রীয় নক্ষত্র এক একটি পৃথিবীর জন্মদাতা হবার সম্ভাব্য প্রার্থী। ফলতঃ এই মহাবিশ্বে অসংখ্য পৃথিবী থাকার সম্ভাবনা অনেক উজ্জ্বল।

www.pathagar.com

৪১:১২ আয়াতের পরিবেশে অন্যান্য আকাশে বিধান ব্যক্ত হওয়ার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ আর একটি আয়াতের উদ্ধৃতি এখানে প্রাসঙ্গিক। *“আল্লাহ সৃষ্টি করিয়াছেন সাত (অসংখ্য) আসমান ও অনুরূপ সংখ্যক পৃথিবী। উহাদের উপরেও তাঁহার নির্দেশ অবতীর্ণ হয়” (৬৫:১২)।* আমরা অন্যান্য ব্যাখ্যায় (ভিন জগতে জীবন–মহাকাশ পর্ব–১) এই আয়াতে অগণিত বা অসংখ্য পৃথিবীর অস্তিত্বের সন্ধান পাই। ৪১:১২ আয়াতের প্রেক্ষাপটটি ৬৫:১২ আয়াতের মতো অন্যান্য জীবনময় পৃথিবীতে নির্দেশ নাযেল হওয়ার বিষয়ে নয়, তা হলো অন্যান্য আকাশে বিধান ব্যক্ত হওয়া সংক্রান্ত অর্থাৎ অন্যান্য আকাশে মহাজাগতিক আইনকানুনের নিয়মিতকরণ সংক্রান্ত। অথবা এর ব্যাখ্যা এমনও হতে পারে যে— যেহেতু ৪১:১২ আয়াতটিতে ‘প্রত্যেক আকাশ’ এর বিপরীতে একটি নিকটবর্তী আকাশের তুলনামূলক অস্তিত্ব রয়েছে, সেহেতু অন্যান্য আকাশ দ্বারা হয়তো বা অন্যান্য পৃথিবীর চারপাশের আকাশকে বুঝিয়ে থাকতে পারে। আমাদের পৃথিবীর চারিদিকের আকাশটি যেমন আলোকময় বস্তু অর্থাৎ গ্রহ–নক্ষত্রদের দ্বারা অধ্যুষিত ; তেমনি মহাবিশ্বের সর্ব অঞ্চলে এর অনুরূপতা সৃষ্টি হয়ে থাকাই সবচাইতে স্বাভাবিক ঘটনা ! আমরা ‘সম্মানিত পৃথিবী’ এই প্রবন্ধে দেখিয়েছি যে একটি পৃথিবীর বিপরীতে ন্যূনতঃ হাজারটি নক্ষত্র থাকা চাই। ফলতঃ ঐ সব পৃথিবীর জগৎ হতেও কোনো দর্শক আমাদের মতই একটি নিকটবর্তী আকাশ প্রত্যক্ষ করবে এবং তাতে তারা আমাদের আকাশের মতই প্রদীপমালা দ্বারা সুশোভিত দেখতে পাবে। *“তিনি আকাশমণ্ডলকে দুই সময়ের পর্যায়ে (সপ্ত) অসংখ্য আকাশে পরিণত করিলেন”*— এই তথ্যটি সম্ভবতঃ সপ্তাকাশ বা অসংখ্য আকাশ বা অসংখ্য নীহারিকা অধ্যুষিত আকাশ (১/২ আলোকবর্ষ ব্যাস) এদের জন্মের তথ্য দেয় আর আকাশমণ্ডল বলতে এর একটি উপরের ধাপ বা গ্যালাক্সিকে বুঝিয়ে থাকতে পারে। মূলতঃ সৃষ্টির প্রায় বিশাল সংখ্যক গ্যালাক্সি একসাথে যুগপৎভাবে অসংখ্য নক্ষত্রদের জন্ম দিয়েছে— এই তথ্যটিও এ আয়াতে প্রকাশিত হয়ে থাকতে পারে।

www.pathagar.com

আমাদের সামনে প্রকল্পের অন্য দিকটি ২টি কাল পর্যায়ে সাত বা অসংখ্য আসমানকে নিয়মিতকরণের ব্যাখ্যা প্রদান করা। সাত আসমান বলতে আমরা সূর্যের মাতৃ-নীহারিকার মতো অসংখ্য সূর্য-নীহারিকাদের যুক্তি পেশ করেছি, এই নীহারিকাদের প্রতিটিই ন্যূনতঃ অর্ধ-আলোক বৎসর ব্যাস সম্পন্ন অতি সুবিশাল এলাকা জুড়ে বর্তমান ছিল। তাই কোরআন সঙ্গত কারণেই ঐ বিশাল মেঘ-অঞ্চলকে 'আকাশ' নাম দিয়ে ন্যায্যতার শর্ত পূরণ করেছেন। এই আসমান বা আকাশগুলি পরবর্তীতে মেইন সিকুয়েন্স স্টার বা সূর্য তৈরী করে। মেইন সিকুয়েন্স স্টারগুলি হল দীর্ঘ-জীবনসম্পন্ন ভারসাম্যপ্রাপ্ত নক্ষত্র যারা আকৃতিতে ছোট, ঐগুলো হলুদ রং-এর আর তাপমাত্রায় কম। পৃথিবীর মতো জীবনময় গ্রহ সৃষ্টি ও প্রতিপালন কেবল এদের দ্বারাই সম্ভব।

যে ধোঁয়া অঞ্চল বা আকাশ বা السماء বা নীহারিকারা এই হলদে ছোট ও কম উত্তপ্ত তারাদের জন্ম দিয়েছে— তাদের নিয়মিত বা নিয়ন্ত্রিত হবার ঘটনাটি কিন্তু ২টি পৃথক পদার্থবিদ্যা বিষয়ক পরিবেশ বা ঘটনাতেই নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। তাদের একটি হলো 'অভিকর্ষ পরিবেশ' যা প্রতিটি কম-বেশি অর্ধ আলোক বৎসর ব্যাসসম্পন্ন নীহারিকা বা ধূম্রপুঞ্জ কোরআন যাকে 'সামায়া' বা আসমান বলে চিহ্নিত করেছে-- তাদেরকে একটি নির্দিষ্ট প্রভাব বলয়ে বন্দী করে এর কেন্দ্রে 'প্রটোস্টার' তৈরীর পূর্বশর্ত পূরণ ও থার্মোনিউক্লিয়ার পাওয়ার হাউজ তৈরী হবার জন্য প্রয়োজনীয় সকল পদার্থবিদ্যাবিষয়ক শর্ত ও পরিবেশ সৃষ্টি করা। দ্বিতীয়টি হলো ঐ নীহারিকার জীবনে 'থার্মোনিউক্লিয়ার-ইপক' বা নক্ষত্রের কেন্দ্র বিন্দুতে পারমাণবিক শক্তিচুল্লি স্থাপনের সময়কাল ও তার পরের সময়। নক্ষত্রের জন্মের ইতিহাস মূলতঃ এই দুইটি কাল-পর্যায়েই বিভক্ত করা যায়, অন্য আর কিছুতে নয়। অভিকর্ষ যখন নক্ষত্রের কেন্দ্রের অভিমুখে তার সমস্ত শক্তিকে প্রবাহিত করে— তখন নক্ষত্রটি চতুর্দিক হতে কেন্দ্রের দিকে ধাবিত হতে থাকে এক চরম ধ্বংসযজ্ঞের স্রোতে ; বিপুল শক্তিতে বস্তু-ভর আছড়ে পড়তে থাকে

www.pathagar.com

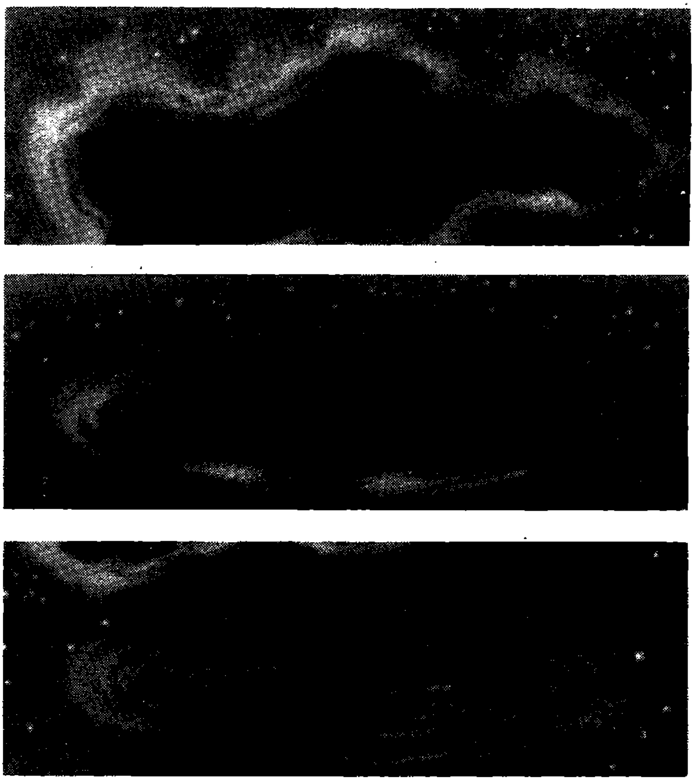

২ কাল–পর্যায়ে সাত (অসংখ্য) আকাশ নিয়মিত করণের সম্ভাব্য প্রতিনিধিত্বমূলক চিত্রের প্রথম পর্যায়টি। এখানে 'দুখান' হতে কিভাবে একটি সৌর–আকাশ তৈরী হয়, তার প্রক্রিয়া দেখানো হলো। এ পর্যায়ে অভিকর্ষ বল একটি প্রাকৃতিক কেন্দ্র নির্বাচন করে ও 'দুখান' বা গ্যাসপুঞ্জকে জড়ো করে আনে কতগুলি অনিয়মিত বলয় আকৃতির বস্তুপিণ্ডে। নক্ষত্র এবং জীবনময় পৃথিবীরূপ গ্রহ এবং গ্রহসমষ্টির জন্য এই অনিয়মিত গ্যাস–বলয়গুলি হলো আদিভিত্তি। এই কাল–পর্যায়টি কেবল অভিকর্ষের ঝড় ও তাণ্ডবের টানাপোড়েনে গ্যাস সমৃদ্ধ অঞ্চলে অন্ধকার ও আতশী ধ্বংস টানের চরিত্রে চিহ্নিত রয়েছে। ইহা একটি অস্থায়ী দীর্ঘ কাল।

একই কেন্দ্রের উপর। যেহেতু বস্তুর চাপ এক পর্যায়ে বিপুল হতে বিপুলতর হতে থাকে, সেহেতু কেন্দ্রে জন্ম নেয় উত্তাপ, এই উত্তাপ ক্রমে বেড়ে চলে, এক পর্যায়ে কেন্দ্রের হাইড্রোজেন হিলিয়ামে রূপান্তরিত হতে শুরু করে। যে মুহূর্তে হাইড্রোজেন হিলিয়ামে

www.pathagar.com

রূপান্তরিত হতে শুরু করল— সে মুহূর্তে জন্ম হয়ে গেল একটি বিশালাকার পারমাণবিক চুল্লির। এই চুল্লি যখন তৈরী হয়ে পড়ল, তখন নক্ষত্রের জীবন প্রবাহিত হতে শুরু করল অন্যখাতে। এর

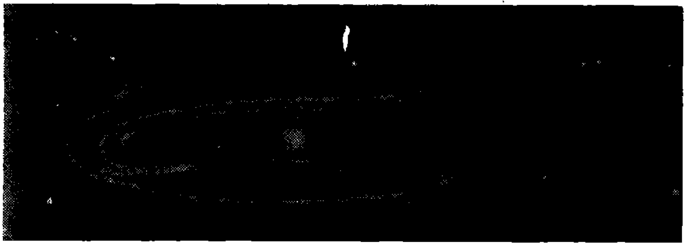

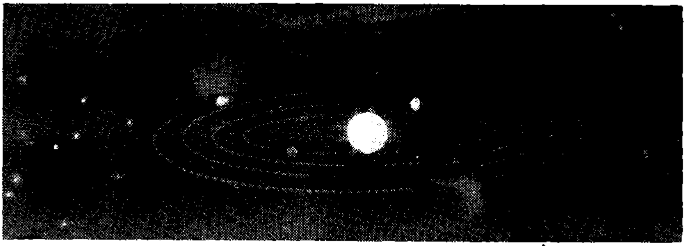

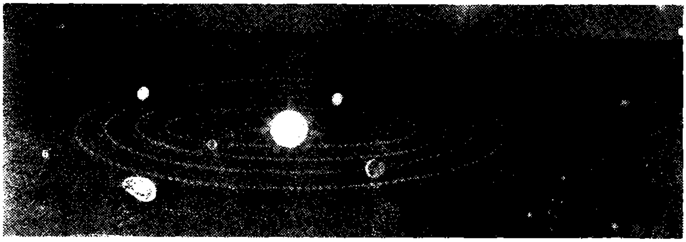

নিয়মিত করণের দ্বিতীয় চিত্রটি (৪১:১২) দেখানো হলো। সঠিক পদার্থ–ভর, স্থান ও কালের শাসনে অভিকর্ষ এক সময় একটি প্রটোষ্টারের জন্ম দিতে সক্ষম হয়। যখনই 'দুখান' পিণ্ডে নিউক্লিয়ার রিএকটার তৈরী হয়ে যায়— তখন অনিয়ন্ত্রিত অভিকর্ষ ঝড়ের তাণ্ডব একটি অতিশয় নিয়মিত ব্যবস্থায় প্রবাহিত হতে থাকে এবং অসীম শীতল অন্ধকারে জন্ম নেয় চক্ষুধাধানো আলো আর উষ্ণতা। ইহা একটি স্থায়ী দীর্ঘকাল। মনে রাখা দরকার, দানবগ্রহ বৃহস্পতির মতো বস্তুতে নিউক্লিয়ার রিএকটার নেই; ফলতঃ উহা আলোর বিকিরণ সৃষ্টি করতে সক্ষম নয়। বৃহস্পতির নিয়মিত করণের পর্যায়টি তাই দ্বিতীয় কাল–চিত্রটি পর্যন্ত প্রসারিত নয়— যদিও তা সূর্যের সঙ্গে সহ–অবস্থান করে। ২টি পর্যায়ে সপ্ত বা অসংখ্য আকাশকে নিয়মিত করার অর্থ ফলতঃ স্থান ও কালের প্রেক্ষাপটে পদার্থের গতি–প্রকৃতি ভিত্তিক; শুধু সময়েই তা সীমাবদ্ধ নয়।

www.pathagar.com

পূর্বে যা ছিল ধ্বংসের, এখন তা হলো সৃষ্টি ও ভারসাম্যের; হাইড্রোজেন বিগলনে হিলিয়াম তৈরী হবার কালে যে বিপুল তাপশক্তি নির্গত হতে শুরু করল— এই তাপশক্তিই বহিঃমুখী শক্তি প্রয়োগের দ্বারা অভিকর্ষের মুখে সমতা আনয়নের মাধ্যমে নক্ষত্রটির ভারসাম্য সৃষ্টি করল। মেইন সিকুয়েন্স নক্ষত্র যখন এমন একটি ভারসাম্য ব্যবস্থায় ঢুকে পড়ল— তখনই তার জন্য নিশ্চিত হয়ে পড়ল একটি দীর্ঘসূত্রী নিয়মতান্ত্রিক জীবন ব্যবস্থা। *"অতঃপর তিনি সপ্ত আকাশকে নিয়ন্ত্রিত করিলেন দুইটি কাল পর্যায়ে এবং প্রত্যেক আকাশকে তাঁহার বিধান ব্যক্ত করিলেন"*— প্রকারান্তরে আল্লাহ্ তা'য়ালা হয়তো এই মহাবিশ্বের অসংখ্য আকাশ তথা নীহারিকাকে অভিকর্ষ ও থার্মোনিউক্লিয়ার এই দুইটি পরিবেশে বা পদার্থের কাল–পর্যায়ে অসংখ্য সূর্যে পরিণত করলেন এবং সেগুলিকে নিয়মতান্ত্রিক করলেন অর্থাৎ আমরা আজ যে সৌর–ব্যবস্থার সাথে পরিচিত এমনি দীর্ঘকালীন জীবনের 'মীড–স্ট্রীম' নক্ষত্র–ব্যাবস্থায় ব্যবস্থিত করলেন। আর এই ব্যবস্থায় পৃথিবী যুক্ত করে জীবন লালন–পালনের জন্য উপযুক্ত করলেন। এই তথ্যটি তিনি আমাদের কাছে ৪১:১২ আয়াত দ্বারা পৌঁছে দিয়েছেন। সুধী পাঠক, কোরআনের বাণীতে যে ২টি কাল পর্যায়ের প্রস্তাব এসেছে, তা বৈজ্ঞানিক স্বতঃসিদ্ধতায় প্রতিষ্ঠিত ও নির্ভরযোগ্য সত্য। কারণ *"তাঁহার মহাবাণীই সত্য (৬:৭৪) উহারা কি সতর্কতার সঙ্গে কোরআনকে অনুধাবন করে না? আর যদি উহা আল্লাহ ভিন্ন অন্য কাহারো নিকট হইতে আসিত— তবে অবশ্যই উহাতে বহু অসঙ্গতি প্রত্যক্ষ করিত (৪:১৮)। ইহা মানুষের জন্য এক বার্তা যাহাতে ইহা দ্বারা উহারা সতর্ক হয় এবং জানিতে পারে যে, তিনিই একমাত্র উপাস্য, যাহাতে বোধশক্তিসম্পন্নরা উপদেশ গ্রহণ করিতে পারে" (১৪:৫২)।*

সুধী পাঠক, সাত আসমানের ব্যাখ্যায় Scientific Indications in the Holy Quran পুস্তকটি যে Seven regions এর যুক্তি এনেছে

www.pathagar.com

(পৃষ্ঠা–২৩) তা ৪১:১২ আয়াতের শর্ত পূরণে সুদৃঢ় নয় এবং পৃথিবী সৃষ্টি হবার সময়ে যে নিয়মিতকরণের দাবী কোরআনে প্রস্তাবিত হয়েছে তা ছিল পৃথিবী ও তার পরিবেশ সংক্রান্ত। অর্থাৎ কোরআন যে সাত আসমানের কথা বলেছে, তার প্রত্যেকটি কোনো না কোনোভাবে পৃথিবীর সাথে সংশ্লিষ্টতা রক্ষা করে— এমন আসমানসমূহ। ৫০ হাজার, ২ মিলিয়ন, ৭৫ মিলিয়ন কিংবা ২০ মহাপদ্ম আলোক বৎসরের পরিধি বা ব্যাপ্তি নিয়ে যে আসমানগুলি বিরাজ করার প্রস্তাব এই পুস্তক করেছে, তার একটিও পৃথিবীর সুখ দুঃখের সাথে সংশ্লিষ্ট হতে পারে না। কোরআনের আয়াতের দাবি সুস্পষ্ট— *"অনন্তর তিনি উহাকে* (আসমান) *ও পৃথিবীকে বলিলেন— তোমরা উভয়ে আস ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায়"* এবং পরের আয়াতে *"অতঃপর তিনি ২টি কালে সাত আসমানকে নিয়ন্ত্রিত করিলেন"।* এই দুই এর মাঝে আকাশ ও পৃথিবীর আপেক্ষিক ধারণাটি সুস্পষ্ট। এই প্রস্তাবগুলিতে আকাশ ও পৃথিবীকে সমগোত্রীয় ও সমসাময়িক পর্যায়ে দর্শন করা হয়েছে। কখনোই ২০ মহাপদ্ম বৎসর দূরের হারিয়ে যাওয়া গ্যালাক্সি বা কোয়াজারের সাথে এই প্রস্তাবের কোনো সঙ্গতি নেই— জোর করেও এ সঙ্গতি সৃষ্টির অবকাশ নেই। ৪১:১২ আয়াতে অসংখ্য (সাত) আসমান মূলতঃ অসংখ্য নীহারিকাদেরই ইঙ্গিতবহ যারা পরিণামে অসংখ্য সূর্য সৃষ্টি করে অসংখ্য পৃথিবীর লালনপালনের দ্বারা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের নিয়মকেই পালন করছে যদিও কোরআনের অন্যত্র অসংখ্য আকাশ বলতে অসংখ্য গ্যালাক্সিদের বুঝানো হয়— তবে তা ৪১:১২ আয়াতে প্রাসঙ্গিক নয়।

ছয়

আমাদের প্রকল্পটি ছিল পৃথিবী ও মহাবিশ্বের সৃষ্টির সময়ে কালের বিবেচনাগুলি বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত কিনা তা চুলচেরা বিশ্লেষণে বিচার করা। আমরা দেখতে পেলাম যে, এই পৃথিবী ২টি কাল পর্যায়ে সৃষ্টি হয়েছে— মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে ৪টি

www.pathagar.com

কাল পর্যায়ে (দ্রষ্টব্য 'ছয় দিবসের বিতর্ক ও মহা বিস্ফোরণ তথ্যের কোরানিক ব্যাখ্যা' মহাকাশ পর্ব-১) ; মহাবিশ্ব ও পৃথিবী সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন হয়েছিল পৃথক পৃথক ৪টি ও ২টি অর্থাৎ ৬টি কাল পর্যায়ের, যাদের একটি অপরটির দ্বারা প্রতিস্থাপিত বা মধ্যে অন্তর্ভুক্ত এই বিবেচনায় আনা যাবে না (দ্রষ্টব্যঃ মহাকাশ পর্ব-১)। আমরা এখন জেনেছি— বিজ্ঞান যে কালের ভাগ করতে শিখেছে বিংশ শতাব্দীর শেষ যোগ্যতায়, কোরআন তা করে রেখেছিল ১৫০০ বৎসর পূর্বে যখন এ ভাবনা কোনো মানুষের ছিল না। আমরা আরো দেখেছি— কোরআন পৃথিবীর ৪টি বৈজ্ঞানিক সময় বিভাজন বা জিয়োলজিক্যাল টাইমের প্রস্তাবও করে রেখেছে বিস্ময়করভাবে। জীবনময় গ্রহ সৃষ্টি ও তাদের প্রতিপালনকারী মেইন সিকুয়েন্স নক্ষত্রদের বিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ২টি কাল পর্যায়ের কথাও কোরআন আমাদেরকে আগাম জানিয়ে রেখেছে। কোরআনের প্রস্তাবিত এই কাল পর্যায়গুলির প্রত্যেকটি স্বাতন্ত্রে ও বৈশিষ্টে অন্যটি হতে পৃথক এবং কখনোই Scientific Indications in the Holy Quran পুস্তকের ৩৯৪অ পৃষ্ঠায় দেয়া মন্তব্যের অনুসারী নয়। 'These phases are to be counted as 2 and not as 4'— এ ধরণের মানবিক সীমাবদ্ধ চাপানো তথ্যের দায় কখনোই কোরআন বহন করেনা। কারণ কোরআন সবচাইতে 'স্মার্ট' যা হতে পারে তার চাইতেও অনেক অনেক বেশি 'স্মার্ট' হয়েই প্রকাশিত রয়েছে। কোরআনকে 'শুদ্ধ' করবার দুঃসাহস যেন আমরা না করি— আমরা দয়াময়ের কাছে করুণা ও পরিত্রাণ কামনা করি।

যে কাল পর্যায়ের বিভাজন চরিত্রের ভিত্তিতে বিজ্ঞান বাইবেলকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে, সেই কাল পর্যায়গুলির বিবেচনায় বিজ্ঞান আজ কোরআনকে শিরে ধারণ করবার অপেক্ষায়। সুধী পাঠক, সে দিন হয়তো বেশি দূরে নয়। *"অদৃশ্যের জ্ঞান শুধু আল্লাহরই। সুতরাং তোমরা প্রতীক্ষা কর এবং আমিও প্রতীক্ষা করিতেছি" (১০:২০)।*

আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন

www.pathagar.com

★ ৪১:৯-৪১:১২ আয়াতসমূহের সম্ভাব্য ব্যাখ্যা

৪১:৯ *"বল, তোমরা কি তাঁহাকে অস্বীকার করিবে যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন দুইটি সময়-পর্যায়ে এবং তোমরা তাঁহার সমকক্ষ দাঁড় করাইতে চাহ? তিনি তো জগৎসমূহের প্রতিপালক"*

ব্যাখ্যা ঃ এখানে পৃথিবী সৃষ্টির বিষয়টি প্রস্তাবিত হয়েছে خلق শব্দ দ্বারা যা ওজন, সূক্ষ্মতায় ও পরিমাপে একটি মৌলিক সৃষ্টির প্রস্তাব করে যা পূর্বে কখনো ছিল না।

এখানে সমকক্ষতার প্রশ্নটি এ জন্য এসেছে যে একটি পৃথিবী সৃষ্টি একটি মহাবিশ্ব সৃষ্টির চাইতে জটিল— অন্ততঃ একটি পৃথিবী সৃষ্টির জন্য একটি মহাবিশ্ব সৃষ্টি করতে হয়। এই সৃষ্টি কুশলতার দৃষ্টিকোণ হতে একমাত্র আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের তুলনা তিনি কেবল নিজেই। সৃষ্টিতে একটি Big Bang জাতীয় ব্যবস্থা ও একটি অনন্য মৌলিক-পদার্থ তৈরীর মহাজাগতিক ব্যবস্থা— এই দুই ব্যবস্থাকে সম্মিলিত না করে পৃথিবী তৈরী সম্ভব নয়; প্রতিপালন ব্যবস্থার জন্য এমনি পদ্ধতি প্রয়োজন যা একমাত্র জগৎসমূহের প্রতিপালকই সম্ভব করে তুলতে সক্ষম।

৪১:১০ *"তিনি স্থাপন করিয়াছেন অটল পর্বতমালা ভূ-পৃষ্ঠে এবং উহাতে রাখিয়াছেন কল্যাণ এবং চারটি সময় পর্যায়ে ব্যবস্থিত করিয়াছেন খাদ্যের সমভাবে যাচনাকারীদের জন্য"।*

ব্যাখ্যা ঃ এখানে جعل শব্দটির ব্যবহার ইতিমধ্যেই সৃষ্টি হয়ে থাকা কোনো অস্তিত্বের বিন্যস্ত (arranging) বা স্থাপন (instalation) ইত্যাদি জাতীয় ধারণা দেয় যা কোনো মৌলিক সৃষ্টির ইঙ্গিত দেয় না। এই আয়াতের চারটি সময়কাল Geological time Scale এর বিভাজনগুলির কথা বলে। এই চারটি সময় পৃথিবীতে রিযিক অর্থাৎ মানুষ ও অন্যান্য জীবের আহার্য, সুখ ও জীবনযাপনের জন্য যাবতীয় উপকরণ তৈরী এবং বংশধারাকে অব্যাহত করার যাবতীয় উপকরণ ও প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়। নীচে এই সময়ের বিভাজনটি দেয়া হলো। এটি শুধুমাত্র পৃথিবীতে

www.pathagar.com

আহার্য ও অন্যান্য উপকরণ ও সেবা সৃষ্টি সংক্রান্ত ; পৃথিবী নিজস্ব সৃষ্টি সম্পর্কিত নয় ঃ

সময়কাল (ERA)	সম্ভাব্য বয়স (মিলিয়ন বৎসর) (রেডিও–একটিভিটির ভিত্তিতে)	অনুকাল (Periods)	ব্যবস্থা (System)
প্রিক্যামব্রিয়েন Precambrian	৪৫০০ ৩৩০০	মিটিও রাইট ও সর্ব পুরাতন শিলা	এককোষী জীবন প্রাচীন বহুকোষী জীবন
পেলিওজয়িক Paleozoic	৬০০ — ২৮০	Cambrian Ordovician Silurian Devonian Mississippian Pennsylvanian Permian	প্রথম ক্ষুদে [illegible]দের জীবাশ্ম প্রথম কশেরুকা (vertebrate) সহ মৎস্যের জীবাশ্ম। প্রথম কীট–পতঙ্গ জীবাশ্ম প্রথম উভচর প্রথম সরীসৃপ
মেসোজয়িক Mesozoic	২৩০ — ১৩৫	Triassic Jurassic Cretaceous	ডাইনোসোর উড়ন্ত সরীসৃপ, পাখি ফুলসম্পন্ন উদ্ভিদ, ঘাস
সিনোজয়িক Cenozic	৬৩ — ১৩	Tertiary Pleistocene Recent	স্তন্যপায়ী মানুষ

৪১:১১ *"এতদ্ভিন্ন তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেন যাহা ছিল ধূম্রপুঞ্জময়। অনন্তর তিনি উহাকে এবং পৃথিবীকে বলিলেন— 'তোমরা উভয়ে আস ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায়।' উহারা বলিল, আমরা আসিলাম অনুগত হইয়া।"*

ব্যাখ্যাঃ এই আয়াত সৃষ্টিতে সৌর–ব্যবস্থাগুলি সৃষ্টির তথ্য দেয়। একটি সৌর ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় গ্যাসসমৃদ্ধ বিস্তৃতি ন্যূনতঃ ১/২ আলোক বৎসর ; এই বিশালতার ব্যাস হলো ৩৬৫ × ২৪ × ৬০ × ৬০ × ১৮৬০০০ ÷ ২ মাইল যা আকাশ নামকরণ পাবার দাবি রাখে।

www.pathagar.com

উল্লেখ্য যে এই আয়াতটির ব্যাখ্যা গ্যালাক্সি ও সৌর ব্যবস্থা তথা পৃথিবী সৃষ্টির বিষয়েও সমভাবে প্রসারিত হতে পারে। ইতিমধ্যে সৃষ্ট হয়ে থাকা বস্তুর ব্যবস্থিত চিত্রই এখানে ফুটে উঠে।

৪১:১২ *"অতঃপর তিনি দুই পর্যায়ে সপ্ত (অসংখ্য) আকাশকে ব্যবস্থিত করিলেন এবং প্রত্যেক আকাশে উহার বিধান ব্যক্ত করিলেন; এবং আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করিয়াছি প্রদীপমালা দ্বারা এবং উহাকে করিলাম সুরক্ষিত। ইহা পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহর নির্ধারিত ব্যবস্থাপনা।"*

ব্যাখ্যা ঃ قضهن শব্দটিতে ব্যবস্থিত করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। ৪১:১১ আয়াতটিতে প্রস্তাবিত আকাশটি হলো একটি এবং তার বিপরীতে পৃথিবীর তথ্য দেওয়া হয়েছে বিধায় ঐ আয়াতটি পৃথিবী সমেত সৌর ব্যবস্থার সৃষ্টিকে বোঝায়। কিন্তু ৪১:১২ আয়াতটি অনেকগুলি আকাশের (সপ্ত আকাশ) বক্তব্য পেশ করছে سبع السموات একটি সংখ্যাবাচক প্রস্তাব; আমরা সহজেই একে অসংখ্য আকাশ হিসাবে ধরে নিতে পারি। এখানে অসংখ্য আকাশের বিপরীতে প্রত্যেক আকাশে السماء كل বিধান ব্যক্ত করা কিংবা 'ওহি' প্রেরণ করার চিত্রে ধরে নেয়া যায় যে, 'প্রত্যেক আকাশ' বলতে নূন্যতঃ একটি সূর্য ব্যবস্থাকে বোঝানো হচ্ছে আর ব্যবস্থিকরণের চিত্রে السموات এর অবস্থান হলো একটি গ্যালাক্সির প্রেক্ষাপট যেখানে سبع السموات অনেক সংখ্যক গ্যালাক্সিকে ইঙ্গিত দিয়ে থাকতে পারে। এই আয়াতে ব্যবস্থিকরণের চিত্রটি এমন হতে পারে যে অগণিত গ্যালাক্সিতে অগণিত সূর্য-ব্যবস্থার ব্যবস্থিকরণ যা যুগপৎভাবে সংঘটিত হওয়া ঘটনারই সম্ভাব্য চিত্র। ২টি পর্যায়কাল মূলতঃ ২টি প্রাকৃতিক অবস্থার পরিমাপে ব্যাখ্যা করা যায়। এর একটি হলো গ্যালাক্সিদের পরিমণ্ডলে আদিকালে হাইড্রোজেন-হিলিয়ামের উপর অভিকর্ষের শাসন। এই শাসনটি গ্যালাক্সির নিজের অস্তিত্ব সুসংহত করা ও প্রতিটি স্বতন্ত্র নক্ষত্রের জন্মদানের জন্য মৌলিক পরিস্থিতি তৈরী করা পর্যন্ত প্রসারিত হতে পারে। এর অন্যটি হলো অভিকর্ষ কর্তৃক অনুকূল পরিবেশে নক্ষত্রদের কেন্দ্রে থার্মো নিউক্লিয়ার রিএকটর এর চালু এবং তদ্দ্বারা দৃশ্য মহাবিশ্বে পদার্থ, আলো, গতি ও আকর্ষণ ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণের পরিবেশ সৃষ্টি করা।

www.pathagar.com

এসটিরয়েড বেল্ট শয়তান ও নিকটবর্তী আকাশ

এক

"যে বিষয়ে উহাদের জ্ঞান নাই— তাহারা তাহা অস্বীকার করে।" (১০:৩৯)।

আমরা বিজ্ঞানের সুদীর্ঘ ধারাবাহিকতায় এ সত্যটি প্রত্যক্ষ করেছি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়— আজ থেকে প্রায় ৪০ বৎসর আগে ব্ল্যাকহোল থাকতে পারে এ বিষয়ে ভারতীয় বিজ্ঞানী শ্রী চন্দ্রশেখর প্রস্তাব পেশ করেছিলেন একটি সিম্পোজিয়ামে। এডিংটনের মতো একজন বড় বিজ্ঞানী হোহো করে হেসে তাকে পাগল আখ্যা দিয়েছিলেন। জগৎবাসী 'শয়তান' সম্পর্কে অবহিত রয়েছে— বিজ্ঞান তাকে প্রামাণিক অবস্থানে এনে দাঁড় করাতে সক্ষম নয়। এমতাবস্থায় বিজ্ঞান বিষয়টিকে কেবল অস্বীকারই করতে পারে।

বিশ্বাসের শর্তহীনতার উপাদানটিকে বাদ দিলে আমরা জানি না শয়তান আছে কিংবা নেই। শয়তানকে অস্বীকার করা ঈমানের বিপরীতে, যে কোনো বিশ্বাসীকে তা শর্তহীনভাবে বিশ্বাস করতে হবে। অন্ততঃপক্ষে যে কোনো বিজ্ঞান দ্রষ্টার কাছে এই শয়তানের অবস্থানটি সন্দেহের সীমানা ছাড়িয়ে নয়। এই সন্দেহটি আরো অধিকতর ঘনীভূত হয় যখন শয়তান উর্ধ্বলোকের তথ্য শুনতে চেষ্টা করলে তাকে অগ্নিময় উল্কার 'মিসাইল' দ্বারা বিতাড়ন করার ধারণা প্রস্তাব করা হয় কিংবা

www.pathagar.com

বলা হয়— আকাশ বা পৃথিবীকে প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তান হতে 'হেফাজত' করা হয়। কোরআনের অনেক অনেক আয়াত আজ অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ও জ্ঞানের আলোকে সত্য ও একমাত্র সত্য হিসাবে উন্মোচিত হয়েছে। আমরা দেখতে পেয়েছি— নির্ভুল বিজ্ঞানময়তায় কোরআন এমন অনেক গুরুতর তথ্য প্রায় দেড় হাজার বছর আগে মুদ্রিত করে রেখেছিল, যা কেবল ক্রমে ক্রমে উন্মোচিত হতে শুরু করেছে। আমরা আরো দেখেছি কোরআনের কতিপয় স্থানে এমন অনেক দুর্বোধ্য আয়াতের অবতারণা ঘটেছে, আমাদের আজকের জ্ঞান ও বিজ্ঞতায় এদের কোনো ব্যাখ্যা জানা নেই।

আমরা অন্ততঃ সন্দেহাতীতভাবেই বলতে পারি যে, জ্ঞানার্জনের শেষ সীমান্তে যেহেতু উপস্থিত হবার সনদ আমাদের হাতে নেই, সেহেতু যে বিষয়টি আমরা প্রমাণ করতে সমর্থ নই, অথচ যা একটি বিশ্বাসের বিস্তৃতি নিয়ে বিরাজমান, সেই বিষয়টিকে ঢালাওভাবে অস্বীকার করা যৌক্তিকতা বিবর্জিত। হয়তো হতেও পারে যে আজকে আমরা পদার্থবিদ্যার সাথে যেখানে অধিবিদ্যার (Metaphysics) কোনো সম্পর্ক স্থাপন করতে সমর্থ নই— সেখানে হয়ত বা আগামী দিনগুলিতে এই দুই শাখা পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক হিসাবে কাজ করবে। সে ক্ষেত্রে আশা করা যায় যে আজকে 'শয়তান'কে যেখানে আমরা পদার্থবিজ্ঞানের জ্ঞাত আইনকানুনে ব্যাখ্যা করতে সমর্থ নই— সেদিন হয়তো বা তার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা মিলবে। আমরা যা প্রস্তাব করতে চাই, তা হলো যে, একজন পদার্থবিদ যেন আজকের প্রেক্ষাপটে 'শয়তানের' অবস্থানটিকে ব্যাখ্যাশূন্যতার কারণে একবারে বাতিল না করে দেন। হয়তো বা সে ক্ষেত্রে বিজ্ঞানী এডিংটন যেমন ব্ল্যাকহোল নিয়ে লজ্জিত হয়েছেন— তেমনি তাকেও একইভাবে লজ্জিত হতে পারে।

আমি শুধু ধর্মীয় কারণে শয়তানকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছি, বিষয়টি এমন নয়। ডাইমেনশন জগতে এক একটি সংযোগে এক

www.pathagar.com

একটি অনন্ত বিস্তৃতি যোগ করে দেয়। মনে করুন, আমরা এমন জগতের মানুষ যেখানে কেবল দুটি ডাইমেনশন কার্যক্ষম অবস্থায় বিরাজ করে। অর্থাৎ এই জগতে কেবল দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ এই ডাইমেনশন দুটি ছাড়া অন্য কোনো ডাইমেনশন বিরাজ করে না। ফলতঃ আমাদের মতো জীবন এই জগতে কখনো সম্ভব হতো না। সমস্ত জীবের (আদৌ যদি থাকত) চেহারা কেবল একটা মুদ্রিত ছবির মত হতে পারত। এই জগতে কোনো প্রাণীর বংশবিস্তার, প্রেম ও আনন্দ বলে কিছুই বিরাজ করতে পারত না। যেই মাত্র এই জগতের সাথে আর একটি ডাইমেনশন যোগ করা গেল— ঠিক তখনই এই জগতে নদী, পর্বত, সমুদ্র, বৃক্ষ, ও সকল জড় পদার্থের উদ্ভব সম্ভব হলো। কিন্তু শুধুমাত্র এই তিনটি ডাইমেনশনের সৃষ্টরা এক অদ্ভুত দশায় পতিত হবে। শুধুমাত্র তিনটি ডাইমেনশনে কোনো প্রকার জীবের অস্তিত্ব সৃষ্টি করা সম্ভব হবে না। কিংবা হলেও তার জন্মের পরপরই তা স্থির ও স্থবির হয়ে পড়বে, কারণ যতক্ষণ না তাদের সাথে সময়ের ডাইমেনশন যোগ না দেয়া হবে— ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের মধ্যে জন্ম, মৃত্যু, হ্রাস, বৃদ্ধি, আশা, সুখ, উপভোগ, স্থায়িত্ব ইত্যাদি অসংখ্য অতি জরুরী বিবেচনাগুলিকে কার্যক্ষম করা সম্ভব হবে না। আমরা দেখতে পাই, এক একটি ডাইমেনশন এক একটি মহাবিস্তৃতিকে সৃষ্টিতে বিরাজ করার সুযোগ দেয়। এক একটি ডাইমেনশন এক একটি মহাজগৎকে আড়াল করে রাখে।

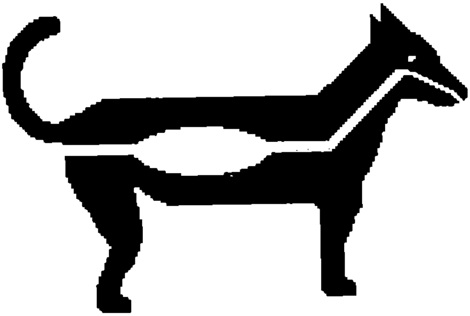

দুই ডাইমেনশনাল জীব। দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে তার অস্তিত্ব কেবল ছবির মতো। খাদ্যনালী ও রেচন ব্যবস্থা এমন জীবকে দুই টুকরা করে ফেলে। ফলতঃ এমন জীব কখনো অস্তিত্বে বিরাজ করতে পারে না।

www.pathagar.com

তিন ডাইমেনশনের জীব ও পদার্থ। এদের দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও ভেদ রয়েছে। এরা অস্তিত্বে বিরাজ করতে সক্ষম— তবে কখনো জীবন্ত অবস্থায় থাকতে পারে না ও বংশধারা সৃষ্টি করতে সক্ষম নয়।

দৈর্ঘ্য × প্রস্থ × ভেদ এর সঙ্গে যখনই চতুর্থ ডাইমেনশন অর্থাৎ সময় যুক্ত হয়, তখন সৃষ্টি হয় মহাবিশ্ব, জীবন ও বংশধারা। সময়ের ডাইমেনশনটি মহাবিশ্বকে আকারে অসীম করে দিয়েছে। সময়ের এই ডাইমেনশন মহাবিশ্বের স্থানকে আমাদের দৃষ্টি ও বোধশক্তি হতে আড়াল করে রাখে।

ঘুরিয়ে বললে বলা যায়, সময়ের ডাইমেনশন আমাদের নিকট হতে এই মহাবিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলকে আড়াল করে রেখেছে। উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি যে, আমরা রাতের আকাশে প্রায় ৬ হাজার নক্ষত্র খালি চোখে দেখতে পাই। টেলিস্কোপ দিয়ে আরো

www.pathagar.com

গভীরে এবং আরো অনেক দূরে আমরা লক্ষ লক্ষ যোজন দূরত্বের জগৎ–মহাজগৎকে দীপ্ত আলোকে দেদীপ্যমান ও সৃষ্টিতে অস্তিত্বের স্বাক্ষর হয়ে বিরাজ করতে দেখি। প্রকৃতপক্ষে আমরা কেবল অতীতকেই দর্শন করি। হয়তো এই দৃশ্যমান তারকা কিংবা দৃশ্যমান জগতের অনেকই আজ হতে লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্বে অস্তিত্ব হতে মুছে গেছে। এখানে যে ঘটনাটি ঘটেছে তা হলো যে, সময় আমাদের এই অঞ্চলের দর্শকের নিকট মহাবিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের ঘটনা ও বাস্তবকে আড়াল করে রেখে দিয়েছে। আমরা বলতে পারি— সময় আমাদের মহাবিশ্বকে স্থানের দিকে অনন্যভাবে প্রসারিত করে দিয়েছে। অর্থাৎ প্রতিটি ডাইমেনশন জুড়ে দেয়ার সাথে সাথে সৃষ্টির ধারণ–পরিধি অপ্রত্যাশিতভাবে বৃদ্ধি পেয়ে যায়।

গুরুতর কোনো সংবাদ না হলেও ফলাফল অবশ্যই গুরুতর, এমন একটি তথ্য হলো যে— অনেক নিম্নশ্রেণীর কীটপতঙ্গরা তাদের দৃষ্টিতে বস্তুর আকৃতিকে কেবলমাত্র দুটি ডাইমেনশনে প্রত্যক্ষ করে; তারা যা দেখে সব ছবির মতো দেখে। এবং তারা সময়ের অতি প্রয়োজনীয় ডাইমেনশনটি সম্পর্কে মোটেই সচেতন নয়। এই নিম্নশ্রেণীর কীটপতঙ্গদের কোনো পদার্থ বিজ্ঞানী (যদি থেকে থাকে) সময়ের ডাইমেনশনকে কেবল অস্বীকারই করবে না, তারা একটি সম্প্রসারণশীল মহাবিশ্বের কোনো সম্ভাবনা কোনোখানেই দেখতে সক্ষম হবে না। তাদের দর্শনের এই সীমাবদ্ধতা মহাবিশ্বের বিশালতাকে মিথ্যা পর্যবসিত করবে।

শয়তানের প্রসঙ্গটি এমনি কোনো 'ডাইমেনশনাল হাইড আউটে'র জগতের জ্ঞান কিনা আমরা জানি না। বলা দরকার, বিজ্ঞানীগণ আজ সুদৃঢ় প্রত্যয়ে সৃষ্টিতে আরো একটি নয়— মোট দশটি ডাইমেনশনের কথা বলে যাচ্ছেন। তাদের ধারণা, এই ডাইমেনশনগুলি নিজেদের মধ্যে অন্তর্মুখী ভাঁজে এবং জটিল পদার্থবিদ্যার নিয়মকানুন সৃষ্টি করে বিরাজমান। এরা ঘটনা, স্থান,

www.pathagar.com

কাল, পদার্থ ও তার দর্শককে আমাদের দৃষ্টি হতে আড়াল করে রাখতে সমর্থ। এমনি কোনো 'ডাইমেনশনাল ট্রিকের' জগতে শয়তান (এবং ফেরেস্তাও) বিরাজ করার কোনো প্রস্তাব যদি করা হয়, তাকে আমরা গ্রহণ করতে দ্বিধাগ্রস্ত হতে পারি বটে— কিন্তু তাকে অস্বীকার করার কোনো অধিকারও কিন্তু আমরা রাখি না।

দুই

আকাশে একটি পাথরের স্তূপ রয়েছে— এই স্তূপ হতে প্রতিনিয়ত পাথর নিক্ষিপ্ত হয় চতুর্দিকে এবং এই নিক্ষেপণের সাথে জগৎবাসীর কল্যাণ-অকল্যাণের একটি বিবেচনা বিসংশ্লিষ্ট রয়েছে— এই তথ্য কোরআনে মুদ্রিত হয়েছিল খ্রীষ্টীয় সাত শতকে। আজ

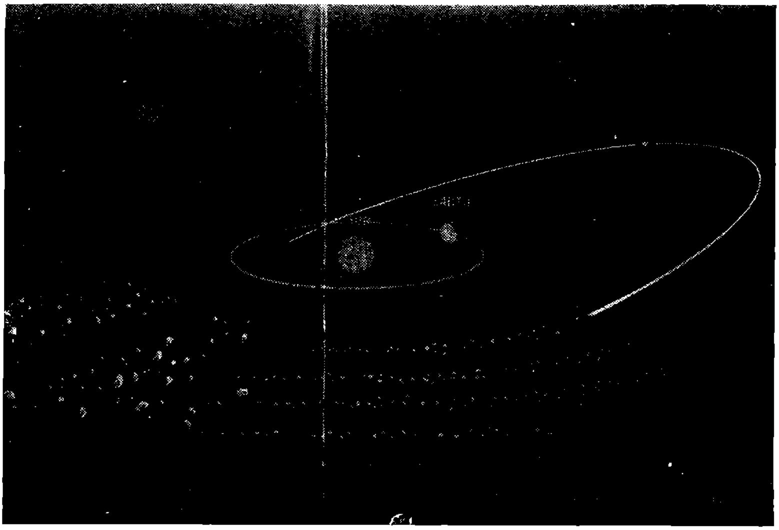

আকাশে শূন্যতার সমুদ্রে ভাসমান পাথর। মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্য বলয়ে প্রদর্শিত এসটিরয়েড ও মিটিওরিট বেল্টের খণ্ডচিত্র। এরাই হলো 'রুজুমান' যাদের তথ্য কেবলমাত্র ১৯ শতকে এসে বিজ্ঞান জানতে পেরেছে। খ্রীষ্টীয় সাত শতকে কোরআন এদের কথা মুদ্রিত করে রেখেছিল বিস্ময়কর শুদ্ধতায়!

www.pathagar.com

বিজ্ঞান প্রত্যক্ষ করেছে যে মঙ্গল ও বৃহস্পতির মাঝখানে রয়েছে এক সুবিশাল পাথরের বেল্ট— একটি ভাসমান পাথরের স্তূপ; আর এই স্তূপ নিয়ে বিজ্ঞানীরাও আজ শঙ্কিত, কখন জানি বড় কোনো একটি অভিশপ্ত পাথর পৃথিবীর বুকে আঘাত হানে। কোরআনে প্রভু সৃষ্টদের অনিষ্টে নিয়োজিত শয়তানের বাক্য বিবৃতিতে এই পাথর স্তূপের আসন্ন বিপদসংকুলতার তথ্য মানুষকে অবহিত করেছেন— *"আমরা জানি না, জগৎবাসীর সর্বনাশই অভিপ্রেত— না তাহাদিগের প্রভু তাহাদের (মানুষ) মঙ্গল চাহেন না" (৭২:১০)।* জ্ঞানী পাঠকের জন্য বিনীতভাবে বলছি, এই আকাশই একদিন এই পৃথিবীর সমূল সর্বনাশের কারণ হবার অপেক্ষায়। তার সরঞ্জাম সৃষ্টিগতভাবেই তৈরী হয়ে রয়েছে আকাশের এক নিকটবর্তী অঞ্চলে। আর তারই সংবাদ জ্ঞাপন করছে কোরআন অত্যন্ত সঠিক মাত্রায়। তথ্যের এই

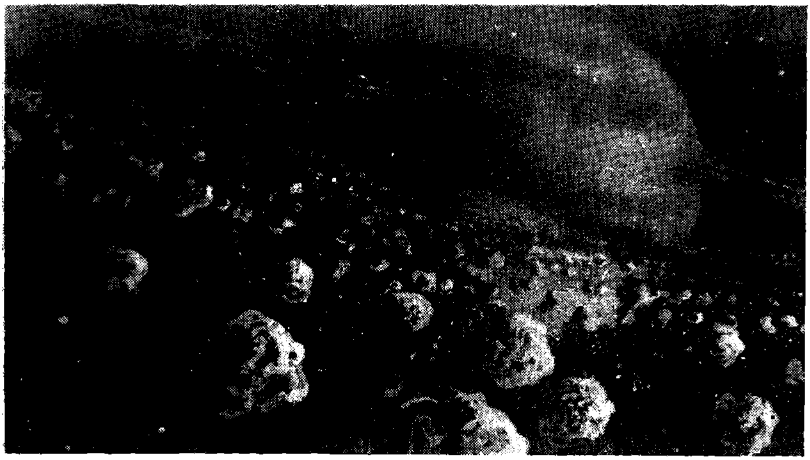

শনির চারপাশেও রয়েছে ভাসমান পাথরের একটি বেল্ট— সেখান হতে নিক্ষিপ্ত পাথরও কালে পৃথিবীর ধ্বংসের কারণ হতে পারে।

সঠিকতা কোরআনের স্বতঃসিদ্ধতার একটি বহিঃপ্রকাশ হলেও আমাদের অনুভব ও জ্ঞানকে তা সত্য সন্ধানে সাহায্য করে বিধায়

www.pathagar.com

আমরা এই পাঠে আরো একটি অন্বয় ও বিরোধের বাস্তবতার মুখোমুখি হতে চাই।

উল্লিখিত ৭২:১০ আয়াতটির দিকে আবার ফিরে যাচ্ছি। *"জগৎবাসীর সর্বনাশই অভিপ্রেত না তাহাদের প্রভু তাহাদিগের মঙ্গল চাহেন না"*— বাক্যটির যে দুটি অংশ রয়েছে, তার প্রত্যেকটি সমার্থক কিংবা একই তথ্য প্রকাশের সাথে বিসংশ্লিষ্ট। জগৎবাসীর কোনো না কোনো অমঙ্গল আর সর্বনাশের একটি বিবেচনা এমনভাবে আয়াতটিতে ভবিতব্য হয়ে ফুটে উঠেছে যে— জগৎবাসীর যেন এই পরিণতি হতে পরিত্রাণ নেই। পৃথিবীর ধ্বংস বা কিয়ামত বিষয়ক অধ্যায়টিতে আমরা বিশ্লেষণ দেবার চেষ্টা করেছি যে— পৃথিবী কোনো না কোনো বড় ধরনের পাথুরে আঘাতের ভয়ঙ্কর হুমকির মুখোমুখি। এমন উদাহরণ আমাদের সহোদর একটি গ্রহে সাম্প্রতিক কালের ঘটনা হতে পেয়ে যাই। সুমেকার লেভী–৯ এর ২১টি পাথর বৃহস্পতির উপর নিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে প্রায় আড়াই কোটি মেগাটন টিএনটি'র ধ্বংসযজ্ঞে। ৬৫০ কোটি বছর পূর্বে পৃথিবীতে একবার প্রায় দশ কিলোমিটার ব্যাসের একটি ঝুলন্ত–পাথর আঘাত করে এক মহাধ্বংসের সূত্রপাত করেছিল। ডাইনোসোরদের মৃত্যু হয়েছিল সে আঘাতেই। আজ আমরা জানি— বৃহস্পতি ও মঙ্গলের মাঝে ঝাঁকে ঝাঁকে ঝুলন্ত–পাথর–দল সদা সন্তরণ অবস্থায় বিদ্যমান। তারা প্রত্যেকেই পৃথিবীবাসীর জন্য এক একটি অমঙ্গলের উৎকণ্ঠা। Rick Gore এর ভাষায়— It's invitable, say Scientists : Earth will once again be hit by an asteroid large enough to cause mass extinctions, as probably happened 65 million years ago, when dinosaurs vanished.

কোরআন নিকটবর্তী আকাশের একটি প্রস্তাব এনেছে ৪১:১২ ও ৩৭:৬ আয়াতের দ্বারা। এই দুটি আয়াত বিবেচনা করলে আমরা পাই مصابيح – كوكب (যথাক্রমে প্রদীপ ও 'কাওকিব') উভয়ে প্রায় সমার্থক ভাব প্রকাশ করে। দুনিয়ার আকাশ যে নিঃসন্দেহে পৃথিবীর উপরিতল হতে কাওকিব সমৃদ্ধ এলাকা পর্যন্ত বিস্তৃত, তাতে আমাদের কোনো সন্দেহ করার উপায় থাকে না। আমরা বলতে পারি আকাশের ঐ অংশ

www.pathagar.com

যা দুনিয়াকে دنيا স্পর্শ করে, তার নামই নিকটবর্তী আকাশ। এই আকাশে আলোক দানকারী প্রদীপতুল্য সূর্য ও উজ্জ্বল চাঁদের সাথে অন্যান্য গ্রহদেরকে কাওকিব অর্থে বুঝে নিতে আমাদের সমস্যা হয় না।

আমরা যখন ৩৭:৭ আয়াতে চোখ ফিরাই— তখন 'রক্ষা করা'র একটি প্রস্তাব প্রত্যক্ষ করি। কে কাকে কি হতে রক্ষা করবে, এই প্রশ্নের জবাবে দেখতে পাই যে— নিম্ন আকাশ বা দুনিয়ার আকাশকে সুরক্ষিত করার তথ্যটি ৪১:১২ আয়াতে ব্যক্ত করা হয়েছে। এই ভাবটি আরো জোরদার হয় ২১:৩২ আয়াত ও অনুরূপ আরো আয়াতে যেখানে প্রস্তাব করা হয়েছে যে আকাশকে নির্মাণ করা হয়েছে একটি সুরক্ষিত ছাদ হিসাবে। খ্রীষ্টীয় সাত শতকের এই প্রস্তাবটি আশ্চর্যজনকভাবে বিজ্ঞানের সাথে পরিপূর্ণভাবে সঙ্গতিপূর্ণ। দুনিয়ার আকাশকে সুরক্ষিত ছাদের মতো করা না হলে সূর্য হতে আগত সৌর-ঝঞ্ঝা পৃথিবীর উপর এতটা উত্তাপ আর ঝড়ের ধ্বংস হানত যে কখনোই কোনো সংগঠনের জীবনের অস্তিত্ব রক্ষা করা পৃথিবীর পক্ষে সম্ভব হতো না। শুধু তা-ই নয়, মঙ্গল ও বৃহস্পতি মধ্য এসটিরয়েড ও মিটিওরের বেল্ট হতে প্রতি চব্বিশ ঘন্টায় কমবেশি ৩০ লক্ষ উল্কাপতনের তথ্যটি পৃথিবীবাসীর জন্য কখনো সুখকর হতো না। এই উল্কাপাত পৃথিবীর চেহারা পাল্টিয়ে দিত। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের পুরো স্তরটি বিভিন্ন মাত্রা-গভীরতায় ভিন্ন ভিন্ন প্রতিরোধ ব্যবস্থা সুদৃঢ়ভাবে সৃষ্টি করে রেখেছে বলে কোনো পতনশীল আকাশীয় বস্তু সরাসরি পৃথিবীকে আঘাত করতে পারে না। শুধু তা-ই নয়— পৃথিবীর উপরে সুবিস্তীর্ণ আকাশীয়মণ্ডল জুড়ে এই বায়ুমণ্ডলের অপ্রতিরোধ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থার সঠিক কার্যক্ষমতা প্রতিক্ষণ একটি 'সুদৃঢ় ছাদের' মতো বজায় না থাকলে এই গ্রহে কখনই জীবনের এত গৌরবময় বিকাশ সম্ভব হতো না। সুরক্ষার গুণাগুণে নিকটবর্তী আকাশ একটি ছাদ হয়ে তার নীচে এক অদৃশ্য নিরাপত্তার বিধান সৃষ্টি ও প্রতিপালন করেছে আর জীবনের প্রবাহকে নিশ্চিত করেছে।

আমরা জানি না ৩৭:৭ কিংবা ৬৭:৫ আয়াতে প্রস্তাবিত 'শয়তানের' সৌরজগতের কোন অবস্থানে কিংবা পৃথিবীর উপর কর্তৃত্ব

www.pathagar.com

আছে কিনা কিংবা শয়তানের কার্যকলাপ পৃথিবী কিংবা নিকটবর্তী আকাশের কোনো অঞ্চলে কোনোরূপ ক্ষতিসাধন করতে সক্ষম কিনা। নাকি শয়তান শব্দের সঠিক সংজ্ঞা আমাদের জানা নেই বিধায় আমরা মৌলিক তথ্যটি এখনো পাবার অপেক্ষায়। কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্যজনকভাবে ৬৭:৫ আয়াতে رجوما শব্দটি অর্থের দিক হতে ঝুলন্ত পাথরের স্তূপের সঠিক নির্দেশ জ্ঞাপক। শব্দটির আরও কিছু কিছু অর্থ এই ঝুলন্ত পাথরের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। যেমন— Projectile, what is thrown, stoning, curse ইত্যাদি। এই رجوما শব্দটি যে এসটিরয়েড বেল্টের সন্ধান দেয় এবং একই সঙ্গে এই স্তূপ–অঞ্চল হতে যে পৃথিবীর জন্য অভিশাপ নেমে আসতে পারে— তার তথ্য সুস্পষ্টভাবে আমরা পেয়ে যাই। কিন্তু বিপত্তিকর বিষয়টি হলো— শয়তান। অনেকগুলি আয়াতে শয়তানের বিরুদ্ধে উল্কার মিসাইল ছুড়ে অব্যাহত শাস্তি দানের প্রস্তাব এসেছে। প্রস্তাব এসেছে শয়তান ও তার অনুসারীরা উর্ধ্ব জগতের তথ্য শুনে ফেললে তাদের বিরুদ্ধে প্রজ্জ্বলিত উল্কাপিণ্ড ধাবিত হয়। এই জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ডগুলি যেন নির্দেশ দিয়ে রাখা একটি প্রোগ্রামকৃত ব্যবস্থা যা শয়তানের পশ্চাতে ধাবমান হবে। প্রকৃতপক্ষে আমি এই অঞ্চলের প্রস্তাবকে কোনো বৈজ্ঞানিক তথ্য–চিত্রের সাথে মিলাতে গিয়ে বার বার ব্যর্থ হয়েছি। আমরা যে বিজ্ঞানের সাথে পরিচিত, সে বিজ্ঞান শয়তান বা devil sprit এর প্রতি কোনো উৎসাহ পোষণ করে না। এসটিরয়েড বেল্ট হতে বিচ্যুত পাথর নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষ কিংবা অস্থির অভিকর্ষ পরিস্থিতিতেই কেবল বাহির হয়ে এদিক ওদিক উৎক্ষিপ্ত হয়। এই উৎক্ষেপণ আদৌ শয়তান সম্পর্কিত কিনা তার পক্ষে কিংবা বিপক্ষে রায় দেবার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যের নিশ্চয়তা আমাদের জানা নেই।

তিন

৬৭:৫, ৭২:৯–১০; ৩৭:৭—৩৭:১০ এবং আরো আয়াতে শয়তানের সাথে ঝুলন্ত পাথরের যে সম্পর্ক পাওয়া যায়, তা হলো শয়তান(রা) যখন উর্ধ্ব জগতের তথ্য আহরণ করতে উদ্যত হয়— তখন তাদের প্রতি বিতাড়নের হাতিয়ার এই অগ্নিযুক্ত পাথর নিক্ষিপ্ত

www.pathagar.com

হয়ে থাকে। যদিও বিজ্ঞানে বর্তমান তথ্যপুঞ্জীর যে মজুদ রয়েছে, তার আলোকে এই শয়তান ও জ্বলন্ত পাথর নিক্ষেপণের সম্পর্কটির গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা তৈরী করা যায় না। তথাপিও অদূর ভবিষ্যতে হয়তো বিজ্ঞানের ভাবনা পরিবর্তন হতেও পারে। হয়তো শয়তানের আজকের ব্যাখ্যা–পরিস্থিতির পার্থক্য হতে পারে। শয়তানের অস্তিত্ব ইসলামে গুরুত্বপূর্ণ। হজ্ব পালনের সময়ও শয়তানের প্রতি কংকর নিক্ষেপ করতে হয়। ইসলাম তথা কোরআন শয়তানের প্রতি ঘৃণার আচরণের নির্দেশ দেয়। তারই সাথে একটি সম্পর্কিত ঘটনা হিসাবে মহাজাগতিক প্রক্রিয়ায় পাথর নিক্ষেপণের তথ্যটি একটি সংশ্লিষ্টতা বহন করে। কিন্তু শয়তানের 'অবস্থান' প্রাকৃতিক নিয়মকানুনের দ্বারা ব্যাখ্যাযোগ্য নয় বিধায় বিজ্ঞান মননে তা প্রশ্নের অবতারণা করে, যেমন প্রশ্নটি এসে থাকে খোদ স্রষ্টার বেলাতেও। অতএব শয়তানের অস্তিত্ব সম্পর্কিত প্রশ্ন ও তার বিতাড়নের জন্য পাথর নিক্ষেপের যৌক্তিকতা— উভয়ই অভিন্নভাবে সমান। সুতরাং, আমরা আমাদের সীমিত জ্ঞানে এর ব্যাখ্যা পেতে কসরত করতে রাজি নই এই জন্য যে আমরা সঠিক উত্তরের চাইতে ভ্রান্তটিকেই বড় করে গ্রহণ করে ফেলতে পারি।

কিন্তু শয়তানের বিবেচনাটি ছেড়ে দিলে আমরা আয়াতগুলিতে যে তথ্য পাই, তার সার হলো যে, আকাশে ঝুলন্ত পাথরের স্তূপ রয়েছে— আর সেগুলি নিক্ষেপণের সঙ্গে পৃথিবীর নিরাপত্তার একটি প্রশ্ন বিজড়িত। আশ্চর্যজনকভাবে এ তথ্যটি বাস্তবের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। কিন্তু তার চাইতেও বেশি তাৎপর্যপূর্ণ দিকটি হলো যে সাত শতকের মানবীয় জ্ঞানে আকাশে ঝুলন্ত পাথরের স্তূপের সন্ধান যেমন একটি অত্যন্ত আশ্চর্যজনক তথ্য— তেমনি এক অতিশয় আশ্চর্যজনক তথ্যসূত্র হলো যে পৃথিবীর জন্য সুরক্ষিত ও নিরাপত্তামূলক আকাশের প্রস্তাব, যা ছাদস্বরূপ এবং তার চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনাটি হলো যে এই নিরাপত্তার ব্যবস্থাটিকে রক্ষা করার বিষয়ে স্রষ্টার বিশেষ প্রস্তুতিও ব্যবস্থাপনার তথ্যটি। ৩৭:৭ আয়াতে

www.pathagar.com

এবং আরো বেশ কয়েকটি আয়াতে নিকটবর্তী আকাশকে 'বিদ্রোহী শয়তান' হতে হেফাজত বা নিরাপদ করার দাবি রয়েছে।

পূর্বেই বলেছি— শয়তানের বিবেচনাটি বাদ দিয়ে শুধু প্রস্তাবটিকে গ্রহণ করলে এটি এক গুরুতর তথ্য হয়ে দাঁড়ায়। জগৎ বিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কে মোটামুটি জ্ঞান রাখেন এমন কোনো ব্যক্তি অবশ্যই স্বীকার করবেন যে, পৃথিবীর তল হতে শুরু করে নিকটবর্তী অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত আকাশটি কি অভাবনীয় ক্ষমতায় অতি নাজুক ভারসাম্য পরিস্থিতিতে এই পৃথিবীর জীবন ব্যবস্থাকে প্রতিনিয়ত ও প্রতিটি মুহূর্তে রক্ষা করে চলেছে। এই ব্যবস্থাটি বায়বীয় পদার্থে তৈরী, এর সাথে সম্পর্কিত রয়েছে অতি ক্ষুদ্র গ্যাস অণুদের ধর্ম ও দুর্বোধ্য বল অভিকর্ষ ; সংশ্লিষ্ট রয়েছে পৃথিবীর আকৃতি এবং ভর, চন্দ্র, সূর্য ও এদের ভর, দূরত্ব, তেজ, গতি, সমুদ্র ও তার প্রসার ইত্যাদি হাজার বিষয়। এদের কোনো একটিতে সামান্য পার্থক্য কিংবা পরিবর্তন চলে এলে জীবন আর পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে সক্ষম হবে না। সৃষ্টিতে প্রতি মুহূর্তে প্রতিটি ভুল সংশোধনের জন্য রয়েছে এক সুবিস্তীর্ণ বিধিদত্ত ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থাগুলি ধরে রাখার কাজ, ভুল ও বিচ্যুতিগুলির সংশোধনের কাজ, দুর্ঘটনাজনিত কারণে ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি হলে তা পুনঃভারসাম্যে প্রতিষ্ঠিত করার কাজ আমাদেরকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে— এই নিকটবর্তী আকাশকে 'রক্ষা' করা হচ্ছে— রক্ষা করতে হয় প্রতিটি ক্ষণে যেমনভাবে কোরআন বলে যায়— *"প্রতিক্ষণই তিনি সৃষ্টির নিয়ন্ত্রণে সুপ্রতিষ্ঠিত" (৫৫:২৯)।* মহাবিশ্বের আর কোথাও না হোক— অন্ততঃ পৃথিবীতে জীবনময় পরিস্থিতি বজায় রাখার কাজটি প্রতিক্ষণের যত্নবান রক্ষণাবেক্ষণের মুখাপেক্ষি। ভূ-পৃষ্ঠে কিংবা সৌরমণ্ডলে অথবা মহাজাগতিক অঙ্গনের হাজার পরিবর্তন প্রতিদিনই ভারসাম্য ব্যবস্থাকে ব্যাহত করে। অন্যদিকে ভারসাম্য পরিস্থিতি অতি সূক্ষ্মমাত্রায় বজায় না থাকলে কোনোদিনও জীবনকে ধরে রাখা সম্ভব নয়। আমরা যে ভারসাম্য পরিস্থিতির কথা বলছি— তা মূলতঃ নিকটবর্তী আকাশেরই

www.pathagar.com

ভারসাম্য পরিস্থিতি (পৃথিবীর আবাসযোগ্যতা, মহাকাশ পর্ব-১ দ্রষ্টব্য)। একে রক্ষা করার প্রয়োজন হয়। আমরা জানি না, *"নিকটবর্তী আকাশকে রক্ষা করিয়াছি প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তান হইতে" (৩৭:৭)* এই বক্তব্যটিই এই আয়াতে প্রতিভাত হয়েছে, নাকি এমন কোনো তথ্য যা সময়ের পরিমাপে বোধগম্য হবার জন্য আমরা এখনো উপযুক্ত হইনি।

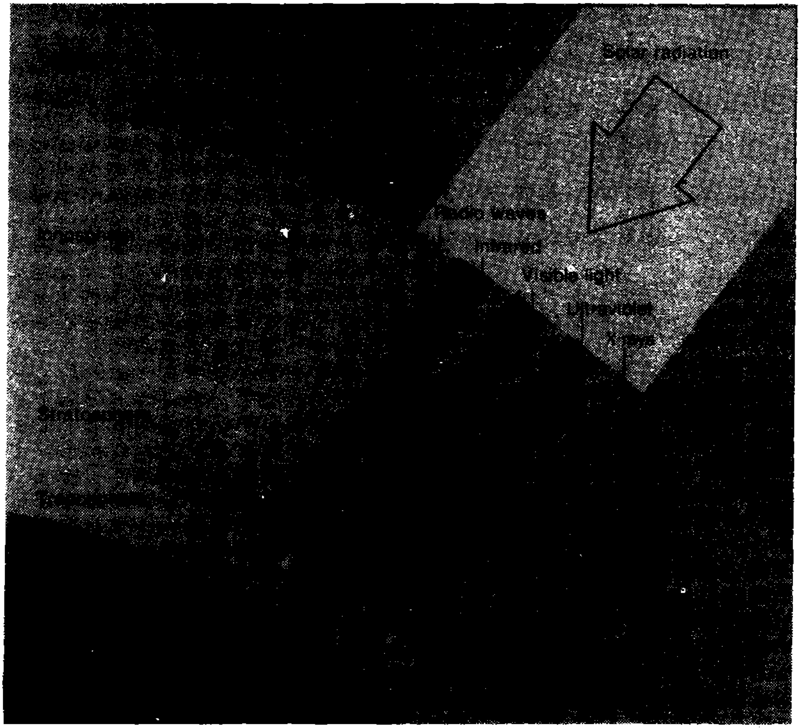

বায়ুমণ্ডলীয় অদৃশ্য অথচ অতি দৃঢ় ছাদ। ক্ষতিকর বিকিরণ ছেঁকে কেবল যা উপকারী সে সব রশ্মিকে প্রবেশ করতে দেয়। X-ray আয়নোস্ফিয়ারে, আলট্রাভায়োলেট স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে, মাত্রাতিরিক্ত অবলোহিত রশ্মি ট্রপোস্ফিয়ারে বিশোষিত হয়ে যায়। শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় রশ্মিরাই প্রতিপালন ব্যবস্থায় বিস্ময়করভাবে পৃথিবী পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। অন্যদিকে 'সোলার উইণ্ড' এবং লক্ষ লক্ষ উল্কাপতনের হাত হতে নিরাপদ রাখার জন্য এই অদৃশ্য ছাদই প্রতিরোধ্যতায় অটল। একমাত্র কোরআনই এই সুদৃঢ় অদৃশ্য ছাদের কথা বলে রেখেছিল বিজ্ঞান তাকে খুঁজে পাবার দেড় হাজার বছর পূর্বে।

www.pathagar.com

আমি শয়তান الشيطن শব্দটিকে কোরআনের বিভিন্ন স্থানে ব্যবহৃত হবার ক্ষেত্র-পরিস্থিতিতে বিশ্লেষণ করে দেখেছি যে এর অর্থের দুটি শাখা থাকে— একটি নিশ্চিতভাবে ইবলিশকে (এবং তার অনুগামী জীনকে) নির্দেশ করে যার বিষয়ে কোনোরূপ দ্বিমতের অবকাশ হয় না। অন্য শাখাটি হলো شيطن শব্দটির মূল شطن এর বিশ্লেষণ হতে প্রাপ্ত অর্থকরণ দ্বারা। যেহেতু شيطان শব্দটি হলো شطن ক্রিয়ার সম্পাদক (যা কর্তা বা কর্ম হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে), ফলতঃ ক্রিয়ামূল হতে যে ভাবার্থ প্রকাশ পায়— আমরা তার পথ ধরে এগিয়ে গিয়ে একটি বিশ্লেষণের প্রয়াস নিতে পারি। এই বিশ্লেষণটির প্রস্তাব হলো যে— প্রচলিত 'শয়তান' অর্থের বিবেচনা বাদ দিয়ে শাব্দিক অর্থে যা বোঝা যায়, তার মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ থাকা। شيطن মূলটির যে কয়টি অর্থ করা হয় তা হলো— oppose another to turn him from his purpose, bind, travel to, be far distance ইত্যাদি।

এই অর্থগুলির প্রতি দৃষ্টি রেখে আমাদের সুযোগ থাকে ৩৭:৭ আয়াতটির প্রচলিত প্রস্তাবকে একটু ঘুরিয়ে পড়ার— *"আমি নিকটবর্তী আকাশকে কাওকাবদের আলোক-সুষমায় সুশোভিত করিয়াছি (৩৭:৬) এবং হেফাজত করিয়াছি যেন কোনো ক্ষেত্রে তার উদ্দেশ্য/কর্তব্য/লক্ষ্য/দায়িত্ব পালন হতে বিচ্যুত হয়ে স্রষ্টার আদেশ অমান্যকারীদের অন্তর্ভুক্ত না হয়" (৩৭:৭)।* সঙ্গত কারণেই আমি উপরোল্লিখিত অর্থকরণের স্বপক্ষে যথেষ্ট জোরালো মনোভাব পোষণ করার দাবি করতে পারি না, তবে পরবর্তী গবেষকগণকে ও জ্ঞানীগুণীজনকে কেবল ভাবনার একটি সূত্র মেলে ধরার প্রয়াস করছি মাত্র।

আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আ'লামীন।

www.pathagar.com

ডেথ-টানেল

এক

মৃত্যু কি জীবনের অনুপস্থিতি— নাকি একটি আলাদা সত্ত্বা, অস্তিত্ব কিংবা সৃষ্টি? সন্দেহ নেই, একটি বিস্ময়কর প্রশ্ন— তবু আমাদের কাছে এ নিয়ে ভাবার একটি সূত্র রয়েছে। পবিত্র কোরআনের আয়াতের রেশ ধরে জনৈক বুদ্ধিজীবী এবং দেশবরেণ্য ব্যক্তি আমাকে কোরআনের ভুল ধরিয়ে দেবার ছলে প্রসঙ্গটি এনে বললেন যে ৬৭:২ আয়াতে মৃত্যু ও জীবনকে দুটি পৃথক সৃষ্টি হিসাবে বলা হয়েছে। তার ভাষায়, কোরআনের যে সব ভুলের দায় রয়েছে, তাদের মধ্যে এই আয়াতটি হলো একটি।

আজকের এই প্রবন্ধটি তার জন্য ও তৎশ্রেণীর বিশ্বাসীগণের জন্য। আমরা আলোচনার গভীরে যাবার আগে কোরআনের সে আয়াতের বক্তব্য পেশ করতে চাই ঃ

"যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন মৃত্যু ও জীবন, তোমাদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য কে তোমাদিগের মধ্যে কর্মে উত্তম। তিনি পরাক্রমশালী"।

বুদ্ধিজীবীর যুক্তি— জীবনের প্রত্যাখ্যানই হলো মৃত্যু। কিংবা জীবনের অনুপস্থিতিই মৃত্যু। মৃত্যু অর্থ জীবনহীনতা। তার অকাট্য

www.pathagar.com

যুক্তির প্রতিটি শব্দ আর অনুভব যেন কোরআনকে লাঞ্ছিত করার দুর্দম পূর্বপ্রস্তুতি আর প্রেষণায় পূর্ণ। শুধু বুদ্ধিজীবী জানেননি যে তিনি যা বলেছেন, যুক্তি ও প্রমাণের নিকট-দূরত্বে এটি একটি গ্রহণযোগ্য জ্ঞান। নিকটের পরপ্রান্তে যে দূর রয়েছে— তার বিস্তৃতি অসীম পর্যন্ত প্রসারিত হতে পারে। বুদ্ধিজীবী মহোদয় বিশ্বের অনেক বরেণ্য পণ্ডিতের উদ্ধৃতি দান করলেন। অথচ তিনি জানেন না যে এই পৃথিবীতে পণ্ডিত বলতে কেউ নেই। কোনো বিষয়ের জ্ঞানের বিস্তৃতিকে যদি রেখাচিত্রে আঁকা হয়, তবে এই রেখাচিত্রের দৈর্ঘ্য বিস্তৃতি হবে অসীম। কোনো পণ্ডিত এই অসীম পর্যন্ত বিস্তৃত জ্ঞান-রেখার মাত্র অত্যল্প অংশকে আলোকিত করতে পারেন তার জ্ঞানের প্রভায়— তার এই আলোচিত অংশের বাইরে প্রসারিত মহাবিস্তৃতি জুড়ে যে অন্ধকার— সবটার বিষয়েই ঐ পণ্ডিতজন অজ্ঞ, একজন মানুষের মতোই অজ্ঞ। আমি দাবি জানালাম— পৃথিবীতে পণ্ডিত বলতে কেউ নেই। তিনি মনঃক্ষুণ্ন হলেন। যুক্তি ও তর্কে আমাদের মূল আলোচনা— মৃত্যু কোনো মৌলিক সৃষ্টি কিনা, এই প্রসঙ্গটি মাটিচাপা পড়ে গেল। অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য যে এদেশের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীদের একটা বড় অংশই মনে করেন এই মহাবিশ্বের কিংবা বিশাল সৃষ্টির পেছনে কোনো স্রষ্টার প্রয়োজন নেই। আর যদিও থেকে থাকেন— তবে তা অন্ততঃ কোরআনের প্রভু 'আল্লাহ' এই সৃষ্টির স্রষ্টা নন। আর যদি বা তিনিই সে সত্য স্রষ্টা হন তথাপিও এই ধর্মকে নিয়ে টুপি পরিধানকারীগণের গোঁড়ামির কারণে তারা এ ধর্মের আঙ্গিনা মাড়াতেও প্রস্তুত নন। আর এই অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয়েছে আমাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কমনরুমে একদিন বসার সুবাদে। বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সব বরেণ্য ব্যক্তিবর্গ না-স্রষ্টায় বিশ্বাসী, তাদের এ ভাবনার পেছনে কিছু যুক্তিও রয়েছে। সারা পৃথিবীময় স্রষ্টা নেই— এই বিশ্বাসটির বাজার বেশি, কারণ ব্যক্তিপর্যায়ে একদিকে এর প্রবক্তাগণ প্রসিদ্ধি লাভ করেন, আবার এর আর্থিক সুযোগ-সুবিধার দিকটাও বেশ ভাল। স্রষ্টা আছেন, এ সত্যটি গ্রহণ করলে স্রষ্টার-বাদ ও তাঁর বক্তব্যই মুখ্য হয়ে যায়,

www.pathagar.com

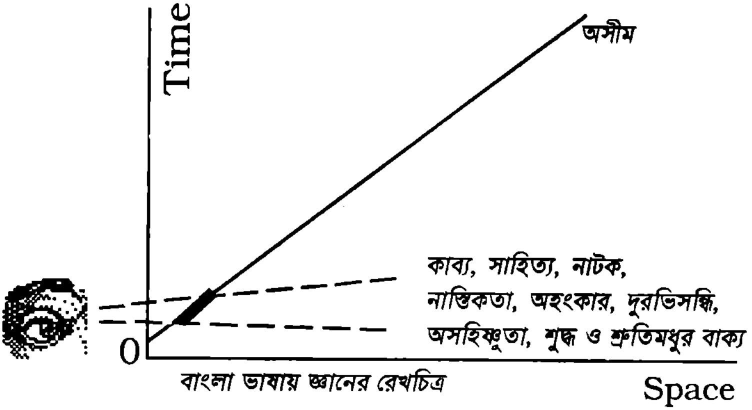

বাংলা ভাষায় জ্ঞানের রেখচিত্র

বুদ্ধি ব্যবসায়ী জীবের জ্ঞানমাত্রা গ্রাফ। এই জীবরা নিজদেরকে পণ্ডিত মনে করতে পছন্দ করেন। কোরআন সত্য নয় এবং বিশ্বসংসারের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন নহেন, এ চিন্তাটি তাদেরকে বেশ পরিতৃপ্ত করে। তারা জন্ম নেন মুসলমানের ঘরে, কপালে ধারণ করতে চান 'ওঁম' চিত্র (অবশ্য বিশেষ কাউকে খুশি করার জন্য), সন্ধা বেলায় তুলসী গাছে নমস্কার– এ হলো তাদের সাংস্কৃতিক তুষ্টি! সচরাচর তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, অতএব, নিজদেরকে তারা বিশ্বের শিক্ষকই মনে করেন। কোরআনে ২০০ ভুল আছে, এমন তথ্যও তাদের কাছে আছে বলে দাবি করেন কেউ। এই স্বঘোষিত বুদ্ধিজীবীরা জানেন কি যে তারা কত কিছু জানেন না? উপরের রেখচিত্রটিতে একজন বুদ্ধিজীবী তার নিজ কৃতি–ভূমি বাংলা ভাষায় মাত্র প্রদর্শিত আলোকিত অংশের (মোটাদাগ) জন্য জ্ঞানী। বাংলা ভাষার বুদ্ধিমাত্রার গ্রাফ অসীম পর্যন্ত বিস্তৃত। এই আলোকিত অংশ ব্যতিরেকে তিনি বাকি অসীম অঞ্চলের জ্ঞানের প্রশ্নে নিজ শাখাতেই একজন নিরেট অজ্ঞ লোকের মতোই অজ্ঞ। পৃথিবীতে অসংখ্য বুদ্ধিজীবী থাকতে পারে, তবে পণ্ডিত বলতে কেউ নেই— এ গ্রাফটি তা–ই বলে।

বুদ্ধির ব্যবসা করে যাদের জীবন ধারণ করতে হয়— সে ব্যবসায় মন্দা পড়ে। অন্যদিকে স্রষ্টা নেই, এবং অধিকতর সুনির্দিষ্টভাবে 'কোরআন মিথ্যা বা ভ্রান্ত'— এইরূপ কোনো ধারণার বীজ বপন করলে বড় অংকের টাকার মুখ দেখা যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক— জ্ঞানের শেষ সীমান্তচারী। অতএব বুদ্ধির জোরেই বুদ্ধিজীবী, আর এ বুদ্ধির বলেই কোরআনকে হেয় প্রতিপন্ন করে কেউ কেউ অর্থ রোজগারে উৎসাহী হন। লাভটা হলো এই— দু' একটা কবিতার বই কিংবা একটা চাকরি (যা কেবল পকেট খরচ যোগাতে সক্ষম) নির্ভর

www.pathagar.com

হলেও দেশের অভিজাত এলাকায় বাড়ি করে বসবাসে তাদের অসুবিধা হয় না। মৃত্যুর পরে পুনরুত্থান এ কথাটি সত্য হয়ে পড়লে হস্ত-পদ-চক্ষু-জিহ্বায় বাঁধন পড়ে যায়, বুদ্ধিজীবী আর বুদ্ধিনির্ভর হয়ে থাকার সুযোগ থাকে না। এই একটি অসুবিধাকে পাড়ি দেবার জন্য সরাসরি অস্বীকার করার চাইতে বড় কিছু তাদের জানা নেই। কিন্তু তারা নিজেরাও বিশ্বাস করেন— নিয়মের এই সংসারে শেষ পরিণতি নিয়মের মধ্যেই সমাপ্ত হতে বাধ্য। কৃতকর্ম তাদের প্রকৃত বিশ্বাসের বিপরীতে অবস্থান নেয়। তাদের জন্য অবশিষ্ট থাকে হতাশা আর ভয়। ফলতঃ সুবুদ্ধিহীন বুদ্ধিব্যবসায়ী নাস্তিক বুদ্ধিজীবীরা শুষ্ক মরুময় হতাশ ও প্রেষণাহীন জীবন কাটান। আমাদের দেশে এই হতাশাবাদীরা শেষ পর্যন্ত "কোরআন সত্য নয়"— এই প্রকল্পে সর্বাত্মক সক্রিয় হয়ে পড়েছেন। এই প্রামাণিক প্রকল্পের জন্য যে সব হাতিয়ার তারা ব্যবহার করতে চান, তার একটি হলো বর্ণিত ৬৭:২ আয়াতের প্রস্তাব। এই বিতর্কটি বুদ্ধিজীবী সাহেব আমার ঘাড়ে জোর করেই চাপিয়ে দিলেন। সুধীপাঠক, চলুন আমরা আলোচনার প্রয়োজনে একটু অন্যদিকে দৃষ্টি ফিরাই।

দুই

যিনিই স্রষ্টা হয়ে থাকুন, তাঁর অসাধারণ গুণের একটি হলো যে তিনি তার সৃষ্ট নিয়মকে পরিপূর্ণভাবে মেনে চলেন। সৃষ্টিতে সৃষ্টিকর্তার চাইতে বড় সুশৃঙ্খল ও নিয়মানুবর্তী আর অন্য কেউ নেই। এই মন্তব্যের বিপরীতে কোনো সুধীজন হয়তো প্রমাণ চাইতে পারেন। প্রাথমিকভাবে স্রষ্টা নেই— এই প্রমাণ চাওয়ারও প্রয়োজন হয় না, কারণ একটি সৃষ্টি-ব্যবস্থাকে আমরা প্রতিনিয়তই প্রত্যক্ষ করে যাচ্ছি। এই সৃষ্টি-ব্যবস্থাই হলো স্রষ্টার বর্তমান থাকার সবচাইতে বড় স্বাক্ষর। অন্যদিকে স্রষ্টা রয়েছেন, এ বিষয়টিও প্রমাণের অসাধ্য। কোনো গণিত বা কোনো সূত্রই স্রষ্টা রয়েছেন এবং কোথায় কিভাবে অবস্থান করছেন, এ সম্পর্কে তথ্য প্রদান করতে

www.pathagar.com

সক্ষম নয়। পরিস্থিতির এই অনন্যধর্মী পক্ষপাতহীনতা এক মহাবিস্তার স্রষ্টার সন্ধান দিয়ে যায়। স্রষ্টা যদি থাকেনই— তবে জ্ঞাত আইনকানুনের আলোকে সুদৃঢ়ভাবেই একজন অতি মহান নিয়মানুবর্তী ও কর্তব্যপরায়ন স্রষ্টাকে আমরা খুঁজে পাই। ধৈর্যের বিপরীতে অবস্থান নিয়ে স্রষ্টা তাঁর বিরুদ্ধাচরণকারীদের উপর সহসা ধ্বংস পাঠিয়ে দেন না কিংবা খুব ভাল কাজের পুরস্কার হিসাবে তাৎক্ষণিকভাবে পুরস্কৃত করেন না। তিনি তাঁর পছন্দ-অপছন্দ ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রের জন্যই তাঁরই সৃষ্ট নিয়মকে ভঙ্গ করেন না। স্রষ্টার এই অনন্যধর্মী নিয়মানুবর্তিতা জীবের মৃত্যুর ক্ষেত্রে একটু বিশেষভাবে প্রবাহিত— আমরা বিষয়টির উপর এখনই আলোকপাত করব।

পদার্থের ভিত্তি প্রোটনের আয়ুস্কাল 10^{31} বৎসর; অর্থাৎ দশ হাজার কোটি কোটি কোটি কোটি বৎসর! পদার্থের এই ধ্বংস দর্শনের জন্য স্রষ্টাকে এতগুলি বৎসর পর্যন্ত অপেক্ষা করে বসে থাকতে হবে যা কোনোভাবেই উৎসাহব্যাঞ্জক নয়। যদি পদার্থের মৃত্যু বা ধ্বংস ঘটানোর কোনো পরিকল্পনাকে স্রষ্টা হাতে নিতে চান, তবে এ ক্ষেত্রে তিনি বড় নিরুপায় হয়ে পড়তেন। ফলতঃ সৃষ্টির নিয়ন্ত্রণ স্রষ্টার নিকট হতে খানিকটা হলেও বেহাত হয়ে পড়ত। সম্ভবতঃ স্রষ্টা এ জিনিসটিও বিবেচনা করে রেখেছেন। তাই সৃষ্টিতে আমরা এন্টিপ্রোটনের অস্তিত্ব দেখতে পাই। একটি প্রোটনের আয়ুস্কাল যত দীর্ঘতরই হোক— একটি প্রতি-প্রোটনের সংস্পর্শে এসে তা মুহূর্তের শত সহস্র ভাগের কোনো ভাগ সময়েই নিঃশেষ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। সৃষ্টিতে অতি দীর্ঘকাল-বিজয়ী পদার্থের ধ্বংস রচনার জন্য সৃষ্টিতে এন্টিমেটার এবং এন্টিমেটার ইউনিভার্স রচিত হয়ে রয়েছে যা মূলতঃ প্রাণহীন পদার্থেরও মৃত্যুর শর্তকে পূরণ করে।

জীবন সৃষ্টির উপকরণে মূলতঃ সর্বত্রই পদার্থের ছড়াছড়ি যা শাশ্বতভাবেই মিলিয়ন মিলিয়ন বৎসর বিজয়ী প্রোটনে সমৃদ্ধ।

www.pathagar.com

তাত্ত্বিকভাবে এখানে প্রশ্ন চলে আসে— জীবন এত অল্পে ফুরিয়ে যায় কেন? পদার্থের অতি দীর্ঘসূত্রী জীবনকাল হওয়া সত্ত্বেও একই পদার্থে তৈরী জীবনের মৃত্যু এত স্বল্পকালীন সময়ে ঘটে যায়— যা একটি বিস্ময়কর ব্যাপার! সুধী পাঠক, এটি একটি গুরুতর প্রসঙ্গ হিসাবেই মনে রাখবেন। এখানে একটি বিরাজমান সমস্যা হলো যে পদার্থবিদ্যা বিষয়ক আইনকানুন বা তথ্য যত দুর্লঙ্ঘভাবে মৃত্যুর উপস্থিতিটিকে বিচার বিশ্লেষণ করুক, আমরা দেখতে অভ্যস্ত হয়েছি যে মানুষ সাধারণভাবে ৫০, ৬০, ৭০, ৮০, ১০০ ইত্যাদি দৈর্ঘ্যের বয়সগুলি পার হয়ে মৃত্যুবরণ করে এবং একই গতিতে অন্যান্য জীবজন্তু নির্দিষ্ট বয়সের পরিসমাপ্তিতে মৃত্যুর কূলবর্তী হয়। আমরা এ প্রক্রিয়াটিকেই স্বাভাবিক বলে ধরে নিয়েছি। প্রকৃতপক্ষে স্বাভাবিক নিয়মকানুনের চাইতে ভিন্ন এই 'মৃত্যু' সত্যিই আমাদের সুচিন্তার দাবি রাখে।

জড়তা বা inertia দ্বারা পরিচালিত এই মহাবিশ্বব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য এই যে, গতিশীল বস্তু চিরদিনই গতিশীল থাকবে (শূন্য পরিবেশে)। এই ব্যবস্থার শাসনে আমাদের মাতৃ–পৃথিবীও লক্ষ কোটি বৎসর ধরে সূর্যের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করে বেড়াচ্ছে। এই কাজ পৃথিবী তার সম্পূর্ণ ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত সৃষ্টিগতভাবে করে যাবার জন্য বাধ্য। গতিজড়তার মতোই যে প্রাণ একবার সৃষ্টি হয়েছে— তার শুধু দীর্ঘ হতে মহাদীর্ঘকাল পর্যন্ত মৃত্যুহীনভাবে বেঁচে থাকাই ছিল স্বাভাবিকতা। এর পেছনে যুক্তি এনে দাঁড় করানো যায় যে— Law of conservation of mass/energy, যেখানে দেখা যায়— পদার্থের বিনাশ নেই, শক্তিরও নেই। জীবন একটি শক্তি এবং জীব একটি পদার্থ। উভয়ের মধ্যে জীবের স্থূল দেহের যে ভর তার ধ্বংস হয় না। দেহটি শুধু পদার্থের একটি বিন্যাস হতে অন্য বিন্যাসে রূপ পরিগ্রহ করে। জীবদেহ Law of conservation of mass মেনে চলে। কিন্তু এই দেহস্থ প্রাণ কি সৃষ্টির এই নিয়ম মানে? অর্থাৎ প্রাণের কি ধ্বংস বা মৃত্যু আছে? পদার্থের আয়ুস্কাল, Inertia কিংবা

www.pathagar.com

Law of conservation of mass এর বৈশিষ্ট্য দেখে মনে হয়— জীবন দীর্ঘ হতে দীর্ঘদিন বেঁচে থাকাটাই হতো স্বাভাবিক। কিন্তু বাস্তব চিত্রটি কি আমরা জানি। অর্থাৎ স্বাভাবিকতার বিপরীতে গিয়ে প্রাণ অল্পেই মৃত্যুর কূলবর্তী হয়। পদার্থের ধ্বংসের জন্য আমরা এন্টিমেটার তৈরী হয়ে থাকতে দেখি। মৃত্যুর বিষয়ে আমরা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি? আমরা বেশি জটিলতায় না গিয়ে সহজে এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে মৃত্যু হয়ত সৃষ্টির আর সব নিয়মকানুনের মতই একটি পূর্বে প্রস্তুত preordained কোনো ব্যবস্থাপনায় ব্যবস্থিত হয়ে চলছে।

তিন

মৃত্যু যে একটি পূর্বেই তৈরী হয়ে থাকা ব্যবস্থায় ব্যবস্থিত হয়ে প্রকৃতির সাধারণ নিয়মের বিপরীতে গিয়ে অন্য একটি স্বাভাবিকতা সৃষ্টি করেছে তার কিছুটা আমরা জীবদের বিভিন্ন সময়ের স্বাভাবিক মৃত্যু বিন্যাস দেখে আঁচ করতে পারি। একটি কচ্ছপ বা কুমিরের স্বাভাবিক আয়ুষ্কাল ৫০০ বৎসর, একটি কুকুর, ছাগল, পাখি কিংবা যে উদাহরণই আনা হোক— আমরা দেখতে পাই যে পারিপার্শ্বিক অন্যান্য উৎপাদককে নিয়ন্ত্রণে রাখলে প্রতিটি প্রজাতি একটি সুনির্দিষ্ট বয়সের পরিমাপে মৃত্যুনীত হয়। এই সময়ের বিন্যাস হতে অন্ততঃ এটুকু পাই যে, মৃত্যু পাত্র ও প্রজাতি বিশেষে সুশৃঙ্খল নিয়মনীতির কাঠামোধীন রয়েছে। অর্থাৎ জীবনের শূন্যতা বা জীবনের অবর্তমানও যদি মৃত্যুর সংজ্ঞা মনে করা হয়— তথাপিও গ্রহণ করতে হয় যে, প্রতিটি প্রজাতির জন্য যেন এটি একটি তৈরী করে রাখা ব্যবস্থাপনারই বহিঃপ্রকাশ। পূর্বেই বলেছি, পদার্থের আয়ুষ্কাল, মহাবিশ্বে জড়তার (Inertia) শাসন ও Law of conservation of matter ইত্যাদির আলোকে অন্ততঃপক্ষে আমাদের এ দাবিটুকু বিচার্য হবার জন্য গ্রহণীয় হতে পারে যে— জীবন একটি অবিনাশী গতিতে চলমান অস্তিত্ব; অন্যান্যদের মতো এটিও হয় অতি

www.pathagar.com

দীর্ঘজীবী কিংবা অবিনাশী হবার কথা ছিল। এ দাবির কারণ যে পদার্থের পাওয়ার হাউসে ব্যবস্থিত সব এটমিক পার্টিকেলের ইলেক্ট্রন আপার /লোয়ার স্টেজ-এ অবস্থানের আদান-প্রদান হতে অতিক্ষুদ্র পদার্থে আমরা শক্তির ভাণ্ডারকে অনাদিকাল হতে বিলয়কাল পর্যন্ত ব্যবস্থিত বলে আশা করতে পারি। এই অবস্থানের আদান-প্রদানটিই হলো পদার্থের শক্তি বা প্রাণ। এইটুকু ছাড়া পদার্থ কখনই কোনো কাজে আসত না এবং আজকের এই পরিচিত ভুবন আমাদের দেখার সুযোগ সৃষ্টি হতো না। একইভাবে মহাবিশ্বে এক অজ্ঞাত ও অপরিমেয় সূক্ষ্মতায় ব্যবস্থিত রয়েছে মহাজাগতিক প্রাণশক্তি— তা হলো এক পদার্থের অন্য পদার্থ কেন্দ্রিক ঘূর্ণন যা মহাজাগতিক ব্যবস্থাটি সচল বা জীবন্ত রাখে। আমরা অতিক্ষুদ্র এটম হতে অতিবৃহৎ মহাজাগতিক যে কোনো বস্তু বিস্তারের কথাই বিবেচনা করি না কেন, প্রতিটি ব্যবস্থাই একটি বিশেষ ধরনের 'জীবনময়' ব্যবস্থার শাসনে চলমান— এবং এদের প্রতিটিরই সময়সূত্রীতা অতি সুবিশাল ও অতি দীর্ঘতর। অতি দীর্ঘতর ব্যবস্থায় শাসিত জীবের 'জীবন' কোনো কারণে আদৌ মৃত্যু দ্বারা নিঃশেষ হয়ে যাবে, কিংবা এত দ্রুত কেন তার পরিসমাপ্তি ঘটবে— তা সৃষ্টির অন্যান্য আইনের তুল্যে বিস্ময়কর! আমরা গভীরভাবে বিচার করলে দেখব যে স্বাভাবিকতার গতি রোধ করে মৃত্যু হলো একটি স্বাভাবিকতা লঙ্ঘনকারী অস্তিত্ব মাত্র যা অহরহ আমাদের চারপাশে ঘটছে বলে কেবল খুব স্বাভাবিক মনে হলেও মূলতঃ এটি একটি ব্যতিক্রম। আমরা পদার্থের স্থায়িত্ব এবং এটম হতে গ্যালাক্সি পর্যন্ত প্রতিটি চলমান ব্যবস্থায় যে শক্তিময় জীবনের স্পন্দন দেখতে পাই— এদের পরিবেশে জীবের জীবনকে সঙ্গত কারণেই পদার্থের মতোই মহাদীর্ঘ ও কালবিজয়ী ভাবার সূত্র খুঁজে পাই। সেই সূত্রেই ভাবা যায় যে, নিশ্চিতভাবে কোনো নির্ধারিত ও পূর্বে প্রস্তুতকৃত ব্যবস্থায় জীবনের দীর্ঘসূত্রীতা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। সে দৃষ্টিকোণ হতে বলা সঙ্গত যে, মৃত্যু কখনই জীবনের অনুপস্থিতি নয়, মৃত্যু হলো জীবনকে প্রতিরোধকারী একটি ব্যবস্থা যা সৃষ্টিতে এঁটে দেয়া হয়েছে। এই

www.pathagar.com

ব্যবস্থাটি অবর্তমান থাকলে হয়তো জীবন বর্তমান থাকতে পারত অসীম–বিস্তৃত কাল পর্যন্ত।

চার

এই পৃথিবী প্রতিনিয়ত যে সব বিধিবদ্ধ আইনের দ্বারা শাসিত হচ্ছে সে সকল প্রাকৃতিক আইনকানুনের উৎস হলো সূর্য। সূর্য শাসিত হচ্ছে গ্যালাক্সি ছায়াপথের দ্বারা আর এই ছায়াপথ শাসিত হচ্ছে লোকালগ্রুপের প্রভাব বলয়ে থেকে যা পরিণামে অধিকতর বড় গুচ্ছ গ্যালাক্সি ও শেষ পর্যন্ত মহাবিশ্বের দিকে হিসাবের ধারাটিকে টেনে নেয়।

মহাবিশ্বের পরিবেশে বিশাল সমুদ্রবেলায় হারিয়ে যাওয়া কৈশিক বালু রেণুর চাইতেও নগণ্যতার তুল্যমাপে লজ্জিত আমাদের পৃথিবীর শুরু মহাবিশ্বের শাশ্বত বৈরী পরিবেশের মধ্য দিয়ে এবং এর শেষও রচনা রয়েছে তার মাঝেই। মধ্যখানে এই পৃথিবী একটি জীবনময়তার স্বর্ণাভ সম্ভার নিয়ে গর্বিত এক অনন্য সাধারণ আবাসস্থল যেখানে প্রাণের সঞ্চার ঘটেছে। প্রাণ হলো মহাবিশ্বের সবচাইতে কীর্তিময় সৃষ্টি যার সম্পর্কে মানবিক জ্ঞান আজ পর্যন্ত যেটুকু অর্জিত হয়েছে— শেষ পর্যন্ত ততটুকুতেই সীমাবদ্ধ থাকবে। এসে যায় এ প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনের নির্ধারণ— *“উহারা প্রাণ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বলিয়া দাও, উহা আমার প্রভুর আদেশঘটিত ব্যাপার এবং এই সম্পর্কে উহাদেরকে অতি অল্পই জ্ঞান দেওয়া হইয়াছে।”* সুস্পষ্টতায় বলা যায় যে প্রাণ বা জীবন বা রূহ সম্পর্কিত জ্ঞানের চর্চা যতদূরই চলতে থাকুক, তাতে কোনো বড় রকমের উন্নতিই সাধন করা সম্ভব নয়— এই হলো কোরআনের ব্যক্ত তথ্য অর্থাৎ প্রাণ সম্পর্কে কোনো জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে না, ব্যাখ্যা চলবে না, এটি এক শাশ্বত বিধান।

www.pathagar.com

মহাবিশ্বের মহা বিশালতার সম্মুখে এত ক্ষুদ্র ও অনুল্লেখযোগ্য একটি গ্রহে কেন জীবন সঞ্চারিত হবে, কেন অন্যান্য গ্রহে জীবন থাকবে না— সে বিশাল ব্যাখ্যাটিকে সংক্ষিপ্তভাবে ছেঁকে আনা যায় এইটুকুতে, যে কেবলমাত্র যে সব গ্রহরা 'সবুজ জীবনময় তলের' অধিবাসী (Green belt of life zone) কেবল তাদের মাঝেই জীবনের উন্মেষ ঘটতে পারে, যেখানে একটি প্রাণ প্রতিপালক তরল (যেমন পানি) তিনটি অবস্থায় (কঠিন, তরল, বায়বীয়) অবস্থান করতে পারে, যেখানে প্রাণের জন্য প্রয়োজনীয় উত্তাপ সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে, যেখানে অক্সিজেন মুক্ত অবস্থায় একটি সুসামঞ্জস্য পরিমাণে বিদ্যমান। এ ছাড়াও রয়েছে আরো হাজার রকমের নাজুক শর্তাদি, এদের কথা না-ই আনলাম (পৃথিবীর মহাকাশ পর্ব-১ এ দ্রষ্টব্য)।

প্রাণ বা জীবনের মহা ছড়াছড়িতে ধন্য এ পৃথিবীতে ·যে বৈচিত্রের শতধা বিভাজন দেখতে পাই— তাতে কোনো উদ্ভিদ হাজার বছর, কোনো জীব কয়েকশত বৎসর, কোনো কোনো প্রাণী শতায়ু এবং কোনো কোনো প্রজাতি সুদীর্ঘ অনেক বৎসর, আবার কোনো কোনো প্রজাতি কয়েক মাস, কয়েক দিন, কয়েক ঘন্টা হতে কয়েক মুহূর্ত কাল পর্যন্ত বেঁচে থাকতে দেখা যায়। এর অর্থ কি? এর অর্থ সুস্পষ্ট যে, এক একটি প্রজাতির জন্য এক এক দৈর্ঘ্যের জীবন-ব্যাপ্তি সুনির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছে। তার সুস্পষ্ট নির্দেশটি হলো এই যে এই জীবনের যিনিই অধিশ্বর হোন, তিনি একটি প্রমাণ রেখে গেছেন যে, জীবনের দৈর্ঘ্যকে তিনি কয়েক মুহূর্তকাল হতে কয়েক হাজার বৎসর পর্যন্ত ধরে রাখতে সমর্থ। পূর্বের প্রসঙ্গটি আবার টেনে আনছি যে, একটি কচ্ছপ কিংবা তিমিমাছ অনায়াসে ৫০০ বৎসর বেঁচে থাকে। আবার একটি নিম্নশ্রেণীর পতঙ্গ জন্মের কয়েকদিন পরই মারা যায়। এদের বিষয়ে কোনো 'কেন' এর উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়, তবে যে সত্যটি প্রস্ফুটিত হয়, তা হলো— জীবনের পরিব্যাপ্তি এক একটি প্রজাতির জন্য এক এক রকম। যেন ছকে বাঁধা এক একটি ব্যবস্থাপনা। একটি মথ কখনো ৫০০ বৎসর বেঁচে থাকবে না

www.pathagar.com

এবং একটি কুমির কারণহীনভাবে কয়েক দিনেই জীবনবৃত্ত শেষ করবে না। অর্থাৎ প্রতিটি প্রজাতির জীবন পরিসীমা নির্ধারিত। জীবন পরিসীমার প্রকৃতি কি? এর প্রকৃতিটি হলো— তার একদিকে জীবন অন্যদিকে মৃত্যু, তবে তা সুনির্দিষ্ট নিয়মে নিয়ন্ত্রিত।

প্রশ্ন এসে যায়— জীবন কি নিজের মধ্যে নিজে সীমিত যে তা নির্দিষ্ট সময় পর আপনা হতেই নিঃশেষ হবে? আমরা এমনটি দেখি না; কারণ একই প্রজাতির প্রত্যেকটি প্রাণী ঘড়ি ধরে বৎসর মাস দিন ঘন্টার পরিমাপে মৃত্যুবরণ করে না— এদের মৃত্যুটি সাধারণ সুনির্দিষ্ট বৃহত্তর ছকের মধ্যে অনির্দিষ্ট কালের পরিমাপে ঘটতে থাকে।

আলোচনার পট অন্যদিকে ঘুরিয়ে নেই। জীবনের অধিকারী কারা? উত্তরটি সহজ— জড় ও জীব উভয়ই জীবনের অধিকারী। শুনতে অবিশ্বস্য মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞান জড় পদার্থের জীবন সম্পর্কে কোনো আস্থাহীনতার প্রশ্ন তুলছে না। দেখা যায় থোরিয়ামের অর্ধজীবন 1.39×10^{10}yrs. পদার্থ বিনাশহীন-এ ধারণার পেছনে এই উপাত্তটি সর্বপ্রধান যোগসূত্র (অর্ধজীবন ধারা শেষ হবার পরও পদার্থটি নিঃশেষ হয় না, সর্বশেষে অন্য পদার্থে রূপ পরিগ্রহ করে)। যে গতিজড়তায় (Inertia of motion) শাসিত হচ্ছে এই মহাবিশ্ব, তারই শাসনে শাসিত হচ্ছে আমাদের এই পৃথিবী। এই গতিজড়তার কারণে প্রতি ঘন্টায় পৃথিবী ছুটে চলছে ৬৬ হাজার মাইল গতিতে— এ গতিতে কোনো ঘাটতি নেই, বাধা নেই, কমতি নেই।

গতিজড়তার শাসনে শাসিত পৃথিবীর আর বাকি সবই একই নিয়মের অধীনে হবার কথা ছিল। গতিজড়তার কারণে এখানে অন্যান্য পদার্থের গতি প্রকৃতিই অনুরূপ ও অভিন্ন হবার কারণ ছিল অর্থাৎ যার চলা অব্যাহত রয়েছে, সে কেবল চলতেই থাকার কথা; এমনিভাবে যে জীবনের উন্মেষ ঘটেছে, তা মৃত্যুহীনভাবে বেঁচে থাকারই কথা।

www.pathagar.com

জীবের দেহে কিছু সুনির্দিষ্ট শর্ত সাপেক্ষে প্রাণ বা 'জীবন' নামক সর্ব দুর্বোধ্য অস্তিত্বটি বিরাজ করে থাকে। যে মৃতের প্রাণ-বিয়োগ ঘটেছে, সে মৃতদেহটি কিন্তু তখনো সম্পূর্ণ জীবিত। কোষ পর্যায়ে মৃত্যু অনেক অনেক দূরের কথা হিসাবেই তখনো থেকে যায়। তাহলে অর্থ দাঁড়ায়— সাধারণভাবে আমরা যাকে মৃত্যু বলে থাকি, তা মূলতঃ দেহ হতে প্রাণ আলাদা করে নেয়ার প্রক্রিয়াতেই সাধিত। অর্থাৎ মৃত্যু হলো একটি জীবন্ত দেহসত্ত্বা হতে প্রাণ পৃথককরণ প্রক্রিয়া। সমীকরণের সাহায্যে দেখতে গেলে বলা যায় যে—

(ক) জীবন্তদেহ + প্রাণ = জীবিত সত্ত্বা
(খ) প্রাণ = জীবিত সত্ত্বা - জীবন্ত দেহ
(গ) জীবন্ত দেহ = জীবিত সত্ত্বা - প্রাণ
এবং
(ঙ) মৃত্যু = জীবিত সত্ত্বা - প্রাণ
(চ) জীবন্ত দেহ = মৃত্যু

অর্থাৎ জীবন্ত দেহের মাঝেই মৃত্যুর ফাঁদ পাতা রয়েছে— এই তথ্যটিই এই সমীকরণ হতে বেরিয়ে আসে।

এই সমীকরণটির আরো একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিকাশ রয়েছে, যা হল ঃ

জীবন্ত দেহ — মৃত্যু = ০

সুধী পাঠক, নিশ্চয়ই আমাদের সমীকরণের এই সম্বন্ধটি আপনাকে ইতিমধ্যেই হতাশ করতে বসেছে। জীবন্ত দেহ হতে মৃত্যুকে বাদ দিতে পারলে তো জীবের জীবনে মহাসাফল্যের সূর্যোদয় ঘটবে। সারা পৃথিবীতে মানুষ মৃত্যুকে বর্জন করে যাবার চেষ্টা করছে, বিজ্ঞান এর রাহুমুক্ত হবার জন্য কতই না উদ্ভাবনের

www.pathagar.com

প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। মৃত্যুকে বাদ দিতে পারলেই যেখানে অমরত্ব আশা করা যায়, সেখানে কোথাকার কোন অখ্যাত লেখক এসে বলতে চায় যে, জীবন্তদেহ হতে মৃত্যুকে বাদ দিয়ে দিলে জীব অমর হবার পরিবর্তে হয়ে যাবে অস্তিত্বহীন; চারিদিকে অর্থাৎ এই সুন্দর পৃথিবীতে বিরাজ করবে শূন্যতা! শুনতে অবাক করা হলেও ঘটনাটি কিন্তু প্রকৃতপক্ষেই সত্য!

প্রিয় পাঠক, একটু পরেই সমস্ত বিষয়টি আমাদের কাছে পরিস্কার হয়ে যাবে। কিন্তু তার পূর্বে আবারো আমরা মূল প্রশ্নটিতেই ফিরে আসতে চাইছি—

মৃত্যুকে প্রাণের অনুপস্থিতি বলা যায় কি?

একটি অতি সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তি হতে বলা হবে— হ্যাঁ; যেখানে প্রাণ অনুপস্থিত, সেখানেই মৃত্যু— এ তো অতি সাধারণ কথাই।

এই সূত্রটি গ্রহণ করতে আমাদের কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু বিপত্তিকর সমস্যাটি হলো যে, মানুষ কিংবা অন্যান্য জীবনের জন্মগ্রহণ প্রক্রিয়ায় যে বিবর্তনের ইতিহাস রয়েছে, তা এই যুক্তিকে বর্জন করে। মানুষের জীবনের বিবর্তনের ইতিহাসে শিশুটি মাতৃগর্ভে একটি সময় অতিবাহিত করে যখন তার মাঝে প্রাণের কোনো অস্তিত্ব থাকে না। কোরআনের ভাষায়ঃ *"কাল প্রবাহে মানুষের উপর এমন একসময় আসিয়াছিল যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিল না"* (৭৬:১)। শুনতে যতদূর অগ্রহণযোগ্য বলেই মনে হোক না কেন, মানব শিশুর জীবনযাত্রাটি শুরুই হয় সম্পূর্ণ প্রাণহীন অতিতুচ্ছ পরিমাণগত অবস্থায়— কিন্তু মৃত অবস্থায় নয়। এ তথ্যটি বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ প্রাণের অনুপস্থিতিই মৃত্যু নয়, তা মানুষ-জন্মের বিবর্তন হতেই সুস্পষ্ট প্রমাণে প্রতিষ্ঠিত। তা হলে মৃত্যু কি?

মৃত্যু হলো সম্পূর্ণ একটি ভিন্নরকম পূর্বাহ্নে তৈরী করা ব্যবস্থা যা জীবন্ত সত্বাকে গ্রাস করে। মৃত্যু একটি সম্পূর্ণ ভিন্নতর অস্তিত্ব যা জীবনের মতোই কিন্তু জীবনের বিপরীত ধর্মী। জীবন যেমন ধীরে

www.pathagar.com

ধীরে গড়ে উঠে, মৃত্যু তেমনি ধীরে-ধীরে গ্রাস করে চলে (আমরা কোনো দুর্ঘটনা বিষয়ক মৃত্যুর কথা বলছি না—স্বাভাবিক জীবন-মৃত্যুর বিষয়ে বলছি)। আমরা এইটুকু অবস্থানে পৌঁছে আলোচনার পটটি আবারো ভিন্নখাতে ঘুরিয়ে নিতে চাই।

মানুষের দেহ অসংখ্য কোষের সমন্বয়ে গঠিত। এই কোষের শতকরা এক হতে দেড় ভাগের স্বাভাবিক নিয়মে মৃত্যু হচ্ছে প্রতিদিনই। এই মৃত্যুকে যদি কোনো বৈজ্ঞানিক কৌশলে বন্ধ করে দেয়া যায়, তাহলে দেহের ওজন প্রতিদিন নূন্যতঃভাবে ঐ হারে বাড়তে থাকবে এটি প্রায় ৭৫—১০০ দিনের মধ্যে দ্বিগুণ ওজনে পৌঁছবে। এক মন ওজনের একটি মানুষ এভাবে প্রথম বছরে হবে ১২ মন, দু'বছরে ১৪৪ মন, তিন বছরে ১৭২৮ মন, চার বছরে ২০৭৩৬ মন এবং এভাবে ৭০ বৎসর সময়ে তার ওজন ও উচ্চতা পৃথিবীর সর্ব উচ্চতম পর্বত হিমালয়কেও ছাড়িয়ে যাবে।

এভাবে ১০০ বৎসরে এই মানুষটির দেহের ভর সমগ্র হিমালয় ও আলপস রেঞ্জের ভরের সমান হয়ে পড়বে। ১২০ বৎসরে মানুষটির ওজন হয়ে যাবে প্রায় পৃথিবীর ওজনের এক দশমাংশ। এমতবস্থায় সারা পৃথিবীতে মাত্র দশটি মানুষও একসাথে বসবাস করতে সক্ষম হতো না। এমন মানুষদের আহার যোগানো অসম্ভব হতো পৃথিবীর জন্য। আর এই কল্পিত অতিদানব মানুষদের দাপটে পৃথিবী প্রেতরাজ্যে পরিণত হতো। আমাদের সুন্দর পৃথিবী হতো অসম্ভব ও অভাবিত। ঐ রকম ব্যবস্থায় পৃথিবীতে কেবল দশটি মানুষই থাকত, আর কোনো জীবজন্তু, বৃক্ষলতার স্থান সংকুলান করা সম্ভব হতো না। আর ভুলক্রমে কোনো কিছু সৃষ্টি হয়ে পড়লেও তার আকৃতি হতো আনুপাতিক হারে দানবীয়। পৃথিবী হতো এক মহাবিভীষিকাময় অবস্থান! ঐ প্রাণীরা নিজদেরকেই স্রষ্টা ভাবত, শক্তিতে এরা এত বিপুল হতো যে তারা কখনো মৃত্যুর কথা ভাবতে পারত না। দুর্বিনীত ও ঔদ্ধত্যে এই সৃষ্টি প্রকম্পিত হতো

www.pathagar.com

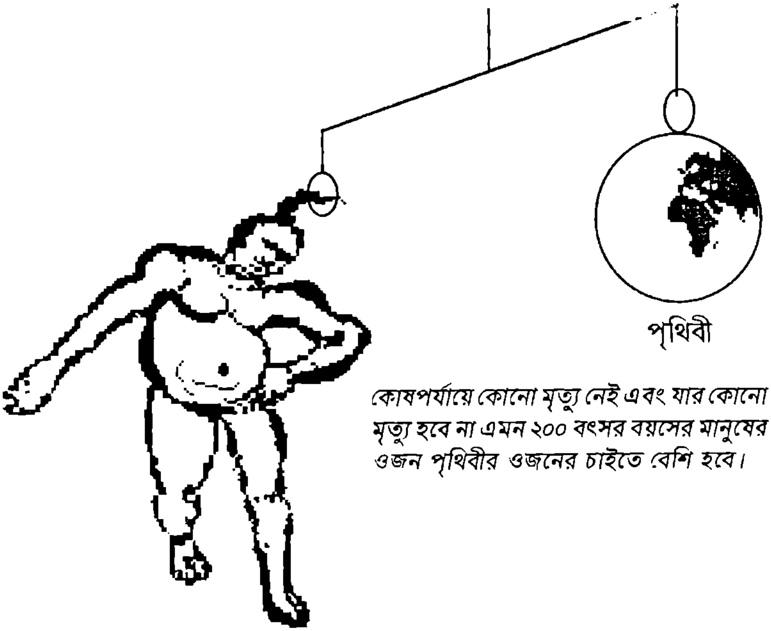

কোষপর্যায়ে কোনো মৃত্যু নেই এবং যার কোনো মৃত্যু হবে না এমন ২০০ বৎসর বয়সের মানুষের ওজন পৃথিবীর ওজনের চাইতে বেশি হবে।

প্রতি নিয়ত। সবচাইতে বড় সমস্যা হতো যে এই মানুষগুলি হতো মৃত্যুহীন! ফলতঃ তারা প্রতিদিন প্রতিক্ষণই বৃদ্ধি পেতে থাকত দেহের আকৃতি আর ক্ষুধার চাহিদা নিয়ে। একসময় এমন হয়ে পড়ত যে, মৃত্যুহীনতার কারণে ক্রমাগত বেড়ে বেড়ে ঐ অতিদানব মানুষরা প্রতিদিনের অধিকতর খাদ্য চাহিদায় পরস্পরকে ভক্ষণ করার কাজে লেগে যেত। ক্ষমতার দ্বন্দ্বে হয়তো বেঁচে থাকত একটি কিংবা দু'টি মানুষ। কিন্তু ততক্ষণে পৃথিবীর যাবতীয় খাদ্যভাণ্ডার শেষ হয়ে পড়েছে। এমতবস্থায় ঐ অতিদানব মানুষটি একাকিত্বের শূন্যতা আর সীমাহীন ক্ষুধা নিয়ে কাতরাতে থাকত। আত্মহত্যা করতেও তার ইচ্ছা হতো, কিন্তু তার জ্ঞান ও সাধ্যে সে একাজটি কখনই সম্ভব করে তুলতে পারত না। পৃথিবীতে চলার মতো স্থান তার থাকত না কোথাও। আপন দেহের ভর তাকে নিজ মাধ্যাকর্ষণে ধৃত ও জীবন্মৃত অবস্থায় নিক্ষেপ করত। সৃষ্টিতে সে-ই হতো সবচাইতে বেশি অসহায়। বুঝি তাই জগৎসমূহের স্রষ্টা সৃষ্টির কার্যে একটা

www.pathagar.com

অনন্ত জীবনের গতিজড়তায় প্রবাহমান জীবনের অধিকারী পৃথিবীজোড়া একাকী সর্ব অসহায় মানুষ যার মৃত্যু নেই। সঙ্গ নেই, খাদ্য নেই, অনুভব নেই, ভালবাসা নেই, বেড়াবার স্থান নেই, জীবনের কোনো চাওয়া-পাওয়া নেই। তার দেহটি পৃথিবীর ভরের সমান। নিজ দেহের ভয়ঙ্কর অভিকর্ষে মৃত্যুর যন্ত্রণা পাবে সে প্রতিক্ষণ— কিন্তু তার মৃত্যু হবে না— কারণ কোষ পর্যায়ে মৃত্যু নেই বলে ক্রমাগত তার দেহটি বেড়েই চলবে।

হিসাব বসিয়ে দিয়েছেন, এঁটে দিয়েছেন একটি নির্ধারণ, এক এক প্রজাতির জন্য জীবনের সময় বেঁধে দিয়েছেন এক এক রকম— ফলতঃ এরা পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক হয়ে চলে আর মুখ্যভাবে সমর্থন দিয়ে যায় মানুষের জীবন ও অবস্থানকে। অতএব, সুস্পষ্টভাবেই দেখা যায়— আলোচনার শুরুতে আমরা যে বুদ্ধিজীবীর প্রসঙ্গটি এনেছিলাম, তা গ্রহণযোগ্য নয়। জীবনের হীনতা বা প্রাণের অনুপস্থিতিই মৃত্যু নয়। মৃত্যু হলো প্রতিটি জীবনের সর্বনিম্ন কোষ পর্যায়ে ফেঁদে রাখা ফাঁদ যা ধীরে ধীরে কাজ করে এবং একটি সুনির্দিষ্ট সময়ে প্রাণ বিয়োগের কাজটি সম্পন্ন করে। আমরা অনুভব করতে সক্ষম হই যে মৃত্যুটি জীবের কোষে কোষে বিরাজ করে। কোষ সৃষ্টি বা জীবন সৃষ্টি ইত্যাদি সম্পন্ন করার সময়ই স্রষ্টা এদের নিয়ন্ত্রণের জন্য জীবের কোষে কোষে মৃত্যু এঁটে দিয়েছেন। জীবনকে এবং সৃষ্ট জীবকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য, তাদের বসবাসকে পরিপূর্ণ নিশ্চিত ও সুখময় করার জন্য জীবন সৃষ্টির সাথে সাথে তিনি মৃত্যু সৃষ্টি করে রেখে দিয়েছেন— এবং এই মৃত্যুর ফাঁদটি প্রতিটি জীবই

www.pathagar.com

তার নিজ দেহে প্রতিক্ষণ লালন করে যায় মাত্র। এভাবে মৃত্যুকে দয়াময় জীব ও তাদের বংশধরগণের জন্য সৃষ্টি করেছেন একটি দয়া ও আশীর্বাদ হিসাবেই। সত্য হয়ে যায় কোরআনের বাণী— *"যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন মৃত্যু ও জীবন, তোমাদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য কে তোমাদিগের মধ্যে কর্মে উত্তম (৬৭:২) আকাশ ও পৃথিবীর আধিপত্য একমাত্র আল্লাহর। তিনি জীবিত রাখেন এবং মৃত্যু দান করেন। তিনি সকল বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান" (৫৭:২)।*

পাঁচ

জীবন্ত দেহেই যে মৃত্যুর ব্যবস্থা এঁটে রাখা হয়েছে তার উদাহরণ প্রতিটি জীবিত প্রাণী। আপনারা জানেন যে, মস্তিষ্কের কার্যকারিতা একটি নির্দিষ্ট বয়সের পর হতে ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেতে থাকে। ভ্রূণ হতে একটি সুনির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত মানবশিশুর দেহ কোষকলায় বৃদ্ধিজনিত পরিবর্তন ঘটে। মস্তিষ্কের ক্ষেত্রে এটি ঘটে ভিন্নভাবে। মস্তিষ্ক তার প্রায় এক পঞ্চমাংশ সময়ে পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয় এবং এরপর আর বৃদ্ধি ঘটে না; মস্তিষ্কের কোষ আবার একটি সুনির্দিষ্ট সময় হতে নির্দিষ্ট হারে মরে যেতে থাকে। মস্তিষ্ক জীব দেহের সকল বৃদ্ধি ঘাটতির নিয়ন্ত্রণের জন্য দায়ী। জীবদের জীবন ধারণের বৈশিষ্টই হলো যে একটি সুনির্দিষ্ট বয়সের পর হতে নিয়ন্ত্রণকারী মস্তিষ্ক নিজেই মৃত্যুর দিকে যেতে থাকে, এবং পরিণামে দেহের অন্যান্য কোষকলাকে ক্রমান্বয়ে হীন-দুর্বল করে চলে ও পরিণামে মৃত্যু ঘটায়। We have not yet found a way to stave off the gradual weakening and eventual breakdown of the human machine. মানুষের দেহযন্ত্র যে ক্রমান্বয়ে দুর্বল হতে হতে পরিণামে সম্পূর্ণ অকার্যকর হয়, তা বিজ্ঞান স্বীকৃত। আর এর জন্য জরুরী ভূমিকা রাখে তারই নিয়ন্তা 'মস্তিষ্ক'। আপন দেহেই মৃত্যু ব্যবস্থাটি এক অপূর্ব সিদ্ধতায় স্রষ্টা এঁটে দিয়ে রেখেছেন যেন কেউ না বলতে পারে যে প্রাণের অনুপস্থিতিতেই মৃত্যু হয়— বরং "মৃত্যু একটি সময়সাপেক্ষ ব্যাপার, মৃত্যু আসে ধীরে ধীরে এক মুহূর্তে সব শেষ হয়ে যায় না"। বিজ্ঞান বিশুদ্ধ এই দুটি উদ্ধৃতির মূল দাঁড়িয়ে রয়েছে

www.pathagar.com

একটি সুনির্দিষ্ট জ্ঞানের কাঠামোয়— যা হলো, মৃত্যু পূর্বে প্রস্তুতকৃত ব্যবস্থায় ব্যবস্থিত একটি জৈবিক শাসন; যা 'জীবনের অনুপস্থিতি' এইটুকু সরল বক্তব্যের উর্ধ্বে। ঘুরিয়ে বলা যায় যে, জীবন যাতে অনুপস্থিত হতে পারে ও জীবের কালচক্রকে সময়ের ও প্রয়োজনের সুসমতায় নিয়ন্ত্রণ করা যায়, যেন পরবর্তী বংশধারা সম্ভব হয়, যেন সৃষ্টিতে জ্ঞান ও স্রষ্টার বিষয়ে চর্চা ও গবেষণা চলতে পারে, যেন সবকিছু সুখময়, সুন্দর, পরিমিত ও আবেদনময় হতে পারে। তার জন্যই মৃত্যু হলো সম্পূর্ণ আলাদা প্রস্তুতি যা 'জীবন' হতে পরিপূর্ণভাবে ভিন্ন এবং জীবনের পূবাহ্নেই যার অবস্থান। অর্থাৎ মৃত্যু হলো জীবনের তুলনায় অগ্রজের অবস্থানে। সৃষ্টিতে মৃত্যুর বিবেচনা আগে আসে তারপর জীবন!

আমাদের এ আলোচনার পরিধি একটি ব্যক্তি–মানুষ কিংবা জীবকে নিয়ে; কিন্তু সমষ্টিগতভাবে এর প্রকাশটি কেমন? পবিত্র কোরআন এর সামষ্টিক বিষয়টিই তুলে ধরেছে ৬৭:২ আয়াতে— *"যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন মৃত্যু ও জীবন তোমাদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য"* —প্রকৃতপক্ষে এটি একটি সামষ্টিক ব্যবস্থা বা সামষ্টিক জীবন প্রবাহেরই মতো। এই সত্যটিকে রেখাচিত্রে প্রকাশ করা যায় ঃ

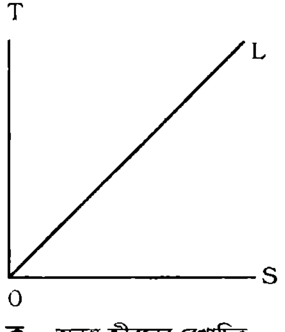

ক অনন্ত জীবনের রেখাচিত্র

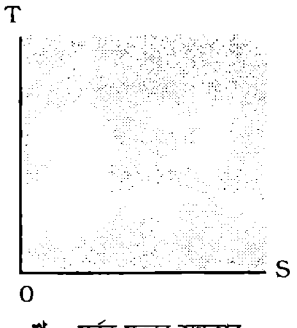

খ সর্বত্র মৃত্যুর অন্ধকার

OT হলো সময় লাইন ও OS স্পেস বা দূরত্ব/স্থান লাইন। OL কোনো একটি নির্দিষ্ট সত্ত্বার জীবন–লাইন। রেখাচিত্র ক–এর পরিস্থিতি

www.pathagar.com

হলো যে মৃত্যুহীন পরিবেশে Inertia of life নিয়ে কোনো ব্যক্তিজীবন অনাদিকাল হতে অনন্ত বিস্তৃতি পর্যন্ত বহমান থাকতে পারে। চিত্র খ-এ আমরা ধরে নেই যে সময় ও স্থানের সীমানায় আবদ্ধ পরিবেশটিতে সর্বত্রই মৃত্যুর ব্যবস্থা সৃষ্টি হয়ে রয়েছে। এখানে জীবন নেই। চিত্র গ হলো প্রথমটির উপর দ্বিতীয়টির প্রতিস্থাপন; ফলতঃ সময়ের সাথে সাথে জীবন রেখা OL দূরত্ব অতিক্রম করবে ঠিকই কিন্তু যেহেতু খ রেখাচিত্রের মৃত্যুর শাসনটি OL এর উপর কার্যকর হবে, সেহেতু OL রেখা ক্রমে ক্রমে দুর্বল ও নিঃশেষ হয়ে যাবে। জন্মের সাথে সাথে L জীবন রেখাটি D মৃত্যু-চোঙ এ প্রবেশ করে। সময় দূরত্ব ধারাবাহিকতার কারণে OL রেখা ক্রমে ক্রমে অধিকতর গভীরতায়

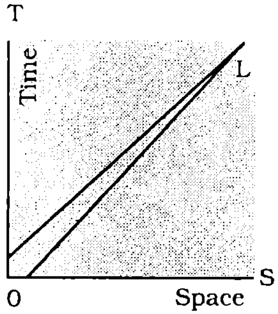

গ মৃত্যু সুড়ং-এ প্রবাহিত
জীবনের রেখাচিত্র

মৃত্যুচোঙ-এ প্রবিষ্ট হতে থাকে। মৃত্যু সুড়ঙটি যতই গভীর হয়, OL রেখা ততই দুর্বল হয়ে পড়ে এবং একটি পর্যায় আসে যখন D সুড়ঙ এর সাথে প্রতিক্রিয়ায় L রেখাটি সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়ে যায়। প্রতিটি ব্যক্তি উদাহরণের ক্ষেত্রেই L + D = 0 এই মান উৎপন্ন হয়। সামষ্টিক ও সামগ্রিকভাবে প্রতিটি ব্যক্তি L জন্মের মাত্রই তার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকা D কে প্রত্যক্ষ করবে। জীবন রেখা L এর চলার পথ, তা যত ক্ষুদ্র কিংবা যত বৃহত্তরই হোক সূচিত হয়েছে কেবলমাত্র D চোঙ এর মধ্য দিয়ে। এটি যেন কেবল পবিত্র কোরআনের একটি শর্ত

www.pathagar.com

পূরণের জন্য— *"জীবন মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিবে" (৩:১৮৫)।*

আমরা পূর্বে উল্লিখিত সমীকরণ ও প্রদর্শিত রেখাচিত্র হতে যথাক্রমে দেখতে পাই যে, প্রতিটি জীবের নিজ নিজ দেহে তার নিজ মৃত্যুর নিশ্চিত ব্যবস্থা বহন করে যাচ্ছে এবং জন্ম মাত্রই জীবকে তার জন্য পূর্বেই প্রস্তুত হয়ে থাকা মৃত্যুচোঙ–এ প্রবেশ করতে হচ্ছে। অর্থাৎ জীবনের পূর্বেই মৃত্যুর ব্যবস্থাটি অগ্রগণ্যতায় বিরাজমান। এ সত্যটিই যেন ঠিক কোরআনের ভাষায় প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, *"যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন মৃত্যু ও জীবন, তোমাদেরকে পরীক্ষা করিবার জন্য" (৬৭:২)।* অর্থাৎ কোরআন বিজ্ঞানের সত্যকেই তুলে ধরছে এখানে। কোরআনও মৃত্যুকে জীবনের পূর্বেই বিবেচনা করছে।

যুক্তিবাদীদের কেউ কেউ হয়তো দুর্ঘটনাজনিত অন্যান্য মৃত্যুর ক্ষেত্রে আমাদের মতামতকে অগ্রহণীয় মনে করবেন। এ জন্য আমরা আপনাকে সাবধানী ও সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষকের ভূমিকায় দাঁড়াতে আহ্বান করছি। চলুন বিষয়টির উপর আমরা একটা এক্সপেরিমেন্ট হাতে নেই। ধরুন আমাদের Subject ব্যক্তি একজন আত্মহননকারী। আপনারা অনেকেই হয়তো শুনেছেন যে, সম্মোহন কিংবা প্রভাবিত কারণে আমেরিকায় একসময় একদল মাদকাসক্ত লোক তাদের হাতের শিরা কেটে দিয়ে চেয়ে থাকত— তারপর মৃত্যু কেমন এ জিনিসটি দেখার চেষ্টা করত। মনে করুন, আমাদের নায়ক এমনি একজন সম্মোহনে মৃত্যুপ্রার্থী। তিনি তার হাতের শিরা কেটে দিয়েছেন এবং রক্তের প্রবাহ দেখে দেখে নিস্তেজ হয়ে একসময় মৃত্যুবরণ করেছেন। মনে করুন এই দৃশ্যটিকে আমরা একটা ভিডিও ক্লীপে ধারণ করে রেখেছি।

এখন ভিডিও টেপটি রিভার্স প্লে করুন। দেখবেন মৃত লোকটি এক পর্যায়ে সামান্য নড়েচড়ে উঠছে, তারপর আস্তে আস্তে কিছুটা

www.pathagar.com

সতেজ হচ্ছে, তারপর দেখবেন মেঝেতে ছড়িয়ে থাকা যে রক্ত কার্পেট কিংবা অন্য কোনো কিছুতে লেগে শুষ্ক হয়ে পড়েছে, সে রক্ত শুষ্কতা হতে তরলতায় পরিবর্তিত হচ্ছে, তারপর রক্তগুলি আত্মহননকারীর দেহের ভিতরে ঢুকতে শুরু করছে এবং শেষ পর্যায়ে লোকটি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে পড়েছে ও তার রগ কাটা স্থানটিও অক্ষত হয়ে গেছে।

এই ঘটনাটির শুধু একটি Physical aspect কে বিবেচনা করলে বলা যায় যে— ঐ ব্যক্তির রক্ত তার দেহে বন্দী ছিল; আর এটাই ছিল জীবনের শর্ত, লোকটির দেহে জীবন রক্ষাকারী যে রক্তের মজুদ আটকে পড়েছিল— তা পরিবেশের চাপের তুলনায় বেশি চাপসম্পন্ন অবস্থায় বিরাজ করছিল। অর্থাৎ তা হলো কম চাপের পরিস্থিতি আর অস্বাভাবিক দিকটি হলো পরিবেশের তুলনায় দেহে বেশি চাপের পরিস্থিতি। শিরা কেটে দেয়ার মধ্যে যা ঘটে তা হলো, একটি বিশেষ ব্যবস্থায় দেহে অধিক চাপসম্পন্ন রক্তের মজুদ অন্য একটি স্বাভাবিক ব্যবস্থার (পারিপার্শ্বিক চাপহীনতা) দিকে প্রবাহিত হয়। বিশেষ ব্যবস্থাটি জীবন হলে স্বাভাবিক ব্যবস্থাটির নাম হয় মৃত্যু। এখানে যে interaction ঘটে তা হলো ক্রমাগত রক্ত বেরিয়ে পড়ার একটি ব্যবস্থায়) মৃত্যুর শর্তগুলিকে অধিক হতে আরো অধিকতরভাবে ঘনীভূত করা। ব্যবস্থাটি এমন যে মাঝপথে রক্তক্ষরণ বন্ধ করলেই ব্যক্তিটি মৃত্যুর হাত হতে বেঁচে যেত। এর অর্থ হলো মৃত্যুর জন্য যে সব ব্যবস্থা রয়েছে— তার মাঝে বাধার সৃষ্টি করা। ঘুরিয়ে বলা যায়, সৃষ্টিতে সর্বত্র মৃত্যুর ফাঁদ পাতা আছে— কিন্তু জীবন হলো ঐ ফাঁদের মধ্য হতেই একটা বিশেষ নিরাপদ পরিস্থিতি যার চারিদিকেই মৃত্যুর সমস্ত সম্ভাব্যতা বিরাজ করছে। অর্থাৎ জীবন ও মৃত্যু যে শুধু দু'টি ব্যবস্থা তা-ই নয়, একটিকে (জীবন) ঘিরে রয়েছে অপরটি (মৃত্যুর কারণসমূহ)। ফলতঃ আমরা যাকে আপাতঃদৃশ্যে দুর্ঘটনা বলি, তার রকমফের যত বৈচিত্রময়ই হোক না কেন আমাদের পূর্বোল্লিখিত সমীকরণ কিংবা মৃত্যুর রেখাচিত্র এর সব শর্তই সব

www.pathagar.com

দুর্ঘটনা পূরণ করে যা একটি স্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনাও সমভাবে করে থাকে। আলোচনার এতটা সীমা পার হয়ে এখন আমরা অতি দৃঢ়তায় বলতে পারি যে— আল কোরআন শুধু সত্য প্রস্তাবই রেখেছে— *"ইহা তো সৃষ্টির জন্য স্মারক ও উপদেশমাত্র" (৮১:২৭)।*

ছয়

আমরা আলোচনার আরো একটু পট পরিবর্তন ঘটাতে চাই। আমরা পূর্বেই প্রস্তাব করেছিলাম, জীবন একটি অসীমদীর্ঘ সৃষ্টি হবার কথা ছিল এবং মৃত্যুকে আমরা শুরুতে স্বাভাবিকতার একটি ব্যতিক্রম হিসাবে সনাক্ত করার প্রয়োজন দেখেছিলাম। এটা সত্য যে বিজ্ঞান এই ধারায় কোনো বড় ধরনের অগ্রগতি অর্জন করেনি বলে জীবন এবং মৃত্যুর বিষয়ে আমরা বড় কিছুই জানতে পারিনি। জীবন ও মৃত্যু— দুটি আমাদের কাছে ছায়াঘেরা, রহস্যঘেরা।

যা-ই হোক, কোরআন পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে পরবর্তী জীবনের সন্ধান দেয় যেখানে মৃত্যু নেই। *"সর্ব দিক হইতে তাহার নিকট আসিবে মৃত্যুযন্ত্রণা, কিন্তু তাহার মৃত্যু ঘটিবে না" (১৪:১৭)* কিংবা *"অতঃপর যেথায় সে মরিবেও না, বাঁচিবেও না" (৮৭:১৩)* কিংবা *"আমাদিগের তো আর মৃত্যু হইবে না প্রথম মৃত্যুর পর" (৩৭:৫৮,৫৯)।* কোরআনের এই আয়াতগুলি প্রকাশ করে যে পরকালে জীবনের দীর্ঘসূত্রিতা রয়েছে, যেখানে মানুষ হবে আজীবন মৃত্যুহীন। এখানে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রকাশ পায় যা হলো সময়-তীরের চরিত্র। কাল কখনই বিপরীতগামী হবার নয়— কোরআন সেটি অনুমোদন করে। কোরআন মানুষের প্রথম জন্ম ও মৃত্যুর পর দ্বিতীয় জন্ম ও মৃত্যুর প্রয়োজন বোধ করে না, শুধু তার পুনরুত্থান ঘটানোর প্রস্তাব করে— *"মৃত্যুর পর আবার তন্মধ্য হইতে তোমাদিগকে বহির্গত করিবেন" (৭১:১৮)।* এতে সৃষ্টির বিষয়ে আল্লাহপাকের পূর্ণজ্ঞান ও সচেতনতার মাহাত্ম্য ফুটে ওঠে। পুনরায়

www.pathagar.com

জন্ম কিংবা মৃত্যু বিধানের প্রস্তাব সময়ের তীরের বিপরীতগামিতার সপক্ষবাদ হয়ে পড়ত, যা হতো প্রকৃতির আইনের চরম বিরোধিতা। স্রষ্টা যে তাঁর সৃষ্ট আইনকে পরিপূর্ণভাবে মেনে চলেন কিংবা তাঁর

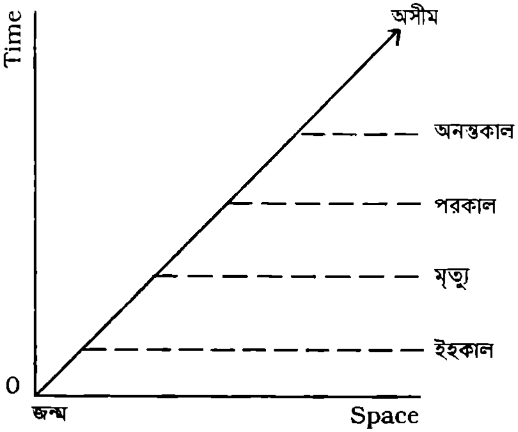

একটি ব্যক্তি–সৃষ্টির জন্য কোরানিক সময়তীর

কোরানিক সময়তীর কখনো প্রত্যাবর্তন–মুখী নয়। স্টিফেন হকিংসের ভাঙ্গাকাপের সময়তীরের চাইতে কোরআনের সময়তীর অধিকতর স্মার্টও বাস্তব। এই সময় প্রবাহে রিভার্সপ্লেতে ভাঙ্গাকাপ জোড়া লাগানোর দৃশ্য দেখার সুযোগ নেই। জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি ঘটনা শুধু একবারের জন্য; ঘটনাটি যতই তুচ্ছ হোক, আর কোনদিন তার পুনরাবৃত্তি নেই। সেই অর্থে— সময় বড় দুর্লভ বস্তু; সম্ভবতঃ সকল সম্পদের চাইতেও অধিকতর মূল্যবান।

সৃষ্ট আইনের বিরোধিতা করেন না, এই পুনরুত্থান বিষয়ক জ্ঞান তারই সুস্পষ্ট প্রমাণ। *"উহারা বলে— অস্থিতে প্রাণ সঞ্চার করিবে কে যখন সে পচিয়া গলিয়া যাইবে? (৩৬:৭৮) বল ইহার মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করিবেন তিনিই যিনি উহা প্রথমবার সৃষ্টি করিয়াছেন (৩৬:৭৯) তোমাদের সকলের সৃষ্টি ও পুনরুত্থান একটি মাত্র প্রাণীর সৃষ্টি ও পুনরুত্থানেরই অনুরূপ (৩১:২৮) অনন্তর (তিনি) ইচ্ছা অনুযায়ী পুনরুত্থান করিবেন" (৮০:২২)।*

আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।

www.pathagar.com

সম্মানিত পৃথিবী

এক

চির-অন্ধকার মহাসমুদ্রে ভাসমান একটি মুক্তা দানার তুল্য আমাদের এই সুখময় পৃথিবী সময়ের তরঙ্গ বিঘাতে অসীম হতে অসীমের পানে নিক্ষিপ্ত হয়ে ছুটছে যার প্রতিটি মুহূর্তে ভয় হারিয়ে যাবার, তলিয়ে যাবার আর নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার। নাজুকতায় আর অনিশ্চতায় তার তুলনা কেবল ক্ষুধার্ত হাঙ্গরের ঝাঁকে জাহাজ হতে পতিত একটি অসহায় মানব-শিশুর— এক

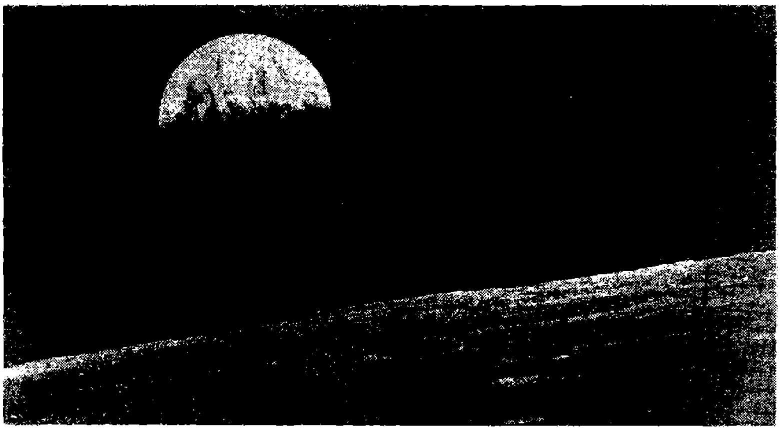

চির-অনিশ্চিত মহাযাত্রায় চলমান এই অসহায় গ্রহটি কিন্তু আমাদের জন্য সৃষ্টি করে রেখেছে এক চমৎকার আলোকময় জীবন্ত

www.pathagar.com

আবাসস্থল। এই মহাবিশ্বে যার অনুরূপতা বড়ই দুর্লভ! এরই মাঝে সৃষ্টি হয়েছে জীবন— প্রায় ৪০০ কোটি বুদ্ধিমান জীব! আর তারই মাঝে উন্মেষ ঘটেছে স্রষ্টার সর্ব অনন্য কৃতিত্ব মানুষ প্রজাতির। আর তার মস্তিস্কটি হলো এ মহাবিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ফসল।

জীবনের সৃষ্টি ও তার প্রতিপালনের অনন্যতায় পৃথিবী এক বিরল সম্মান ও প্রাধান্যের অবস্থানে নির্ণীত রয়েছে। এই সত্যটুকু কোরআনে প্রস্ফুটিত হয়েছে অতি বলিষ্ঠ ভাবাবেগে ও সহজবোধ্যতায়।

কোরআনের সমস্ত কলেবর জুড়ে *'আকাশসমূহ ও পৃথিবী'* السموات والأرض এবং *'সাত আসমান ও পৃথিবী'* السموات والأرض سبع এই দুই সমাসবদ্ধ পদকে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। এই শব্দগুচ্ছগুলি প্রশ্ন সৃষ্টি করেছে। অবিশ্বাসীগণ কিংবা দোদুল্যমান বিশ্বাসী সম্প্রদায় সব সময়ই প্রশ্ন করে এসেছেন— অনেক আকাশ আর এক পৃথিবী কিংবা সাত আসমান আর এক পৃথিবী এই প্রস্তাবের বিশ্বাসযোগ্যতা কোথায়? আকাশের সংখ্যা সাতটি নয় এবং পৃথিবীও একটি নয়— তাহলে *'সাব'আ সামাওয়াতি ওয়াল আরদ'* এই পদ বা বাক্যাংশের প্রকৃত অনুভূতি আর প্রস্তাবের ভাবাবেগ কি?

বিজ্ঞান সম্পর্কে যাদের সামান্য সচেতনতা রয়েছে, তারা এই প্রস্তাবটির ঘোর বিরোধিতা করবেন শত কারণে। বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের অনেকেই কোনরূপ দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে না গিয়ে কোরআনের ভাবাবেগের বিরোধী হওয়া থেকে নিজকে গুটিয়ে নেন। যিনি বিশ্বাস করেন না, তিনি এটিকে ব্যবহার করতে সচেষ্ট হন হাতিয়ার হিসাবে। আর যিনি বিশ্বাস করেন, তিনি হতে চান পলায়নপর। আমাদের স্বল্প জ্ঞানই এর জন্য দায়ী— আর ঠিক সে কারণেই এই অপ্রীতিকর অনুভূতির মীমাংসা হওয়া জরুরী।

www.pathagar.com

ঐশী বাণীর প্রতি কোনরূপ অবিশ্বাস রাখা যাবে না— এই জরুরী মনোভাবটিও পরিণামে আমাদের অজ্ঞানতার দ্বারা দুষ্ট হয়ে যায়। যারা বিজ্ঞান সম্পর্কে কম জানেন, তারা সাত তবক আসমান ও জমিনের কথা বলেন আর যে ধারণা প্রতিপালন করেন তা বাস্তবতার স্পর্শ হতে বহু বহু দূরে অবস্থান করে।

প্রাচীন ইসলামিক গবেষকগণ সাত আসমান সম্পর্কে যে সব ধারণার কথা প্রস্তাব করে গেছেন, তা বিজ্ঞানের অবলোকনে প্রায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বাতিল হয়ে যায়। ধারণাগুলি গুরুতরভাবে সীমিত ও হাজার সীমাবদ্ধতায় দুষ্ট। অথচ মনীষীগণের এ উক্তিসমূহকে বাদ দেয়া যায় না— এই হলো অনুভব। এ সব অনুভূতি আমাদের মতো অনেক স্বল্প জ্ঞানসম্পন্ন বিশ্বাসীকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে। আমাকে লিখিত এক পত্রে জনৈক সম্মানিত পাঠক শাসিয়ে লিখেছেন যেন আমি এই সব গবেষণা হতে বিরত থাকি। 'আকাশের সংগঠন' সম্পর্কে আমি যে চিত্র আঁকতে চেয়েছি (মহাকাশ পর্ব-১), তা একজন জগৎ বিখ্যাত মুসলিম মনীষীর আকাশ সম্পর্কিত চিত্রায়ণের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তিনি আমাকে প্রশ্ন করেছেন— আমি কি সেই মনীষীর চাইতেও নিজকে বিজ্ঞ মনে করি কিনা! 'ক্বাফ' পর্বতের নীলিমায় আসমান নীল এবং প্রতি পাঁচ'শো বছরের দূরত্বে লৌহের আসমান, তামার আসমান, স্বর্ণের আসমান, ইয়াকুত পাথরের আসমান— এই তথ্যগুলি আমি অবগত কিনা তিনি প্রশ্ন করেছেন। আমার সম্মানিত সমালোচক পাঠকের এই ধারণাকে কোনরূপ যুক্তি দিয়ে আমি খণ্ডন করতে সমর্থ হব বলে মনে করি না। কারণ তিনি বিজ্ঞানের বিবেচনাগুলি গ্রাহ্য করতে আগ্রহী নন।

আমি বিনীতভাবে সকল শ্রদ্ধেয় ইসলামিক মনীষী ও গবেষকের পায়ের কাছে আমার নিজের অবস্থানকে পেশ করে সবিনয়ে বলতে চাই— আমার কখনই কোনো জ্ঞানের গর্ব করার মতো জ্ঞান নেই।

www.pathagar.com

(কোরআন গবেষকের জন্য জ্ঞানের চাইতে জরুরী হলো দয়াময়ের কৃপা। দয়াময় যে কোনো অজ্ঞানকে তিনি তাঁর ইচ্ছায় নির্বাচন ও সমর্থন দিতে পারেন। জ্ঞানহীনতা রাব্বুল আলামীনের দয়ায় সমর্থিত হলে আমি নিজেকে বড় ধন্য মনে করি)।

এ প্রসঙ্গে আমি আর একটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র টেনে আনতে চাই। মনে রাখা দরকার যে, কোনো মানবিক গবেষণা কার্যের সঠিকতার বিষয়ে কোরআনে কোথাও নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়নি। এই সত্যটুকুকে বিবেচনায় আনলে আমরা সহজেই উপলব্ধি করতে সমর্থ হব যে, যে কোনো মনীষীর যে কোনো মহামূল্যবান গবেষণাকর্মও কালের গতিতে ত্রুটিপূর্ণ প্রমাণিত হতে পারে। আর এই ক্ষেত্রে যিনি সত্য প্রস্তাবের কাছাকাছি থাকবেন, তার যেমন অত্যন্ত উৎফুল্ল হবার কিছু নেই— তেমনি কোনো গবেষকের কর্মটি ত্রুটিপূর্ণ প্রমাণিত হলে তার ভক্তগণের সে ক্ষেত্রেও দুঃখিত হবার কিছু নেই। কারণ কোনো গবেষণা-কর্মই কিংবা কোনো মনীষীর বক্তব্যই কোরআনের মতো অনন্য এবং আল্লাহ্‌পাকের পক্ষ হতে দলিলে সমর্থিত নয়।

আমি যে বক্তব্য ও ভাবাবেগে এই কথাগুলি উপস্থাপন করেছি তা হলো আমরা কোরআনকে তার প্রকৃত অর্থে ও সামর্থে না বুঝতে পারার বিষয়টি হলো আমাদের সীমাবদ্ধতা; এ ক্ষেত্রে কোনো মনীষীও যদি কোনো গুরুতর প্রস্তাবের কারণে কোরআনের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করেন সেটা কখনই কাম্য হতে পারে না। অত্যন্ত দৃঢ়তায় বলতে চাই— অতীতে কিংবা আজকের দিন পর্যন্ত আমরা জ্ঞানের এমন অবস্থানে পৌছিনি যাকে জ্ঞানের সীমারেখা বলা যায়। বরং জানা দরকার যে, সময়ের সম্প্রসারণ জ্ঞানের পরিধিকে এগিয়ে নিয়ে যায়; আর বিশেষভাবে কোরআনের ক্ষেত্রে জ্ঞানের উন্মোচন সম্ভবত আরো হাজার হাজার বছরের বিষয়। কোরআন সময়ের সাথে সাথে তার গাম্ভীর্য ও তথ্যের জটিলতা উন্মুক্ত করবে— অতীত অভিজ্ঞতায় আমরা এ সিদ্ধান্তে পৌছতে পারি। আর এই প্রবাহে আমরা আজ

www.pathagar.com

যাকে গুরুতর সত্য বলে ভাবছি, সময়ে তাও প্রতিস্থাপিত হয়ে যেতে পারে। সে সূত্রে আমার প্রিয় সমালোচক পাঠককে আমি বিনীতভাবে জানাতে চাই যে— যে কোনো নগণ্য গবেষক যে কোনো মহামনীষীর তথ্যের বিরুদ্ধে চলে যেতে পারেন। আমরা প্রকৃতপক্ষে তাকেই ধারণ করব যা কোরআনের প্রস্তাবকে প্রকাশ করে প্রকৃত সঠিকতায় আর যার সঙ্গে লব্ধ জ্ঞানের ব্যবহারিক সঙ্গতি রয়েছে।

আমরা আবার পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরে আসতে চাই। কোরআনের কলেবরে *'সামাওয়াতি ওয়াল আরদ'* এই শব্দগুচ্ছ সম্পর্কে অনেকেই আমাকে প্রশ্ন করেছেন ও নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্বের মুখোমুখি হয়েছেন যে অনেকগুলি আসমানের মাঝে একটি পৃথিবীর প্রস্তাব কতটা সঙ্গতিপূর্ণ? আবার সাতটি আকাশ ও একটি পৃথিবী— এই ধারণাটি আজ বিজ্ঞান সচেতনতার সাথে কোনোভাবেই সঙ্গতিপূর্ণ নয়। অথচ পূর্ণবিশ্বাসী বিজ্ঞান সচেতন মুসলমান এই দ্বান্দ্বিকতা থেকে মুক্তি চান।

সুধী পাঠক! আপনি বিস্মিত হবেন যে কোরআন শুধু ন্যায় ও সত্যকেই প্রকাশ করেছে আর তার সাথে বিজ্ঞানের কোথাও কোনো সংঘাত বিরাজ করে না। শুধু বিজ্ঞানের অগ্রজ হয়ে কোরআন যা বলেছে বা ইঙ্গিত দিয়েছে, তা বিস্ময়করভাবে বিজ্ঞানময়।

দুই

মহাবিশ্বের বিশালতা সম্পর্কে আমরা কোনো খোঁজখবরই রাখি না। এমন কি যারা নিজেদেরকে অনেক সচেতন ভাবেন, তারাও প্রকৃত সত্যজ্ঞান হতে অনেক অনেক দূরের অবস্থানে রয়েছেন। মহাবিশ্ব বলতে আমরা যা বুঝি, তা হলো শত মহাপদ্ম (১০০ বিলিয়ন) গ্যালাক্সি অধ্যুষিত মহাবিস্তৃতি। গ্যালাক্সি হলো গড়ে শত

www.pathagar.com

সহস্র আলোক বৎসর (১০০,০০০ আলোকবর্ষ) ব্যাস-সম্পন্ন সুবিশাল তারকাদের আবাসস্থল। আলোকবর্ষ হল ৫৮৬৫৭০০০০০০০০ মাইল (10 trillion kms)। আমাদের ছায়াপথের মতো একটি সাধারণ গ্যালাক্সিতে তারার সংখ্যা ১০ হাজার কোটি। একটি তারা হতে অন্য তারার দূরত্ব— রকেটের গতি নিয়ে চলমান মানুষের জন্য প্রয়োজন তার প্রাপ্য জীবনকালের এক হতে দুই শতগুণ বেশি সময়।

এই পৃথিবীতে যতগুলি সমুদ্র সৈকত আছে, আর এই সমুদ্র সৈকত সমষ্টিতে যত বালিকণা আছে— সেই বালিকণার যত সংখ্যা এই মহাবিশ্বে তারকাদের সংখ্যা তার চাইতে ঢের ঢের বেশি। অনুমান করা হয়, এই সংখ্যা 10^{18}; অর্থাৎ মহাপদ্ম, মহাপদ্ম সংখ্যক। বিজ্ঞানের পর্যবেক্ষণ হতে আশা করা যায় যে এর ন্যূনতম শতকরা একভাগ মিডস্টীম তারা বা সূর্যের জাত। এই উপাত্তে এই মহাবিশ্বে তারকাদের সৌর-সংখ্যা ন্যূনতম ১০ নিযুত মহাপদ্মের (10 million billion) কম নয়। এই সৌর জগৎগুলির প্রত্যেকেই গ্রহ ব্যবস্থা সৃষ্টি করে রেখেছে যাদের একটি অংশ তাদের কোনো না কোনো গ্রহকে green belt of life zone বা সবুজ জীবনময় তলে স্থাপন করতে সমর্থ। এই সৌর-ব্যবস্থাগুলির যদি শতকরা ১ ভাগও জীবনময় পৃথিবী ধারণ করতে সক্ষম হয়— তবে শত-সহস্র মহাপদ্ম সংখ্যক জগৎ রয়েছে যেখানে জীবনের উন্মেষ ও বিস্তার ঘটেছে। এই তথ্যটি অনেককেই হতচকিত করে তুলবে। বিশেষভাবে যারা বিশ্বাস করেন— 'আশরাফুল মাখলুকাত' সমেত এই জগতের সংখ্যা একটির বেশি হওয়াটি ন্যায্যতায় সমর্থিত নয়। 'আশরাফুল মাখলুকাত' আদৌ সৃষ্টিতে একটি জীবনময় পৃথিবীর চাইতে বেশি সংখ্যক জগৎকে কেন সমর্থন করবে না তার বৈজ্ঞানিক যুক্তি তো নেই-ই বরং কোরআনের দ্বারাও সমর্থিত নয়। যে ধর্মগ্রন্থের সর্বপ্রথম প্রস্তাব *"প্রশংসা তাঁহার যিনি জগৎসমূহের প্রভু"*— সেই ধর্মে বিশ্বাসীগণের 'আশরাফুল মাখলুকাত' সমেত একটি মাত্র পৃথিবীর

www.pathagar.com

প্রত্যয়টি যুক্তিযুক্ত নয়। বিশেষভাবে যুক্তি ও তথ্যে তার কোনো সমর্থন নেই।

'মহাকাশ পর্ব–১' এর 'ভিন জগতে জীবন'— এই প্রবন্ধটিকে অনেকেই প্রশ্নের সামনাসামনি করেছেন। তাদের ধারণা, পৃথিবীর সংখ্যা একটির বেশি কোরআন সমর্থন করে না।

কিন্তু প্রকৃত সত্যটি বিপরীত। কোরআন অতি বলিষ্ঠতায় বহুজগতের ধারণা চিত্রিত করে। বিজ্ঞান যখন এই অধ্যায়ে শিশু কিংবা এ শিশুর যখন জন্মও হয়নি— তার বহু আগেই পবিত্র কোরআন এই গুরুতর সত্যকে মুদ্রিত করে রেখেছে। *"আল্লাহ্ হইতেছেন তিনি যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন অগণিত আকাশ ও তত সংখ্যক পৃথিবী"* (৬৫:১২— এখানে *"সাব'য়া"* এর অর্থকরণ অগণিত করা হয়েছে। দ্রষ্টব্য মহাকাশ পর্ব–১ আকাশের সংগঠন ও স্তর বিন্যাস; ভিন জগতে জীবন)।

তত সংখ্যক পৃথিবী অথবা অনুরূপ সংখ্যক পৃথিবী আমাদের জ্ঞান এক বিস্ময়ের জিজ্ঞাসায় রেখাপাত করে। কোরআনের বাণী–গাম্ভীর্যে বিজ্ঞানের এই অসাধারণ তথ্যটি কি করে আমরা এড়িয়ে যাই— তাও আরেক বিস্ময়। কোরআনের এই প্রস্তাবে الأرض বা পৃথিবী শব্দটি যে একটি বহুবচনেও ব্যবহার পেয়েছে, সে সম্পর্কে আমরা এখানে অবগত হই। (দ্রষ্টব্য ভিন জগতে জীবন, মহাকাশ পর্ব–১)।

আল্লাহ্পাকের সৃষ্টির চরিত্রটি হলো অফুরন্ততা। কোরআনের ভাষায়—*"তাঁহার নিকটেই রহিয়াছে সকল কিছুর মজুদের অফুরন্ততা" (১৫:২১)।* এই অফুরন্ততা সুধীজন এবং বিনীতজনকে দয়াময়ের প্রতি উত্তরোত্তর শ্রদ্ধাশীল করে। কিন্তু বিজ্ঞানের এক বিশাল সংখ্যাকে করে হতাশাবাদী। স্টিভেন ওয়েনবার্গের ভাষায়, "The more the universe seems comprehensible, the more it

www.pathagar.com

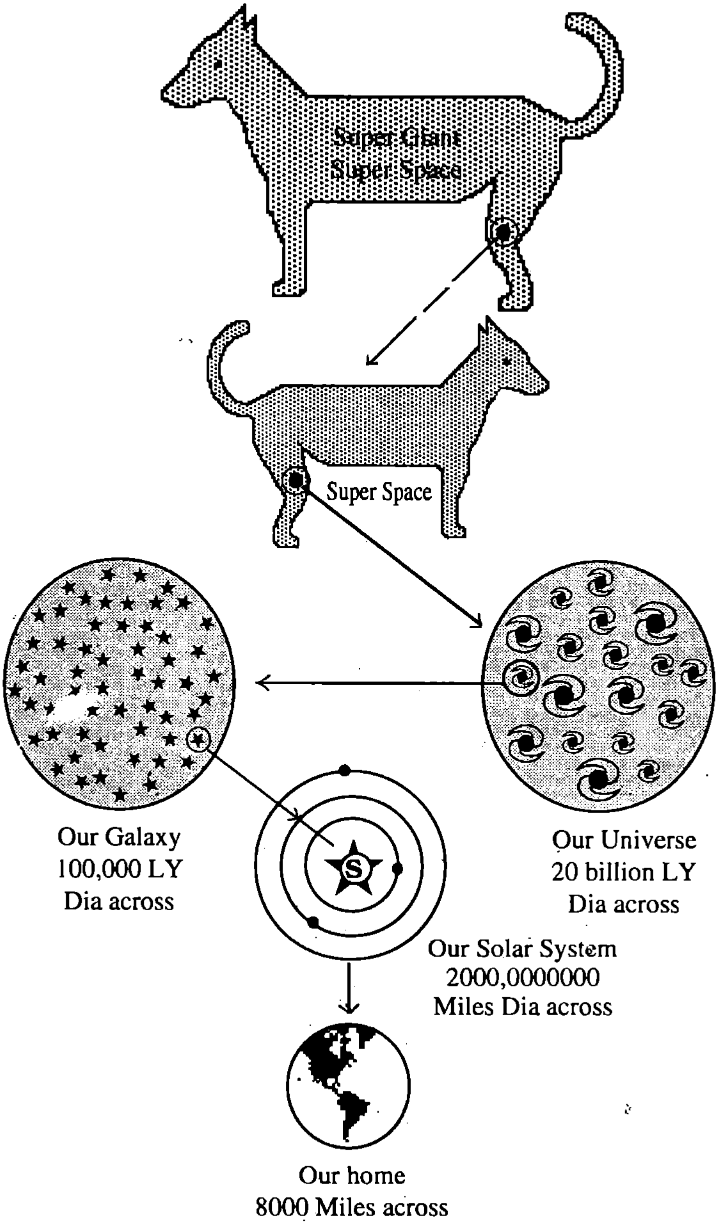

www.pathagar.com

also seems pointless"— এই মহাবিশ্বকে যত জানতে পারি, হতাশা ততই বেড়ে যায়। মহাবিশ্বের সুবিশালতার বিস্ময়কর চরিত্রই এই ক্ষুদ্র মানবিক মনকে হতাশ করে! কিন্তু আমরা যে মহাবিশ্বের কথা বলছি, সে মহাবিশ্বটি মূলতঃ একটি বিকট গ্রে-হাউণ্ডের পায়ের উপর ফুলে ওঠা ক্ষুদ্র একটি আঁচিল তুল্য; গ্রে-হাউণ্ডটি যেন অসীম শূন্যতায় একাকীত্বের কারণে হতাশায় চিৎকার করে যাচ্ছে— সে কেবল একটি সুপার স্পেসে বসবাস করছে। আর এই সুপার স্পেসটি নিজেও হয়তো অন্য কোনো Giantly Super গ্রে-হাউণ্ডের পায়ের একটি আঁচিলের মতো যার বসবাস কোনো Super Giant Super Space এর কোনো অজ্ঞাত কিনারায়! আমাদের মহাবিশ্বটি কেবল গ্রে-হাউণ্ডের দেহের অনেকগুলি আঁচিলের একটি। আমরা জানি না জ্ঞানের প্রশ্নে আজকের বিজ্ঞানীরা যে হতাশায় ভোগেন, তা ঐ গ্রে-হাউণ্ডের সুপার স্পেসে নিজের একাকীত্বের অনুরূপ কিনা। কিন্তু আমাদের জানা দরকার যে মহাবিশ্বের কিংবা মহাসৃষ্টির এই আকৃতি এই মহাবিশ্বের স্রষ্টার নিজস্ব বিশালতার কথাই বলে; আর তার মাঝে তৈরী হওয়া যত অফুরন্ততা, তা আমাদেরকে স্রষ্টার প্রতিপালন দক্ষতার নিখুঁত যোগ্যতা দর্শন করার সুযোগ দেয়। সৃষ্টির অফুরন্ততা ও মহাবিশ্বের বিশালতা আমাদেরকে হতাশ না করে একজন অতি বিশাল অনন্য স্রষ্টার সাথে পরিচিত হবার আনন্দও দান করতে পারে।

আমরা অফুরন্ততার কথা বলছিলাম। হাতের নাগালে যে সব অফুরন্ততা রয়েছে, তাদের নিয়ে আমরা কথা বলতে পারি। একটি কড বা একটি ইলিশ প্রায় ৭০ লক্ষ ডিম ধারণ করে। এতটা বিশাল সংখ্যক ডিম একটি বেহিসাবী পরিমাপ বলেই মনে হওয়া স্বাভাবিক। এমন একশটি ইলিশের দ্বারা এদেশের জনসংখ্যার সংবৎসর মৎস্য সমস্যার সমাধান হতে পারে। কিন্তু বিষয়টি দেখা যায় ভিন্নরূপ। এমনি পরিমাণগত লক্ষ লক্ষ ইলিশ আমাদের উপকূলীয় অঞ্চলে মজুদ থাকা সত্ত্বেও এই প্রজাতির মাছটি আজ দুষ্প্রাপ্য হতে

www.pathagar.com

চলেছে। ইলিশের যিনি স্রষ্টা, তাঁর কাছে এই বিবেচনাগুলি ছিল বলেই তিনি সৃষ্টিতে ইলিশকে অবাধ ও অসংখ্য করে দিয়েছিলেন; ফলতঃ আমরা আজ এই সুস্বাদু প্রজাতির মৎস্যকে আমাদের রসনা যোগান দিতে এখনো হাতের কাছে পাই।

•

এই ত্রিমাত্রিক জগতে একটি সুসময় জীবনের সর্ব ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে প্রতিপালককে তার সঙ্গে একটি সময়ের মাত্রা যোগ করতে হয়েছে। সময়ের এই মাত্রা যোগ কিন্তু সমস্যারও সৃষ্টি করেছে— সে হলো, জীবনময়তাকে সমর্থিত করার জন্য প্রত্যেক প্রকারের বস্তুর চাই অফুরন্ততা; তা না হলে এর সেবা কখনই আর পরবর্তী বংশধর পর্যন্ত পৌছানো সম্ভব নয়। অতএব, আল্লাহপাকের সৃষ্টি ধারাটি যে অফুরন্ত ও অবাধ, তা কেবল বিজ্ঞানীগণকে হতাশ করার জন্যই নয়— তাদের ও তাদের বংশধরকে কল্যাণের স্পর্শটুকু পৌছানোর জন্যও।

আমরা অসংখ্য সংখ্যক পৃথিবীর আলোচনায় এই অবাধ বিস্তৃতির প্রসঙ্গটিকে এনেছিলাম। আশরাফুল মাখলুকাত সমেত পৃথিবীর সংখ্যা কখনই একটি নয়— অগণিত সংখ্যক, এই প্রস্তাবের সপক্ষে কোরআনকে তার ৬৫:১২ আয়াতে দৃঢ় অবস্থান নিতে দেখি। *"মহান আল্লাহই জগৎসমূহের প্রতিপালক (৪০:৬৪) জগৎসমূহের প্রতিপালক সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কি? (৩৭:৮৭) তিনি আরো সৃষ্টি করিয়াছেন– যাহা তোমরা অবগত নও" (১৬:৮)* আমরা আয়াতগুলির দিকে তাকিয়ে সহজেই বুঝতে পারি যে পৃথিবীর ন্যায় আরো পৃথিবী রয়েছে যাদের বিষয়ে কোরআনের বক্তব্য হলো— *"উহাদের (অগণিত পৃথিবী) উপরেও আল্লাহর নির্দেশ অবতীর্ণ হয়; এই তথ্যটি এ জন্য যে, তোমরা যেন অবগত হও যে, আল্লাহ সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ" (৬৫:১২)।* আল্লাহপাক যে অসংখ্য জীবনময় জগতের সৃজনকারী, নির্দেশ দানকারী ও প্রতিপালনকারী এই গুরুতর তথ্যটি যে মানুষ অবগত নয়, এবং

www.pathagar.com

মানুষের মানসিক উন্নতির জন্য কিংবা স্রষ্টার বিশালতা অনুধাবন করার জন্য মানুষের এ তথ্যগুলি জানা উচিৎ বিধায় তিনি এর সূত্র কোরআনের পাতায় দান করেছেন— আমরা এই অনুভূতিটির সামনাসামনি হই।

এখানে বিজ্ঞানের প্রাপ্ত ডাটা অনুসরণ করা হলে আমরা গ্রহণ করতে প্রস্তুত যে— কম-বেশি একশত সহস্র মহাপদ্ম পৃথিবী রয়েছে যেখানে জীবন সঞ্চারিত হয়েছে; আর তাদের কতিপয়ে আমাদের পৃথিবীর মত 'আশরাফুল মাখলুকাত' বর্তমান থাকতে পারে। অথচ এই একশত সহস্র মহাপদ্ম সংখ্যক পৃথিবী নক্ষত্রের সংখ্যার কাছে নগণ্য; অনুপাতের হিসাবে, প্রতি হাজার নক্ষত্রে মাত্র একটি। অর্থাৎ সর্ব উদার ব্যবস্থায় প্রতি হাজারটি নক্ষত্রের মাঝে মাত্র একটি জীবনের স্পন্দনময় সৌরজগৎ থাকতে পারে— এর বেশি নয়। কিন্তু বিজ্ঞানীগণের কাছে একটি জীবনময় পৃথিবী একটি মহাদুর্লভ দুষ্প্রাপ্য বস্তু। If we were randomly inserted into the cosmos, the chance that we would find ourselves on or near a planet (Earth like life bearing) would be less than one in a billion trillion trillion (10^{33}). মহাবিশ্বের যে কোনো অবস্থানে যদি আমাদেরকে অবাধে ছেড়ে দেয়া হয়— পৃথিবীর মতো একটা জীবনময় গ্রহে অবতরণের সম্ভাব্যতা কিংবা তার নিকটবর্তী হবার সুযোগ যদি একটি ক্ষেত্রে হ্যাঁ-বাচক হয়, না-বাচক হবে এক লক্ষ কোটি কোটি কোটি কোটি বার! আমাদের পৃথিবীটি গুরুত্বের ও মূল্যমানের প্রশ্নে দুর্লভ নয় কি? আমাদের কাছে এই তথ্যটি কিন্তু অতি গুরুত্বপূর্ণ।

গুরুত্বের প্রশ্নটি অতি জটিল ও অতি সরল। আমরা জটিলতার দিকটি পরিহার করে সহজতর বিবেচনাটি বিচার করব। আমাদের পৃথিবীর মতো একটি অলক্ষ্যে হারিয়ে যাওয়া গ্রহে জীবনের প্রবাহ সৃষ্টি করার জন্য প্রতিপালককে গড়ে সহস্র নক্ষত্র ব্যবস্থা তৈরী ও

www.pathagar.com

তাদের প্রতিপালন করতে হয়েছে যেন সর্বতোভাবে এক কল্যাণকর ধারা অব্যাহত থেকে একটি পৃথিবীতে জীবনের কৃতিত্ব সৃষ্টি হতে পারে। ক্ষুদ্রত্বে যতটাই নগণ্য হোক, তারপরেও সহস্র নক্ষত্রের মাঝে কেবল একটি ক্ষুদ্র গ্রহই জীবনের স্পন্দনে মুখরিত। আর বাকি সহস্র নক্ষত্রের ব্যবস্থা কেবল এই ক্ষুদ্র পৃথিবীর সেবার জন্যই তৈরী। স্রষ্টা নিঃসন্দেহে তাঁর কৃতিত্বের চূড়ান্ত রূপটি জীব ও জীবনের সৃষ্টির ভেতর দিয়ে প্রস্ফুটিত করেছেন। এই মহাবিশ্বে যদি কোথাও কোনো প্রাণ অর্থাৎ জীবন না থাকত, তবে সৃষ্টিকর্তা নিজেও নিষ্প্রাণ একটি মহাবিশ্ব নিয়ে বিপাকে পড়তেন। তিনি হতেন চরম একাকী। মহাবিশ্বের এই নিঃসঙ্গতা কাটানোর উপলক্ষে হোক কিংবা তিনি তাঁর কৃতিত্বের চূড়ান্ত রূপ কি তা দেখার জন্যই হোক— জীবনের সৃষ্টিই হলো এই মহাবিশ্বের চূড়ান্ত সাফল্য। আর এই সাফল্য এসেছে গড়ে সহস্র নক্ষত্র ব্যবস্থার মাঝে কেবল একটিতে। এমন একটি দুর্লভ স্থানের পরিমাণগত একটি চিত্র আমরা পেতে পারি। আমাদের সৌর ব্যবস্থায় প্লুটোর পরে সুবিশাল ওর্ট মেঘরাজ্য (Oort cloud); এর সুবিশাল বিস্তৃতি জুড়ে রয়েছে সৌরজগতের প্রেত, ধূমকেতু। আমাদের মতো একটি ছোটখাটো সূর্যের জগৎটি ব্যাসে প্রায় ২ হাজার কোটি মাইল (Oort cloud সমেত) বিস্তৃতি নিয়ে বিরাজ করে। এর পর অন্ধকারের অসীম শীতল শূন্যতা, তারপর অন্য তারার রাজ্য। এই দুই হাজার কোটি মাইলের ব্যাসে মাত্র ৮০০০ মাইলের পৃথিবীর বুকে জীবনের স্পন্দন জেগেছে। শুধু এই সৌর জগৎটিতে এর আনুপাতিক চিত্রটি হল ২,৫০০,০০০:১; অর্থাৎ প্রতি ২৫ লক্ষ মাইলে মাত্র একমাইলের জীবন ধারণ সক্ষমতা। এটি কিন্তু প্রকৃত চিত্র নয়। এর জন্য একটি সাদামাটা হিসাব আমরা করতে পারি এখানেই। প্রক্সিমা সেন্টুরাসের দূরত্ব ৪.৩ আলোকবর্ষ; এটিকে যদি আমরা স্বাভাবিক ও প্রতিনিধিত্বমূলক দূরত্ব হিসাবে ধরে নিই— এবং আমাদের পূর্ব ডাটায় প্রাপ্ত এক হাজার নক্ষত্রকে যদি একটি লাইনে সাজাই, তবে এই দূরত্বের পরিমাণ হবে প্রায় ৪৩০০ আলোকবর্ষ। তারারা এক লাইনে নয় এবং এই প্রকল্পিত হাজার তারার অবস্থানকে যদি একটি সাধারণ

www.pathagar.com

বিন্দু কেন্দ্রিক ধরে নেই। তবে ঐ সংখ্যক তারা ন্যূনতম যে ব্যাস তৈরী করবে তা কমপক্ষে হবে প্রাপ্ত সংখ্যাটির ১০ ভাগের এক ভাগ দূরত্বের। অর্থাৎ কমবেশি ৪০০ আলোকবর্ষের একটি গোলকে এক হাজার তারা আঁটানো সম্ভব হবে। আর ঐ ৪০০ আলোক বর্ষের মাঝে কেবল একটি পৃথিবীর ৮০০০ মাইলে জীবন সৃষ্টি হতে পারে। এর অনুপাতটি হবে হতবুদ্ধিকর। ৪০০ আলোকবর্ষের ব্যাসটির দূরত্ব কম-বেশি $2{\cdot}3 \times 10^{15}$ যার অনুপাত চিত্রটি দাঁড়ায় ২৮৭৫০০,০০০০০০০০০ ঃ ১ অর্থাৎ প্রতি ১ মাইল অঞ্চলকে জীবনময় করার জন্য স্রষ্টাকে প্রায় ৩ লক্ষ মহাপদ্ম মাইলের জীবনহীন তারকারাজ্য তৈরী করতে হয়েছে এই একটি মাইলের জীবনময়তা সেবায়। এই অনুপাতের দিকে তাকালে আমরা বলতে পারি— পৃথিবী ও তার মতো জীবন্ত গ্রহদের মূল্যমান অতি উচ্চতর; অন্ততঃ সৃষ্টির অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় তিন লক্ষ বিলিয়ন গুণ বেশি। এই অতি উচ্চ মূল্যমানসম্পন্ন পৃথিবীকে তাই আল্লাহ্পাক সম্মানে ভূষিত করতে চান— এবং তা-ই তিনি কোরআনের পাতায় পাতায় মুদ্রিত করে দিয়েছেন। একটু পরই আমরা তার বিশদ বিশ্লেষণ পাব।

তিন

স্টিভেন ওয়েনবার্গ ও সমজাতীয় বিজ্ঞানীদের সৃষ্টির বিশালতা সম্পর্কিত হতাশার একটি ভাল উত্তর এই ১০০০ঃ১ অনুপাতের পৃথিবী ব্যবস্থায় পাওয়া যেতে পারে। আমরা জানি যে, এই মহাবিশ্ব কেবল হাইড্রোজেন ও হিলিয়ামের সওগাত নিয়ে জন্মেছিল। মহাবিস্ফোরণে এর চাইতে আর বেশি কোনো কিছুই সৃষ্টি হয়নি। ৭৫ ভাগ হাইড্রোজেন ও ২৫ ভাগ হিলিয়ামের গ্যাস কখনই জমাটবদ্ধ বস্তুর গোড়াপত্তন করার উপযোগী নয়। আমরা সৃষ্টিতে আজ ১০৭টি মৌলের সাথে পরিচিত; এই মৌলদের আশীর্বাদেই কেবল দৃশ্যমান জগৎ বিশেষভাবে আমাদের এই জীবনময় পৃথিবী সম্ভব হয়েছে। আপনি যে দিকেই তাকান, হোক সে পানি কিংবা সর্বঘৃণ্য আবর্জনা

www.pathagar.com

কিংবা একটি ইঁদুর অথবা একটি মাছি কিংবা খাবারের থালায় রসনা যোগায় এমন যে কোনো উপাদেয়; তারা সকলই ঐ ১০৭টি মৌল–সদস্যদের কতিপয়ে সৃষ্ট। এরা পারস্পরিক ক্রিয়া বিক্রিয়া ঘটিয়ে লক্ষ লক্ষ যৌগমূল ও পদার্থ ভাণ্ডার তৈরী করে রেখেছে যার উপর জীবনের সঞ্চালন সম্ভব হয়েছে।

আপনার দেহে যত পদার্থ আছে, তাদের সবই কিন্তু নক্ষত্রদের রন্ধনশালায় তৈরী; এই পৃথিবীতে নয়! মহাবিশ্ব সৃষ্টি হবার পর একটি অতি সূক্ষ্ম আনুপাতিক বা পরিমাণগত ব্যবস্থা বিরাজ করেছিল যার ফলশ্রুতিতে গ্যাস বিস্তার সম–ঘনত্বে ছড়িয়ে না গিয়ে থোকায় থোকায় কিংবা গুচ্ছে গুচ্ছে জমা হয়। এদের মধ্যে অনেক জটিল ব্যবস্থায় তারাদের জন্ম হয়েছে। এই তারাদের জন্মের জন্য লক্ষ–কোটি বৎসর চলে যায়। তারারা জন্ম হয় বিভিন্ন আকৃতিতে— অতিকায় দানবীয় হতে শুরু করে সূর্যের মতো ও তার চাইতে ক্ষুদ্র ইত্যাদি আকৃতিতে। যে যে তারারা সূর্যের ভারের ১০–৩০ গুণ হতে পেরেছে; তারা অভিকর্ষ বলের প্রভাবে কালের প্রবাহে সৃষ্টি করেছে 'সুপারনোভা বিস্ফোরণ'। সুপারনোভা বিস্ফোরণ হলো অতিমাত্রায় অভিকর্ষ প্রভাবে মারাত্মক তাপীয় পরিস্থিতিতে এক মহাবিকট বিস্ফোরণ যা কেবল দানবীয় নক্ষত্রে ঘটে থাকে। এর পূর্বে তারাটিতে এক এক পরিস্থিতিতে এক এক ধরনের মৌলিক পদার্থের জন্ম হয়ে থাকে। বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে ঐ সব তৈরী হয়ে থাকা মৌলিক পদার্থগুলি সূক্ষ্ম–ধূলিমেঘে পর্যবসিত হয়— আর অসীম উত্তাপ ও তীব্র গতি নিয়ে তারা চলতে থাকে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর। চলার পথে তারা কোনো একটি নক্ষত্র ব্যবস্থায় কোনো ভাগ্যবান একটি গ্রহকে ঐ সব মৌলিক পদার্থের আশীর্বাদ ছড়িয়ে যায়। এভাবে হয়তো গ্রহটি মাত্র কয়েকটি মৌলের মজুদ একটি বিস্ফোরণ হতে পেয়ে যেতে পারে। কিন্তু শুধু সামান্য কটি মৌলের দ্বারাই জীবন সৃষ্টি ও প্রতিপালন সম্ভব নয়। চাই আরো সুপারনোভা বিস্ফোরণ, আরো আরো মৌলিক পদার্থ কণা। এভাবে

www.pathagar.com

কাল প্রবাহে একাধিক ও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সুপারনোভা বিস্ফোরণের দ্বারা তৈরী মৌলকে যদি একটি পৃথিবীকে দীর্ঘ সময়ের সূত্রে প্রেরণ করা যায়, কেবল তখনই জীবন সৃষ্টি হবার ভিত্তিটি স্থাপিত হয়। একটি গ্রহে জীবনের হাসি ফোটানোর জন্য এভাবে অনেক নক্ষত্রের জীবনকে বিসর্জন দিতে হয়। ঐ সব নক্ষত্রে যে সব পদার্থ কণা তৈরী হয়, তারা পরিণামে একটি শিশুর মুখে সুন্দর হাসি, একটি ফুলে সুন্দর রঙ ও গন্ধ, একটি জিভে রসনার স্বাদ

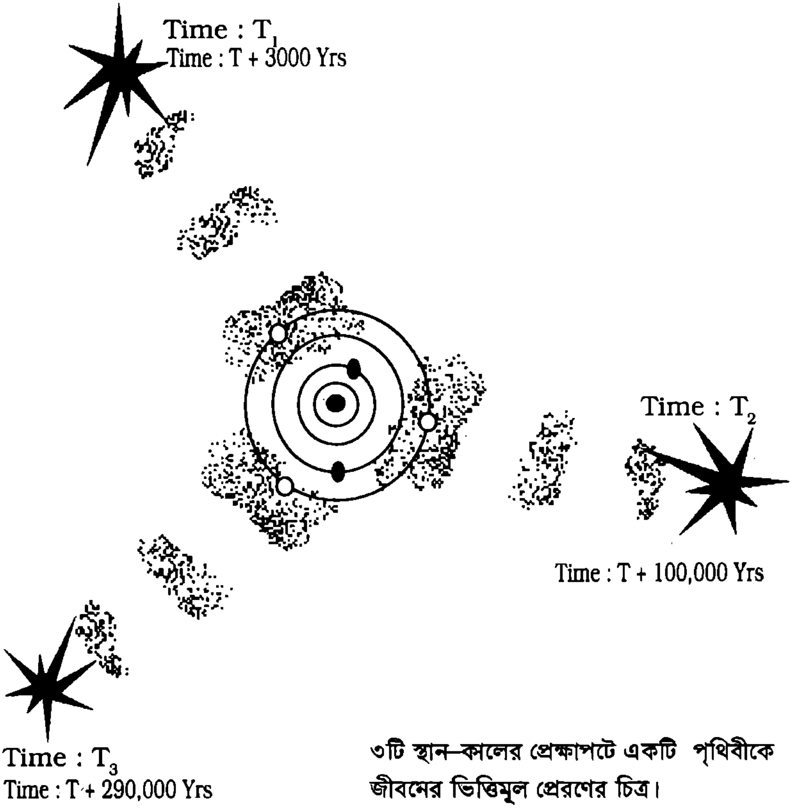

৩টি স্থান—কালের প্রেক্ষাপটে একটি পৃথিবীকে জীবনের ভিত্তিমূল প্রেরণের চিত্র।

সময়ের সুদীর্ঘ ব্যাপ্তি জুড়ে একাধিক সংখ্যক সুপারনোভা বিস্ফোরণ হতে প্রাপ্ত ভারী মৌলদের রসদে সৃষ্টি হয় জীবন পালনে সক্ষম এমন একটি গ্রহ। ছবিটিতে তিনটি কালের

www.pathagar.com

প্রেক্ষাপটে ৩টি সুপারনোভা বিস্ফোরণের ফসল একটি পৃথিবীতে প্রেরণ করা হচ্ছে। দুর্লভ ঘটনায় দুর্লভ পৃথিবী সৃষ্টির পেছনে এক অদৃশ্য পরিকল্পনা নিখুঁত সুক্ষ্মতায় কাজ না করলে কখনই পৃথিবীর মত আবাসস্থল তৈরী হতে পারতো না।

ও মানব–মানবীতে ভালবাসার অস্তিত্ব হয়ে প্রকাশ পায়। আমরা অনুভব করতে সক্ষম হই যে, সহস্র নক্ষত্রের মাঝে একটি পৃথিবীর অনুপাতটি আর কোনোভাবেই স্টিভেন ওয়েনবার্গের হতাশার কারণ হবার কারণ নেই। এই নক্ষত্ররা অনর্থক সৃষ্টি নয় এবং তারা উপযোগিতার স্কেলে প্রসারিত রয়েছে। কোরআনের ভাষায়— *"যাহারা দাঁড়াইয়া, বসিয়া এবং শুইয়া আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করে (তাহারা) বলে,— হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি ইহা অনর্থক সৃষ্টি কর নাই; তুমি পবিত্র"(৩:১৯১)।* আমরা বলতে পারি— হাজার নক্ষত্রে একটি জীবনের ব্যবস্থার বিশ্লেষণে এই আয়াত যথার্থই প্রসারিত। অর্থাৎ নক্ষত্রদের অতিমাত্রায় ছড়াছড়ির বিষয়টি কখনই হতাশকর বাড়াবাড়ি নয়। এটি পূর্বে উল্লিখিত 'ইলিশ' মাছের উদাহরণটির মতোই। এই সুবিশাল স্কেলে বিস্তৃত না করা হলে যে ঘটনাটি ঘটত, তা হলো— অনুকূল সুপারনোভা বিস্ফোরণে এক বা একাধিক নক্ষত্রের সওগাত পাওয়া সম্ভব হতো হয়তো; কিন্তু জীবন সৃষ্টির জন্য আরো যা দরকার, সে মৌলসম্ভার কখনই একটি পৃথিবী নাগালের মধ্যে পেত না। ফলতঃ এই মহাবিশ্বের কোনো ব্যবস্থাতে জীবনের স্পন্দন জাগরিত হবার সুযোগ সৃষ্টি হতো না। অসম্ভবকেই সম্ভব করে তুলবার জন্য কেবল অবাধভাবে সৃষ্টি করে রাখতে হয়েছে— তার কম হলে হয়তো পুরো সৃষ্টি ব্যবস্থাটিই একটি অপরিণামদর্শী বর্জে রূপান্তরিত হতো। জীবন হতো দুর্লভ কিংবা কখনই কোনো জীবনই আদৌ সৃষ্টি হতে পারত না।

চার

আমরা আমাদের কথিত প্রচলনে রাজা ও রানী, ধন ও রত্ন ইত্যাদি শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করে থাকি। এভাবে একটির বিপরীতে

www.pathagar.com

অন্যটি প্রকাশ করার জন্য এ ব্যবস্থাটি, যার প্রয়োজনীয় উপাদানটি হলো সমকক্ষতা। *'সামাওয়াতে ওয়াল আরদ'* এই সমাসবদ্ধ পদটি কোরআনের প্রায় পাতায় পাতায় বর্তমান। কোন্ প্রয়োজনে আল্লাহ্পাক ঘুরে ফিরে বারবার এই শব্দগুলি এভাবে ব্যবহার করেছেন— সে প্রশ্নটি জিজ্ঞাসায় উঁকি দেয়।

'সামাওয়াতে' শব্দটি বহুবচন। একটি গুচ্ছশব্দের একটি বহুবচন এবং অন্যটি একবচন; আর এর দ্বিত্বতা ঘটেছে বার বার। আদৌ এমনটির প্রয়োজন ছিল কি?

সম্ভবতঃ অনেকগুলি আকাশের তুল্যতার বিপরীতে একটি পৃথিবী হওয়া সত্ত্বেও এই পৃথিবীটি সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ— এই তথ্যটিকে আমাদের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্যই দয়াময়ের এ প্রকাশভঙ্গি। আশরাফুল মাখলুকাত সমেত সকল ধরনের জীবন এখানে বিকশিত হয়েছে। আর তা সাধন করা হয়েছে দীর্ঘ সময়ের ব্যাপ্তিতে অগণিত তারকাদের মাঝ হতে অসীম দূরত্বে অবস্থিত একাধিক নক্ষত্রদের সরাসরি আত্মদানের মধ্য দিয়ে। জীবনের সম্মান অর্জিত হয়েছে এই এবং হয়তো অনুরূপ পৃথিবীতেই। এই পৃথিবী কিংবা অনুরূপ কোনো জগৎ এদের মাঝেই মহাবিশ্বের স্রষ্টার মহাকীর্তির চূড়ান্ত বিকাশ ঘটেছে; আর কোথাও নয়। ফলতঃ এই পৃথিবী (কিংবা অনুরূপ পৃথিবীসমূহ) কেবল অনন্যতায়-ই বিকশিত। সম্ভবতঃ এই তথ্যটিকেই উদ্ভাসিত ও ন্যায্যতায় সঙ্গত করার জন্য দয়াময় প্রকাশের প্রতিক্ষেত্রে বহুবাচনিক আকাশের বিপরীতে একটি পৃথিবীর প্রস্তাবকে ঘুরে ফিরে পেশ করেছেন যেন আমরা প্রশ্ন করতে সক্ষম হই— এমন ব্যবস্থাটি কেন? বলা দরকার, অনুরূপ আর কোনো শব্দগুচ্ছ কোরআনে এভাবে ব্যবহৃত হয়নি। সে দৃষ্টিকোণ হতে 'অনেক আকাশ ও পৃথিবীর' প্রকাশভঙ্গিটি একটি অনন্যতার স্বাদ বহন করে।

www.pathagar.com

বহুবচনের বিপরীতে একবচন— এটি মূলতঃ সম্মান কিংবা গুরুত্ব প্রকাশের একটি উপায়। কোরআনে কোথাও কোথাও দেখা যায় যে আল্লাহপাক নিজ সম্পর্কে বর্ণনা করার সময় নিজের বাচন মানকে আধিক্যে অর্থাৎ বহুবচনে প্রকাশ করেছেন। অনেকেই এটিকে একটি সমস্যা হিসাবে ভাবেন। মূলতঃ এটি একদিকে সম্মান জ্ঞাপক ও অন্যদিকে বিনয় প্রদর্শন করার একটি ব্যবস্থা।

প্রশ্ন হতে পারে, সরাসরি পৃথিবীকে বহুবচনে এনে এর প্রকাশ সম্ভব ছিল কি? উত্তরে বলা যায়, 'আকাশসমূহ' বিশালতা কিংবা সংখ্যা যা-ই প্রকাশ করুক, তার সামর্থ্যে পৃথিবীর ন্যায্যতা বিধান করার কোরানিক অভিব্যক্তিটি কেবল গুরুত্ব বা সম্মানের অর্থেই প্রকাশিত হতে পারে— এ ছাড়া আর অন্য কোনো ব্যাখ্যাই এখানে প্রসার করা যায় না।

'সামাওয়াতি ওয়াল আরদ' শব্দগুলি আমাদেরকে বারবার মনে করিয়ে দেয়— এই পৃথিবী এক অনন্য সৃষ্টি; এই পৃথিবীর তুলনা কেবল অগণিত আকাশের সাথে; অনেক আকাশের বিপরীতে কেবল একটি পৃথিবী হলেও এখানেই আল্লাহপাকের নির্দেশ অবতীর্ণ হয় (৬৫:১২) এবং এখানেই সৃষ্টির সেরা 'জীবন' প্রকাশ পেয়েছে এবং সৃষ্টিজীবদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আশরাফুল মাখলুকাতের ঠিকানা নির্ধারণ করা হয়েছে। আল্লাহপাক এই মানুষদের প্রতি যে একটি সম্মানের অবস্থান দান করেছেন— এটি তারই একটি প্রত্যক্ষ প্রকাশ।

প্রশ্ন হতে পারে— যদি *'সামাওয়াতে ওয়াল আরদ'* শব্দগুচ্ছটি পৃথিবীকে সম্মান বিধানকারী ব্যবস্থা হয় তবে *'সাব'আ সামাওয়াতি ওয়াল আরদ'* এ ক্ষেত্রে সামাওয়াতি বা আকাশসমূহের বহুবচনের দ্বিত্বতা হতে আমরা কি বুঝতে পারি? *"তোমরা কি নিদর্শন প্রত্যক্ষ কর না যে আল্লাহ কেমন করিয়া অসংখ্য (সাব'আ) আকাশকে স্তরে স্তরে সৃষ্টি করিয়াছেন? (৭১:১৫), আল্লাহ হইতেছেন তিনি যিনি সৃষ্টি*

www.pathagar.com

করিয়াছেন অগণিত সংখ্যক আকাশ (সাব'আ) ও অনুরূপ সংখ্যক পৃথিবী" (৬৫:১২)। আমরা এরূপ আরো অনেক আয়াতেই *'সাব'আ'* শব্দটি প্রত্যক্ষ করি; আপনি অতিশয় সহজবোধ্যতায় হৃদয়ঙ্গম করবেন— আকাশের আধিক্য কিংবা সংখ্যার বিশালতা প্রকাশ যেখানে জরুরী, সেখানে কোরআন *'সাব'আ সামাওয়াতে ওয়াল আরদ'* ব্যবহার করেছে। অন্যপক্ষে যেখানে সংখ্যা জ্ঞাপকতা নিষ্প্রয়োজন— অর্থাৎ যে বর্ণনাটি একটি সাধারণ প্রকাশ আর যার সংখ্যাজ্ঞাপক প্রয়োজনীয়তা নেই— সে ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে *'সামাওয়াতে ওয়াল আরদ'।* একটি অন্যটি হতে বৈচিত্রে ও তথ্যে পৃথক। কোরআনে 'আকাশ ও পৃথিবী' এ ভাব প্রকাশ করতে *'সামাআ ওয়াল আরদ'* السموات والأرض এর ব্যবহার হয়নি কেন? এ প্রশ্নের বিপরীতে আমরা এ প্রবন্ধের কেন্দ্রীয় ধারণাকেই কেবল আবিষ্কার করতে সক্ষম হব যে— *'সামাওয়াতে ওয়াল আরদ'* শব্দগুচ্ছটি পৃথিবীর অবস্থানকে নায্যতায় ও সম্মানে ভূষিত করেছে আর তার মহামূল্যমানের চিত্রটি অঙ্কিত করেছে।

ফ্রেড হয়েল যে হিসাব দেখিয়েছেন— তাতে পৃথিবীতে বিজ্ঞানসম্মতভাবে কোনো জীবন থাকতে পারে না, কিংবা কোনো জীবন আদৌ রয়েছে— এ বক্তব্যটি মিথ্যায় পর্যবসিত হয়। পৃথিবীতে জীবনের মূল এমাইনো এসিডের উৎপাদনের সম্ভাব্যতা $10^{-40,000}$ এর চাইতেও কম। অর্থাৎ যদি একবার বলা হয় যে পৃথিবীতে জীবন রয়েছে— তবে ১ লিখে ৪০ হাজার শূন্য দিয়ে যে সংখ্যা হয়, ততবার বলতে হবে যে জীবন এখানে নেই। এই মহাবিশ্ব প্রকৃতপক্ষে জীবনের জন্য মোটেই অনুকূল নয়। বিস্ময়করভাবেই পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল, ভর, আকৃতি, পদার্থ, দূরত্ব, ঘূর্ণি, পানি ও মুক্তগ্যাস সহ আরো অসংখ্য উৎপাদক এমন ভাবে বিরাজ করে যে মহাবিশ্বের –২৭৩° কেলভিন এর ঠাণ্ডা পরিবেশে কিংবা শুক্রের মতো ৪০০° সেলসিয়াসের উত্তাপের পরিবেশে থেকেও এই পৃথিবীতে একটি বিস্ময়কর ও চমৎকার তাপীয় অবস্থা বিরাজ

www.pathagar.com

করে। এই অবস্থাটি যেন ধারালো ছুরির সূক্ষ্মভাগে অবস্থান নেয়া একটি ভারসাম্য ব্যবস্থা! এর এদিকে মৃত্যু, এর ওদিকে মৃত্যু; কেবল যা আছে, যেটি আছে শুধু তা-ই প্রকৃত নিয়ামক। ভারসাম্য ব্যবস্থায় যৎসামান্য ত্রুটি এই পৃথিবীর জীবনব্যবস্থাকে সমূলে শেষ করে দিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, আমরা যে অক্ষতীর্যকতার সাথে পরিচিত, তার মান হল ২৩$^{১}/_{২}$ ডিগ্রী। এই তীর্যকতাকে বাড়িয়ে যদি ২৪-২৫ ডিগ্রী করে দেয়া যায়— তবে পৃথিবীর সমুদ্রপৃষ্ঠ প্রায় ২০০ ফুট উপরে উঠে আসবে আর সমুদ্র হবে বরফের শীটে ঢাকা এক আন্তঃমহাদেশীয় উঠান। এই তীর্যকতা কমিয়ে যদি ২২-২১ ডিগ্রীতে আনা হয়— অর্কেটিক বরফের বিস্তৃতি সমগ্র ইউরোপকে গ্রাস করবে। গতির ক্ষেত্রে নিজ অক্ষে পৃথিবী যদি ২৪ ঘন্টার স্থলে ৩০ ঘন্টায় প্রদক্ষিণ সময় নিত— তবে সূর্যের উত্তাপের আধিক্য সৃষ্টি হতো। হাজার হাজার বিপত্তির পাশাপাশি এই পৃথিবী হয়ে পড়ত একটি ঝঞ্ঝাপীড়িত গ্রহ; সর্বক্ষণ এখানে কেবল

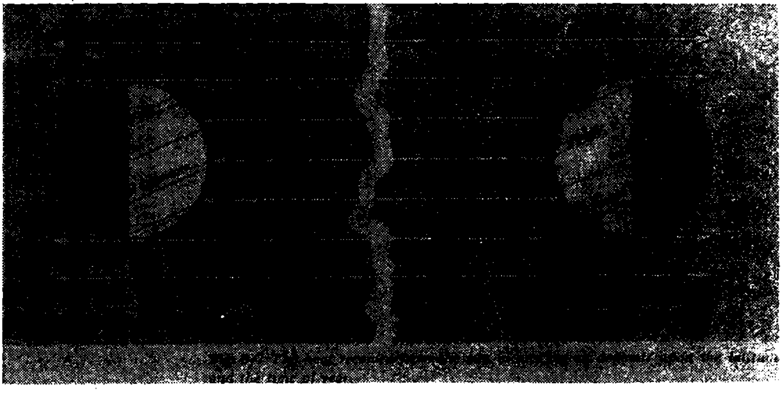

পৃথিবীতে সঠিক মাপের জলবায়ু ও তাপীয় অবস্থা রক্ষার জন্য সূক্ষ্ম হিসাব করা পরিমাপে ব্যবস্থাগুলি এঁটে দেয়া হয়েছে। তারমধ্যে পৃথিবীর অক্ষতীর্যকতা হলো এক অনন্য বৈশিষ্ট্য যার সামান্য হেরফের হলে পৃথিবীর চেহারা সমুল পাল্টে যাবে। পৃথিবী হয়ে পড়বে বসবাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য।

ঝড় বইতে থাকত। যদি এই চক্রটি ২০ ঘন্টার হতো— তবে

www.pathagar.com

পৃথিবীতে নেমে আসত অকাল দুর্ভিক্ষ। আলোক সংশ্লেষণের জন্য প্রয়োজনীয় সূর্যতাপের ঘাটতি খাদ্যমজুদকে সর্বনাশের দিকে নিয়ে যেত অল্প দিনেই। এভাবে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই পরিমাপের সূক্ষ্মতা বিধান করতে হয়েছে, তাকে লালন করতে হয়েছে, তাকে ধারণ করে রাখতে হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে একটি পৃথিবীর জন্য স্রষ্টাকে যে সব সূক্ষ্ম নিয়মের শাসন সৃষ্টি করতে হয়েছে— হাজারটি নক্ষত্র এমনকি মহাবিশ্ব ব্যবস্থাতেও ততটা প্রয়োজন পড়েছে কিনা তা সন্দেহের ব্যাপার! Big Bang কে আমরা যেভাবে দেখেছি— তা অতিশয় সাদামাটা! অথচ পৃথিবীর জন্য রয়েছে অজস্র নিয়মের ছড়াছড়ি। এই নিয়মগুলি সূক্ষ্মতায় এ নাজুকতায় আমাদের বিস্ময়কে স্তম্ভিত করে দেয়।

সমস্ত সৃষ্টিতে যেখানে বিশৃঙ্খলা (Entropy) বেড়ে চলে, সেখানে কেবলমাত্র পৃথিবীতে শক্তিস্রোত চলে সৃষ্টির মাঝে ব্যবস্থিত ধর্মের বিপরীতে। "Life feeds on negative entropy" এই চমৎকার ও অনন্য ব্যাপারটি কেবলমাত্র পৃথিবীতেই প্রত্যক্ষ করা যায়। এনট্রপি হলো বিশৃঙ্খলের দিকে শক্তির অবক্ষয়; আর সৃষ্টিতে এটি একটি অলঙ্ঘনীয় আইন। মহাবিশ্বের কোথাও, কোনো গ্যালাক্সি, কোনো নক্ষত্র— ইত্যাদি সবই শাসিত হচ্ছে এনট্রপিক নিয়মকানুনের ধারায়। কেবলমাত্র 'জীবনের' স্রোত প্রবাহিত হয় বিপরীত এনট্রপিতে। আর তার জন্য যা চাই— তা হলো পৃথিবীর মতো কোনো অনন্য বিকাশ। সত্যিকার অর্থে পৃথিবী অনন্য না হলে কখনো এখানে জীবনের বিকাশ সম্ভব হতো না।

পাঁচ

এই মহাবিশ্বে মানুষের সৃষ্টি সর্ব প্রাধান্য নিয়ে বিরাজ করে। এই মানুষের অবস্থানকে সমর্থিত করার জন্য সৃষ্টি হয়ে রয়েছে আরো হাজার জীবন— হোক সে জীব কিংবা উদ্ভিদ। মানুষ যদি সৃষ্টির

www.pathagar.com

উদ্দেশ্য হয় (এমন কি তা না হলেও), তবে এই সৃষ্ট জীবন ব্যবস্থার সুবিশাল বিস্তৃতি কেবল মানুষের কল্যাণেই নিয়োজিত রয়েছে। কোরআনের ভাষায় *"তিনিই তোমাদিগের কল্যাণে নিয়োজিত করিয়াছেন রজনী, দিবস, সূর্য এবং চন্দ্রকে; আর নক্ষত্ররাজিও অধীন রহিয়াছে তাঁহারই বিধানে। অবশ্যই উহাতে বোধশক্তি-সম্পন্নের জন্য নিদর্শন রহিয়াছে" (১৬:১২)*। একটি মানুষ কিংবা একটি পৃথিবী সৃষ্টির জন্য স্রষ্টাকে একটি মহাবিশ্ব সৃষ্টি করতে হয়েছে। শুধু এই মহাবিশ্ব সৃষ্টিতেই শেষ হয়নি ঘটনাটি, এর জন্য প্রয়োজন হয়েছে একটি সম্প্রসারণ ব্যবস্থার; এই সম্প্রসারণ ব্যবস্থাই আবার শেষ নয়; এর পেছনে রয়েছে একটি অতি হিসেব করা শক্তি ও পদার্থের অবস্থান— যার সহস্র সহস্র ভাগের এক ভাগ গতি বেশি হলে এই মহাবিশ্বে গ্যালাক্সিরা দানা বাঁধতে পারত না, নক্ষত্ররা পদার্থের আদি ভিত্তি 'মৌল'দেরকে তৈরী করতে সক্ষম হতো না এবং প্রয়োজনীয় সুপারনোভা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটতে পারত না এবং পৃথিবীতে অথবা মহাবিশ্বের কোথাও কোনো প্রকার জীবনের উন্মেষ হতো না। অন্যপক্ষে এই সম্প্রসারণ সহস্র সহস্র ভাগের এক ভাগ কম হলেও আবার গ্যালাক্সিরা কখনো নক্ষত্র তৈরী করতে পারত না এবং তৈরী হলেও তাদের কোনো দীর্ঘজীবন সম্ভব হতো না এবং সমস্ত বস্তুভর আর সমস্ত নক্ষত্র, গ্যালাক্সি মিলে কেবল বড় বড় কালো-বিবর বা ব্ল্যাক-হোল তৈরী করত। এই ব্ল্যাক-হোলরা মহাবিশ্বের যাবতীয় পদার্থকে গ্রাস করে বসত। একটি পৃথিবীতে জীবন সৃষ্টির জন্য স্রষ্টা প্রতিপালককে এতটা সূক্ষ্ম ও পরিমাণগত হিসাবের আশ্রয় নিতে হয়েছিল। কোরআনের ভাষায়— *"তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন যথার্থ আনুপাতিকতার সূক্ষ্ম পরিমাপে" (৬৪ঃ৩)*। তারপর রয়েছে শত সহস্র রকমের সমন্বয় ও প্রস্তুতি। বিস্ময়করভাবে পৃথিবীতে জীবনের আশীর্বাদ এসেছে। হোক সে অতি তুচ্ছ কীট বা হোক সে সৃষ্টির সেরা মানুষ— প্রত্যেকের মৌলিক জীবন-অণু এমাইনো এসিড ও তার উপরে প্রাণের আবির্ভাব হলো এই মহাবিশ্বের সবচাইতে

www.pathagar.com

কীর্তিময় ঘটনা। একটি এমাইনো এসিডের অণু তৈরীতে এই মহাবিশ্বের যাবতীয় পদার্থ ব্যবহার করা হলেও অতি দীর্ঘ সময়ের

সৃষ্টির দুর্লভ ফসল— এমাইনো এসিড ; আমাদের চারপাশে অতি অনাদরে যার ছড়াছড়ি। অথচ একটি এমাইনো এসিড তৈরীর পেছনে সময়ের যে ধারা তা হলো ১৫টি মহাপদ্ম বৎসর আর পদার্থের যে যোগান, তা হলো মহাবিশ্বের তাবৎ পদার্থ-দল। এমাইনো এসিড— জীবন তৈরীর মূল কণা ; তাদের সর্বোত্তম সংগঠন হলো মানুষের মস্তিষ্ক, যা মহাবিশ্বের স্রষ্টার সর্বশ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব।

পর কেবল একটি বিষাক্ত আমিষ-অণু তৈরী হতে পারে— যার উপর প্রাণের আবির্ভাব সম্ভব নয়। অথচ এই পৃথিবীর আনাচেকানাচে কত অযত্নে কত বিপুল বিস্তৃত প্রাণের ছড়াছড়ি আমরা দেখতে পাই।

www.pathagar.com

একটি নক্ষত্র কিংবা একটি গ্যালাক্সি আকৃতিতে অনেক বড়, অনেক শক্তির উৎস হওয়া সত্ত্বেও তারা কখনো প্রাণ সঞ্চারণের গৌরব পাবে না। জীবন সৃষ্টি হয়েছে এই পৃথিবীতে— এই কারণে এই পৃথিবীকে অতিশয় মর্যাদাময় কিংবা অতিশয় মূল্যবান করে তৈরী করতে হয়েছে। এই পৃথিবীতে রয়েছে দুর্লভ দ্রবণীয় 'পানি' যার বিশেষত্বের কাছে সমস্ত বিজ্ঞান স্তম্ভিত (মহাকাশ পর্ব-১, পানি দয়ার এক নিদর্শন দ্রষ্টব্য)। এই পৃথিবীকে ঘিরে স্রষ্টা তৈরী করেছেন এক অদৃশ্য ছাদ— যার নীচেই কেবল একটি সৃষ্টি ব্যবস্থা বিকশিত হতে পারে (বায়ুমণ্ডল ও পৃথিবী জীবন, পর্ব-১)।

এই যে মর্যাদা কিংবা এই যে মূল্যমান যার স্বর্ণালী আভা এই পৃথিবীর মুখকে উজ্জ্বল করেছে অতিশয় অনন্যতায়, তার স্বাক্ষরই দয়াময় ছেপে দিয়েছেন কোরআনের পাতায় পাতায়। অগণিত আকাশ আর পৃথিবী বা *'সামাওয়াতে ওয়াল আরদ'* —এই বাক্যাংশে এ সত্যই প্রস্ফুটিত হয় যে— একটি পৃথিবীর তুলনা শুধু অগণিত সংখ্যক আকাশে; একটি পৃথিবী আকারে যতই ক্ষুদ্র হোক— সে মূল্যের প্রশ্নে অগণিত আকাশের চাইতেও অনেক উত্তম স্থানে অবস্থান করে।

এই পৃথিবীতেই কেবল রয়েছে উদ্ভিদ, যারা আলোক সংশ্লেষণের অতি দুর্লভ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। এই পৃথিবীকে জীবনময় ও প্রাণময় অবস্থানে রাখার জন্য একটি অস্বাভাবিক বড় চন্দ্র এর সাথে রয়েছে। এর জল-তলের হিসাবও সূক্ষ্মতায় বিস্তৃত। তার ঘনত্ব, ভর, আকৃতি, মুক্তিগতি, জীব-উদ্ভিদ অনুপাত এবং সবশেষে নিকষ কালো চরম শীতল এবং অগ্নিময় মহাজাগতিক পরিবেশে বিস্ময়কর ভাবে উপভোগ্য ও উপযোগী একখানি চলমান গ্রহের অবস্থান ও বিশেষভাবে লক্ষ কোটি প্রজাতির জীবনময় এই গ্রহের সৃষ্টির মধ্যেই এই ছায়াপথ কিংবা মহাবিশ্বের পূর্ণাঙ্গতা রূপায়িত হয়েছে। জীবনের অনন্যতায় সম্মানিত ও মহাপরিকল্পনায় সৃজিত এই পৃথিবী আকৃতিতে ক্ষুদ্র হলেও, এটি সৃষ্টির সর্বতো সম্মান, জীবন—

www.pathagar.com

বিশেষভাবে আশরাফুল মাখলুকাতকে ধারণ করে রয়েছে। সম্ভবতঃ এই বিস্ময়কর বিশেষত্বের দিকগুলিকে মনে করিয়ে দেবার জন্যই দয়াময় অনেকগুলি আকাশের তুল্যে একটি পৃথিবীর প্রস্তাব বার বার এনে আমাদেরকে বোঝাতে চান যে— সহস্র আকাশ আর একটি পৃথিবী গুরুত্বের দিকে সমপর্যায়ভুক্ত।

"তিনিই মহান আল্লাহ যিনি পৃথিবীকে অনন্যভাবে আবাসযোগ্য করিয়াছেন (৪০:৬৪) এই নভোমণ্ডল ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, তৎসমূহকে তিনি তোমাদের সেবায় আয়ত্তাধীন করিয়া দিয়াছেন। নিঃসন্দেহে ইহাতে গভীর চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রহিয়াছে (৪৫:১৩) তিনিই ভূমণ্ডলস্থিত যাবতীয় কিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন (২:২৯), পৃথিবী পরিভ্রমণ কর এবং অনুধাবন কর তিনি কিভাবে সৃষ্টি আরম্ভ করিয়াছেন (২৯:২০), আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই— এবং তাঁহার দিকেই প্রত্যাবর্তন" (২৪:৪২), আল্লাহ্ই শস্য-বীজ ও আঁটি অংকুরিত করেন, তিনিই প্রাণহীন হইতে জীবন্তকে নির্গত করেন এবং জীবন্তকে প্রাণহীনে পর্যবসিত করেন। এই তো আল্লাহ্ সুতরাং তোমরা কোথায় ফিরিয়া যাইবে? (৯৬:৯৫)।

সুধীপাঠক! আপনি তাঁকে ভালবাসুন আর না-ই বাসুন, বিশ্বাস করুন আর না-ই করুন, আমরা সকলেই কেবল নিয়মের সাক্ষী। নিয়মই আমাদিগকে প্রত্যাবর্তিত করবে। আমরা সম্ভবতঃ যুক্তি, বুদ্ধি, বিদ্যা, চিন্তা ছাড়াই একটি সিদ্ধান্তে পৌছতে পারি যে— একটি শক্তি আমাদেরকে জন্ম, লালন-পালন ও জীবন নির্বাহ করার সকল সামর্থ্য যুগিয়েছে; আমাদের একই নিয়মের মৃত্যু সম্ভবতঃ তাঁরই কাছে ফিরে যাবার জন্যে। আমাদের প্রত্যাবর্তনের গতিমুখ কেবল একই দিকে— সেই অদৃশ্যের দিকে, যে অদৃশ্য হতে আমাদের আগমন! *"যাহারা না দেখিয়া দয়াময় আল্লাহকে ভয় করে ও বিনীতভাবে উপস্থিত হয় (৫০:৩৩) তাহাদিগকে বলা হইবে— শান্তির সহিত উহাতে প্রবেশ কর; ইহা তো অনন্ত জীবনের দিন" (৫০:৩৪)।*

আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।

www.pathagar.com

জীবনের সন্ধানে

জীবন !

এ হলো মহাকীর্তিমানের এক মহামহিমাময় সম্পাদন যার আর কোনো তুলনা নেই। জীবন, প্রাণ, রূহ, আত্মা ইত্যাদি সবই মূলতঃ পরিপূরক ধারণা, ভাষা ও শব্দের ব্যাপ্তিতে অনুভব বা ব্যাখ্যার ভিন্নতা থাকলেও আমরা মূলতঃ একটি সত্ত্বাকেই বুঝি। প্রাণ, রূহ, আত্মা বা জীবনের কোনো সংজ্ঞা হয় না, কোনো সঠিক রূপায়ন জানা যায় না। জীবন বা প্রাণ কি, তার কোনো দৈর্ঘ্য প্রস্থ ভেদ ওজন গন্ধ ইত্যাদি আছে কিনা আমরা জানি না। জীবন সম্পর্কে কোনো জ্ঞানই এগোয় না। অত্যন্ত অদ্ভুত যে, এ বিষয়ে সুস্পষ্ট তথ্য দেয়া আছে পবিত্র কোরআনে যে, প্রাণ বা জীবন সম্পর্কে মানুষের কিছুই জানা সম্ভব হবে না। জীবন থাকবে অজ্ঞেয় ও অজানা। বাস্তবেও তা-ই রয়ে গেল! বিজ্ঞান জীবন বা প্রাণের বিষয়ে বিন্দুমাত্র অগ্রসর হতে পারেনি। প্রাণের পরিমাপ তারা জানতে পারেনি, আর কখনো তা পারবেও না। *"উহারা প্রাণ সম্পর্কে প্রশ্ন করে? বল, প্রাণ আমার প্রতিপালকের আদেশঘটিত ব্যাপার এবং এ সম্পর্কে তোমাদেরকে অতি সামান্যই জ্ঞান দেওয়া হইয়াছে" (১৭:৮৫)।* দয়াময়ের আদেশেই প্রাণ বিকশিত হয় এবং এ প্রাণ সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান তুচ্ছতায় 'অতি সামান্য' অবস্থানেই রয়েছে— এই অতি সামান্যটির অর্থ হলো এমন যে, এই অঞ্চলে জ্ঞানের বড় একটা বৃদ্ধি ঘটবে না। এর সম্ভাবনার দিকটি আয়াতের উদ্ধৃত অংশটুকুই যেন গ্রাস করে ফেলেছে।

www.pathagar.com

প্রাণ বিষয়ক গবেষণায় জানা গেছে যে, পৃথিবীর বয়সের তুলনায় অনেক অনেক আগেই জীবনের উন্মেষ ঘটেছে। বিজ্ঞানের কাছে এ হলো বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা। এ অভিজ্ঞতার ভিত্তি পদার্থ ও তাদের ধর্ম অনুসারে স্রষ্টাহীন পরিবেশে প্রকৃতি হতে প্রাণের উদ্ভাবনের সম্ভাব্যতার উপর নির্ভরশীল। আমরা মহাকাশ পর্ব-১ এ দেখিয়েছি যে, সহস্র লক্ষ কোটি উপায়ে আমিষ-অণুর (এমাইনো এসিড) উদ্ভাবনের পদ্ধতি খোলা থাকলেও স্রষ্টাহীন পরিবেশে একটি মাত্র আমিষ-অণু তৈরী করার জন্য তাবৎ মহাবিশ্বে যতগুলি পদার্থ রয়েছে, তাদের সকলকে একত্রে মিলিয়ে রাখতে হবে কোটি কোটি বৎসর। তারপর এই বিপুল পরিমাণ পদার্থের প্রক্রিয়াজাত অংশগ্রহণে বিপুল সময়ের ব্যাপ্তিতে যে একটি আমিষ-অণু তৈরী হতে পারে, এর পদ্ধতিতে অতি সূক্ষ্ম হেরফেরের জন্য তা জন্মের সাথে সাথে বিষাক্ত দ্রব্যে পরিণত হবে— জীবনের স্পন্দন ধারণ করার জন্য তার আর কোনো যোগ্যতাই থাকবে না।

আজকের বিজ্ঞানীগণ বিস্ময়ের এই ধারা হতে সরে এসে আরো গুরুতর প্রশ্ন তোলেন— 'পৃথিবীতে আদৌ জীবনের অস্তিত্ব কেন বিরাজ করছে' পৃথিবী যখন তার আজকের বয়সের ২০ ভাগ সময় অতিক্রম করেছে (৩৫০০ মিলিয়ন বৎসর আগে), তখন হতেই জীবনের স্পন্দন অনুভূত হয়। অতটা আগে পৃথিবীতে জীবন স্পন্দিত হবে, এমন কোনো গ্রহণযোগ্য ও যুক্তিযুক্ত কারণই নেই। The chances of the amino acids and nucleotides forming in the primeval oceans and then coming together randomly to create enzymes, the substances that cause and direct the numerous chemical reactions that occur in living organisms, it has been estimated at something like against 10^{78}. বস্তুধর্মের নিয়মনীতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এনজাইম তৈরীর সম্ভাব্যতা ও সম্ভাবনাহীনতার অনুপাত ১ঃ১,০০০,০০০,০০০,০০০, ০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০ ,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০(৭৮টি শূন্য)। অর্থাৎ

www.pathagar.com

এর সম্ভাবনা যদি একবার হ্যাঁ হয়, তবে না হবে এক লিখার পর ৭৮টি শূন্য দিয়ে যত বড় সংখ্যা তৈরী হয়, তার সমান (দশ লক্ষ মহাপদ্মকে প্রতিবার মহাপদ্ম (বিলিয়ন) দিয়ে আরো ৭ ঘাত গুণ দ্বারা যে ফলাফল পাওয়া যাবে, তার সমান। এ সংখ্যা ভাষায় প্রকাশ সম্ভব নয়)। বিজ্ঞানীরা এই সম্ভাবনাহীনতার সামনে আর কোনো তথ্যকেই যুক্তিযুক্ত করে দাঁড় করাতে পারেন না। হতাশ হয়ে বলতে বাধ্য হোন— 'There is a complete gap in our explanation as to why life has developed at all on Earth'? — জীবন আদৌ কেন সৃষ্টি হয়েছে, কি করে সৃষ্টি হয় এই সম্ভাবনাহীনতার মাঝে আমরা যে পৃথিবীতে সঅস্তিত্বে বর্তমান রয়েছি, এ সত্যটি মিথ্যায় পর্যবসিত হয়ে পড়ে। Sir Bernard Lovell এর ভাষায়— It strikes me as extraordinary that life emerged so early in the earth's history. পৃথিবীর ইতিহাসে জীবন এত আগে এসে গেছে, তা এক বিস্ময়কর ঘটনা!

পৃথিবীতে জীবনের উন্মেষ নিয়ে বিজ্ঞানের এই বিস্ময়বিহ্বলতা কিন্তু আমাদেরকে চমৎকার একটি তথ্য দান করে। যে জীবন উন্মেষ হবার কথা ছিল না, সে জীবনের এত বিস্ময়কর ছড়াছড়িতে ধন্য পৃথিবীর উপর একটি সুনিশ্চিত অদৃশ্য হস্তের ছায়া আমরা দেখতে পাই। দেখতে পাই এক মহাকুশলী মহাবিস্তার স্রষ্টার স্বাক্ষর—*"মহান আল্লাহই শস্যবীজ ও আঁটি অংকুরিত করেন ; তিনি প্রাণহীন হইতে জীবনের প্রবাহ ঘটান (৬:৯৫) তোমরা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি যে বীজ তোমরা বপন কর তাহার সম্বন্ধে? (৫৬:৬৩) তোমরা কি উহা অংকুরিত কর— না আমি? আমি ইচ্ছা করিলে উহাকে খড়কুটায় পরিণত করিতে পারি (৫৬:৬৫)। আমিই পানিতে ব্যবস্থিত করিয়াছি সকল জীবনের উৎস— তবু কি উহারা বিশ্বাস করিবে না?" (২১:৩০)।*

www.pathagar.com

কোরআনে আমরা শুধু মানুষের জীবনের উন্মেষ সম্পর্কে যে সূত্র পাই— তা হলো মাটি বা তুচ্ছ কর্দম জাতীয় মাটি কিংবা শক্ত মাটির নির্যাস হতে মানুষের অবয়ব সৃষ্টি এবং উহাতে আল্লাহ তাঁর নিজ রূপ বা spirit ফুঁকে দেয়ার একটি তথ্য (১৫:২৮–২৯)। অন্যদিকে ১৭:৮৫ আয়াতে দেখা যায় যে এই 'রূহ' বা Spirit হলো একটি আদেশ বা Command; আজকের বিজ্ঞানের কল্যাণে আমরা অবগত রয়েছি জীবনের মৌলিক বস্তু DNA একটি পরিপূর্ণ কমাণ্ড কোড–এ চালিত সম্পূর্ণ পূর্বাহ্নে স্থিরকৃত ব্যবস্থাপত্র— কোন্ সময়ে কোন্ পরিবর্তন সংযোজন বা বিয়োজন দরকার, তা এর Command code হতে নির্দেশিত হয়। কম্পিউটর চিপসে'র চাইতেও লক্ষ কোটি গুণ দক্ষতা সম্পন্ন এই DNA শাশ্বত ও অপরিবর্তিত রীতি–নীতির মাপকাঠিতে জীবনের বিস্তারে লক্ষ কোটি পরিবর্তন সৃষ্টি করে জীবনের প্রবাহকে মূলতঃ একটি একক ধারায় অব্যাহত রাখে। সময়ের এতটা পূর্বে কেন জীবনের সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে— আমরা এ প্রশ্নের ব্যাখ্যাশূন্যতায় আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে এনে বসিয়ে দিলে পরবর্তীতে একটি বিস্ময়কর মিল দেখতে পাই— যা হলো জীবন একটি প্রোগ্রাম করা কোড–কমাণ্ড পদ্ধতিতে প্রবাহিত হবার পেছনে সম্ভবতঃ সে মহা স্রষ্টার আদেশ বা Command এর সত্যতাটি যেন অলক্ষ্যে এসে দাঁড়িয়ে যায়। *"প্রাণ (বা জীবন)... বল ইহা আমার প্রতিপালকের আদেশঘটিত ব্যাপার, এ সম্পর্কে তোমাদেরকে অতি সামান্যই জ্ঞান দেওয়া হইয়াছে" (১৭:৮৫)।* DNA সম্পর্কে মানবিক জ্ঞানের বিস্ময়কর সাফল্য অর্জিত হয়েছে নিঃসন্দেহে বলা যায়; তবু এই DNA–এর পেছনে অদৃশ্য চালিকাশক্তি প্রাণের বিষয়ে জ্ঞান এক তিলও অগ্রগতি পায়নি।

পৃথিবীর আর কোনো ধর্মগ্রন্থ আপনাকে জীবন বা প্রাণ সম্পর্কে এর চাইতে বেশি বাস্তব চিত্র দেয়নি, এবং কোরআন যতদূর দিয়েছে— তাতে বিস্ময়করভাবে বিজ্ঞানের শত সহস্র বৎসর অগ্রজ হয়ে তার অবস্থানকে সুদৃঢ় করেছে। আজ ব্যাখ্যার উর্ধ্বে প্রমাণিত

www.pathagar.com

হয়েছে যে— প্রাণ সত্যিই একটি একক ও অদৃশ্য কমাণ্ড কোডে চালিত অজ্ঞেয় ব্যবস্থাপনা, যার মাঝে DNA/RNA ইত্যাদি হলো তার বাহন কিংবা হাতিয়ার। আর এ বিষয়ে বেশি জ্ঞান লাভ করার সম্ভাবনা প্রায় নেই— কিংবা এ বিষয়ে মানবিক জ্ঞান বড় একটা প্রসারিত হবে না— যেভাবে ১৭:৮৫ আয়াতটি আমাদের জানিয়েছে— *"এই বিষয়ে তোমাদেরকে সামান্য জ্ঞানই দেওয়া হইয়াছে।"*

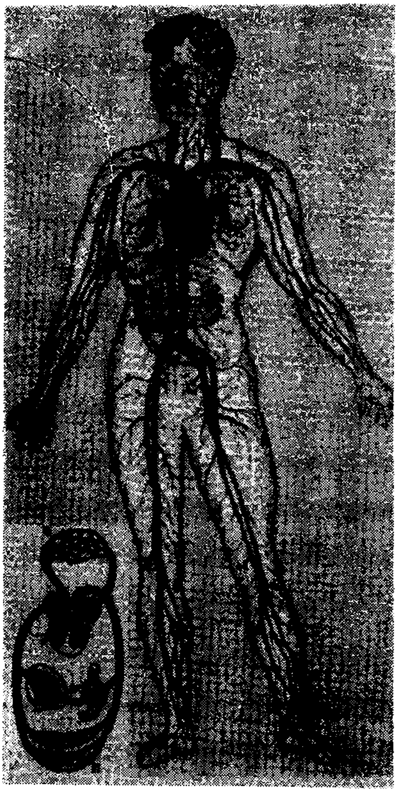

মানুষের দেহযন্ত্র। আমিষ অণুতে তৈরী সর্বোচ্চ ও সর্বোৎকৃষ্ট সংগঠন— সৃষ্টিতে যা কেবল অনন্য। নিয়ন্ত্রিত হয় প্রাণ নামক অদৃশ্য, অজ্ঞেয় অতিজাগতিক কমাণ্ড-কোড দ্বারা। এ দেহের কোনখানে তার আবাস তা কেউ জানে না। তা কেউ জানবেও না কখনো।

সুধী পাঠক— আমাদের এই প্রবন্ধের মূল প্রস্তাবটি কিন্তু অন্য এক সত্যের উদঘাটন, যা আপনার সমস্ত হৃদয়-মনকে অভিভূত শ্রদ্ধায় কোরআনের পবিত্রতার সামনে নতশির করবে। আমরা

www.pathagar.com

বিস্ময়াভিভূত হয়ে দেখব বিজ্ঞানের কত গুরুতর তত্ত্ব ও তথ্যই-না কত সাধারণভাবে পবিত্র কোরআন মানুষের জ্ঞানচর্চার উপকূলে ফেলে দিয়ে গেছে! যেমন করে জোয়ারের জলোচ্ছ্বাস সমুদ্রবেলায় ঝিনুক ছড়িয়ে যায়। চলুন আমরা আলোচনার মুখ ভিন্ন দিকে ঘুরিয়ে বসি।

দুই

আপনার হয়তো শুনতে অবাক লাগবে যে Living thing are composed of lifeless molecules— সমস্ত জীবকুলের সৃষ্টি হয়েছে সে সব অণু দ্বারা, তারা নিজেরা জীবনহীন— মৃত! এ হলো শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম আবিষ্কারগুলির একটি, যা কেবল কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যা ও রাসায়নিক বস্তু, ডাবল হেলিক্স (double helix), এনজাইম ইত্যাদি ক্ষেত্রগুলি সম্পর্কে মানুষের জ্ঞানার্জনের মাধ্যমেই সম্ভব হয়েছে! শতাব্দীর শীর্ষতম জ্ঞান ও অভিজ্ঞতায় মানুষ যা জেনেছে— কোরআন সে তত্ত্বটিকে অতিশয় সহজ তথ্যে উপস্থাপন করেছে মানুষের সামনে।

আল্লাহ্ পাকের অসীমত্ব ও তাঁর ক্ষমতা, পরিচায়ক বাণী "*(বল), তুমিই মৃত অস্তিত্ব হইতে জীবনের প্রবাহ ঘটাও" (৩:২৭)* আমাদেরকে সচরাচর একটি সাধারণ অনুভবের চিত্র দিয়ে থাকে যে, তিনি যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারেন এবং সেই সুবাদে তিনি মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করে সেখান হতে পরবর্তী জীবনের ধারা প্রবর্তন করতে সক্ষম ইত্যাদি। প্রকৃতপক্ষে এই বাণীর বিসংশ্লিষ্টতা কিন্তু এর চাইতে অনেক অনেক উর্ধ্বে এবং এটি একটি পরিপূর্ণ বৈজ্ঞানিক তথ্য যা আমাদেরকে বিস্ময়ে বিমোহিত করে। আমরা এই পাঠে এই অতি সাধারণ অথচ অতি মূল্যবান বৈজ্ঞানিক আয়াতটির স্বরূপ সন্ধান করব।

এই পৃথিবীতে যেভাবে জীবন সঞ্চারিত হয়েছে, তাদের সকলেরই দেহকলা গঠনে কার্বন-যৌগরা মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে।

www.pathagar.com

কার্বন যৌগরা হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, ফসফরাস ও নাইট্রোজেন ইত্যাদি মৌল সমেত গঠিত— এরা জীবনের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু কিছু অতি প্রয়োজনীয় যৌগ রয়েছে যারা দেহ কোষকলা কিংবা সংগঠনের সাহায্যকারী তো বটেই, দেহের সমুদয় কোষকলা ও ব্যবস্থাদি কার্যক্ষম করে রাখার একক কৃতিত্বের দাবিদার, তারা হলো প্রোটিন। আপনার দেহে প্রায় ৫০ হাজার বিবিধ রকমের প্রোটিন রয়েছে। সমস্ত প্রোটিনরা অতিক্ষুদ্র 'সাব-ইউনিট' দ্বারা তৈরী যাদেরকে বলে এমাইনো এসিড। এই এমাইনো এসিডরা একটি চেইন-ওয়ার্কে একটির সাথে অন্যটি সংযুক্ত থাকে। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো যে জীবদেহের সমস্ত প্রোটিন তথা এই পৃথিবীতে প্রাপ্ত যাবতীয় প্রাণের সমস্ত প্রোটিন কেবল ২০টি মৌলিক এমাইনো এসিড দিয়ে তৈরী। তারা বিভিন্ন বিন্যাস বা order এ সংগঠিত হয়। একটি ইংরেজী পুস্তক (তা যত বড় হোক) এর কথা ধরুন। ২৬টি অক্ষর বা বর্ণ বিভিন্ন সংগঠন ও বিন্যাসে একটি বিস্তৃত পুস্তক তৈরী করে ফেলে। ঠিক তেমনি ২০টি এমাইনো এসিডের মৌলিক জীবন সৃষ্টিকারী কণাদের সমন্বয়ে অসংখ্য হতে অসীম সংখ্যক ভিন্ন ভিন্ন প্রোটিন তৈরী হওয়া সম্ভব। দেহের কোষকলারা হলো এই প্রোটিন তৈরীর কারখানা। অতি বড় প্রোটিন অণুরা (macromolecules) একটি পূর্ণাঙ্গ তথ্যের কিংবা একটি বাক্যের সমানুপাতিক এবং ক্ষুদ্র অণু এমাইনো এসিড সংকেত লিপির অক্ষর যেন। দেহের বিভিন্ন সহজ ও জটিল কর্মকাণ্ড পরিচালনা, পরিবর্তন, ক্ষয়, বৃদ্ধি ব্যতিক্রম ইত্যাদি সবই এই প্রোটিনদের জেনেটিক কোডে নির্দেশিত জীবনের ভাষায় পূর্বাহ্নেই লিখিত হয়ে থাকে। 'ক্রোমোসোম' বাহিত প্রজনন উপাদানদের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হলো কোষকে নির্দেশ প্রদান করা যেন সঠিক সময়ে সঠিক প্রোটিনটি উৎপাদন করে জীবনের অব্যাহত ধারাকে বজায় রাখতে সক্ষম হয়। ক্রোমোসোমে যতটা তথ্য মজুদ থাকে, তা মূলতঃ এই ২০টি এমাইনো এসিডের 'অক্ষর' কর্তৃক লিপিবদ্ধ একটি নির্দেশমালা যা জেনেটিক ভাষায় (Double helix) লিখা হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

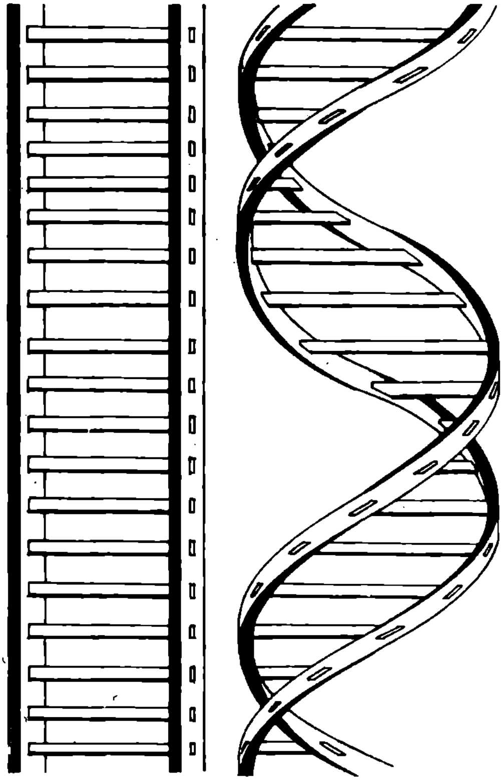

২০টি মূল এমাইনো এসিডের অক্ষরে লিখিত ভাষায় জীবনের মহাকাব্য। ভাষাটি জেনেটিক্স-কোড; যা Double helix এর সংগঠনে প্রয়োজন অনুসারে প্রোটিন তৈরী করে। প্রোটিনরা হলো দেহের আকৃতি ও কার্যক্রম পরিচালনার মৌলিক ভিত্তি। পুরুষের পর পুরুষ মৃত্যুর কোলে আত্মসমর্পণ করে। বেঁচে থাকে জেনেটিক্সের ভাষা; অনাদিকাল হতে বিলয়কাল পর্যন্ত। এরা স্রষ্টার সৃষ্টির Signature বা সাক্ষী।

আমরা বলতে পারি— জীবনের সব তথ্য, নির্দেশ, বংশ, পরিবর্তন, রোগ, জরা ইত্যাদি সবকিছুর মূলে রয়েছে প্রোটিন। Proteins, in all living things on Earth, are composed of different permutation and combinations of the same basic amino aids, just 20 different varieties এবং সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো— On their own, amino acids have no intrinsic biological properties— thery are not living molecules. Joined together to make protein, however, they become the very staff of life.

www.pathagar.com

যে জীবন সৃষ্টি করে, সে নিজে জীবন্ত নয়— তার কোনো জৈবিক চরিত্র নেই, সে মৃত পদার্থের ন্যায় ও মৃত এবং এই জীবন কিংবা জৈবিক চরিত্রহীন ও জীবনহীন পদার্থদের দ্বারাই জীবনের সৃষ্টি— কত বিস্ময়কর নয় কি! তা হলে কি কোরআন শুধুমাত্র খেলাচ্ছলে এ কথাটি বলেনি যে— *(বল) 'তুমিই প্রাণহীন' কিংবা মৃত অস্তিত্ব হইতে জীবনের প্রবাহ ঘটাও?'* কোরআন এ ক্ষুদ্র বাণীতে

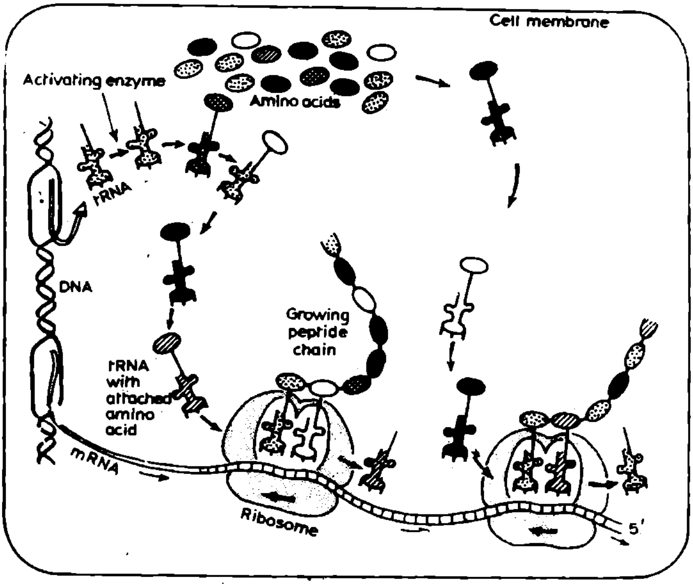

এনজাইম গুচ্ছ এমাইনো এসিডকে বিভিন্ন উপায়ে একটি ব্যাকটেরিয়ায় ব্যবস্থিত করছে DNA এর নির্দেশ অনুসারে। এই সংগঠনের জন্য দরকার কমপক্ষে ৩২ রকম বিভিন্ন প্রোটিন। DNA তার ব্লু-প্রিন্টের নক্সা অনুসারে যখন যতটা নিয়ন্ত্রণ দরকার, তা বিধান করে যাচ্ছে এক অদৃশ্য তাড়নায়। আর এই মূল জীবন প্রক্রিয়াটি নির্ভর করে বসে আছে প্রাণহীন এমাইনো এসিডের উপর, যেন আল্লাহর বাণীকে সত্য করতে যে, তিনি প্রাণহীন হতে জীবনের প্রবাহ সৃষ্টি করেন। আমরা জানি না, এত সূক্ষ্ম ডিএনএ জগতে এই মহা-নক্সার ব্লুপ্রিন্ট কে তৈরী করে রেখেছে যার মৃত্যু নেই!

এক যুগের আবিষ্কারের সারাংশ তথ্য দিয়ে বসেছে। 'এই ক্ষুদ্র এমাইনো এসিড দল যে মৃত, তারা যে জীবন্ত কোনো অস্তিত্ব নয়

www.pathagar.com

এবং তাদের যে জৈবিক চরিত্র নেই— এই প্রাপ্তিতে পৌঁছার জন্য বিজ্ঞানকে অন্তত কোয়ান্টাম ফিজিক্স ও কোয়ান্টাম বায়োলজির সর্বোচ্চ আবিষ্কারের সাফল্য পর্যন্ত অপেক্ষা করে থাকতে হয়েছে। আমরা জানি না, কেবল পরিপূর্ণ সত্যদ্রষ্টা ও বিজ্ঞানময় স্রষ্টা ব্যতীত এই গুরুতর তথ্যটি খ্রীষ্টীয় সাত শতকে বসে অন্য কেউ দিতে সক্ষম হতো কিনা। অন্তত এইটুকু বলতে দ্বিধাগ্রস্ত হবার কারণ নেই যে— একমাত্র কোরআন ব্যতীত পৃথিবীর কোনো ধর্মগ্রন্থ, কোনো বিজ্ঞান, কিংবা কোনো জ্ঞানের বাণী এই গুরুতর তথ্যটি ইতিপূর্বে প্রদান করেনি কিংবা কেউ তা জানতে পারেনি যে রহস্যময় জীবন মূলতঃ একদল মৃত ক্ষুদ্রতম অস্তিত্ব হতেই উদ্ভূত! আমরা স্তম্ভিত বিমূঢ়তায় কোরআনের প্রতি শ্রদ্ধামধুর বিনয় না পেশ করে আর পারি না। মেনে নিয়ে বলতে হয়—*"তোমার প্রভুর বাক্য সম্পূর্ণ সত্য ও ন্যায়সঙ্গত, তাঁহার বাণী কেহই মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতে পারিবে না (৬:১১৬)। আমি তো কোরআনকে সদুপদেশের জন্য সহজবোধ্য করিয়াছি —অতঃপর কেহ কি উপদেশ গ্রহণ করিবে?"*

"আমিই তাহাকে (মানুষ) ব্যবস্থিত করিয়াছি এমন যে, হয় সে কৃতজ্ঞ হইবে নাহয় সে অকৃতজ্ঞ হইবে (৭৬:৩) স্মরণ কর— সেই দিন তিনি তোমাদিগকে সমবেত করিবেন সমাবেশ দিবসে। সেই দিন হইবে লাভ ও লোকশানের দিন। যে ব্যক্তি আল্লাহকে বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে, তিনি তাহার পাপ মোচন করিবেন এবং তাহাকে দাখিল করিবেন জান্নাতে, যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেথায় তাহারা হইবে চিরস্থায়ী" (৬৪:৯)।

"সেইদিন জাহান্নামকে আনয়ন করা হইবে এবং সেই দিন মানুষ উপলব্ধি করিবে— কিন্তু এই উপলব্ধি তাহার কি কাজে আসিবে? (৮৯:২৩); সে বলিবে, হায়— আমার এ জীবনের জন্য আমি যদি কিছু 'অগ্রিম' প্রেরণ করিতাম (৮৯:২৪) উহারা বলিবে, আমরা যদি শুনিতাম অথবা বিবেক প্রয়োগ করিতাম, তাহা হইলে আমরা

www.pathagar.com

জাহান্নামের অধিবাসী হইতাম না (৬৭:১০) বল— হে সার্বভৌম শক্তির মালিক আল্লাহ! তুমি যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমতা প্রদান কর এবং যাহার নিকট হইতে ইচ্ছা ক্ষমতা কাড়িয়া লও; যাহাকে ইচ্ছা তুমি পরাক্রমশালী কর। আর যাহাকে ইচ্ছা তুমি হীন কর। কল্যাণ তোমারই হাতে। তুমি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান (৩:২৬) তুমিই রাত্রিকে দিবসে পরিণত কর এবং দিবসকে রাত্রিতে পরিণত কর; তুমিই মৃত অস্তিত্ব হইতে জীবনময় অস্তিত্বে প্রবাহ ঘটাও, আবার জীবন্ত হইতে মৃতের আবির্ভাব কর। তুমি যাহাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবনোপকরণ দান কর (৩:২৭) আল্লাহই শস্যবীজ ও আঁটি হইতে অংকুর উদগত করেন— তিনিই প্রাণহীন হইতে জীবন্তকে নির্গত করেন আর জীবন্তকে প্রাণহীনে পর্যবসিত করেন। এই তো আল্লাহ —সুতরাং তোমরা কোথায় ফিরিয়া যাইবে?" (৬:৯৫)।

আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।

www.pathagar.com

মহাবিশ্বের ভবিষ্যৎ
ও
Burst of Creation তত্ত্ব

এক

"প্রশংসা তাঁহারই যিনি প্রত্যেক অস্তিত্বের প্রতি–যুগল (anti) সৃষ্টি করিয়াছেন যেন তোমরা নির্দেশ পাইতে পার"। (৫১:৪৯)

কোরআনের এ সত্যতার প্রতি স্বীকৃতিস্বরূপ ল্যাবরেটরিতে anti-matter সৃষ্টি করা সম্ভব হলো। Anti-proton ও positron তৈরী করার সাথে সাথে মানুষের মনে বদ্ধমূল ধারণার জন্ম নিল যে সৃষ্টির কোনো না কোনো ঠিকানায় প্রতিবস্তুর বিস্তৃতি রয়েছে এবং তা থাকতেই হবে। আয়াতে ব্যবহৃত كل ও زوجين শব্দ দুটির প্রতি চোখ ফেললে আপনি দেখবেন, বাংলায় ধারণকৃত অর্থ কিংবা ব্যাখ্যা মূল প্রস্তাব হতে যেন আবেগে সত্যতায় দূরত্ব রচনা করে রয়েছে। প্রত্যেক বস্তুর যুগল সৃষ্টি করেছেন— শুধু এইটুকু অর্থকরণের দ্বারা মূলতঃ মূল আরবী প্রস্তাবটির উপর প্রচণ্ডরকমের সীমাবদ্ধতা আরোপ করা হয়েছে। মনে রাখা দরকার যে, كل شئ শব্দ দুটির অর্থ হলো— যা কি তাবৎ, তার প্রত্যেকটি এবং তা হতে একটিও বাদ নয়। অন্যদিকে زوجين একটি দ্বিবচন। এর অর্থ যুগলই শুধু

www.pathagar.com

নয়— এমন যুগল যারা পরস্পরের বিরুদ্ধাচারী কিংবা প্রতিক্রিয়াশীল বা বিপরীত ধর্মী। এদের সম্পর্ক রয়েছে ব্যবহৃত خلق ধাতুটির সঙ্গে যা একটি নির্ধারিত পরিমাপ/সংখ্যার সীমাবদ্ধতা আরোপ করে। এই সব দৃষ্টি রেখে আমরা ৫১:৪৯ আয়াতের যে সম্ভাব্য গ্রহণযোগ্য অনুবাদ নিতে পারি, তার প্রকৃতি হবে এমন— *"আমরা সৃষ্ট সকল বস্তুকে অস্তিত্বে আনয়ন করিয়াছি পরস্পরের প্রতি প্রতিক্রিয়াশীল প্রতি-যুগলে এক নির্ধারিত পরিমাপের ভিত্তিতে। তথ্যটি তোমাদেরকে অবগত করা হইলো যেন তোমরা ভাবনার (গবেষণা) সূত্র পাও।"* মূলকথা, প্রতিটি সৃষ্টিই প্রতিযুগল সহ সৃজন হয়েছে— এই বক্তব্যই এ আয়াত সুস্পষ্টতায় জানাতে চায়।

প্রতিবস্তু হল স্বাভাবিক বস্তুরই প্রতিরূপ; আর প্রতিবস্তুর 'সাব-এটমিক পার্টিক্যাল স্পীন' স্বাভাবিক বস্তুর সাব এটমিক পার্টিক্যাল স্পীনের উল্টা দিকে মাত্র। প্রতিবস্তুর জগতে একটি মানুষ আমাদের মতো নিজেকে স্বাভাবিক ভাববে এবং আমাদের ভাববে প্রতিমানুষ। তবে এই দুই জগতের মানুষের যদি সাক্ষাৎ সম্ভব হতো এবং তারা যদি পরস্পরের সাথে করমর্দন করতে চাইত তবে একে অপরের সংস্পর্শে আসা মাত্র ঘটে যেত এক প্রকাণ্ড বিস্ফোরণ। দু'জনের হাড় মাংস অস্তিত্ব সব শূন্যে বিলীন হতো— কোনো অবশেষও থাকত না।

বিজ্ঞানীগণ আজ কোনোরূপ অস্বচ্ছতা না রেখেই গ্রহণ করেছেন যে, শূন্যতার (void) কোনো সীমানায় একটি সমান্তরাল মহাবিশ্ব হিসাবে বিপরীত বস্তুর এক মহাজগৎ রয়েছে যার আইনকানুন আমাদের মহাবিশ্বেই অনুরূপ। আমাদের মতোই প্রতিবস্তুর মহাবিশ্ব সম্প্রসারণশীল অবস্থায় বিরাজ করে। এই ধারণাটি কেবল তাত্ত্বিকভাবেই গ্রহণযোগ্য— কারণ এর কোনো বাস্তবতা নেই, সত্য হলেও এর বাস্তব সম্ভব নয়। জ্ঞানের দৈর্ঘ্যে যত বড় বিস্তৃতিই ঘটুক— এই তথ্যের প্রমাণ সত্যে কিংবা মিথ্যায় কখনো নিষ্পত্তি করার মতো নয়। কারণ এই প্রমাণের কাছাকাছি যাবার অর্থ হলো এক

www.pathagar.com

মহাধ্বংস! প্রতিবস্তু ও প্রতিমহাবিশ্ব আমাদের বিজ্ঞানের এক সুপরিচিত বিবেচনা যার সম্পর্কে কোনো বিরোধ নেই। আর এই গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণের মুখাপেক্ষী নয়।

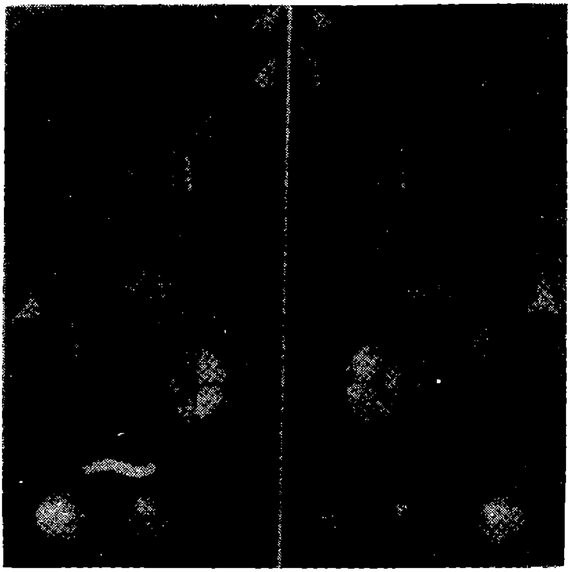

সাধারণ মহাবিশ্বের সুদর্শন যুবক (+) আর প্রতি মহাবিশ্বের প্রতিযুবক (-)। দেখতে এক আর অনুরূপ হলেও এদের করমর্দনে ভয়ঙ্কর ধ্বংসলীলা শুরু হয়ে যাবে।

প্রশ্ন আসে— প্রতিবস্তু অধ্যুষিত প্রতিমহাবিশ্ব যদি থেকেই থাকে— তবে কি তার উদ্দেশ্য হতে পারে? এ কি এই অনন্ত অসীম মহাবিশ্বের এক নিঃশেষ ধ্বংস ফাঁদ? স্রষ্টা কি তাহলে সময় ও কালের দূরত্বের মাপকাঠিতে আমাদের পরিচিত ডাইমেনশনেই এমন একটি ব্যবস্থা এঁটে দিয়েছেন যেন এই দানবিক মহাবিশ্ব একদিন তার সৃষ্টিকর্তার নিয়ন্ত্রণ সীমার বাইরে চলে যাবার পথ না পায়?

প্রিয় পাঠক! বিবেচনার জন্য এ প্রসঙ্গটির সূত্রপাত ঘটিয়ে চলুন আমরা বিজ্ঞানের অন্যান্য ভাবনাগুলির সাথে পরিচিত হই।

www.pathagar.com

দুই

Open এবং Close Universe ধারণার সাথে আমরা কমবেশি অনেকেই পরিচিত। এই দুই মতবাদের বক্তব্য হলো যে চিরদিন কেবল সম্প্রসারিত হয়েই যাবে এই মহাবিশ্ব (Open Universe) এবং যদি মহাবিশ্বের 'ক্রিটিক্যাল' ভরটি এই সম্প্রসারণের গতিকে জয় করতে পারে— তবে এই সম্প্রসারণ সংকুচন দ্বারা স্থলাভিষিক্ত হবে এবং একটি অতিঘন কিছুতে পরিণত হবে একসময় (Close Univese)। যে মুহূর্তে অতিঘন ও অতিক্ষুদ্র বিন্দুতে পরিণত হবে এই সুবিশাল মহাবিশ্বটি, তার অপর পৃষ্ঠে আবার ঘটবে বিস্ফোরণ, জন্ম নেবে নতুন মহাবিশ্ব (Big Bang-2) এবং এ প্রক্রিয়ায় Big Bang ও Big Crunc হবে একটি অব্যাহত পুনরাবৃত্তি (Oscillating Universe). মহাবিশ্বের ভবিষ্যৎ নিয়ে বিজ্ঞানীদের ভাবনায় এই বিবেচনাগুলিই রয়েছে এখন পর্যন্ত।

আমরা জানি— আজ থেকে প্রায় ১৫ মহাপদ্ম বৎসর পূর্বে এক মহাবিস্ফোরণ হতে যে বল ও গতি পেয়েছিল, সেই বল-গতির তাড়নায় বস্তুর আদিম গতিজড়তার মহাটানে সম্প্রসারিত হয়ে চলছে এই গোটা সয়াল সংসার মহাবিশ্ব প্রকৃতি। এই মহাসম্প্রসারণের গতি প্রতিটি সেকেণ্ডে সেকেণ্ডে বেড়ে চলেছে যা আমরা হাবেল ধ্রুবক হতে জানি (দ্রষ্টব্য সম্প্রসারণশীল মহাবিশ্ব, পর্ব-১)। আলোর গতির প্রায় ৯০% গতিতে চলমান কোয়াসার OQ-172 কে আশা করা যায় যে অদূর ভবিষ্যতে জ্যোতিষ্কটি আলোর সমগতিসম্পন্ন হতে পারে। যে বস্তু আলোর দ্রুতি অর্জন করে— তার ভর ও আকৃতিতে এক অভাবনীয় পরিবর্তন আসে— এ কথা আমরা আপেক্ষিকবাদ হতে জানি। ফিট জিরাল্ড কনট্রাকশন (Fitez Gerald Contraction) ও আইনস্টাইনের ভরবেগ তুল্যতার সমীকরণ ($E = mc^2$) হতে আমরা জানি যে, চলন্ত বস্তুর গতিকে যদি ক্রমাগত বাড়ানো যায়, তবে বস্তুটির আকৃতি গতির দিকে

www.pathagar.com

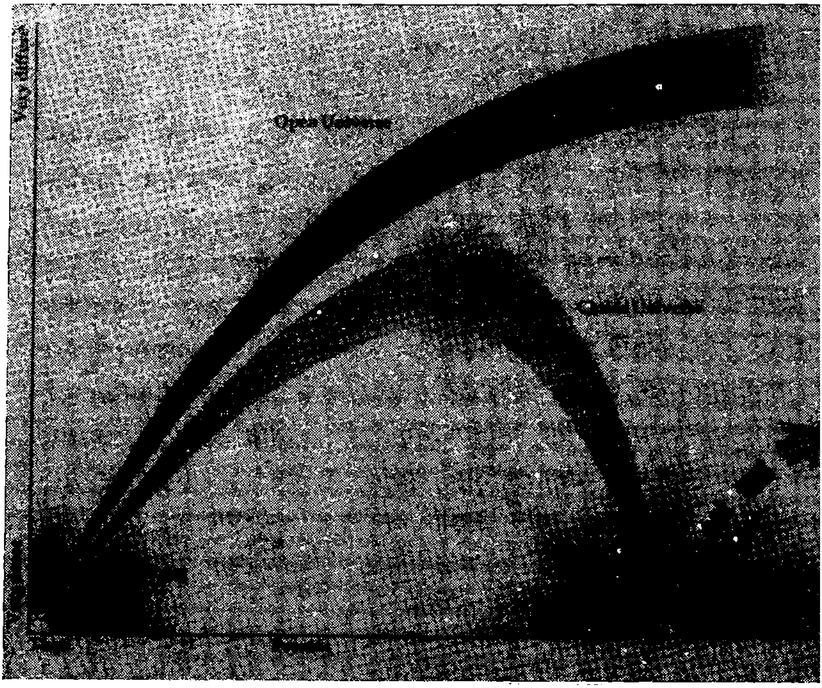

Open Universe (চিরকাল সম্প্রসারণশীল) ও Closed Universe (কাল পর্যায়ে সংকুচনশীল) এবং Oscillating Universe (পুনঃপুনঃ সৃষ্টি তত্ত্ব) এই তিন তত্ত্বের রেখচিত্র— বিজ্ঞানের চুলচেরা হিসাবে যাদের একটিকেও পৃথক ভাবে গ্রহণ করে না। আমাদের প্রস্তাবিত Burst of Creation theory একসাথে Open, Closed এবং Oscillating Universe তত্ত্বের সমষ্টি তত্ত্ব।

কমতে থাকে কিন্তু এর ভর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। সমীকরণ হতে দেখা যায় যে ৭ মাইল/সেকেণ্ড বেগে ধাবমান বস্তু (রকেট) গতির অনুকূলে এক মহাপদ্ম ভাগের দুই ভাগ সংকুচিত হয়। কিন্তু ৯৩000 মাইল/সেকেণ্ড গতিতে বস্তুটি সংকুচিত হবে ১৫ ভাগ, যখন তা ১৬৩,000 মাইল/সেকেণ্ড গতিতে চলবে, চলমান বস্তুটি হয়ে পড়বে তার আদি অস্তিত্বের ৫0%। বস্তুটি যখন ১৮৬,২৮২ মাইল/সেকেণ্ড গতিতে চলতে পারবে, তখন বস্তুটির দৈর্ঘ্য চলার অনুকূলে দাঁড়াবে শূন্যের কোটায়।

www.pathagar.com

পরবর্তীতে ওলন্দাজ পদার্থবিদ Hendrik Antoon Lorentz ফিট জিরাল্ডের প্রাপ্তিকে আরো কিছুদূর এগিয়ে নিয়ে যান। তিনি দেখান, গতির দিকে পদার্থের দৈর্ঘ্য কমতে থাকলেও এর ভর বৃদ্ধি পায় গতির অনুপাতে। তিনি দেখান, ৯৩,০০০ মাইল/সেকেণ্ড গতিতে বস্তুর ভর ১৫% বৃদ্ধি পায়। বস্তুর বেগ যখন ১৬৩,০০০ মাইল/সেকেণ্ড, বস্তুর ভর বৃদ্ধি পেয়ে হবে ১০০% বা দ্বিগুণ। বস্তুর বেগ যখন আলোর গতির সমান হবে, তখন বস্তুর ভর বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়াবে অসীম (Infinite). পরবর্তীতে আইনস্টাইন ও প্রমুখ এই তত্ত্বটিকেও গ্রহণ করলেন যথার্থ যুক্তিযুক্ত কারণেই।

লরেন্টজ-ফিটজ জিরাল্ড সমীকরণটি আজ বিজ্ঞানে একটা সুপ্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব। এই তত্ত্ব অনুযায়ী আশা করা যায়— কোনো গ্যালাক্সি যদি আলোর গতির সমান গতিসম্পন্ন হয়ে পড়ে, তবে ঐ গ্যালাক্সির দৈর্ঘ্য হবে শূন্য এবং এর ভর হবে অসীম (x^{nx}). আমরা জানি, যে মুহূর্তে অসীম গ্যালাক্সির পদার্থ একটি শূন্য দৈর্ঘ্যে প্রবেশ করবে, তখন ঐ গ্যালাক্সির ভর হবে অসীম গুণিতক অসীম ($x^{nx} \times x^{nx}$) বা α^{n}।

আমরা Big Bang এর পরিবেশে এমন পরিস্থিতি দেখেছি। শূন্য দৈর্ঘ্যে (10^{-32}cm) আমাদের জানা মহাবিশ্বের সমস্ত পদার্থ আটকানো ছিল। সেখান হতে প্রায় একশত মহাপদ্ম সংখ্যক গ্যালাক্সি তৈরী হয়েছে। আমরা জানি না, সেই আদি মহাবিশ্ব বা Primordial Fireball টি এমনি কোনো গতিতাড়িত অসীম ভরের শূন্যে সংকুচিত অবস্থায় ছিল কিনা। তবে আমরা বলতে পারি— কোনো গ্যালাক্সি যখন আলোর গতি প্রাপ্ত হবে, তখন তার দৈর্ঘ্য শূন্য ও ভর অসীম গুণিতক অসীম হবার কারণে সেখানেও একটি বিস্ফোরণ অবশ্যম্ভাবী। এই বিস্ফোরণ আশা করা যায়, Big Bang এর মতোই তীব্র ও বিশাল এবং আশা করা যায় যে এই বিস্ফোরণ হতে জন্ম নেবে আবার হাজার হাজার শিশু গ্যালাক্সি, পরিণামে গ্যালাক্সি ও গ্যালাক্সিগুচ্ছ ইত্যাদি। এভাবে প্রতিটি গ্যালাক্সি যারা OQ-17[2] এর

www.pathagar.com

মতো মূল বিস্ফোরণ বিন্দু হতে ১০,০০০ মিলিয়ন আলোক বৎসর দূরের সীমারেখায় পৌঁছে গেছে, তারা সকলেই এমনি এক একটি নতুন মহাবিস্ফোরণ জন্ম দেবার প্রার্থী। আজ থেকে ১৫ মহাপদ্ম বৎসর পূর্বে যে মহাবিশ্বের জন্ম হয়েছিল (আমরা যার অধিবাসী) সেই মহাবিশ্বটি আজ তার ১০০ মহাপদ্ম গ্যালাক্সিকে ১০০ মহাপদ্ম মহাবিশ্বের বীজ রূপে সুপ্ত করে রেখেছে; এই প্রতিটি বীজ গ্যালাক্সি কেবল সময়ের প্রেক্ষাপটে ন্যূনতম আরো ১০০ মহাপদ্ম নতুন মহাবিশ্ব সৃষ্টি করবে যার প্রতিটিতেই মহাবিশ্বের অনুরূপ সংখ্যক গ্যালাক্সি থাকতে পারে। স্বয়ংক্রিয় গান/কামান হতে যেমন ট্রিগার টিপে এক একটি বার্স্ট ফায়ারে ঝাঁক ঝাঁক গুলি বর্ষণ করা হয়, অনুরূপভাবেই মহাবিশ্বের প্রান্তসীমায় হয়তো প্রতিদিন/ প্রতি মুহূর্তে একাধিক গ্যালাক্সি কিংবা গ্যালাক্সির ঝাঁক গতি প্রাপ্ত হবার কারণে শূন্যদৈর্ঘ্যে অসীম ভরসম্পন্ন হয়ে পড়ার কারণে বিস্ফোরণ ঘটাবে এবং প্রতিটি মহাবিস্ফোরণে জন্ম নেবে এক একটি মহাবিশ্ব। যদি এমন একজন বহিরাগত দর্শককে কল্পনা করা যায় যে ১১০০০ মিলিয়ন আলোক বর্ষ দূরের প্রান্তিক বলয়টিকে একসময় ও একসাথে দেখতে সক্ষম— তিনি দেখতে পাবেন, স্বয়ংক্রিয় গান বা কামানের ফায়ারের মতো সেই প্রান্তিক বলয়টির বিভিন্ন স্থান হতে নতুন নতুন মহাবিশ্বের জন্ম নিচ্ছে। জন্ম নেবার সঙ্গে সঙ্গে ঐ মহাবিশ্বগুলি আদি গতিজড়তার কারণে কল্পিত প্রান্তিক বলয় রেখা হতে দূরের অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হতে থাকবে তীব্র গতিতে— কিন্তু ঐ মহাবিশ্বের অভ্যন্তরের কোনো দর্শক শুধুমাত্র একটি সম্প্রসারণশীল মহাবিশ্বকেই দর্শন করবে। নুতন ভাবে তৈরী হওয়া মহাবিশ্বটি একটি একক বুদবুদের ন্যায় শূন্যতার সমুদ্রে মাতৃ-মহাবিশ্বের কেন্দ্র হতে দূরের দিকে চলমান থাকবে। আবার আমাদের মহাবিশ্বের মত্যো কয়েক বিলিয়ন বৎসরের চলন শেষে সেও তৈরী করবে অসংখ্য অসংখ্য মহাবিশ্ব। এভাবে মহাশূন্য বা Void-এ ক্রমাগত মহাবিশ্বের সংখ্যা বেড়ে চলবে সময়ের ধাপে ধাপে। নবসৃষ্ট মহাবিশ্ব বুদবুদগুলি শান্ত চৌবাচ্চার পানিতে ফেলে দেয়া একদলা সাবানের ফেনার মত

www.pathagar.com

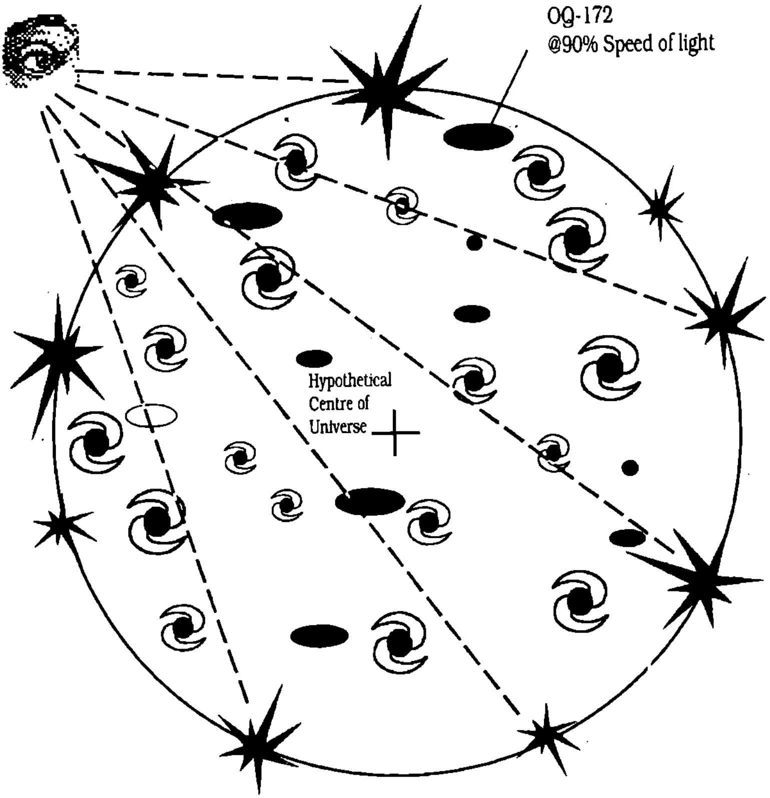

অসংখ্য গ্যালাক্সি হতে অসংখ্য মহাবিশ্ব তৈরী হচ্ছে। দর্শক যদি এমন যোগ্যতা সম্পন্ন হতে পারতো যে আনুমানিক ত্রিশ মহাপদ্ম আলোকবর্ষ ব্যাস সম্পন্ন মহাবিশ্বকে একসাথে দেখতে পায়, তবে তিনি অবলোকন করতে সক্ষম হতেন যে একটি আনুমানিক অন্ধকার মহাবৃত্তের প্রান্তিক বলয়ে প্রতিমুহূর্তে হাজারটি মহাবিশ্ব জন্ম নিচ্ছে এক একটা Big Bang এর মহাঘটনা হতে।

কেন্দ্র হতে ছড়িয়ে পড়তে থাকবে চারিদিকে। আর প্রতিটি ব্যক্তি–বুদবুদ নিজ চলমান গতি–অবস্থানে ক্ষুদ্র হতে বড় আকারে সম্প্রসারিত হতে থাকবে। এভাবে মহাকালের মহাদৈর্ঘ্যে মহাসৃষ্টির মহামহিমায় মহাসংখ্যক মহাবিশ্বের মহাসমাবেশ মহাশূন্যের (void)

www.pathagar.com

মহাবিশালতায় মহামহিম স্রষ্টার মহাকীর্তির মহাস্বাক্ষর হয়ে বিরাজ করবে অনাদি কাল হতে অনন্তলোক পর্যন্ত!

আমরা একে একটি তত্ত্ব হিসাবে উপস্থাপন করতে চাই এবং তার নামকরণ করতে চাই— Theory of Burst of Creation (প্রস্তাবের প্রস্তুতিকাল ২৪ মার্চ ১৯৯৭)।

এই Burst of Creation তত্ত্ব Oscillating Universe অথবা Open Universe এর প্রয়োজনীয়তাকে অপসারণ করে। Open Universe এর ধারণাটি কার্যতঃ গ্রহণযোগ্য কিন্তু তার সমাপ্তি বিজ্ঞানীগণ কেবল মহাশূন্যের মহাশীতলতায় বিলীন হয়ে যাবার মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হবে বলে ধারণা করেন। 'The universe created by the scheme is open an will expand forever.' আমাদের প্রস্তাবিত তত্ত্ব অনুসারে কেবল উধাও হয়ে যাবার মধ্যে মহাবিশ্বের সমাপ্তি নির্ধারিত নয়। আমরা কোয়াসার OQ-172 এর অবস্থানের কথা জানি যা আমাদের অবস্থান হতে প্রায় ১০,০০০ মিলিয়ন আলোক বৎসর দূরে এবং এটি আলোর গতির ৯০% গতি নিয়ে চলছে। এটি ও তার সমপর্যায়ের গ্যালাক্সি/কোয়াসাররা শীঘ্রই আলোর গতিসম্পন্ন হলে তার Theory of burst of creation এর শর্ত পূরণ করতে বাধ্য। অনুরূপভাবে অন্যান্য গ্যালাক্সিরা হাবেল ধ্রুবকের রীতি নিয়ে ক্রমাগত তাদের/গতি বাড়িয়ে চলছে বিধায় সময়ের প্রেক্ষাপটে তারাও এই তত্ত্বের শর্তগুলি পূরণ করবে।

বিজ্ঞানীরা হয়তো যুক্তি আনবেন, কোনো কোয়াসার কিংবা গ্যালাক্সির পক্ষে আলোর গতি অর্জন করা কখনই সম্ভব হবে না। কারণ, এটি একটি "কসমিক স্পীড লিমিট"। Nothing in physics prevents you from travelling as close to the speed of light as you like; 99.9 percent of the speed of light would be just fine. But no matter how hard you try, you can never gain

www.pathagar.com

that last decimal point. For that would to be logically consistent, there must be a cosmic speed limit. Otherwise, you could get to any speed you wanted by adding velocities on a moving platform— আলোর গতির ৯৯.৯ ভাগ গতি অর্জন করা পর্যন্ত কোনো সমস্যাই নয়, শুধুমাত্র সর্বশেষ দশমিক ভগ্নাংশ 0·1 ভাগ গতি চিরদিন অজেয় থাকবে; তা না হলে সৃষ্টিতে 'কসমিক স্পীড লিমিটের' সীমাবদ্ধতা আরোপিত হবার সুযোগ কখনই থাকত না যা পদার্থবিদ্যার যুক্তিগ্রাহ্য অবস্থানকে হারাবে। এ পরিস্থিতিতে আমাদের Burst of Creation Theoryটি কোনো প্রতিকূলতার মুখোমুখি হয় কিনা— এ প্রশ্নটি হতে পারে।

প্রকৃতপক্ষে Burst of Creation Theory–র জন্য 99·9% আলোর গতি অর্জন করার যোগ্যতাই যথেষ্ট; এর দ্বারা অসীম গ্যালাক্সি দৈর্ঘ্য সম্পূর্ণ শূন্য না হলেও শূন্যের চাইতে মাত্র কিছু ডেসিমেল মাত্রায় কম হবে। আমাদের মহাবিশ্বের গোড়ায় যে আদি দৈর্ঘ্যটি প্রত্যক্ষ করি, তাও সম্পূর্ণ শূন্য নয়— তা 10^{-32}Cm. অর্থাৎ এর জন্য প্রস্তাবিত তত্ত্বটিকে কোনো সমস্যার মুখোমুখি হতে হবে না।

আমরা Closed এবং Oscillating Universe এর সম্ভাবনাকে যথেষ্ট হীন দেখতে পাই। যে Critical mass এর প্রস্তাব এই Closed Universe এর সম্ভাবনার ভিত্তি রচনা করেছে— সে Critical massটি কোথায় আমরা জানি না। মনে করি, তা মহাবিশ্বের কেন্দ্রে অবস্থিত। OQ-172 এর বর্তমান অবস্থানটি ১০,০০০ মিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরে। এই দূরত্ব (যদি Critical mass OQ-172 এর অবস্থান আমাদের নিকটবর্তী কোনো অঞ্চলে ভাবি) কোনো Critical mass–ই OQ-172'র উপর কার্যকর হবে না কারণ অভিকর্ষ বলের টানটি দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতে কমতে থাকে। OQ-172 এর গতি জড়তা, ঐ দূরত্বে গতির কারণে তার ভরের বৃদ্ধি ঘটবে অনেক বেশি। এই গতি জড়তাকে থামানোর জন্য যে শক্তির দরকার, তা

www.pathagar.com

মহাবিশ্বের যেখানেই অবস্থান করুক— মহাবিশ্বের অন্যান্য অংশকে নিঃশেষে গলাধঃকরণ করতে বাধ্য। এমতবস্থায় একটি ক্রমাগত সম্প্রসারণমান মহাবিশ্বেও একটি বস্তু–বিস্তারের ঘূর্ণিপাক ও একটি সুনির্দিষ্ট দিকেই গ্যালাক্সিদের চলার স্বাক্ষর মানুষের হাতে যে প্রযুক্তি আছে, তাতে স্পষ্টতই ধরা পড়ত। অর্থাৎ গ্যালাক্সিদের যাত্রা একটি সুনির্দিষ্ট দিকের পানে ঘটে থাকত। এমন সম্ভাবনার আশা বিজ্ঞানের জানা নেই।

অন্যদিকে Critical massটি যদি যত্রতত্র ছড়ানো ছিটানো হয়ে থাকে, তবে এই mass কখনই নিকটবর্তী আলোর গতিসম্পন্ন গ্যালাক্সিদের থামাতে সমর্থ হবে না। পদার্থের গতি প্রকৃতির সম্পর্কে একটু গভীর দৃষ্টিদান আমি মনে করি বিজ্ঞানীদেরকে Closed Universe Concept হতে বেরিয়ে আসবার পথ দেখায়। বস্তুতঃ Close Universe Conceptটি একটি উপায়হীনতার নামান্তর মাত্র।

আমাদের উপরের প্রস্তাবগুলির সঙ্গে কোরআনের সঙ্গতি রয়েছে। প্রাথমিকভাবে ৫১:৪৭ আয়াতে যে সম্প্রসারণের তথ্যটি এসেছে তার সম্প্রসারণমূলক ক্রিয়া موسعون শব্দটি বর্তমান ও ভবিষ্যৎকাল বাচক; অর্থাৎ ভবিষ্যতে এর জন্য কেবল সম্প্রসারণটিই কোরআনের প্রভু আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন কর্তৃক ব্যবস্থিত —এ যুক্তিটি কোরানিক ন্যায্যতায় প্রতিষ্ঠিত।

এই প্রস্তাবটি কোরআনের অন্যান্য আয়াতের অনুগামী। যেমন ঃ *"যিনি আদিতে সৃষ্টি করেন, অতঃপর তিনি উহার পুনরাবৃত্তি করিবেন (২৭:৬৪), তাহারা কি লক্ষ্য করে না কিভাবে আল্লাহ্ সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করেন অতঃপর পুনরাবৃত্তি ঘটান? ইহা তো আল্লাহর জন্য সহজ (২৯:১৯) উহারা কি লক্ষ্য করে না যে আল্লাহ্, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন— তিনি উহাদের অনুরূপ সৃষ্টি করিতে সক্ষম। তিনি উহাদিগের জন্য স্থির করিয়াছেন একটি কাল। ইহাতে সন্দেহ নাই" (১৭:৯৯)* এই

www.pathagar.com

অনুরূপ সৃষ্টি করার জন্য Closed Universe Concept টি আল্লাহ তায়া'লার গ্রহণ করার প্রয়োজন নাও থাকতে পারে। যদি আমাদের Burst of Creation তত্ত্বের পরিবেশে এই আয়াতগুলি বিবেচনা করা যায়— তবে আমাদেরকে কোনোরকম বৈপরীত্ব বা অসঙ্গতির মুখোমুখি হতে হয় না।

অনেকেই মনে করেন— *"সেই দিন আকাশকে গুটাইয়া ফেলিব, যে ভাবে গুটানো হয় লিখিত দফতর; যে ভাবে আমি প্রথম সৃষ্টির সূচনা করিয়াছিলাম, সেইভাবে পুনরায় সৃষ্টি করিব" (২১:১০৪)*— এই আয়াতটি Closed Universe এর একটি দলিল। এই বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে বুঝবার জন্য পূর্বের (৯৬–১০৩) আয়াতগুলি গুরুত্বপূর্ণ। এই আয়াতগুলি কিয়ামতের দৃশ্য তুলে ধরে। আমরা মহাবিশ্বের ধ্বংস পাঠটিতে দেখতে চেয়েছি যে সম্ভবতঃ কিয়ামত একটি স্থানীয় ঘটনা, যা কেবল পৃথিবী অথবা একটি সৌরজগৎ অথবা একটি গ্যালাক্সি জুড়ে ঘটবে; সমগ্র মহাবিশ্ব নিয়ে নয় (আমি দয়াময়ের ক্ষমা চাই যেন কোনো ভ্রান্ত ধারণা না পোষণ করি) কারণ মহাবিশ্ব ধ্বংস সংক্রান্ত তথ্যের চাইতে একটি পৃথিবী ও তার অধিবাসীদের ধ্বংসের তথ্যগুলি অধিকতর নিকটবর্তী ও গ্রহণযোগ্য।

গুটানো দফতরের মতো আকাশকে গুটিয়ে ফেলার তথ্যটি সম্ভবতঃ পৃথিবীর আকাশ কিংবা পৃথিবীর পরিবেশ। অনেকেই ব্যবহৃত الشماء শব্দটিকে এখানে গগনমণ্ডল অর্থাৎ বহুবচনের ধারায় চালাতে চান, কিন্তু বিষয়টি সুস্পষ্ট যে এই পরিবেশে একটি আকাশের গুটানোর কথাই বলা হয়েছে— অগণিত গগনমণ্ডল নয়। ফলতঃ লিখিত কাগজের ন্যায় মহাবিশ্বকে গুটিয়ে ফেলার তথ্যটি কোরআন সমর্থন করে না ; কোরআন কেবল পৃথিবী সংলগ্ন الشماء কে গুটিয়ে দেয়ার কথাই বলে। এখানে পুনঃসৃষ্টির বিষয়টিও সমগ্র মহাবিশ্বকে বিসংশ্লিষ্ট করে না, কারণ আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন একটি অতি স্পর্শকাতর, অতি হিসাব করা নাজুক ব্যবস্থা এবং অতিকায়

www.pathagar.com

ক্ষণস্থায়ী ও অদৃশ্য কিছু ব্যবস্থা আমাদের নিকটবর্তী আকাশে এঁটে দিয়ে এই পৃথিবীতে একটি অতিনিশ্চিত ও দীর্ঘকালীন বাস্তব জীবনের ভিত্তি রচনা করেছেন। এই ব্যবস্থাটিকে গুটিয়ে নেয়া শুধু একটি 'দুর্ঘটনার দয়া' আর তাঁর পক্ষে একটি অনুরূপ ব্যবস্থায় কিংবা তার চাইতে অধিকতর কার্যকর ব্যবস্থায় আবার জীবন রচনা কিংবা পুনরুত্থান ঘটানো মোটেই দুস্কর নয়। অন্ততঃ এই পৃথিবীতে জীবনের বাস্তবতা দেখে আমরা এ কথা বলতে পারি। দ্রষ্টব্য (২:৩, বায়ু-মণ্ডল ও পৃথিবী জীবন, মহাকাশ পর্ব-১)।

অন্যদিকে ২১:১০৪ আয়াতটি যদিও একটি পুনরাবৃত্ত বা চক্রবৃত্ত সৃষ্টির প্রস্তাব করে বলে আমরা ধরে নেই, তবুও আমরা তাকে Close Universe এর সামনাসামনি নিতে পারি না, কারণ ১০৪ আয়াতের যে পরিবেশ, তার কিঞ্চিৎ পূর্বেই এই পৃথিবীতে মানুষের অবস্থান থাকবে যা ২১:৯৬, ৯৭, ১০০ আয়াতগুলি দ্বারা সমর্থিত। ১০৩ আয়াতটি জান্নাত বা বেহেস্তের পরিবেশের কথা বললেও ১০৪ আয়াতটি হলো তারই পূর্বক্ষণের তথ্য। বস্তুতঃ মহাবিশ্বের ধ্বংস যা Close Universe এর প্রস্তাব, তা ৩০ মহাপদ্ম বৎসরের আগে কখনই নয়। আর আমরা কিয়ামতের তথ্য জানি যে তা হলো এক অনির্দিষ্ট সন্নিকট সময়ে। অতএব ১০৪ আয়াতটি যার যোগসূত্র ৯৬ ও ৯৭ আয়াতের সাথে সুস্পষ্ট— সেটি কখনই মহাবিশ্বের ধ্বংসের কথা বলেনি। এর ধ্বংসচিত্র কেবল পৃথিবীর আকাশকে কিংবা অঞ্চলকে নিয়েই।

অথবা হতেও পারে যা ২১:১০৪ আয়াতের ব্যাখ্যাকারীগণ একে মহাবিশ্বের ধ্বংস প্রস্তাব বলে থাকেন; তবে তা Close Universe এর প্রক্রিয়ায় নয়। মহাবিশ্ব সম্প্রসারণ হতে হতে যদি কেবল বাইরের দিকেই ছড়িয়ে যেতে থাকে অসীম অনন্ত শূন্যতা (Void) এর পানে, আর যদি অন্য কোনো দিক হতে একই নিয়মে আর কোনো সমান্তরাল মহাবিশ্ব কেবলমাত্র বিপরীত বা প্রতিবস্তু দিয়ে তৈরী হয়ে আমাদের মহাবিশ্বের সঙ্গে সংঘর্ষে অবতীর্ণ হয়— তখন

www.pathagar.com

ঘটবে অবশ্যম্ভাবী মহাপ্রলয়। তখন হয়তো দপ্তরের কাগজের ন্যায় গুটিয়ে পড়বে মহাবিশ্ব, কিন্তু এই গুটানো হতে কোনো নতুন বা অনুরূপ মহাবিশ্বের সৃষ্টি সম্ভব হবে না।

অন্যদিকে আমরা ২১:১০৪ আয়াতের অবস্থানকে Brust of Creation তত্ত্ব দিয়েও ব্যাখ্যা করতে পারি না। কারণ ৯৬, ৯৭ আয়াতে মানুষের অবস্থানটি সুস্পষ্ট। আমাদের পৃথিবীতে মানুষ অবস্থান করবে এবং এমতাবস্থায় আমাদের গ্যালাক্সি আলোর গতি প্রাপ্ত হবে ও আয়াতটি এই প্রস্তাবিত তথ্যকে অনুসরণ করবে— অতটা আশা করা যায় না। অথবা যা প্রস্তাব করতে চাই— ২১:১০৪ আয়াতটি পৃথিবীর আকাশকে গুটানোর কথা বলেছে আর আখিরাতে জীবনের যে প্রস্তাবিত বিন্যাস/পদ্ধতি তৈরী হবে, তার জীবনময় অবস্থানটি নিশ্চিত করার প্রতি আলোকপাত করেছে। মূলতঃ একটি অদৃশ্য, নাজুক ও সাধ্যাতীত ব্যবস্থাপনা আকাশে এঁটে দিয়ে রাব্বুল আলামীন পৃথিবীতে এক চমৎকার জীবন দান করেছেন। তিনি হয়তো অনুরূপ পদ্ধতিতেই পুনরায় পরকালেও জীবনময় ব্যবস্থা শুরু করতে পারেন।

তিন

সৃষ্টির মাঝে স্রষ্টা যে কয়টি অনন্যতার ছাপ রেখেছেন— তার একটি হলো সৃষ্টি কর্মের সরলতা ও অন্য আর একটি হলো অনুরূপতা বা সামঞ্জস্য। অর্থাৎ মূল সৃষ্টি পদ্ধতি ও এর মাঝে ব্যবস্থিত আইনকানুনগুলি সরল ও সহজে বোধগম্য হবার মত। সৃষ্টির সামঞ্জস্যতার গুণাবলী বলে যে, একটি অন্যটির সঙ্গে অনুরূপতার অন্বয় বা সম্পর্ক বহন করে। কোরআনে এই বিশেষ দিকটি ভালভাবেই প্রতিভাত হতে দেখা যায়— *"ইহারা একে অন্যের সদৃশ এবং ইহার মাঝেই পার্থক্য ও বৈচিত্র" (৬:১০০)।* মহাবিশ্বের জানা সংগঠনগুলির মধ্যে সবচাইতে বড় সংগঠন হলো মহাবিশ্বের নিজস্ব সত্তা ও সব চেয়ে ক্ষুদ্রতর সংগঠনটি হলো একটি

www.pathagar.com

পরমাণু। এই পরমাণু ও মহাবিশ্বের মধ্যে অনেকগুলি ধারাবাহিকতা বর্তমান। মজার বিষয় যে এই পরমাণু হতে মহাবিশ্ব— এর মাঝে যতগুলি ধাপ বিদ্যমান, তাদের প্রতিটি নিকটবর্তী ধাপই অনুরূপতার গুণাগুণে বৈশিষ্ট্যময়। সৃষ্টির সংগঠন মূলতঃ পরমাণু, অণু, পদার্থ, মহাজাগতিক বস্তু ও মহাবিশ্ব— এই ধারায় প্রসারিত। এই ধারাটিতে একটি পরমাণু বা একটি সৌর ব্যবস্থা কিংবা একটি গ্যালাক্সি— ইত্যাদির গঠনে অনেক অনেক সাদৃশ্য বিদ্যমান।

একটি পরমাণু বা একটি সৌরজগতের গঠন ও ঘনত্ব বিবেচনা করা যাক। পরমাণুর নিউক্লিয়াস যদি খেলার মার্বেলের সমান হয়, তবে ইলেক্ট্রন প্রায় ৩৫ মিটার দূর দিয়ে নিউক্লিয়াসকে প্রদক্ষিণ করবে। অর্থাৎ নিউক্লিয়াসের ব্যাস যদি ১ সেঃ মিঃ হয়, তবে নিকটতম ইলেক্ট্রনের দূরত্ব হবে ৩৫০০ সেঃ মিঃ।

এই অনুপাতটি যদি সৌরজগতের উপর ফেলা যায়— তবে সব চেয়ে নিকটতম গ্রহটির দূরত্ব হওয়া উচিৎ = সূর্য ব্যাস × ৩৫০০ বা ৮৬৪১০০×৩৫০০=৩০২,৪৩৫,০০০ মাইল বা ৪৮৭,৭৯৮,৩৭০০ কিলোমিটার। অর্থাৎ নিউক্লিয়াসের ব্যাস ও দূরত্বের অনুপাত = ১ঃ৩৫০০ এই অনুপাতে বজায় থাকবে (নিউক্লিয়াসের ব্যাস যদি ১ ইউনিট হয়— তবে ইলেক্ট্রনের দূরত্ব হবে নিউক্লিয়াসের ব্যাস ৩৫০০)।

এই হিসাবে আমরা সৌরজগতের বিশাল পরমাণুটির ঘনত্বের অনুপাত কি তা নির্ণয় করে নিতে পারি। সৌরজগতের নিউক্লিয়াস সূর্যের ব্যাস হলো ৮৬৪১০০ মাইল; সে হিসাবে সৌরজগতের নিকটবর্তী গ্রহের দূরত্ব হওয়া উচিৎ ৮৬৪১০০ × ৩৫০০ = ৩০২,৪৩৫,০০০ মাইল। কিন্তু বুধের গড় দূরত্ব হলো, ৩৬০০,০০০০ মাইল। অর্থাৎ বুধ গ্রহটি পরমাণুর ঘনত্ব অনুপাতের তুলনায় (৩০২৪৩৫০০০০÷৩৬০০০০০০) ৮৪ ভাগের এক ভাগ দূরত্বে অবস্থিত। ঘুরিয়ে বললে বলতে হয়— এই সৌরজগৎ তার বর্তমান পদার্থদের নিয়ে যদি আরো ৮৪ গুণ বড় হতো— তবে কেবল যে

www.pathagar.com

ঘনত্বে পরমাণু বিরাজ করে, সে ঘনত্ব লাভ করতে সক্ষম হতো। সে দৃষ্টিকোণ হতে পরমাণুর তুলনায় আমাদের সৌরজগত তথা মহাবিশ্ব অস্বাভাবিক অনুপাতে 'ঘন' বলে প্রতীয়মান হয়। অর্থাৎ মহাবিশ্ব যত বড় আকৃতিতেই থাকুক, তা যদি আয়তনে ন্যূনতম আরো ৮৪ গুণ বৃদ্ধি পায়, তবেই কেবল এই মহাবিশ্ব একটি পদার্থ যতটা ঘন ততটা ঘনত্বে উপনীত হবে।— অর্থাৎ মহাবিশ্বকে পদার্থ হারাতে হবে, নইলে আয়তনে আরো ৮৪ গুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত মহাবিশ্ব একটুকরা পদার্থের চাইতেও অধিকতর ঘনসন্নিবেশিত অবস্থায় থাকবে।

আমরা কেন এ ধরনের হিসাবের আশ্রয় নিলাম— তার একটি সুনির্দিষ্ট কারণ রয়েছে। একটি বিস্ফোরকের কথা ধরুন। ডেটোনেশন করার কারণে একটি বিস্ফোরকের সভরাভ (enmass) ধ্বংস ঘটে। এ বিস্ফোরক দ্রব্যটির প্রতিটি এটম সৌরজগতের তুলনায় কমপক্ষে ৮৪ ভাগ কম ঘন। অর্থাৎ সৌরজগতের কেন্দ্র ও সর্ব নিকটবর্তী গ্রহের দূরত্বের যে অনুপাত, বিস্ফোরক দ্রব্যের প্রতিটি এটমের নিউক্লিয়াস ও সর্ব নিকটবর্তী ইলেক্ট্রনের দূরত্বের অনুপাত— এদের আনুপাতিক পার্থক্য বিবেচনা করলে সৌরজগতের বস্তুবিন্যাসটি এটমের তুলনায় অতিশয় ঘনত্বসম্পন্ন বলে মনে হবে। অন্যদিকে পদার্থের অণুতে এটমের বিন্যাস ব্যবস্থায় যে ফাঁকা শূন্যতা কিংবা আন্ত-আণবিক শূন্যতা বিরাজ করে তাকে বিবেচনা করলে একটি পদার্থে কেবল শূন্যতা ছাড়া আর অন্য কিছুর প্রাধান্য চোখে পড়ে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে একটি পূর্ণদৈর্ঘ্য মানুষের দেহের সমস্ত অণুর আন্ত-আণবিক শূন্যতাকে যদি বল প্রয়োগ করে ভরাট করে দেয়া সম্ভব হয়, তবে পরিণামে ঐ পূর্ণদৈর্ঘ্য মানুষটি এত ক্ষুদ্র বিন্দুতে পরিণত হবে যে তা প্রায় চোখে দেখা সম্ভব নয়। আমরা দেখতে পাই— পদার্থে যা সব চাইতে বেশি ব্যাপ্তি নিয়ে বিরাজ করে, তা হলো শূন্যতা। আর এই শূন্যতা পদার্থের নিজস্ব প্রকৃত আকারের চাইতে বহু গুণ বড়। আমরা মানবদেহের আকৃতির

www.pathagar.com

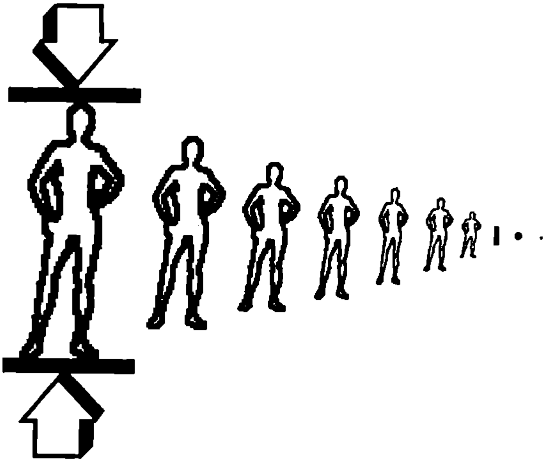

পদার্থের মাঝে সবচাইতে বৃহৎ অস্তিত্ব নিয়ে যা বিরাজ করে— তা হলো শূন্যতা। পদার্থের আন্ত–আনবিক শূন্যতাকে চাপ প্রয়োগে তুলে দিতে পারলে অনেক বড় পদার্থও দৃষ্টির আড়ালে চলে যাবে। চিত্রে একটি মানুষকে একটি অদৃশ্য বিন্দুতে পরিণত হওয়ার সম্ভাব্যতা তুলে ধরা হয়েছে।

উদাহরণ এখানে আনলাম এই জন্য যে প্রকৃত পদার্থ তার আকৃতিতে একটি অদৃশ্য বিন্দুর কাছাকাছি হলেও মানব দেহের গড় আকৃতি $4\pi r^2 \times L = 4 \times 3{\cdot}14 \times (20)^2 \times 165cm = 828960$ CC ($r = 20cm$. $L=165cm$ বিবেচনায়)। চলুন আমরা সহজবোধ্যতার খাতিরে হিসাবটিতে একটা অতি বড় ছাড় দিয়ে বিবেচনা করি। ইতিপূর্বে চাপ প্রয়োগ করে পূর্ণদৈর্ঘ্য মানব দেহকে যে অদৃশ্য–প্রায় বিন্দুতে পরিণত হবার কথা বলেছিলাম, তার পরিবর্তে বিন্দুটিকে আমরা ১ সেঃ মিঃ (অর্থাৎ দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ভেদে ১ সেঃ ১ সেঃ ১ সেঃ) বলে ধরে নেই। আমরা এখানে যে ছাড় দিয়েছি তা অতিশয় বড় ছাড়, এতদসত্ত্বেও পূর্ণদৈর্ঘ্য গড় মানবদেহ ও সংকুচিত মানবদেহ বিন্দুর অনুপাত হবে 828960 : 1 অর্থাৎ পদার্থ ১ গুণ হলে এর শূন্যতা হবে প্রায় সাড়ে আট লক্ষ গুণ। আমরা এই ছাড়কে আরো বাড়িয়ে দিতে প্রস্তুত এবং মনে করি যে তা পরমাণু ও সৌরজগতের অনুপাত অর্থাৎ ৮৪:১ পর্যন্তই!

www.pathagar.com

এভাবে বিচার করলে দেখা যাবে যে, শুধুমাত্র একটি মানুষের দেহে নয়— এই সৃষ্টির তাবৎ বিন্দুতেই কেবল প্রতীয়মান হবে যে প্রকৃত পদার্থ ভরের তুলনায় শূন্যতার পরিমাণ হাজার লক্ষ কোটি গুণ বেশি। অনুরূপভাবে একটি গ্যালাক্সির সামগ্রিক পদার্থ স্তূপ ও আয়তনগত শূন্যতা বিচার করা হলেও অনুপাতটি ঐ মানবদেহের অনুরূপ কোনো মান প্রদর্শন করবে। মনে রাখা দরকার যে একটি গ্যালাক্সি একটি মানবদেহের মতোই একটি একক ও নিরবচ্ছিন্ন ব্যবস্থা বা System মাত্র।

যেহেতু সূর্য ব্যবস্থাগুলি গ্যালাক্সিতে প্রায় সমভাবে (Homogenous) বন্টিত, সেহেতু আশা করা যায়— একটি সৌরজগৎ যে ব্যবস্থার একটি 'এটম', সে ব্যবস্থার পদার্থ স্তূপ অর্থাৎ একটি গ্যালাক্সিও অনুপাতের দিক দিয়ে অতিশয় ঘন। এখানে আমরা যে সর্বনিম্ন স্কেলটি স্থির করেছি, অন্ততঃ তার আলোকে বলা যায় যে কমবেশি ৮৪ গুণ বৃহত্তর পরিমণ্ডলে যদি গ্যালাক্সির সমুদয় পদার্থ-সম্ভার ছড়িয়ে থাকত তবেই কেবল পদার্থ ও শূন্যতার অনুপাত একটি পরমাণুতে অবস্থিত পদার্থ ও শূন্যতার অনুপাতের কাছাকাছি উপনীত হতো।

ইতিপূর্বে আমরা যে বিস্ফোরকের কথা বলছিলাম— আশা করা যায় যে বিস্ফোরক পদার্থ ও মানবদেহে অবস্থিত পদার্থ প্রায় একই অনুপাতে বিন্যস্ত— অর্থাৎ বিস্ফোরক পদার্থের ভর ও শূন্যতার অনুপাতে আমাদের এক্সপেরিমেন্টাল মানব দেহটির পদার্থের ভর ও শূন্যতার অনুপাতেরই অনুরূপ, অর্থাৎ সাড়ে আট লক্ষ ভাগের এক ভাগ। আমার যদি এই মুহূর্তে সমগ্র গ্যালাক্সিকে কেবল বিস্ফোরক পদার্থে বোঝাই ধরে নেই— তবে গোটা গ্যালাক্সির চেহারা হবে পৃথিবীতে জমা ও তৈরী হওয়া সমস্ত বিস্ফোরকের চাইতে অতিশয় ঘন বা Ultra dense explosive (গ্যালাক্সির পদার্থ ও শূন্যতার অনুপাত ১:৮৪ হিসাবে ও বিস্ফোরকের পদার্থ ও শূন্যতার অনুপাত

www.pathagar.com

১:৮৫০০০০ বিবেচনায়)। আপনি জানেন কি যে, প্রতিবস্তুর বিবেচনায় আমাদের গ্যালাক্সিটির যাবতীয় পদার্থ হলো বিস্ফোরকের স্তূপ এবং তা পৃথিবীর জমা সকল বিস্ফোরক হতে তুলনায় অতিশয় ঘনত্বসম্পন্ন— ফলতঃ আমাদের এই মাতৃ-নীহারিকা ছায়াপথ কিংবা এই মহাবিশ্ব একটি সুবিশাল বিস্ফোরক দ্রব্যেরই প্রতিরূপ মাত্র !

চার

পরমাণু, সাধারণ বস্তু ব্যবস্থার প্রতীক একটি মানব দেহ, একটি সৌরজগৎ ও একটি গ্যালাক্সির বিবেচনার পর আমরা সমস্ত মহাবিশ্বের হিসাব নিয়ে বসতে চাই। বিজ্ঞানীগণ আজ গ্যালাক্সিদেরকে মহাবিশ্বের পরমাণুর সঙ্গে তুলনা করেন। প্রকৃতপক্ষে মহাবিশ্ব ও গ্যালাক্সিদের সম্পর্ক এমনি অনুপাতে নির্ধারিত। আমরা এর একটা পরিমাপ নিতে পারি। গ্যালাক্সিদের আকৃতিকে গড়ে যদি একটি ডিনার প্লেটের আকৃতির সমান ভাবা যায়, তবে অন্যান্য গ্যালাক্সির সাথে এর দূরত্ব বিন্যাসের চিত্রটি হবে যে কোনো দিকে প্রতি পাঁচ মিটার দূরবর্তী বিন্দুতে অন্য একটি ডিনার প্লেটের অবস্থান। বর্তমান Spacing বা দূরত্ব অনুযায়ী গ্যালাক্সিদের আয়তনিক ঘনত্বের অনুপাত ১:১৪১৩ যেখানে পরমাণুর আয়তনিক ঘনত্বের অনুপাত হলো ১:১৫৩৮৬০০০০; অর্থাৎ পরমাণুর তুলনায় আয়তনের বিচারে মহাবিশ্বের অবস্থা প্রায় ১,০৮,৮৮০ গুণ বেশি ঘনত্বসম্পন্ন। ঘুরিয়ে বললে, আমাদের মহাবিশ্ব যদি আয়তনে আরো লক্ষ গুণ বেশি সম্প্রসারিত হয় তবেই কেবল পরমাণুর আয়তনিক ঘনত্বের অনুপাতের সমতলে আসবে— যা আজকের সম্প্রসারণের হার অনুযায়ী হয়তো লাগবে আরো বিলিয়ন বিলিয়ন বৎসর। হিসাব চিত্রটি অধ্যায়ের শেষে প্রদান করা হয়েছে।

•

আমরা দীর্ঘ একটি আলোচনায় কেবল মহাবিশ্ব ও পরমাণুর পদার্থ ও শূন্যতার প্রেক্ষাপটগুলি চোখের সামনে এনে বিচার করার

www.pathagar.com

প্রয়াস নিয়েছি মাত্র। আমরা দেখলাম একটি পরমাণুর তুলনায় একটি মহাবিশ্ব হাজার হাজার গুণ (৫৫ হাজার গুণ) বেশি ঘন-সন্নিবদ্ধ (Compact)।

এই ঘন-সন্নিবদ্ধতার একটি বিপত্তি রয়েছে। মহাবিশ্ব সম্প্রসারণশীল, তা আমরা জানি। বর্তমানে এই মহাবিশ্বটি প্রায় ২০ মহাপদ্ম আলোক বৎসর ব্যাস-সম্পন্ন বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন। এই মহাবিশ্বটি যদি ২০ মহাপদ্ম আলোকবর্ষ হতে সম্প্রসারিত হয়ে ৪০, ৮০, ১০০ কিংবা হাজার মহাপদ্ম আলোকবর্ষ ব্যাস-সম্পন্নও হয়, তথাপিও একটি এটমের তুলনায় মহাবিশ্বটি অধিকতর ঘন বা Compact অবস্থায় বিরাজ করবে। এমতাবস্থায় কোনো নিকট বা অতিসদূর ভবিষ্যতে একটি সমান্তরাল প্রতিমহাবিশ্ব একইভাবে সম্প্রসারিত হতে হতে আমাদের জানা মহাবিশ্বটির সীমানায় পৌঁছে যায় এবং এই মহাবিশ্বকে স্পর্শ করতে সক্ষম হয়— তখন ঘটবে এক মহা দুর্ঘটনা। প্রতিটি গ্যালাক্সির মানকে একটি পরমাণু হিসাবে বিবেচনা করলে আমরা দেখতে পাব যে গোটা মহাবিশ্ব একটি পদার্থের টুকরা ছাড়া অন্য কিছু নয়— এই চিত্রে কার্যতঃ একটি এই জাগতিক পদার্থ-টুকরা, অন্য একটি প্রতিজাগতিক পদার্থ-টুকরার (antimatter) সঙ্গে সংস্পর্শে এসেছে। আর এই সংস্পর্শের অর্থ হলো সভরাভ (enmass) ধ্বংস। এই ধ্বংসের কোনো অবশেষ থাকবে না। সত্য হয়ে যাবে কোরআনের বাণী— *"আল্লাহর সত্তা ব্যতীত সমস্ত কিছুই ধ্বংসশীল। বিধান তাঁহারই এবং তোমরা তাঁহারই নিকট প্রত্যানীত হইবে। (২৮:৮৮) ইহার উপর অবস্থিত সকল বস্তুই লয়শীল (৫৫ঃ:২৬) শুধু তোমার মহাসম্মানিত প্রভুর সত্তাই লয়হীন ও অনন্তস্থায়ী" (৫৫:২৭)।* সম্প্রসারণের নেশায় ছুটে চলায় নিরত এই মহাবিশ্ব পরিণামে একটি প্রতিমহাবিশ্বের সংস্পর্শে আসবে না এবং এই প্রতিমহাবিশ্বের সমুদয় বস্তু নিচয় যে সভরাভ ধ্বংস হবে না— এই নিশ্চয়তার বিষয়টি আমাদের কাছে অজ্ঞাত। এমন সম্ভাব্যতাটি কেউ হেসে উড়িয়ে দিতে পারে কি?

www.pathagar.com

কোরআন সামগ্রিক অর্থে পদার্থের নিঃশেষ ধ্বংসের কথা বলেছে। আমরা জানি যে, পদার্থের কোনো নতুন মৌল তৈরী হবার ক্ষেত্র হলো নক্ষত্র, পৃথিবী নয়। অনুরূপভাবে আমরা জানি যে, পদার্থের সমূল ধ্বংস এই পৃথিবী, কোনো নক্ষত্র কিংবা এই মহাবিশ্বের কোনোখানে সম্ভব নয়। এই মহাবিশ্বের রীতি হলো এই যে— এক পদার্থ কেবল অন্য পদার্থ বা শক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারে। সমূল ধ্বংস বলতে যা বোঝায় তার Scale বা পরিমাপ এই মহাবিশ্বে নয় তার সম্ভাবনা অবশ্যই এই মহাবিশ্বের বাইরে, নিশ্চিতভাবে কেবল প্রতিমহাবিশ্বে লুক্কায়িত। এই হলো আমাদের আজকের বিজ্ঞানযোগ্যতায় লব্ধ জ্ঞান! বস্তু লয়শীল— এই তথ্য বিজ্ঞান জানার বহু পূর্বেই কোরআন তার বাণী গাম্ভীর্যে মুদ্রিত করে রেখেছে। বিষয়টি কিন্তু শুধু এখানেই শেষ নয়। এর আরো একটি অন্তর্নিহিত তথ্য রয়েছে— তা হলো বস্তুর লয়শীলতা, তথা তার সভরাভ (enmass) ধ্বংস সাধনের একটি উপায় বা পদ্ধতির প্রতি অঙ্গুলী প্রদর্শন ও নির্দেশ। এই নির্দেশপত্র কেবল উপায়হীনভাবে

www.pathagar.com

একটি মাত্র ব্যবস্থাপত্রের অনুমোদন দান করে— তা হলো প্রতিমহাবিশ্বের সংস্পর্শে এসে উভয় মহাবিশ্বের নিঃশেষ লয়— তখন সৃষ্টির কোথাও আর বিন্দুবৎ পদার্থও অবশিষ্ট থাকবে না। সমস্ত পদার্থজাত লয়প্রাপ্ত ও নিঃশেষ হবে।

স্টিফেন হকিংস সহ অনেকেই প্রশ্নটি এনেছেন— সৃষ্টির শুরু অর্থাৎ Big Bang–এর আগে স্রষ্টা কোথায় ছিলেন? আমরা Burst of Creation তত্ত্বের আলোকে বলতে পারি স্রষ্টা হয়তো আরো অসংখ্য মহাবিশ্ব নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। যেহেতু মানুষ মাত্রই সীমিত জ্ঞানের প্রতীক— সেহেতু এই প্রশ্ন করা এবং তার উত্তরের চেষ্টা করা, উভয়ই ভ্রান্তির বেড়াজালে বন্দী বিধায় এ সব একান্তই নিস্ফল প্রয়াস। অন্ততঃ খোদ বিজ্ঞানী, যিনি এসব প্রশ্ন তুলতে পারেন— তিনিও ভাল করেই জানেন, বিজ্ঞান অনেক 'কেন' কিংবা অনেক 'কোথায়' কিংবা অনেক 'কি' ইত্যাদির উত্তর জানে না। এটা বিজ্ঞানের জন্মগত সীমাবদ্ধতা। তথাপিও যখন প্রশ্ন এসে থাকে, তারও যে উত্তর কোরআন দেয়নি এমন নয়। এমনকি Burst of Creation তত্ত্বের মূল খুঁজতে গিয়েও একটি স্থানে আমাদের এসে দাঁড়াতেই হবে— সৃষ্টির সর্বপ্রথম অস্তিত্ব কোথা হতে এসেছে? এর সঙ্গে আমরা যোগ দিতে চাই আরো একটি প্রশ্ন Burst of Creation এর ফলশ্রুতিতে যদি এই মহাবিশ্ব কোনো প্রতিমহাবিশ্বের সংস্পর্শে এসেই পড়ে এবং সমস্ত সৃষ্টি বলতে যা বোঝায় তা যদি ধ্বংস হয়েই যায়, তাহলে স্রষ্টার অবস্থান কোথায় নির্ণীত হবে? এর জবাবে একটি আয়াত পেশ করব— *"(আল্লাহ্) ! তিনিই আদি, তিনিই অন্ত, তিনিই ব্যক্ত ও তিনিই গুপ্ত— এবং তিনি সর্ব বিষয়ে সম্যক অবগত" (৫৭:৩)।* যদি মহাবিশ্বের ভবিষ্যত এমনি কোনো ঘটনায় শেষ হয়ে যায়— তবে সমস্ত ব্যক্ত অস্তিত্বের অবসান ঘটবে, হয়তো সমস্ত মহাসৃষ্টির সকল অস্তিত্ব তখন কেবল শক্তিরূপে গুপ্ত হয়ে পড়বে— এবং এই 'গুপ্তে' অবস্থান করবেন তিনি। সেই গুপ্তটি এমন কোনো ডাইমেনশন যা আমরা ভাবতে বা চিন্তা করতে সক্ষম নই যেমন অনেক নিম্ন শ্রেণীর প্রাণী কেবল দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের ডাইমেনশনের সাথে পরিচিত, ভেদটি সম্পর্কে তাদের কোনো জ্ঞান নেই— তারা যা দেখে, সব ছবির মতোই দেখে।

www.pathagar.com

যখন Big Bang বা আদি সৃষ্টি ঘটেনি, তখনও আল্লাহ্ ছিলেন— গুপ্ত ছিলেন শক্তি বা মহিমায়, সৃষ্টির সমাপ্তিতে আবার তিনি তাঁরই মহিমার রাজ্যে গুপ্ত হবেন হয়তো। তবে যা কিছুই ঘটুক, আমরা শুরু ও শেষ এ দুই-এর অবস্থানে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনকে স্পষ্টতই দেখতে পাই, কারণ এই শূন্যতা পূরণের প্রস্তাব যা ৫৭:৩ আয়াতে এসেছে, তার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পৃথিবীর আর কোনো ধর্মগ্রন্থ কিংবা বিজ্ঞানবাদ আজ পর্যন্ত আত্মপ্রকাশ করেনি।

আমরা পূর্বে যে মহাধ্বংসের আলোচনা করছি, মূলতঃ তা স্থানীয়; অর্থাৎ একটি কিংবা একাধিক জীবনময় গ্রহ বা পৃথিবী নিয়ে। সম্ভবতঃ মানুষ জাতি বা সৃষ্টিকুলের জন্য এটাই মহাধ্বংস! কিন্তু এ ধ্বংসের পরও পদার্থস্তূপ অবশিষ্ট থেকে যাবে। কোরআন শেষপর্যন্ত কোনো পদার্থই থাকবে না— এ প্রস্তাব করে দৃঢ়ভাবে। ব্ল্যাকহোল অধ্যুষিত Close Universe এর যে চিত্র বিজ্ঞানীগণ এঁকে থাকেন, এর শেষভাগে সব পদার্থই ধ্বংস হবে বটে— কিন্তু অবশিষ্ট থেকে যাবে Black hole নিজেই এক মহাবৃহত্তর সময়ের জন্য। তাও যদি হকিংস রেডিয়েশন বা গামা-রে বিচ্ছুরণের ভেতর দিয়ে শূন্যের দিকে যেতে চায়, তবে তার জন্য সময় লাগবে বিলিয়ন বিলিয়ন বৎসর। হকিংস রেডিয়েশন পদার্থের সর্বশেষ অস্তিত্বের বিলুপ্তি ঘটাবে— কোরআনের প্রতি এই সমর্থন দিয়ে থাকে বলে হকিংসকে ধন্যবাদ। কিন্তু তার প্রক্রিয়াটি স্রষ্টা আদৌ গ্রহণ করবেন কিনা, তা-ই হলো প্রশ্ন। কারণ এতে স্রষ্টার হাতে বিলিয়ন বৎসরের শৃঙ্খলের বাঁধন পড়ে। তিনি হয়তো এতটা বোকামিতে যাবেন না সেখানে তাঁর হাতে অধিকতর কার্যকর প্রতিমহাবিশ্বের হাতিয়ার মজুদ আছে। যেহেতু ৫১:৪৭ আয়াতটি close universe ধারণার বিপক্ষে অবস্থান করে সব সময়ের জন্য, সেহেতু আমরা ধরে নিতে পারি যে কোরআন নিঃশেষে সমস্ত বস্তুর ধ্বংস বলতে যা বোঝাতে চেয়েছে, তা কেবল সম্প্রসারণের কারণে প্রতিমহাবিশ্বের সংস্পর্শে এসে যে ধরনের ধ্বংস সম্ভব— তা কিংবা তার অনুরূপ কিছুকে প্রতিভাত করে। এই ভাবগতিটি আমাদের Burst of Creation তত্ত্বকে নিঃশব্দে অনুমোদন দিয়ে যায়।

আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।

www.pathagar.com

Calculations

(Richard Carrington, The Stardy of Our Earth এর একটি তথ্যকে ভিত্তি করে এই হিসাবটি তৈরী করা হয়েছে। প্রদর্শিত অনুপাতটি সর্বোত্রভাবে ছাড় দেয়া একটি অতিশয় সরল প্রকৃতির হিসাব; এই হিসাবে স্থানকে মাত্র ২ ডাইমেনশনাল শীট বিবেচনা করা হয়েছে যার রয়েছে একটি মার্বেল আকৃতির নিউক্লিয়াস। নিউক্লিয়াসের ব্যাসার্ধ, r = 1cm। এমতাবস্থায় সর্বনিকটবর্তী ইলেক্টনটির দূরত্ব হবে 35 m বা 3500 cm. ফলতঃ নিউক্লিয়াসের radious ও sweeping area এর অনুপাত হবে ঃ

$$1 : 4\pi r^2$$
$$= 1 : 4 \times 3.14 \times 3500 \times 3500$$
$$= 1 : 15386\,0000$$

; অর্থাৎ নিউক্লিয়ামের ব্যাসার্ধের তুলনায় সুইপিং এরিয়া হলো ১৫৩৮৬০০০০ গুণ।

মহাবিশ্বে গ্যালাক্সিদের অবস্থান প্রতি ৫ মিঃ দূরে দূরে একটি বড় ডিনার টেবিলে খাবারের প্লেট বিন্যাসের মত। খাবারের প্লেটটি $^1/_2$ ফুট ব্যাসার্ধ সম্পন্ন হলে অনুপাত চিত্রটি দাঁড়ায় (৫ মিটার দূরত্বকে ১৫ ফুট বিবেচনায়) r = 7·5 ft :

$$^1/_2 : 4\pi r^2$$
$$\text{or} \quad 1 : 8 \times 3.14 \times 7.5 \times 7.5$$
$$\text{or} \quad 1 : 1413$$

সুতরাং, মহাবিশ্বের শূন্যতা ও পরমাণুর মধ্যে শূন্যতার অনুপাত

$$1413 : 153860000$$
$$\text{or } 1 : 108880$$

অর্থাৎ পরমাণুর অভ্যন্তরের ফাঁকা অংশ মহাবিশ্বের অনুপাতে ১,০৮,৮৮০ গুণ বেশী কিংবা মহাবিশ্বটি পরমাণুর তুলনায় ১ লক্ষ গুণের চাইতেও বেশী ঘনত্বসম্পন্ন।

হিসাবটিকে যদি ৩টি ডাইমেনশনের ভিত্তিতে করা হয়— তবে এই অনুপাতটি বেড়ে যাবে বহু বহু গুণ। আমরা সবচাইতে সরল পদ্ধতিটি বিবেচনা করলাম। আমরা বোঝাতে প্রয়াস পেয়েছি যে একটি পরমাণুর তুলনায় মহাবিশ্বটি অধিকতর ঘন সন্নিবদ্ধ (compact) যা প্রতিমহাবিশ্বের সংস্পর্শে এলে একটি একক বিস্ফোরক দ্রব্যের মত প্রতিক্রিয়া করবে।

www.pathagar.com

'কুন ফা-ইয়াকুন' -এর কোয়ান্টাম বিজ্ঞতা

এক

Edward Fahri এবং Alan Guth তাদের একটি যৌথ গবেষণাপত্রের শিরোনাম দিয়েছিলেন— "An Obstacle to Creating a Universe in the Laboratory". এতে তারা মন্তব্য করেছেন, একটি মহাবিশ্ব তৈরী করার জন্য অনেক পরিমাণ পদার্থের ভর দরকার হয় না। কোয়ান্টাম কার্যকারণই (Quantum effect) এর জন্য যথেষ্ট! কিন্তু তার জন্য যা চাই, তা হলো এমন একটি শর্ত যা অতি উচ্চ ঘনত্ব ও তাপমাত্রা (Very high density and a temperature) যার মান হতে হবে ন্যূনতঃ 10^{24}K বা এক মিলিয়ন বিলিয়ন বিলিয়ন ডিগ্রী কেলভিন, এইটুকু। তাপমাত্রা না হলে ইনফ্লাশনারী কার্যক্রম মহাবিশ্ব তৈরীর বাকি শর্তগুলি সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হবে। আমাদের হাতে যে শক্তি রয়েছে (হাইড্রোজেন বোম) তা দিয়ে এই ব্যবস্থাটির অর্ধেকের মত সুসম্পন্ন করা যায়— কিন্তু সমস্যা হলো এই অতি উচ্চক্রমের শক্তিকে অতি ক্ষুদ্র আয়তনে বন্দী করার জ্ঞান কারো হাতে নেই। যদি কোনো কারণে তা-ও সম্পন্ন করা সম্ভব হয়, তবে কেবল একটি Black-hole-ই তৈরী হবে, কোনো নতুন মহাবিশ্ব নয়!

www.pathagar.com

এতদিন মানুষের জ্ঞানের কাছে সবচাইতে বড় বিষয় ছিল যে সম্পূর্ণ শূন্য হতে কি করে এত সুবিশাল বস্তু বিস্তারময় একটি মহাবিশ্ব তৈরী হতে পারে? আজ এটি আর কোনো বিস্ময় নয়। 'Quantum cosmology allows the possibility of creating not just one universe but an infinite number of universes out of nothing at all' —আমরা এখন বিস্মিত হচ্ছি যে, বিজ্ঞান যেন দ্রুত কোরআনের জ্ঞানরাজ্যের দুর্বোধ্য তত্ত্ব ও তথ্যগুলিকেই প্রকাশ করতে চলেছে। সুধী পাঠক! এ অধ্যায়টি আমাদেরকে বিস্ময়কর কোয়ান্টাম রাজ্যের সম্ভাবনায় মহাবিশ্বের একটি অতিজটিল জন্মের রূপ চরিত্র প্রদান করবে। আমরা আশা রাখি বিমুগ্ধ অনুভব নিয়ে হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হব যে, এই মহাবিশ্বের একটি শুরু রয়েছে, এই শুরুটি একটি আদেশঘটিত ইচ্ছা ; একটি আদেশ কিংবা ইচ্ছা যে পরিণামে পদার্থ-কণা হয়ে প্রকাশ পেতে পারে, আমরা সে সত্যেরই সম্ভাবনাকে এ অধ্যায়টিতে পরখ করে দেখতে চাই।

দুই

আলো যখন পদার্থের উপর পতিত হয়, তখন তা পতিত ক্ষেত্রতলে চাপের সৃষ্টি করে। এই ঘটনাটি শতবৎসর পূর্বে Prof PN Lebedev কর্তৃক প্রমাণিত হয়েছিল। দেখা গেছে অতি পাতলা ধাতব পাতের উপর আলোর ঝলক ফেললে পাতটি সামান্য স্থানচ্যুত হয়। রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে প্রতি বর্গমিটারে এই চাপের পরিমাণ ·00047 gms. 'This experiment led to the indisputate conclusion that a flux of light had mass.' আলোর ঝলক ভরসম্পন্ন শক্তি। এইটুকু প্রমাণিত হবার পাশে পাশে Lebedev এর এক্সপেরিমেন্ট আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক তথ্য পেশ করল যা হলো— বস্তু ও আলো, এ দুই-এর মাঝে একটা ধারাবাহিকতা বিদ্যমান! বিজ্ঞানীগণ সিদ্ধান্ত পেলেন, 'Light is a form of matter in motion'— আলো চলমান বস্তুরই প্রতিরূপ মাত্র! যার সংক্ষেপ চিত্রটি যেভাবে এরপর

www.pathagar.com

পাওয়া গেল, তা হলো— The whole matterial world, matter in motion, exists in two principals; mutually related forms as of moving particles of matter and as light. অর্থাৎ তাবৎ সৃষ্টিতে বস্তুভর হয় চলমান কণা বিস্তার (পদার্থের মধ্যে) কিংবা আলোক হিসাবে বিরাজ করে।

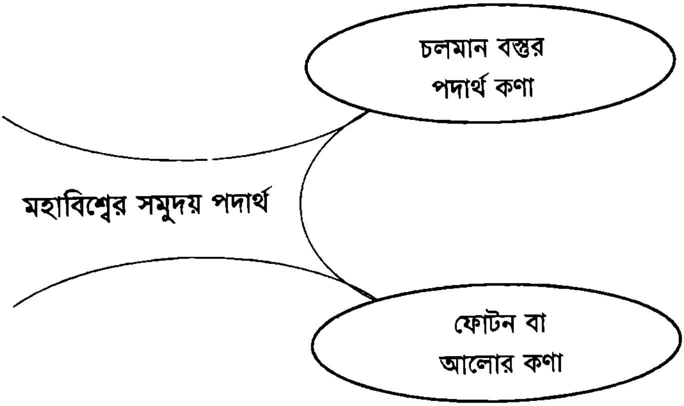

উপরোক্ত তথ্যটি আমাদেরকে সহজেই একটি যোগসূত্রে পৌঁছে দেয়। আমরা বলতে পারি যে, আলো ও পদার্থের ধারাবাহিকতায় ফোটন কণারা পদার্থের বিল্ডিং ব্লক কোয়ার্কের অতি নিকটবর্তী। পদার্থের জ্ঞাত ভিত্তি ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন— এ মূলতঃ ছ'টি কোয়ার্কের সমন্বয়ে ঘটিত। কোয়ার্ক পর্যন্ত আমরা পদার্থকে পদার্থ-রূপ মনে করতে পারি। কিন্তু কোয়ার্কের পরবর্তীতে?

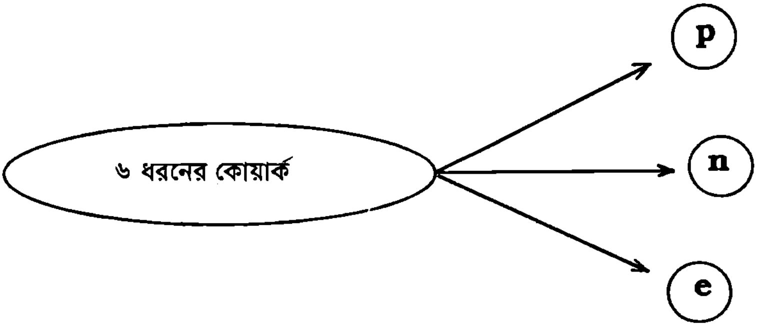

www.pathagar.com

পদার্থকে যদি উপরের তথ্য অনুযায়ী দুটি রূপে বিচার করি, তবে কোয়ার্ক পর্যন্ত আমরা পদার্থকে moving particle of matter হিসাবে বিবেচনা করতে পারি। কোয়ার্কের পর পদার্থের রূপটি আর পদার্থ থাকে না, তার প্রকাশ ঘটে photon কণায় ; অর্থাৎ আলোর কণিকা ফোটন হলো কোয়ার্কের পরবর্তী ধাপ কিংবা ফোটন হলো পদার্থের ও তথ্যের মাঝে অন্বয় রক্ষাকারী একটি ধারাবাহিকতা। ছকে বাঁধলে তা যেরূপ দেখায় ঃ

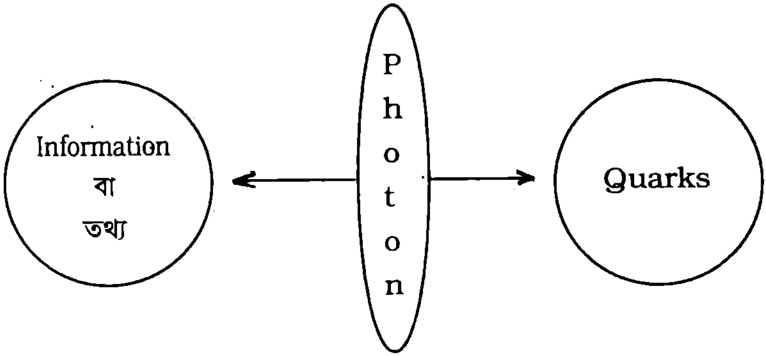

তিন

এডুয়ার্ড ফ্রেডকিন নামক একজন কম্পিউটার জিনিয়াস এক অতিশয় খেয়ালী তত্ত্ব দান করেছেন। তার তত্ত্বের পরিচয় তিনি দিয়েছেন Digital Physics হিসাবে, যার প্রস্তাব হলো তথ্য কণারাই মূল চালিকাশক্তি। বস্তু বিভাজনে যে সর্বশেষ মৌলিক অস্তিত্বের সন্ধান জুটবে— তা হলো তথ্যকণা। একটি তত্ত্ব হিসাবে ফ্রেডকিনের এই প্রস্তাব যত ক্ষুদ্রই হোক, এর ব্যবহারিক বিশালতা এই মহাবিশ্বের মতো। ফ্রেডকিনের জগতে একটি ইঁদুর মূলতঃ একটি চলমান তথ্যের ভাণ্ডার। তার দৃষ্টিতে এই মহাবিশ্ব হলো একটি অতিবৃহৎ কম্পিউটার সফ্‌টওয়্যারের মতো; এটি এমনভাবে ডিজাইন

www.pathagar.com

করা যেন সমস্ত প্রশ্নের ও জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে প্রস্তুত। According to his theory of Digital Physics, information is more fundamental than matter and energy. He believes that atoms, electrons and quarks consist ultimately of bits— binary units of information like those that are the currency of computation in a porsonal computer or a pocket calculator. ফ্রেডকিন মনে করেন, এই 'বিট'গুলির ব্যবহারিক চাল-চরিত এবং সর্বশেষে এই গোটা মহাবিশ্বের জন্যও তা নিয়ন্ত্রিত হয় একটি একক আইন (Single program rule) দ্বারা। ফ্রেডকিন এই একক আইনটিকে 'The cause of prime mover of everything' মনে করে থাকেন।

তিনটি গুরুতর দার্শনিক জিজ্ঞাসা যা মানুষ তার জীবন ও এই সৃষ্টি সম্পর্কে মুখোমুখি হয়, তা হলো— জীবন কি? চিন্তা, অনুভব, স্মৃতি এগুলি কি এবং এই মহাবিশ্বটি কিভাবে চালিত হয়ে চলেছে? ফ্রেডকিন মনে করেন, এই তিনটি প্রশ্নের জবাবই মূলতঃ তথ্য বা information নির্ভর। ডিএনএ-রা 'ডিজিটাল এনকোডেড ইনফরমেশন' এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ বই কিছু নয়। প্রাথমিক পদার্থের জটিলতাগুলি সাধারণ পদার্থবিদ্যা বিষয়ক জ্ঞানে পরিচালনা করা সম্ভব। কিন্তু পর্যায়টি যখন আরো উচ্চে উঠে আসে—যেমন জীবন কিংবা ডিএনএ, তখন বায়োকেমিক্যাল কার্যকারণ প্রবাহিত তথ্যসমূহকে একধরনের ডিজিটাল প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। তার চাইতেও উচ্চপর্যায়— যেমন আমাদের চিন্তাভাবনা মূলতঃ তথ্য প্রক্রিয়াজাত কার্যক্রম ছাড়া আর কিছুই নয় যা পদার্থবিদ্যার রাজ্য ছেড়ে অধিবিদ্যা (metaphysics) এর দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করে। "It's one more avenue of modeling reality, and it happens to cover the sort of three biggest philosophical mysteries."

কম্পিউটার জগতে Cellular automation এর ধারণার জন্ম হয় ১৯৫০ সালে জন ডন নিউম্যান কর্তৃক। এই সেলুলার শব্দটি কোনো

www.pathagar.com

জীববিজ্ঞান বিষয়ক ব্যবহারের জন্য নয়— এটি পরবর্তী বা সন্নিহিত খালি স্থানকে বোঝায় ; এই খালি কোষ সদৃশ স্থানগুলি সম্মিলিতভাবে বিভিন্ন কম্বিনেশনে বিভিন্ন প্যাটার্ন তৈরী করে। তখন হতেই ফ্রেডকিন এই সেলুলার অটোমেশন নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন। অনেক উদ্ভাবন ও প্রযুক্তির আলোকে এখন তিনি সুদৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে সেলুলার অটোমেশন প্রযুক্তিটি অতি মৌলিক পর্যায়ে অণু, পরমাণু, ইলেক্ট্রন ও কোয়ার্কদের সম্পর্কে গুরুতর তথ্য প্রদান করে। ভিত্তিগত পর্যায়ে এই অটোমেশন বস্তুজগতের আইনকানুনকে অতি সুনিশ্চিত ও সূক্ষ্মতায় ব্যাখ্যা করতে সক্ষম। তার এই ধারণার ভিত্তি হলো যে, ঐ পর্যায়ে (ত্রিমাত্রিক অটোমেশন জগতে) প্রতিটি ক্রিয়াশীল লজিক-ইউনিট প্রতি সেকেণ্ডে কয়েক জিলিয়ন (ট্রিলিয়ন ১০০০) বার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে যে, পরবর্তী মুহূর্তে এটি 'অফ' অথবা 'অন' থাকবে কি না? The information thus produced, Fradkin Says, is the fabric of reality, the stuff of which matter and energy are made. ফ্রেডমিনের জগতে একটি ইলেক্ট্রন, একটি 'তথ্য-বিন্যাস' (Pattern of information) ছাড়া অন্য কিছু নয়। ফ্রেডকিন যুক্তি দেখান— ইনফরমেশন বিটগুলি যে কনফিগারেশন বা বিন্যাসে নিয়োজিত রয়েছে কেবল তার বহিঃপ্রকাশ ঘটায় ; অর্থাৎ আমরা বিট-বিন্যাস পদ্ধতিকে কখনো ইলেক্ট্রন বলি কিংবা কখনো বলি হাইড্রোজেন এটম কিংবা অন্য কোনো কিছু বলে থাকি।

সন্দেহ নেই— ফ্রেডকিনের বিতর্কের সূত্রগুলি অতিশয় জটিল এবং তা না পদার্থবিদ না কম্পিউটার বিশেষজ্ঞের জন্য খুব সহজ বিতর্ক। কোনো ধর্মে বিশ্বাস করেন না ফ্রেডকিন। কিন্তু তার বক্তব্যের শেষ রেশটি ক্রমেই যেন ধার্মিক মানুষের মতো এক মহাশক্তিশালী স্রষ্টার সন্ধান করে। ফ্রেডকিন মনে করেন— It seems likely to me that this particular universe we have is a consequence of something I would call 'intelligence'--- এই মহাবিশ্ব একটি বুদ্ধিমত্তা ও অসাধারণ জ্ঞানের ফসল !

www.pathagar.com

ফ্রেডকিনের Digital Physics theory হতে আমরা কেবল এইটুকু সার পেতে পারি যে, প্রতিটি শক্তি বা পদার্থের পেছনে prime mover হলো information বা তথ্য। Information হলো— febric of reality; অর্থাৎ তন্তু হলো বাস্তবতার তন্তু! বস্তু ও শক্তি এই তন্তুতে তৈরী। আমরা এক একটি বস্তুকে এক এক ধরনের পরিচয়ে দেখি, কারণ তাদের মাঝে তথ্যগুলি এক এক ধরনের বিন্যাসের রূপ পরিগ্রহণ করে যার মাঝে এই ভিন্নতা সৃষ্টি হয়। ফ্রেডকিনের ধারণা— সকল বস্তু ও শক্তি বিভিন্ন তথ্যের বিটে তৈরী ; আমরা যখন কোনো বস্তুকে প্রত্যক্ষ করি— মূলতঃ আমরা তথ্য বা information এর জমাটবদ্ধ রূপ ছাড়া অন্য কিছু প্রত্যক্ষ করি না! এই পৃথিবীর সকল প্রাণী ও উদ্ভিদের DNA double helix–এ মজুদকৃত সকল তথ্য মাত্র চারটি nucleotide এর আকারে লিখিত। একটি ভাইরাস গঠিত হবার জন্য দরকার হলো ১০,০০০ তথ্য–কণা (bit of information) যা এ পুস্তকের প্রায় দুটি পাতার সমান। ভাইরাল ইনফরমেশন অত্যন্ত সরল। জীবনের সংগঠন যতই বড় হতে থাকে, তথ্যের বিন্যাস–জটিলতা ততই বেড়ে যায়। একটি ব্যাকটেরিয়ার গঠনে তথ্যের দরকার হয় প্রায় ১ মিলিয়ন বিট যা লিখতে দরকার হয় শতাধিক পাতার। একটা সাঁতার কাটতে সক্ষম অ্যামিবার জন্য চাই চারশত মিলিয়ন তথ্যের কণা যা দিয়ে ৫০০ পৃষ্ঠার ৮০টি পুস্তক

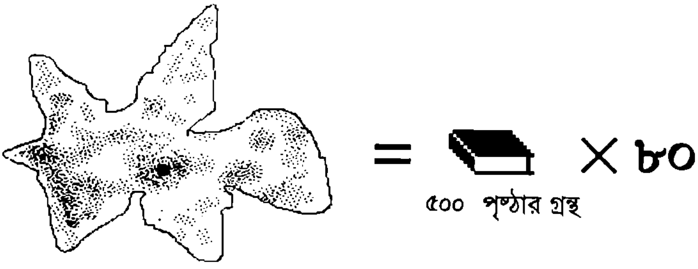

এক কোষী অ্যামিবা

www.pathagar.com

লিখা যায়। একজন মানুষের একটি কোষের মধ্যে তথ্য রয়েছে পাঁচ মহাপদ্ম (5×10^9) ; পুস্তকে রূপ দিতে হলে সহস্রাধিক ভলিয়মের সৃষ্টি হবে যা একটা লাইব্রেরির সমান প্রায়। এভাবে প্রতিটি মানব দেহের প্রতিটি কোষ এক একটি তথ্যের লাইব্রেরি যেন। আর পূর্ণাঙ্গ মানুষের দেহটি পৃথিবীর এক লক্ষ মহাপদ্ম লাইব্রেরি যতটা তথ্য ধারণ করতে সক্ষম তার সমান। একটা মানুষের দেহ যতগুলি তথ্যে গঠিত— তাবৎ পৃথিবীর পুস্তক ভাণ্ডারে ততগুলি

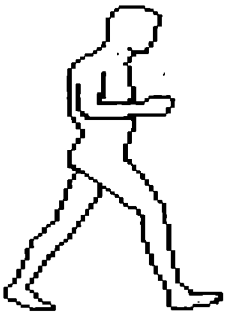

= ১০০,০০০,০০০০০০০ লাইব্রেরীতে যাবতীয় পুস্তকে যত তথ্য রয়েছে।

তথ্য নেই। The 5×10^9 bits of information in our encyclopadia of life – in the nucleus of each of our cells— if written out in, say, English, would fill a thousand volumes. Every one of your hundred trillion cells contains a complete library of instructions on how to make every part of you—আপনার দেহের একশত ট্রিলিয়ন কোষের প্রতিটি এক একটা সুবিশাল তথ্যের লাইব্রেরি; আর এই তথ্যরা শরীরের কোন্ অংশ কেমন হবে পূর্বেই স্থিরকৃত নির্দেশ অনুযায়ী গঠনের কাজটি সম্পন্ন করে। এভাবে জীবদেহ তৈরী হয় তথ্যের পেছনে তথ্যের সারি দিয়ে। একটু পরেই আমরা দেখতে পাব— জড় পদার্থের 'সার' বলতে যা বোঝায়— তা-ও কেবল তথ্য ভিন্ন অন্য কিছু নয়।

www.pathagar.com

চার

আমরা এবার ক্ষুদ্রতম লবণের দানায় ফিরে আসতে চাই। একটি আদর্শ মাইক্রোগ্রাম লবণ কণায় ন্যূনপক্ষে 10^{16} (১ এর পর ১৬টি শূন্য) সংখ্যক এটম বিরাজ করে। আমরা মহাকাশ পর্ব–১ এ দেখেছি যে, 'We cannot on this level understand a grain of salt, much less than the universe. So in this sense the universe is intractable, astonishingly immune to any human attempt at full knowledge—আমাদের মাইক্রোগ্রাম লবণ মূলতঃ 10^{16} সংখ্যক এটমে সমৃদ্ধ। এই সংখ্যক এটমকে যখন 'বাইনারি বিটে' পরিবর্তন করা হয়, তখন ক্ষুদ্রতম লবণের তথ্যের সংখ্যা দাঁড়ায় এত বেশি যা পূর্ণ ব্যবহারে প্রায় হাজারটি মস্তিষ্কের ধারণসাধ্য জ্ঞানের চাইতেও বেশি। ফলতঃ এই মহাবিশ্ব কিংবা তার স্রষ্টা বিষয়ক জ্ঞান অর্জন কখনোই আমাদের কিংবা কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব হবার কথা নয় (মহাকাশ পর্ব–১; শেষের কথা–১ দ্রষ্টব্য)।

আমরা যে প্রসঙ্গটিতে ছিলাম— তথ্য বা information লবণ কণায় 10^{16} সংখ্যক এটমে কিভাবে অবস্থান করে তা কি আমরা জানি? আমরা যদি আমাদের আয়তনকে অতি ক্ষুদ্রতম আকারে নিয়ে যেতে পারি যেন লবণের কেলাস জগতে প্রবেশ সম্ভব হয়, তবে দেখতে পেতাম যে, সীটের পর সীট দিয়ে এই লবণের কেলাস জগৎ তৈরী— যেন অসংখ্য অসংখ্য 'সীট' আমাদের উপর নীচে সামনে পিছে ও ডানে এবং বায়ে! এই সীটগুলি পর্যায়ক্রমে সোডিয়াম, ক্লোরিন, সোডিয়াম ক্লোরিন এমনি বিন্যাসে ব্যবস্থিত। এই বিন্যাস ব্যবস্থাপনাটি কিন্তু আর কিছু নয় ; তথ্য দ্বারা গঠিত ও নির্ধারিত। 'An absolutely pure crystal of salt could have the position of every atom specified by something like 10 bits of information.' এটম জগতে বস্তুর আকৃতি যে তথ্য–কণারা নির্ধারণ করে— আমরা এ তথ্যটি এখানে পেয়ে থাকি।

www.pathagar.com

মূলতঃ চিত্রটি আরো প্রসারিত। ক্লোরিন একটি বিষাক্ত হলদে গ্যাস, সোডিয়াম একটি ক্ষারকীয় বর্ণহীন জেলী সদৃশ পদার্থ। দুইকে একত্রিত করলে সোডিয়াম ক্লোরাইড তৈরী হয় যা রঙে সাদা আকৃতিতে কেলাসময়, কঠিন ; উভয় ক্লোরিন ও সোডিয়ামের স্বাদ ও ধর্ম হতে সম্পূর্ণ পৃথক স্বাদ ও ধর্ম নিয়ে লবণের আবির্ভাবটির পেছনে যে মূল কারণগুলি কাজ করে, সে হলো bit of information; এই bit of information; প্রতিটি পরমাণুর অবস্থানকে নির্ধারণ করে দেয়; ফলতঃ প্রতিটি মৌল কার্যতঃ তাদের আদি গুণাগুণকে পরিবর্তন করে সম্পূর্ণ নতুন অবয়বে ও পরিচয়ে উদ্ভব হয়ে থাকে। বস্তুজগতের মূল চালিকাশক্তি যে information বা তথ্যের বিট হতে

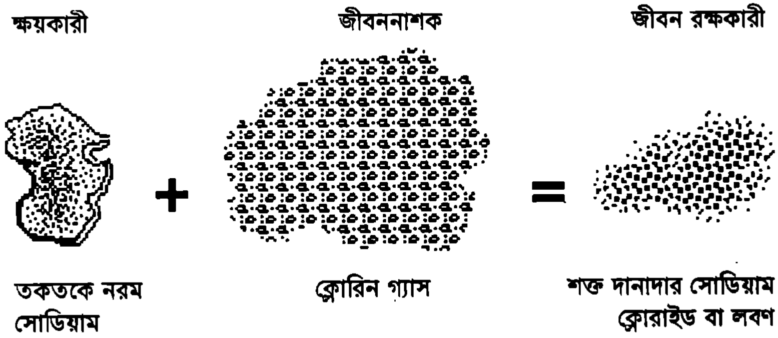

উৎসারিত হয়, এই তথ্যই আমাদেরকে লবণ কণায়, ক্লোরিন ও সোডিয়ামের নির্ধারণটি জানিয়ে যায়। এই নির্ধারণ প্রতিটি বস্তুর জন্য এক এক রকমের হলেও ফ্রেডকিনের সেই Single program rule এর অন্তর্ভুক্ত একটি একক মহাবিশ্বময় বিস্তৃত কম্পিউটার সফটওয়ারের নির্দেশভুক্ত !

পাঁচ

Information বা তথ্যের সাথে আর একটি অধ্যায়ও ওতপ্রোতভাবে জড়িত— তা হলো, 'আদেশ'। ফ্রেডকিন তথ্য

www.pathagar.com

সম্পর্কে অবহিত রয়েছেন। এরা কিভাবে কাজ করে, কতিপয় ক্ষেত্রে বিজ্ঞান তা ব্যাখ্যা দিতে পারে— ফ্রেডকিন্ এই ভাবধারার একজন প্রবর্তক। কিন্তু তিনি জানেন না— এই bit of informationগুলি আদৌ কেন একটি সুনির্দিষ্ট উপায় কিংবা পদ্ধতিতে কার্যক্ষম হয়ে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে কোনো নির্দিষ্ট পরিবেশে একটি সুনির্দিষ্ট ফলাফলের জন্ম দেয়। ফ্রেডকিন জানেন, সোডিয়াম ও ক্লোরিন লবণের জন্ম দেবার সময় তথ্য তরঙ্গদের প্রভাবে সোডিয়াম ও ক্লোরিন তাদের নিজ নিজ স্বভাবজাতগুণকে হারায় এবং নতুন গুণাগুণসম্পন্ন লবণের জন্ম সম্ভব করে তুলে। কিন্তু তিনি অবগত নন— কোন উৎস বা কোন কারণ সোডিয়াম ও ক্লোরিনকে এভাবে নতুন উদ্ভাবনের পথে শক্তির সরবরাহ্ করে। তবে তিনি বিশ্বাস করেন— Somewhєr out there is a machinelike thing that actually keeps our individual bits of space abiding by the rule of the universal cellular automation. তথ্য জগতে মহাজাগতিক সেলুলার অটোমেশন নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি যান্ত্রিক ব্যবস্থা কোথাও না কোথাও সদা সর্বদা কাজ করে; নইলে তথ্য কণারা যে চালিকাশক্তির যোগান দিয়ে থাকে, সেই শক্তি সরবরাহের মূল ব্যবস্থাটি কখনই সম্ভব হতো না। অর্থাৎ মানবিক জ্ঞানের দৈর্ঘ্যে আমরা তথ্য কণাদের কার্যক্রম বুঝতে পারি তাতে সন্দেহ্ নেই, কিন্তু তথ্য কণারা আদৌ কেন একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট ধারাবাহিকতায় ও সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থায় নিয়ন্ত্রিত হবে এর জবাবে ফ্রেডকিন একটি অতিজাগতিক শক্তির অবস্থানকে তার ব্যবস্থাপত্রে সুনির্দিষ্ট করে গেছেন। অবিশ্বাসী ফ্রেডকিন অন্ততঃ এখানে বিশ্বাসের ক্ষেত্রে যেন আইনস্টাইনের উত্তরসুরি হয়ে পড়েছেন!

ছয়

ফ্রেডকিন তথ্যকণাদের কার্যক্ষম করার যে "machinelike thing" এর সূত্র ডেকে এনেছেন— বিজ্ঞানের ব্যাখ্যার সীমা এইক্ষেত্রে

www.pathagar.com

এখানেই সীমিত। মূলতঃ এই বিষয়টিতে কোনো ব্যাখ্যার প্রসার ঘটে না এই জন্য যে, পদার্থবিদ্যার সীমা এখানেই শেষ রেখা টানে। পদার্থবিদ্যা আমাদের উপর যে সীমারেখা আরোপ করে, তাকে অতিক্রম করার জন্য আমরা অধিবিদ্যার (metaphysics) শাসন মেনে নিতে বাধ্য হই, যেমন ফ্রেডকিন নিজেও করতে বাধ্য হয়েছেন।

Digital Physics-এর সূত্র ধরে আমরা যতদূর এগিয়েছি, তা হলো যে— পদার্থবিজ্ঞানের মূলে কেবল তথ্যের প্রবাহ ; তথ্যরাই মূল চালিকাশক্তি। পদার্থকণা কোয়ার্ক কিংবা ইলেক্ট্রন কিংবা ফোটন ইত্যাদির মৌলিক ভিত্তি হলো তথ্যকণা বা binary bits of information. প্রযুক্তির দক্ষতা বেড়ে আসলে আমরা কি দেখতে পাব যে, পদার্থের মূলভিত্তি কোয়ার্কের বিভাজন সম্ভব হলে পরবর্তী ভিত্তিমূলের নাম হবে তথ্য বা Information? এই জিজ্ঞাসার মূলে বিজ্ঞানের যে সম্ভাব্য রায়, তা হলো 'হ্যাঁ'— কিন্তু 'এক্সপেরিমেন্টাল প্রুফ' হাতে পেতে হয়তো বিজ্ঞানকে অপেক্ষা করে বসে থাকতে হবে আরো অনেকদিন— অন্ততঃ সূক্ষ্ম প্রযুক্তির দক্ষতা যতক্ষণ হাতে না আসছে, ততক্ষণ তার প্রমাণ কেবল অধিবিদ্যার অনুগ্রহেই বিরাজ করবে। আমরা আমাদের জ্ঞানের এইটুকু অঞ্চলে প্রবেশ করতে পেরেই খুশি। বাকিটুকু আমরা পারিপার্শ্বিক জ্ঞানের দ্বারা বুঝে নিতে সক্ষম হব বলে আশা রাখি।

Information বা তথ্যরা কিভাবে কাজ করে, আমরা ব্যবহারিক জীবন কিংবা একটি কম্পিউটার সফটওয়ার হতে ভালভাবে বুঝতে পারি। সকল অর্থে তথ্যদের কার্যক্ষম করার জন্য Command বা আদেশ একটি অলঙ্ঘনীয় শর্ত। কম্পিউটার সফ্টওয়ারে প্রয়োজনীয় তথ্য দেবার পর শেষ আদেশটি কমাণ্ডকে নির্ণীত করে; শেষ 'কমাণ্ড–আদেশ' পাবার সাথে সাথে কম্পিউটারটি যে কোনো সিস্টেমকে কার্যক্ষম করে তোলে। মনে করুন, একটি আমেরিকান মিসাইল ব্যবস্থায় প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে পাতানো কয়েকশ' নিউক্লিয়ার মিসাইলকে সচল করার জন্য প্রয়োজনীয় ডাটা বা তথ্য দেবার পর

www.pathagar.com

সর্বশেষ কমাণ্ডটির নাম 'ফায়ার'। এই 'ফায়ার' আদেশ না দেয়া পর্যন্ত মিসাইলগুলি লক্ষ্যের দিকে ছুটে যাচ্ছে না। এখানে এই 'ফায়ার' সফ্টওয়ারটি একটি কমাণ্ড সফ্টওয়ার। এই কমাণ্ড সফ্টওয়ার এই প্রোগ্রামের পূর্ণতা বিধান করবে। সুতরাং পরিপূর্ণভাবে ডাটা প্রয়োগের পরবর্তী ধাপটি হলো Command বা আদেশ।

একটি ব্যক্তি-অপারেশন কিংবা একটি অতি বৃহত্তর ব্যবস্থা পৃথক পৃথক পদ্ধতি ও নিয়মকানুনে ব্যবস্থিত হতে পারে— অন্ততঃ এটা সঙ্গত কারণে আশা করা যায়। আমরা আমাদের জ্ঞানের দৈর্ঘ্যে আজকের অবস্থানে একটি ক্ষুদ্রতম লবণ দানাকে বুঝতে সক্ষম নই। অতএব, আশা করা যায় যে, আমরা কোনো ক্ষুদ্র কিংবা বৃহৎ বিষয়ে চূড়ান্তজ্ঞান অর্জন করিনি এবং আমাদের সিদ্ধান্ত ভুল হতে পারে। তথাপিও আমাদের ব্যবহারিক জ্ঞান স্রষ্টা কর্তৃক এমনভাবে পরিচালিত যে— আমরা যেন মূল সত্যের সন্ধান লাভ করতে পারি। God must guide us in accordance with our laws so that we can understand Him or He must improve our knowledge and make us as wise as He is so that we can understand Him.

আর সম্ভবতঃ এই কারণেই হয়তো একটি লবণ দানাকে সম্পূর্ণরূপে বুঝতে অসমর্থ মানুষজাতি জ্ঞানে এই মহাবিশ্বের সৃষ্টি পদ্ধতিকে বুঝতে পারে। আমরা সৃষ্টিকে যতদূর বুঝতে সক্ষম হয়েছি, তার আলোকে পূর্ব আলোচনাটিকে এখানে এভাবে প্রসারিত করতে পারি যে—

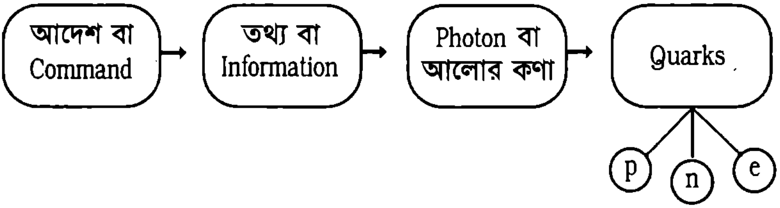

www.pathagar.com

Big Bang এর সন্ধিক্ষণে বিজ্ঞান কোনো কমাণ্ড বা আদেশের অস্তিত্বের কথা জানে না। আমরা জানি না কোনো স্রষ্টা ঐ সময় অনেক অনেক শক্তিশালী তথ্যকে একত্রিত করে কোনো Command বা আদেশ দিয়েছিলেন কিনা, যার ফলশ্রুতিতে এই মহাবিশ্বের জন্ম হয়েছিল। তবে কোনো সৃষ্টিকর্তা এমন একটি কাজ যদি করতেন, তবে আমরা একটা চমৎকার সমাধানে যেতে সক্ষম হতাম। Big Bang এর প্রবক্তাগণ অবশ্যই একটি অতিসুন্দর ও গ্রহণযোগ্য সৃষ্টি–তত্ত্ব প্রস্তাব করেছেন যার প্রতি বিজ্ঞানের আস্থা দীর্ঘদিনের। সময়, উপাত্ত ও প্রযুক্তি এই Big Bang সৃষ্টি তত্ত্বকে আরো অধিক বিশুদ্ধতায় গ্রহণ ও ব্যাখ্যা করে চলেছে। কোয়ান্টাম কার্যকারণ একটি একদম শূন্যতার পরিবেশ হতে একটি মহাবিশ্বের জন্মকে সমর্থন করে। কিন্তু সন্দেহ থেকে যায় তারপরেও— মহাশূন্যতার পরিবেশ অসীম বিস্তার শক্তি অতি ক্ষুদ্র বিন্দুতে ঘনায়ন জন্য একটি আদেশ বা Command এর আবশ্যিকতা অত্যন্ত জরুরী। Big Bang এর সকল উপাত্ত শেষ পর্যন্ত একটি অতিশয় চমৎকার তত্ত্বের জন্ম দিতে পারে যদি কেবল কথিত মহাবিস্ফোরণটির মূলে কোনো কারণ (Couse)–কে আবিস্কার করা যায়। কারণ হিসাবে যদি এখানে স্রষ্টাকে ডেকে আনা হয়, তবে স্রষ্টায় বিশ্বাসী নয় এমন বিজ্ঞানীগণ সমস্যায় পতিত হন। ফলতঃ Big Bang এর মহাবিস্ফোরণ কোনো স্রষ্টার মুখাপেক্ষী ছিল না এই ধারণাটিকে প্রভূতভাবে শক্তিশালী করা হয়েছে নির্বিচারেই।

আমাদের সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তি বলে যে, একটি মহাবিশ্বের জন্মের পেছনে একটি মহাবিস্তার স্রষ্টার অবস্থান অতি প্রাসঙ্গিক। Big Bang এর মতো ঘটনার পেছনে কিন্তু প্রস্তুতি ও চূড়ান্ততায় 'আদেশ' বা Command এর একটি ভূমিকা কোনোভাবেই এড়াবার মতো নয়। আমরা এ সত্যটিকে আমাদের আলোচনায় বিশেষভাবে ফুটিয়ে তুলতে চাই।

www.pathagar.com

সাত

এইবার আমরা আমাদের প্রচলিত জ্ঞানকে সৃষ্টি বিষয়ক ব্যাখ্যার বিচারে নিয়ে আসতে চাই। আমরা জানি যে, Big Bang এর ক্ষণে অসীম বিস্তার শক্তিময় তথ্যপ্রবাহ ছিল তাতে সন্দেহ নেই (যেহেতু Big Bang হতে একটি মহাবিশ্ব জন্ম নিতে পেরেছিল) — কিন্তু সেখানে একটি শক্তিশালী আদেশ দানকারী কোনো স্রষ্টার কথা বিজ্ঞানীগণ অবহিত নন। যদি সেখানে এমন কোনো আদেশ দানকারী স্রষ্টার বিবেচনা বিচার্য হতো, তবে সে স্রষ্টার জন্য একটি শর্ত হলো যে তাঁকে তাঁর হাতের অসীম বিস্তার তথ্যকে (যদি আদৌ এমন স্রষ্টা থেকে থাকেন) অতিশয় ক্ষুদ্র বিন্দুতে ঘনায়ন করতে হবে। এই ব্যবস্থায় তিনি যদি সামান্যতম ব্যর্থ হন— তবে, Edward Fahri/Alan Guth এদের মতো তিনিও কেবল একটি ব্ল্যাক–হোলই তৈরী করবেন, কোনো মহাবিশ্ব নয়!

বিজ্ঞান এমন কোনো যোগ্য স্রষ্টার সন্ধান না জানলেও কোরআনে এমন একজন স্রষ্টার তথ্য রয়েছে যিনি সত্যি সত্যিই সেই চূড়ান্তক্ষণে আদেশ দানকারী, একটি আদেশ যাঁর সৃষ্টিমূলে এক অতি উল্লেখযোগ্য বিবেচনা; যিনি অতিশয় শক্তিশালী প্রভু এবং বিজ্ঞানীগণের মতো ভুল করে মহাবিশ্বের পরিবর্তে Black-hole তৈরী করেন না। সেই প্রভুর নাম— আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন। আমরা এখানে সেই প্রভুর সৃষ্টির বিষয়ে সংশ্লিষ্টতা পরীক্ষা করে দেখব, আর একই সাথে আমরা দেখব যে সৃষ্টিতে যে শূন্যতা বিজ্ঞানীরা বিরাজ করতে দেখেছেন, সেই শূন্যতাকে তিনি কতদূর পূরণ করতে সমর্থ হয়েছেন। আলোচনায় প্রবেশের পূর্বে আমরা আমাদের পূর্বের রেখচিত্রটিকে একটু বিন্যস্ত করতে চাই ঃ

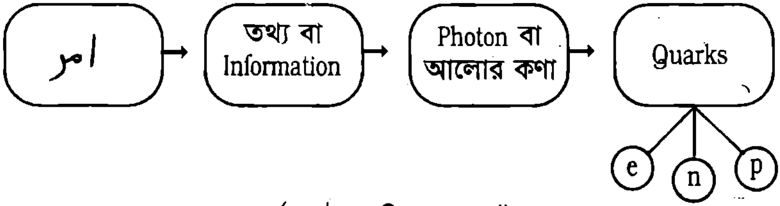

(امر = Command)

www.pathagar.com

এই রেখচিত্রটি امر বা খোদায়ী আদেশ Information বা তথ্য বিস্তারকে কোয়ার্ক/ফোটন কিংবা সাব এটমিক পার্টিক্যালে পর্যবসিত করার প্রস্তাব করেছে।

কোরআন এখন আপনাকে আজ হতে ১৫ মহাপদ্ম বৎসরের অতীতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। লক্ষ্য করুন— *"সেই মহান সত্তাই আকাশসমূহ ও পৃথিবীসমূহকে সৃষ্টি করিয়াছেন সঠিক সূক্ষ্ম-সমতায়। তিনি যখন আদেশ করেন 'হও'— অমনি তাহা হইয়া যায়।" (কুন ফা-ইয়াকুন ৬:৭৩)। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা যখন কিছু করিতে সিদ্ধান্ত করেন, তখন শুধু আদেশ করেন— 'হও' ; আর উহা যুগপৎ হইয়া যায়" (২:১১৭)।*

আমরা উপরের দুটি আয়াতে অবগত হই যে— কোরআনের স্রষ্টা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী (সমূহ) সৃষ্টি করার সময় একটি পরিমাপগত সূক্ষ্মতা ব্যবহার করেছেন এবং এই সৃষ্টি কর্মটি ছিল তাঁর একটি আদেশঘটিত বিষয় امر। এবং সৃষ্টির সময় তিনি শুধু নির্দেশ ব্যক্ত করেছেন— 'হও' আর অমনি এই মহাসৃষ্টির গোড়াপত্তন ঘটেছে। Big Bang এর গোড়ার দিকে এক অসীম বিস্তার শক্তির উন্মেষ ঘটেছিল। আমরা কোয়ান্টাম কার্যকারণ হতেও অবগত রয়েছি যে, অসীম শক্তিকে অতি ক্ষুদ্র বিন্দুকে ঘনায়ন করার একটি শর্ত এই সৃষ্টিকর্মে অবশ্যই পূরণ হতে হবে। আমরা এমন একটি পরিবেশ কোরআনের আয়াত হতে পেয়ে যাই— *"মহাবিশ্বকে السماء সৃষ্টি করিয়াছি অসীম শক্তির দ্বারা উহাকে আমরা সম্প্রসারণ করিতেছি"* *(৫১:৪৭)* মহাবিশ্বের আদি সৃষ্টিক্ষণে অসীম শক্তির বিবেচনাটি একদিকে যেমন বিস্ময়কর, অন্যদিকে বিস্ময়কর হলো এর সাথে যুগপৎ সম্প্রসারণের তথ্যটি। *'উহাকে আমরা সম্প্রসারণ করিতেছি'*— এই আয়াতাংশে অন্যপক্ষে বলে যে আদিক্ষণে মহাবিশ্বটি সংকুচিত ছিল এবং শক্তি ঘনায়নের কারণে এর সম্প্রসারণ একটি অত্যাবশ্যকীয় শর্ত। শক্তি যে সংকুচিত স্থানে

www.pathagar.com

সীমাবদ্ধ করে একটি কোয়ান্টাম ইফেক্ট তৈরী করা হয়েছিল— এই আয়াতে যথার্থভাবেই তার সত্যাসত্যটি ফুটিয়ে তোলে।

কোরআনের আয়াত সৃষ্টিক্ষণে যে শক্তির ঘনায়ন ঘটানো হয়েছিল, তার মাত্রা নির্ণেয়ক বর্ণনাও দিয়েছে। *"উহারা আল্লাহর যথোচিত মর্যাদা উপলব্ধি করে না ; আল্লাহ নিশ্চয়ই মহাক্ষমতাবান পরাক্রমশালী (২২:৭৪)* ব্যবহৃত শব্দ *قوي عزيز* আল্লাহতা'লার শক্তি ও সাধ্যের একটি মাত্রা প্রদান করে। 'ক্বাভিও' শব্দের অর্থ হলো অতিশয় তীব্র, প্রচণ্ড, যৎপরোনাস্তি জোরালো শক্তিমান ও ক্ষমতাবান আর 'আজিজ' শব্দের অর্থ হলো ক্বাভিও এর অনুরূপ। ফলতঃ 'ক্বাভিও আজিজ' শব্দ দুটিতে শক্তির উপর শক্তি বা শক্তি গুণিতক শক্তি— অর্থাৎ এক মহাশক্তির মাত্রা নির্দেশ করে। আমরা ধরে নিতে পারি— যে স্রষ্টা শক্তি গুণিতক শক্তি দ্বারা সৃষ্টির ক্ষণে মহাবিশ্বকে সৃষ্টি করেন এবং সাথে সাথে যা সম্প্রসারণ করার প্রয়োজন হয়েছিল, সেই স্রষ্টা নিশ্চিতভাবেই অসীম শক্তিকে একটি অসম্প্রসারিত বা সংকুচিত পরিসরে ঘনায়ন করেছিলেন। মূলতঃ তিনি তাঁর অসীম শক্তিকে তথ্য আকার Void এ উপস্থাপন করেছিলেন, অতঃপর তাকে কার্যকর করেছিলেন একটি আদেশ বা امر দ্বারা— *"সেই মহান সত্ত্বাই আকাশসমূহ ও পৃথিবীসমূহকে সৃষ্টি করিয়াছেন সঠিক সূক্ষ্মসমতায়। তিনি যখন আদেশ করেন— 'হও', অমনি তাহা হইয়া যায়" (৬:৭৩)।* কোয়ান্টাম কার্যকারণ ও কোরানিক স্রষ্টার মহাশক্তি এক সংকুচিত স্থানে ঘনায়ন এবং পরিণামে তাকে কুন كن আদেশ দ্বারা সমর্থিত করার মধ্য দিয়ে একটি মহাবিশ্ব যা Big Bang এ তৈরী হয়েছিল, তেমনি কোনো মহাবিশ্বের জন্ম সম্ভব হতে পারে।

বলা দরকার, কোরআনে স্রষ্টা নিজকে সর্বত্র একক, অদ্বিতীয় ও অংশহীন প্রভু বলে প্রকাশ করেছেন। কিন্তু কতিপয় ক্ষেত্রে তিনি নিজের পরিমাপ করেছেন বহুবচনে 'আমরা' সর্বনাম ব্যবহার করে। এক ও অদ্বিতীয় প্রভু নিজের অবস্থানকে বহুবচনে ব্যবহার করার দুটি বিশেষ চরিত্র রয়েছে— একটি হলো বিনয়। প্রকাশে শালীনতা ও বিনয়ের ক্ষেত্রে কোরআনের প্রভু আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের চাইতে কেহই বেশি

www.pathagar.com

অগ্রগামী নয়। এই 'আমরা' বা বহুবচনের অন্য ব্যবহারটি হলো শক্তির প্রকাশ। তিনি তাঁর মহাশক্তির তথ্যকে প্রকাশ করার জন্য তাঁর এককতাকে বহু সংখ্যায় প্রকাশ করেছেন। যে প্রভু সদা একক, অংশীবাদের বিরুদ্ধে সর্বদা যিনি ক্ষমাহীন ক্রোধ প্রকাশ করেছেন, সেই প্রভু নিজকে 'আমরা' বহুবচনে প্রকাশ করে কেবল তাঁর গুণের প্রাচুর্যতা, অতুলনীয়তা, আর অসীমতার দাবিই মানুষের বিবেচনার সামনে মেলে ধরেছেন। তাঁর এই আমরা প্রকাশ তাই তাঁর এককতা বা তাহওহীদিবাদের একটি অনন্য স্বাদের অলঙ্কার মাত্র! ৫১:৪৭ আয়াতে তাঁর এই বহুবচনের প্রকাশ ঘটেছে দুই স্থানে— *"মহাবিশ্বকে 'আমরা' সৃষ্টি করিয়াছি শক্তির (অসীম) দ্বারা ; আমরা ইহার সম্প্রসারণ করিতেছি"।* এই অদ্বিতীয় স্রষ্টার বহুবাচক অবস্থানটির দ্বিত্ব তাঁর সৃষ্টিকর্মে শক্তির অসীমতা এবং সম্প্রসারণ ব্যবস্থায় অসীম বিপুলতার সমাবেশকে চিত্রায়িত করে।

খুঁত সন্ধানীগণ অনেকেই আমাকে প্রশ্ন করেছেন— আল্লাহ্ এক জায়গায় তাঁর এককতার কথা বলেছেন, অন্য জায়গায় তাঁর সেই এককত্বের বিপরীতে বহু সংখ্যার কথা বলেছেন। তিনি কি তাঁর সাথের অংশীদারগণের কথা বলেছেন? অথবা তিনি কি একটা team work এর কথা জানাচ্ছেন?

তাদের আমি জানাতে চাই, আল্লাহ্ তায়া'লা যেমন তাঁর শক্তিকে প্রকাশ করতে চান শক্তি গুণিতক শক্তি (যেমন শক্তি × শক্তি অর্থাৎ মহাশক্তি × মহাশক্তি قوي عز يز এমনি তথ্যের দ্বারা— তাঁর বহুবাচক প্রকাশগুলিও তদ্রূপ ; তিনি ঐ বহুবচনটি মূলতঃ এককতা গুণিতক এককতা অর্থাৎ 1×1^{nx} এই Order–কে নির্দেশ করে থাকতে পারেন। এই অবস্থানে থেকে তিনি যদি নিজেকে 'আমরা' বলে প্রকাশ করেন, তবে তা তাত্ত্বিকভাবে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ। আর এ পরিস্থিতিতে গাণিতিকভাবেও তিনি $1 \times 1^{nx}=1$ অর্থাৎ এককতার অবস্থানেই নিজকে রক্ষিত করেন team work এর প্রয়োজন এখানে আসে না।

মনে রাখা দরকার— একটি মহাবিশ্ব সংক্রান্ত ব্যাখ্যা কখনই শুধুমাত্র Physical Laws দ্বারা পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ সম্ভব নয়। পদার্থ

www.pathagar.com

বিজ্ঞানকে তার সীমারেখা অতিক্রম করে অবশ্যই অধিবিদ্যার জগতে প্রবেশ করতে হবে। যে মুহূর্তে পদার্থবিদ্যা অধিবিদ্যায় প্রবেশ করবে, সে সময় হতে আমরা খুঁজব— কোন তথ্যগুলি আমাদের প্রকল্পকে সবচাইতে সার্থকভাবে ব্যাখ্যা করতে সমর্থ। কোরআনের আয়াতে আশ্চর্যজনকভাবে বিজ্ঞানের সকল শর্ত পূরণ করে Big Bang চিত্রকে পরিস্কারভাবে ব্যাখ্যা করে। Big Bang–এর ব্যাখ্যায় আমরা সৃষ্টিক্ষণে একদম শূন্য হতে সৃষ্টির বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে যে সব সমস্যার মুখোমুখি হই— কোরআনের আয়াতসমূহ অবলীলাক্রমে তার সকল শূন্যতাকে পূরণ করে আমাদেরকে নির্দেশ দেয় যে, সূক্ষ্মতায় আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করার ক্ষণে.দয়াময় যে পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন— তার সাথে একটি امر বা আদেশের বিষয় ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল (৬:৭৩)। দয়াময় নিজে সেই امر বা আদেশদাতা হিসাবে সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করেছিলেন। ঘটনাটি ঘটেছিল আলোর ঝলকের ন্যায় অতি সূক্ষ্ম সময়ের মধ্যেই (৫৪:৫০)। সৃষ্টির পত্তন হয়েছিল একটি স্বাভাবিক নিয়মে যেভাবে বিজ্ঞান আমাদেরকে তথ্য দেয় (দ্রষ্টব্যঃ টাইম জিরো, প্লাঙ্ক টাইম ও প্রাইমোরডিয়াল ফায়ার বল—মহাকাশ পর্ব–১)। আমরা পুরো ঘটনাটিকে রেখচিত্রে সাজাতে পারি এভাবে—

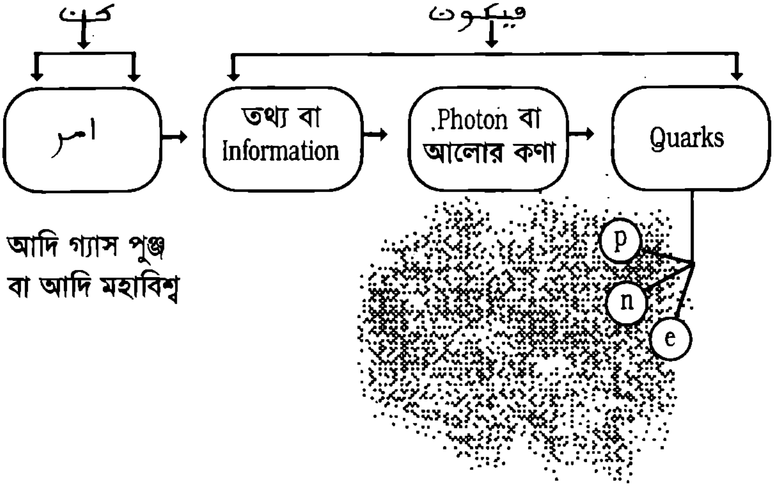

www.pathagar.com

আমাদের প্রচেষ্টা ছিল শুধু এইটুকু বুঝতে যে, কোরআন যে পদ্ধতিতে স্রষ্টাকে সৃষ্টির কার্যকরণে এনে দাঁড় করিয়েছে, সেই পদ্ধতিটি আদৌ জ্ঞাত বিজ্ঞানের কাছে কতদূর গ্রহণযোগ্য হতে পারে। আমরা দেখলাম, কোরআনের ভাষা মূল–পদার্থ–বিজ্ঞানের পদার্থ সৃষ্টির ধারাবাহিকতায় যেখানে ছন্দপতন ঘটেছে, সে শূন্যতাকেই কেবল পূরণ করে না ; কোরআন পদার্থ সৃষ্টির যে ধারাবাহিকতাকে অনুমোদন করে— তার বাইরে বিজ্ঞানের জন্য আর কোনো পদ্ধতিই খোলা নেই। Big Bang এর বিস্ফোরণ–ক্ষণে কোয়ান্টাম কার্যকারণ সৃজনকারী স্রষ্টা তার তথ্যশক্তি ভাণ্ডারকে কার্যকর করার জন্য 'কুন' শব্দের দ্বারা Command এর শর্ত পূরণ করেন। কোরআন দেখায়, এই 'কুন' শব্দটি পরবর্তী ৫১:৪৭ আয়াতের 'শক্তি'কে কার্যক্ষম ও উপযোগিতা দান করে ; এই উপযোগপ্রাপ্ত শক্তিটি كن আদেশের সাথে সাথে আদি বস্তু ভর তৈরী করে যা যুগপৎভাবে সম্প্রসারণের সৃষ্টি করে। সেই পরিবেশে শক্তি বস্তুর ঘনত্ব তাপমাত্রার ক্রম ছিল অসীম যা ২২:৭৪ আয়াতের *"ক্বাভিও আজিজ"* বা মহাশক্তি গুণিতক মহাশক্তির ($E^A \times E^A = \alpha^{nx}$) পরিবেশের ইঙ্গিত দেয়।

মহাবিশ্বের সৃষ্টিতে كن শব্দটি একটি امر বা Command হিসাবে মূল সৃষ্টি রচনায় যে ভূমিকা পালন করেছে তার ফলাফল আমরা যুগপৎভাবে فيكون অর্থাৎ 'হয়ে যাওয়ায়' প্রত্যক্ষ করেছি। আশ্চর্য হবার বিষয় যে— একটি Big Bang যে যে শর্তগুলি দাবি করে, আমরা কোরআনের ৬:৭৩, ৫৪:৫০, ৫১:৪৭, ২:৭৪ ইত্যাদি আয়াতসমূহে ঐ সব শর্তসমূহকে পূর্ণ উপযোগিতায় ও পরিপূর্ণতায় বিজ্ঞানের ব্যাখ্যাশূন্যতাকে পূরণ করতে দেখি। একটি মহাবিশ্ব সৃজনের জন্য একজন মহা উদ্যোক্তার প্রয়োজন ছিল এবং তিনি তাঁর আদেশঘটিত কার্যক্রম দ্বারা মহাবিশ্বের গোড়াপত্তন করেছিলেন— এই হলো আমাদের প্রস্তাব; যা কোয়ান্টাম ফিজিক্স কিংবা Big Bang Model হতে একটি মৌলিক পার্থক্য সৃষ্টি করে।

www.pathagar.com

কোরআনের প্রস্তাবের আলোকে আমরা বুঝতে সক্ষম হই— Standard Big Bang Model টি–ই গ্রহণযোগ্য যদি কিনা আমরা এর কেন্দ্রমূলে স্রষ্টাকে স্থাপন করতে পারি; অন্যথায় কোয়ান্টাম কার্যকারণ যত চাতুর্য অবলম্বন করুক— তা একটি অসার, বাকস্ফূর্তিতে শ্রুতিমধুর বক্তব্য ছাড়া অন্য কিছু মনে হবার কারণ নেই। John Gribbin এর সাথে সুর মিলিয়ে আমরা বলতে পারি— Does that mean that the universe is not the result of chance? Have comologists re-discovered God?

জগৎ বিজ্ঞানীরা আজ যে স্রষ্টার সন্ধান পাবার প্রয়াস করছেন, কোন সে স্রষ্টা? তিনি মূলতঃ কোরআনের স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নন কি? *"তিনিই প্রথম, তিনিই শেষ! তিনি সুপ্রকাশ এবং তিনিই অদৃশ্য, তিনি সকল বিষয়ে মহাজ্ঞানী (৫৭:৩) আকাশ ও ভূমণ্ডলের সৃজনকারী। যখন কোনো কার্য করিতে মনস্থ করেন, তখন আদেশ করেন— 'হও', অমনি তাহা হইয়া যায় (২:১১৭)। বলো আল্লাহ্ই সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন ও উহার পুনরাবৃত্তি ঘটান (১০:৩৪)। তিনিই মহান আল্লাহ্, তোমাদের প্রতিপালক, স্রষ্টা। তিনিই সকল বস্তুসমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব, তোমরা বিভ্রান্ত হইয়া কোথায় ছুটিয়া যাইতেছ?" (৪০:৬২)।*

আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।

www.pathagar.com

মহাধ্বংস বা কিয়ামত

এক

নিয়মের স্বতঃসিদ্ধতা সৃষ্টির বিপরীতে ধ্বংসকে বিসংশ্লিষ্ট করে রেখেছে। যে ভাবেই বিবেচনা করা হোক, এই পৃথিবী কিংবা এই মহাবিশ্ব একদিন বিলয়কালে অস্তিত্বের সমাপ্তি ঘটাবে— এটি একটি স্বাভাবিক রীতিনির্ভর জ্ঞানে ও বুদ্ধিতে গ্রাহ্য। ধ্বংসই যেখানে সৃষ্টির অপ্রতিরোধ্য পরিণাম— সেখানে এই পৃথিবী, মাতৃ-নক্ষত্র সূর্য, মাতৃ-গ্যালাক্সি ছায়াপথ ও সর্বশেষে এই মহাবিশ্ব ইত্যাদি সকলেই অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের প্রতীক্ষিত প্রার্থী মাত্র।

মহাধ্বংস বা কিয়ামত সম্পর্কে আমরা সকলেই একটা প্রচ্ছন্ন ধারণা পোষণ করে থাকি। একটি ভয়াবহ ধ্বংস প্রক্রিয়া এই পৃথিবী কিংবা গোটা সৃষ্টিকে গ্রাস করবে— এই হলো ধারণাটির শেষ উপসংহার। আমাদের বিশ্বাসটি একটি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বাধ্যবাধকতা যেন।

এই বাধ্যবাধকতা আমাদের ব্যক্তি ও ধর্মীয় জীবনে অনেক প্রভাব ফেলে। আমরা গুরুতরভাবে বিশ্বাস করি যে— কিয়ামত হবে। পবিত্র কোরআন পাঠকারীরা জেনে থাকবেন আকাশ হতে নক্ষত্ররা খসে পড়ে পৃথিবীকে ধ্বংস করে দেবে। কোরআন পাঠকের এই জ্ঞান বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। পৃথিবীর মতো শর্ষেদানা সদৃশ স্থানের উপর একদিকে যেমন নক্ষত্র পতিত হবার স্থান, কারণ ও উপায় নেই— অন্যদিকে যে কোনো নক্ষত্র নিকটবর্তী হলেই সে-ই

www.pathagar.com

পৃথিবীকে গ্রাস করবে দুর্জয় অভিকর্ষের মহাটানে। নক্ষত্র ঝরে পড়বে না, কারণ সে ফুল বা পাতা নয়। আর খসে পড়বে না, কারণ আদি বিশ্বাসের 'আকাশ-গম্বুজে' নক্ষত্ররা শক্ত করে বসানো সজ্জাসামগ্রী নয়। ফলতঃ বিরুদ্ধবাদীগণ আনন্দ চিত্তেই প্রতিবাদী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে থাকেন। আমরা যারা কোরআন বিশ্বাস করি এবং বিরুদ্ধবাদীগণ যারা খুঁত সন্ধান করেন, আমরা উভয় দল জ্ঞানের দৈর্ঘ্যে কতটা অগ্রসর— সে প্রশ্নটি এসে যায়। মহাধ্বংস বলতে আদৌ আমাদের ধারণা সঠিক সমতলে রয়েছে কি?

বস্তু ও শক্তির নিত্যতার সূত্র ধ্বংসের বিপরীতে একটি সোচ্চার প্রতিবাদ। এদের ধ্বংস নেই। আমরা আহলে কোন ধ্বংসের বিবেচনাকে ধরে নিয়ে আছি? কি তার প্রকৃতি ও কি তার ভেদ্যতা? গুরুতর আরো একটি জিজ্ঞাসা এসে যায়— কার ধ্বংস? পৃথিবী, সূর্য, ছায়াপথ নাকি এ সয়াল সংসার— আমাদের এই মহাবিশ্ব?

কোরআন তার বাণী গাম্ভীর্যে কিয়ামতের উপর অনেক আয়াতে একটি মহাধ্বংসের চিত্র রূপায়ণ করেছে। আমাদের বিজ্ঞানের চোখে কিভাবে বিচার্য হয়েছে, তা খুঁটিয়ে দেখার সুযোগ দেবে আজকের এই আলোচনা। সুধী পাঠক, চলুন মহাবিশ্বের পরিমাপে আমাদের সামনে সম্ভাব্য সে ধ্বংসের রূপ-চরিত্রের সামান্য সন্ধান করি।

দুই

এই গ্রহে জীবনের উন্মেষ ঘটেছে অতিশয় দ্রুত— জীবনের সমাপ্তি তার চাইতে বহু বহু গুণ দ্রুত গতিতে সম্পন্ন হতে পারে, এবং কতটা দ্রুততায় তা ঘটে যেতে পারে, আমরা তার কোনো জ্ঞানই রাখি না। আমরা পৃথিবীতে বসবাস করছি ও দুর্দান্ত প্রতাপে বেঁচে রয়েছি— এ যেন একটা জন্মগত অধিকার। এ অধিকারে যেন হাত দেবার সাধ্য কারো নেই। কিন্তু দুঃখজনকভাবে আমাদের এ ভাবনা এক

www.pathagar.com

দুরন্ত নির্লজ্জ বুদ্ধিবৃত্তি ছাড়া অন্য কিছু নয়। মানুষ জানে না যে সে কতটা বৈরী পরিবেশে, কতটা শঙ্কাময় অবস্থানে, কতটা স্বাচ্ছন্দে ও নির্বিঘ্নে কালাতিপাত করছে! শুধু এইটুকু প্রশ্নের জবাব খোঁজার মধ্যে সে এক মহাবিস্তার স্রষ্টা ও প্রতিপালকের সন্ধান না পেয়ে পারে না। দুঃখজনকভাবেই মানুষ উদাসীন— তার নিজের পরিণাম শঙ্কা ও নাজুকতায় কতটা দোদুল্যমান, সে বিষয়ে মানুষ কোনো চিন্তাও করে না।

চিরশীতল অনন্ত মৃত্যুময় নিকষ কালো অন্ধকার শূন্যতার মহাসমুদ্রে প্রতি পলে ৩০ কিঃ মিঃ গতি নিয়ে ধাবমান এই পৃথিবী জীবন সৃষ্টি ও জীবন প্রতিপালনের যে মহিমা নিয়ে বিরাজ করে, তার তুলনা আর কিছুতেই সম্ভব নয়। রুবুবিয়াতের মহা বিস্ময়কর মহিমায় স্রষ্টার যে অনন্ত বিস্তৃতি— তাঁর প্রতি একান্ত বিনীত শ্রদ্ধা কেবলমাত্র এই প্রতিপালন ব্যবস্থায় খানিকটা হলেও জ্ঞান আছে— তেমন জ্ঞানসম্পন্ন মনের নিকট হতেই কেবল আশাযোগ্য। আপনারা নিশ্চয়ই অবগত রয়েছেন যে বিস্ময়কর বায়ুমণ্ডল ও 'ওজোন' স্তরটিকে যদি একটি মুহূর্তের জন্যও অপসারণ করা যায় কোনোভাবে— তবে অনতিবিলম্বে এবং অতি ক্ষুদ্র সময়ের পরিসরে এই দুর্লভ জীবন-ব্যবস্থা পুড়ে ভস্ম হয়ে যাবে। অবলোহিত রশ্মির মৃত্যুঘাতী ছোবলে শেষপর্যন্ত জীবনের আর কোনো স্পন্দন এখানে অবশিষ্ট থাকবে না। এই পৃথিবীকে ধ্বংস করার জন্য তো শুধুমাত্র এমন একটি ব্যবস্থাই যথেষ্ট!

পৃথিবীকে ধ্বংস করার জন্য পৃথিবীতেই প্রাপ্ত হাতিয়ার এবং খোদায়ী ব্যবস্থা এমন আরো অনেক অনেক বর্তমান রয়েছে যার কোনো কোনো একটি কিংবা একাধিক প্রয়োগের দ্বারা এই পৃথিবীকে সহজেই মৃত্যুপুরীতে পর্যবসিত করা যায়। আমরা এদের আলোচনা করব না। কোরআনের প্রস্তাব অনুযায়ী কিয়ামত সম্পর্কে যে সব ধারণা নিকটবর্তী— আমাদের আলোচনা তার মাঝেই গণ্ডীভুক্ত রাখতে চাই।

www.pathagar.com

মহাধ্বংস বা কিয়ামত সম্পর্কে আল-কোরআনে যে সব প্রস্তাব এসেছে— তা বিস্ময়কর সত্যতায় আধুনিক বিজ্ঞানের অতি নিকটবর্তী। আমরা ক্রমশই সে আলোচনায় প্রবেশ করব। তার পূর্বে আপনার মনে অনেক প্রশ্নের সঞ্চার করবে এমন কতগুলি জিজ্ঞাসাবাহী আয়াতের উদ্ধৃতি দিতে চাইছি— *"তোমরা কি নিশ্চিত হইয়াছ যিনি আকাশে রহিয়াছেন— তিনি তোমাদের উপর কংকর/পাথরবাহী ঝঞ্চা প্রেরণ করিবেন না? (৬৭:১৭)। সেই দিন আকাশ হইবে গলিত ধাতুর মতো এবং পর্বতসমূহ হইবে রঙিন পশমের মতো (৭০:৮/৯) যখন সিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে— এবং একটি মাত্র ফুৎকার (৬৯:১৩); পর্বতমালা সমেত পৃথিবী উৎক্ষিপ্ত হইবে এবং ধাক্কায় উহারা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া পড়িবে (৬৯:১৪)। যখন আকাশের আবরণ উন্মোচিত করা হইবে (৮১:১১)— সেই দিন সংঘটিত হইবে মহাপ্রলয়" (৬৯:১৫)।*

কংকর বা পাথর বর্ষণের মধ্য দিয়ে কিয়ামতের প্রকাশ, আকাশের গলিত ধাতুর ন্যায় রূপ ধারণ, সিংগার ফুৎকার ও আকাশের আবরণ উন্মোচিত হওয়ার প্রস্তাবে কোরআনে বিশ্বাসী নয় এমন বিজ্ঞানমানস নির্দ্বিধায় প্রতিবাদী অবস্থানে দাঁড়াবেন। অথচ বিশ্বাস করবেন কি যে ভাষাগত প্রকাশ বৈষম্যে প্রস্তাবের উপর যতটা ক্ষতিকর প্রভাবই আসুক না কেন, এই আয়াতগুলি একান্তই প্রাপ্তজ্ঞানে সঙ্গতিপূর্ণ যা আলোচনার গভীরে প্রবেশ করলেই স্পষ্ট হয়ে আসবে। চলুন, এটুকু প্রারম্ভিক অবতারণার পর আমরা আলোচনার পট পরিবর্তন করি।

তিন

Bode's Law সম্পর্কে আমাদের অনেকেরই জানা আছে। এটি হলো— গ্রহদের দূরত্ব বিন্যাস একটি সাধারণ গাণিতিক নিয়ম মেনে চলে। প্রকৃতিতে একটি সুনির্দিষ্ট ধারাবাহিকতা সর্বত্র বিরাজমান

www.pathagar.com

দেখে বিজ্ঞানীগণ গ্রহদের বিন্যাস-দূরত্বের বিষয়ে ধারাবাহিকতার নিয়ম খাটে কিনা সে অনুসন্ধান কার্যে শেষপর্যন্ত কৃতকার্য হন। গ্রহদের দূরত্বের ক্রম বিষয়ক এই সূত্র যা Bode's Law নামে সমধিক খ্যাত, তা একটি গাণিতিক প্রগমনকে নিত্য হিসাবে আবিষ্কার করে। প্রগমনটি হলো— ০ ৩ ৬ ১২ ২৪ ৪৮ ৯৬....... ইত্যাদি যার ৩ থেকে প্রতিটি সংখ্যাই পরবর্তী সোপানে দ্বিগুণ হয়ে পড়েছে, এই হলো প্রগমনের বৈশিষ্ট্য। এবারে প্রত্যেক সোপানে ৪ যোগ করলে এই প্রগমনের চিত্র দাঁড়ায় ৪ ৭ ১০ ১৬ ২৮ ৫২ ১০০ ১৯৬ ইত্যাদি। নতুন এই প্রগমনটি আশ্চর্যজনকভাবে আমাদের সৌরজগতের গ্রহ বিন্যাসের সাথে অতি নিখুঁত সম্পর্কে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সূর্য-পৃথিবীর দূরত্বকে যদি ১০ ইউনিটে প্রকাশ করা যায়—তবে এই প্রগমন চিত্রে সৌরজগতের গ্রহদের দূরত্ব বিন্যাস দাঁড়ায় নিম্নরূপ—

প্রগমন চিত্র	৪	৭	১০	১৬	২৮	৫২	১০০	১৯৬
গ্রহসমূহ	বুধ	শুক্র	পৃথিবী	মঙ্গল	—	বৃহস্পতি	শনি	ইউরেনাস
প্রকৃতদূরত্বে	৩.৯	৭.২	১০	১৫.২	—	৫২	৯৫.৪	১৯১.৮

সূত্রটি একটি চমৎকার সঠিকতায় খেটে যাচ্ছে— তবে বিপত্তি হয়ে থাকল মঙ্গল ও বৃহস্পতির মাঝের শূন্যতা; ২৮ সংখ্যার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এমন কোনো গ্রহের প্রয়োজন বিজ্ঞানপাড়ায় তল্লাশির খোরাক যোগাতে শুরু করল। ১৮০১ সালে সিসিলির পালের্মো মানমন্দিরের জনৈক পিঁয়াৎসি (Piazzi) একটি জ্যোতিষ্কের সন্ধান লাভ করেন যার চলন ছিল ভিন্নতর। এটির উপর বিখ্যাত গণিতজ্ঞ সিজে গাউস (CJ Gauss) রায় দিলেন যে জ্যোতিষ্কটি একটি গ্রহ, যার দূরত্ব ২৭.৭ আর তা বোডের টেবিলের সাথে সামঞ্জস্যময়। পরের বছরও এটিকে একই দূরত্ব বলয়ে দেখতে পাওয়া গেল। কিন্তু বিপত্তি দাঁড়াল যে মাত্র ১০০০ কিঃ মিঃ ব্যাসসম্পন্ন জ্যোতিষ্ককে (যা ছিল Ceres) কোনোভাবেই গ্রহ হিসাবে বিবেচনা করা যায় না। বিষয়টির

www.pathagar.com

উপর অনুসন্ধান চলতে থাকল। ১৮০২ সালে 'সিরিসের' অনুরূপ দ্বিতীয় জ্যোতিষ্ক আবিষ্কৃত হলো— নাম দেওয়া হলো পেলাস (pallas), পাঁচ বছরের মধ্যে আবিষ্কার হলো জুনো (Juno) ও ভেস্তা (Vasta)। পরে ১৮৪৫ সনে আবিষ্কৃত হলো এ্যাস্টে (Astaea) এবং ১৮৪৭ সালে হেবে (Hebe) ইরিস (Iris) ও ফ্লোরা (flora)। এরা সকলেই গ্রহের মতো, তবে গ্রহের চাইতে আকারে অনেক অনেক ছোট। এভাবে আবিষ্কৃত হয়ে চলল— ছোট থেকে বড় সকল আকারের নতুন জ্যোতিষ্ক। উনিশ শতকের শেষভাগে এদের সংখ্যা দাঁড়াল ৩০০টি এবং ১৯৭১ সনে এ সংখ্যা পৌছুল ১৭৫০টিতে। বিজ্ঞানীরা এদের নাম গ্রহ রাখতে পারলেন না— নামকরণ করা হলো গ্রহাণু বা Asteroid. বিজ্ঞানীরা এদের উৎস সন্ধান করতে গিয়ে খোঁজ পেলেন— মঙ্গল ও বৃহস্পতির মাঝে এমন লক্ষাধিক গ্রহাণু থাকতে পারে, এদের একত্রিভূত পদার্থ মূলতঃ কোনো কালে আমাদের চাঁদের মতো কোনো একটি গ্রহ বৃহস্পতি আর মঙ্গলের টানাপড়েনে ভেঙ্গে টুকরা টুকরা হয়ে যায়। এভাবে লক্ষাধিক গ্রহাণুর জন্ম হয় যারা সে থেকে বিভিন্ন ওজন ও আকৃতি নিয়ে পৃথিবীবাসীর দৃষ্টির অলক্ষ্যে প্রতিনিয়ত সন্তরণ করে চলেছে। এরা বৈশিষ্ট্যে গ্রহও নয়, চাঁদও নয় গ্রহের ভগ্নাংশ মাত্র। এদের আকৃতি কয়েক শত ফিট হতে হাজার কিলোমিটার, এরা সূর্যকে কেন্দ্র করে পথ চলে। এদের কক্ষগুলি বৃত্তাকার, উপবৃত্তাকার এবং এরা ক্রান্তিবৃত্তের সঙ্গে সামান্য হেলানো।

এই গ্রহাণুদের কক্ষপথ মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্যের পরিসরে সীমাবদ্ধ থাকবার কথা থাকলেও সমস্ত গ্রহাণুদের বেলায় নিয়মটি খাটে না। ভেতরের দিকে কখনো বুধের চেয়ে ভেতরে ও বাইরের দিকে, কখনো কখনো শনিগ্রহের সীমা পর্যন্ত প্রসারিত হয় এদের কক্ষপথ। ভেতরের দিকে আসার সময় এদের কতিপয় পৃথিবীর কক্ষপথকে অতিক্রম করে। আবার বাইরের দিকের অঞ্চল হতে প্রত্যাবর্তনের সময় বৃহস্পতির তীব্র টানে প্রভাবিত হয়ে এরা ভেতরের দিকে, অর্থাৎ পৃথিবীর দিকে উৎক্ষিপ্ত হয়ে থাকে। এমন

www.pathagar.com

এসটিরয়েড বেল্টের একাংশ। দানবগ্রহ বৃহস্পতির বিপরীতে তোলা ছবিটিতে ভাসমান পাথরের স্তূপে কয়েক ফুট হতে কয়েকশত কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের বিভিন্ন খোদায়ী মারণাস্ত্র সদাপ্রস্তুত। কংকরবর্ষী ঝঞ্ঝা প্রেরণের জন্য এখানে রয়েছে রাশি রাশি কংকর। সদা নিয়ত ঘূর্ণায়মান এই পাথর পিণ্ডের একটি কিংবা অনেকটি এসে উপস্থিত হতে পারে সহসাই। পৃথিবীতে একটি ধ্বংসযজ্ঞ ঘটানোর জন্য কয়েক কিলোমিটার ব্যাসের একটি পাথরই যথেষ্ট। সৃষ্টিতে এই হাতিয়ার প্রয়োজনের তুলনায় লক্ষ-কোটি গুণ বেশি মজুদ রয়েছে।

একটি ঘটনা ঘটতে পারে কেবলমাত্র বিশেষ কোনো মুহূর্তে— যখন গ্রহাণুদের প্রত্যাবর্তন লাইন— বৃহস্পতি, মঙ্গল ও সূর্য ইত্যাদি লাইনের উপর পতিত হয় কিংবা সন্নিহিত অথবা সমান্তরাল হয়। এই ক্ষেত্রে গ্রহাণুর বেগ তার স্বাভাবিক গতি হতে বেশ কয়েকগুণ

www.pathagar.com

বৃদ্ধি পেতে পারে এবং ফলশ্রুতিতে গ্রহাণু তার মূল কক্ষপথ বিচ্যুত হয়ে একটি নতুন গতিপথের সূচনা করতে পারে। একইরূপ উৎক্ষেপণশক্তি ভয়েজারকে সজোরে নিক্ষিপ্ত হয়ে সৌরমণ্ডলীয় এলাকা ছেড়ে অন্য নক্ষত্ররাজ্যের উদ্দেশে পা ফেলতে সাহায্য করেছিল।

১৯৯১ সনে জানুয়ারি মাসে এক ক্ষুদ্রকার গ্রহাণু পৃথিবীর খুব কাছাকাছি চলে আসে যার ব্যাস ছিল মাত্র ২০ ফুট। এটি পৃথিবীর মাত্র ১০০০০০ মাইল দূর দিয়ে পৃথিবীকে পাশ কাটিয়ে চলে যায়। অভিকর্ষের কারণে ভূ-পৃষ্ঠে এর আঘাত হানার আশঙ্কা ছিল অনেক বেশি। তার পূর্বে ১৯৮৯ সনে ১৩০০ ফুট ব্যাসসম্পন্ন গ্রহাণু পৃথিবীর নিকটবর্তী অঞ্চলে চলে আসে যা মাত্র দুই-চাঁদ-দূরত্ব দিয়ে চলে যায়। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা হিসাব করে শঙ্কিত হয়েছিলেন যে— এর পৃথিবীকে আঘাত করার আশঙ্কা ছিল উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি। এটি পৃথিবীকে আঘাত করলে কমপক্ষে এক সহস্র মেগাটন টিএনটি'র বিস্ফোরণ ঘটত যা ২৩৫০,০০০ হিরোসিমা বোমের ধ্বংস ক্ষমতার সমান। জ্যোতির্বিজ্ঞানের ধারণা, পৃথিবীর বুকে এক মাইল ব্যাসসম্পন্ন কোনো গ্রহাণুর আঘাত হানার সম্ভাব্যতা প্রতি তিন লক্ষ বৎসরে একটি (১ মাইল ব্যাসের কম গ্রহাণুরা এ হিসাবের অন্তর্ভুক্ত নয়— অথচ এদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি)। এমন একটি গ্রহাণুর বিস্ফোরণ ক্ষমতা ১০০,০০০ মেগাটন টিএনটি'র সমতুল। (২৩৫,০০০,০০০ হিরো সিমা বোম)। এক মাইল ব্যাসসম্পন্ন গ্রহাণুর আঘাত এই পৃথিবী হতে সমস্ত জীবন-বিস্তারকে সমূলে নির্বাসন দেয়ার জন্য যথেষ্ট। আমাদের হাতে যে সব তথ্য রয়েছে, তাতে দেখা যায় যে— শুধু এক বা কয়েক মাইল নয়— কয়েক শত মাইল ব্যাসসম্পন্ন এস্টিরয়েডরাও পৃথিবীর কক্ষকে ছেদ করে যায়; যাদের একটি আঘাত এই পৃথিবীকে চিরদিনের জন্য নিস্পন্দ ঘুমে নিক্ষেপ করতে সক্ষম।

www.pathagar.com

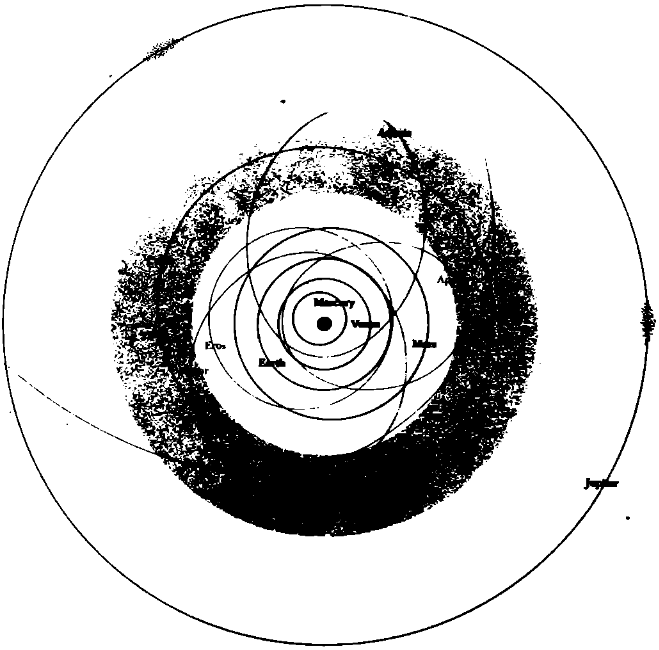

পৃথিবীবাসীর জন্য এ চিত্রটি হলো এক অদৃশ্য অশনি সংকেত! মানুষ জানে না, মানুষ কতটা শঙ্কাময় মহাজাগতিক পরিবেশে কতটা আশ্বাসের স্বস্তিতে জীবন কাটায়। দয়াময়ের প্রতি মানুষের কৃতজ্ঞতার দায়তা প্রতিটি পলে পলেই! চিত্রের কালো বেল্টটি এসটিরয়েড বেল্ট, আর পৃথিবীর কক্ষ ছেদনকারী এসটিরয়েডসমূহের কতিপয় কক্ষপথ দেখা যাচ্ছে। পৃথিবী তাদের যে কোনো একটি দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হতে পারে। ২০ কিঃমিঃ ব্যাসসম্পন্ন এসটিরয়েড পৃথিবীতে আঘাত করলে সম্পূর্ণভাবে জীবনের যবনিকাপাত হবে ; শেষ হয়ে পড়বে এই পৃথিবীর ইতিহাস। এমন পাথরের সংখ্যা লক্ষাধিক বলে অনুমান করা যায়।

গ্রহাণুরা মঙ্গল ও বৃহস্পতির মাঝামাঝি সুবিস্তৃত এসটিরয়েড ও মিটিওরিট বেল্টের অধিবাসী। সেখান হতে কখনো কখনো কক্ষচ্যুত হয় গ্রহাণুরা— পরস্পরের মধ্যে ঠোকাঠুকির কারণে কিংবা বড় গ্রহদের আতশী টানের জন্য। এই বিচ্যুতি অনির্ধারিত ও অনুমান অসাধ্য। অন্যদিকে মিটিওর গ্রহাণুদের চাইতে আকারে অতিশয় ক্ষুদ্র ও সংখ্যায় অসংখ্য। এদের বিচ্যুতির পরিমাণও অত্যন্ত বেশি।

www.pathagar.com

আকাশে দৃশ্যমান উল্কা প্রজ্জ্বলনের অধিকাংশই হলো এই সব মিটিওরদের কাজ। বৃহস্পতি-মঙ্গল-মধ্য এসটিরয়েড ও মিটিওরিট বেল্ট ছাড়াও শনি ও ইউরেনাস গ্রহের মধ্যবর্তী আরো একটি পাথরের ঘূর্ণায়মান বেল্ট রয়েছে যার নাম Kowal। সেখান হতেও অনুরূপ বিচ্যুতি ঘটে থাকে। বেগে নিক্ষিপ্ত হবার সময় যখন এই পাথরগুলি পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ বলয়ে ধৃত হয় তখনই তারা প্রবেশ করে প্রতিরোধী বায়ুমণ্ডলের সুবিস্তৃত সমুদ্রে। সেখানে বাতাসের কণাদের সাথে ঘর্ষণে ঘর্ষণে জ্বলে ওঠে মিটিওরাইটগুলি। বায়ুমণ্ডলের মাত্রাগভীরতা বৃদ্ধির সাথে সাথে এদের উপর ঘর্ষণের প্রচণ্ড চাপ পড়ে। একসময় ঘর্ষণের তীব্রতা সর্ব চরমে পৌঁছে। এর ফলে তীব্র উত্তাপে ছোট ছোট মিটিওরাইটগুলি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। পৃথিবী পৃষ্ঠে পতিত হয় শুধু ভস্মগুলি। কিন্তু কোনো কারণে পতনশীল বস্তুটি যদি উল্কা না হয়ে যে কোনো আকৃতির গ্রহাণু হয়— তখন বায়ুমণ্ডলীয় প্রতিরোধ সেখানে ব্যর্থ হয়। বায়ুমণ্ডলীয় ওজোন স্তর এবং নিকটবর্তী অঞ্চলগুলি যে তীব্র প্রতিরোধের অদৃশ্য ছাদ তৈরী করে রেখেছে তাকে সহজে ভেদ করে পতিত হতে পারে একটি গ্রহাণু। আর এই পতনই আমাদের পৃথিবীর মতো কোনো গ্রহের উপর মহাধ্বংস প্রলয় ঘটাতে পারে। যে গ্রহাণুর ব্যাস মাত্র এক মাইল— এমন একটি বস্তু পৃথিবীতে আঘাত করলে যতটা ধ্বংসযজ্ঞ শুরু হবে— তার তুলনা হলো হিরোসিমায় বর্ষিত পারমাণবিক বোমার ৫৫০ লক্ষটির সমান। এই জীবন-ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার জন্য এমন একটি গ্রহাণুর একটি ভগ্নাংশই যথেষ্ট। সেখানে কয়েকশত মাইল ব্যাসসম্পন্ন গ্রহাণুদের আঘাত আমাদের জন্য কতটা ধ্বংস বয়ে আনতে পারে তার হিসাব নেয়ার কোনো দরকারই পড়ে না।

পৃথিবীর জীবন-ব্যবস্থার প্রতি কিংবা পৃথিবীর অস্তিত্বের প্রতি হুমকি যেমন এসটিরয়েড, তেমনি আর একটি হুমকির উৎস হলো ধূমকেতুর দল। এরা সৌরজগতের প্রেত, দুর্বোধ্য ও নিয়মলঙ্ঘনকারী

www.pathagar.com

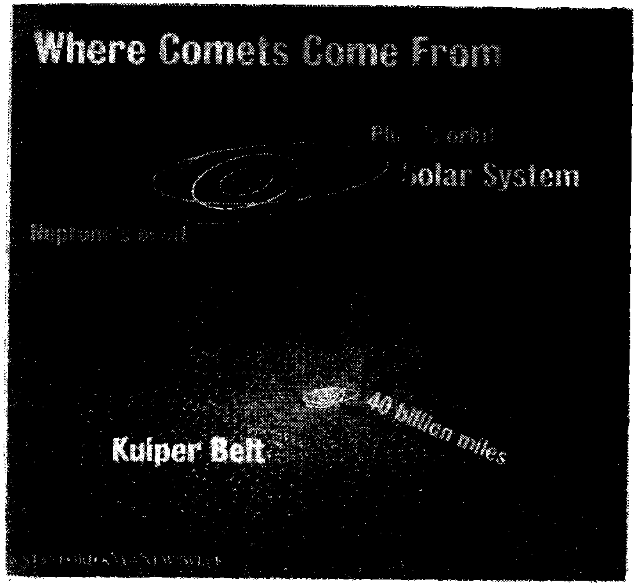

৪০ বিলিয়ন মাইল ব্যাসার্ধ (ব্যাস ৮০ বিলিয়ন মাইল)-সম্পন্ন Kuiper Belt-এ Solar System এর অবস্থান দেখানো হয়েছে। এই বেল্টে কোটি কোটি ধূমকেতু— শুধু একটি পৃথিবী নয়, লক্ষ পৃথিবীকে ধ্বংস করার মারণাস্ত্র মজুদ করা আছে। নিত্যদিন সৌরজগৎ ও পৃথিবীকে ঘিরে ওদের আনাগোনা। এদের হাতে পৃথিবীর ধ্বংস কেবল সময়ের অপেক্ষা মাত্র !

বস্তুপিণ্ড। প্লুটোর বিস্তৃতি ছাড়িয়ে প্রায় দুই আলোকবর্ষের অধিক দূরত্ব নিয়ে বিস্তৃত ওর্ট ক্লাউড (Oort Cloud) অঞ্চলটি মূলতঃ কোটি কোটি ধূমকেতুর নিত্য আবাসস্থল। এই অঞ্চল হতে ধূমকেতুরা ছুটে আসে। সৌরজগতের নিয়ম অমান্যকারী হিসাবে সুপরিচিত এই ধূমকেতুদের মস্তক কয়েক শত গজ হতে কয়েক মাইল ব্যাসসম্পন্ন হয়ে থাকে। যদিও এদের মস্তক কঠিন বরকে ঢাকা, তথাপিও ওদের সিঁথিতে রয়েছে কঠিন প্রস্তর ও শিলা। বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন উপাত্ত হতে দৃঢ় বিশ্বাসে পৌঁছেছেন যে, বিভিন্ন প্রাগৈতিহাসিক যুগে যে কয়েকবার কয়েকটি মহাধ্বংস ও তুষারযুগ নেমে এসেছে— এদের ভূমিকায় ধূমকেতু একটি বিশেষ কারণ। ভবিষ্যতেও এদের আঘাত এই

www.pathagar.com

পৃথিবীর বুকে কোনো মহামৃত্যু কিংবা কোনো বরফযুগ ফিরিয়ে আনতে পারে। পৃথিবীর অস্তিত্বের প্রতি এই ধূমকেতুরা এক ভয়ঙ্কর ও ভীতিকর হুমকিরই নামান্তর!

চার

১৯০৮, ৩০ জুন সকাল ৭–২০। রৌদ্রোজ্জ্বল পরিস্কার আকাশ। সহসা সহস্র লক্ষ বজ্রধ্বনি একত্রে যে তীব্র নিনাদের সৃষ্টি করতে পারে, তেমনি এক মহাত্রাসের শব্দ কম্পনে সাইবেরিয়ার বিশাল অঞ্চল প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। সাইবেরিয়ার অধিবাসীরা দেখতে পায়— একটি বড়সড় আগুনের বলয় পৃথিবীর দিকে ধাবিত হচ্ছে এক সুবিশাল অগ্নিস্তম্ভের ন্যায়। বায়ুমণ্ডলে প্রবেশের সাথে সাথে বিনা মেঘে লক্ষ লক্ষ বজ্রধ্বনির সৃষ্টি করে সেই অগ্নিবলয় সদৃশ পতনশীল বস্তুটি। চোখের পলকেই আঘাত হানে সে পৃথিবীর বুকে। অদৃশ্য হয়ে যায় আগুনের গোলক কিন্তু পতনস্থানে দেখা দেয় আগুনের এক বিশাল লেলিহান শিখা আর তার সাথে যেন এক–পৃথিবীজোড়া ধোঁয়ার বিস্তৃতি। সেদিন প্রায় হাজার কিলোমিটারের বেশি দূরের মানুষ এই পতনের শব্দ ও কম্পন অনুভব করেছিল। আলোর ঝলকটি প্রত্যক্ষ করেছিল আরো দূরদূরান্ত হতে। মাত্র ১৫০ ফুট দৈর্ঘের একটি মিটিওরাইট পতিত হয়েছিল সাইবেরীয় বনাঞ্চল টেঙ্গোস্কায়। ইমপেক্ট অঞ্চলে ৪০ মাইল ব্যাসসম্পন্ন একটি ধ্বংস গোলক সৃষ্টি হয়। এই ধ্বংসস্থলে কোথাও কোনো বৃক্ষ কিংবা অন্য কোনো আকৃতি আর দণ্ডায়মান অবস্থায় থাকেনি। লক্ষ লক্ষ বৃক্ষ নিধন হয়েছিল সেদিনের মাত্র একটি ছোবলে। গভীর অরণ্যে পতিত হবার কারণে মানুষ এর ধ্বংসশক্তি সম্পর্কে বড় কোনো তথ্য পায়নি তাৎক্ষণিকভাবে। কিন্তু পরবর্তীতে বিভিন্ন অভিযাত্রী দল ও আকাশী ছবিতে দেখা গেছে যে মাত্র ১৫০ ফুট দৈর্ঘ্যের একটি পাথর যা ওজনে মাত্র ৪০,০০০ টনের বেশি নয়, সেকেণ্ডে ৩০ কিলোমিটার গতিতে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলকে আঘাত করে। বায়ুমণ্ডলীয়

www.pathagar.com

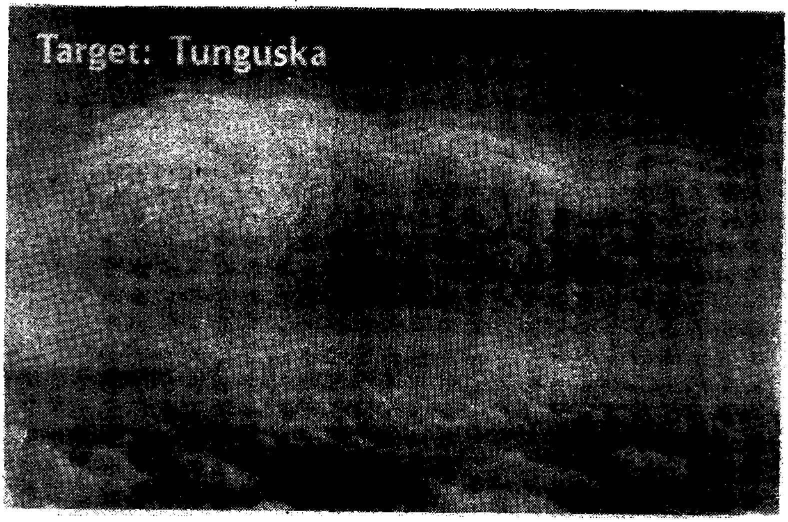

মাত্র ১৫০ ফুটের মিটিওর, তাও আকাশী প্রতিরোধে ভেঙ্গে খানখান হয়ে পতিত হয়েছিল। অথচ এতেই সে ধ্বংস করেছে ১২,০০০,০০০ টন টিএনটি মিলে যতটা ধ্বংস করতে পারে— তার সমান! আর প্রায় সাড়ে পাঁচ ঘন্টা পরে এর পতন ঘটলে মস্কো শহরের ম্যাপ পৃথিবী হতে বদলে যেত চিরকালের জন্য।

প্রতিরোধ্যতায় প্রায় ৮.৫ কিঃ মিটার উচ্চতায় থাকতে মিটিওরটি ভেঙ্গে টুকরা টুকরা হয়ে যায়। একই কারণে এর গতি নেমে আসে মাত্র ১১ মিঃ এর মধ্যে। ফলতঃ যতটা ধ্বংস নেমে আসার কথা ছিল, সৌভাগ্যক্রমে পৃথিবী তা হতে বেঁচে যায়। তথাপিও এই আঘাতটি ছিল ১২ মেগাটন টিএনটির সমশক্তিসম্পন্ন। কিন্তু অনুমান করা হয়, যদি এই পাথরটি মাত্র কয়েকগুণ বড় হতো তবে বায়ুমণ্ডলীয় প্রতিরোধ এর গতিরোধ করতে ব্যর্থ হতো। ফলতঃ পূর্ণ অবয়বে এবং পূর্ণ গতিতে সে আঘাত করত পৃথিবীকে। এর ফলাফল হতো ভয়ঙ্কর, এবং তা কতটা ভয়ঙ্কর হতে পারে— যা আমাদের কাছে যথাযথ উদাহরণ না থাকার কারণে অনুমানেরও অসাধ্য! তবে সন্দেহ নেই যে, এই ১৫০ ফুট পাথরের পতন ১৫০ মাইল ব্যাসসম্পন্ন এসটিরয়েডের পতনের গুরুতর দুঃসংবাদবহ— যা আমাদের বিজ্ঞানকে আতঙ্কিত করে।

www.pathagar.com

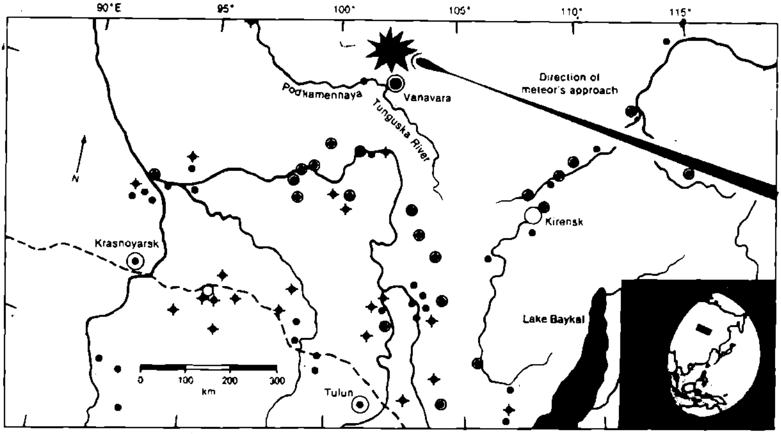

টেঙ্গোস্কায় পতিত মিটিওর–ম্যাপ। পতনের সময় পৃথিবীর চিত্রটি (নিচের বক্সে–ছবিটিতে প্রদর্শিত) প্রত্যক্ষদর্শীগণের সমীক্ষা অনুসারে ○ দর্শন, ● শ্রবণ, + কম্পন; ⊙ দর্শন ও শ্রবণ, ✦ শ্রবণ ও কম্পন, ⊕ দর্শন, শ্রবণ, কম্পন অনুভব।

পৃথিবীর লুপ্ত ইতিহাসের দিকে চোখ ফেরালে আমরা কিছু গুরুতর তথ্য পেতে পারি। বিজ্ঞানীগণ বিভিন্ন নমুনা ও বিরাজমান প্রমাণাদি হতে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, ছয় কোটি পঞ্চাশ লক্ষ বছর আগে পৃথিবীর বুকে যে বিপর্যয় ঘটেছিল— তার কারণে ডাইনোসোরাস প্রজাতির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। এ নিয়ে নোবেল বিজয়ী লুই অলভারেজ ও পুত্র ওয়ালটার বার্কলের অনুসন্ধানটি সমধিক আদৃত। এই গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল ছিল— ঐ সময়ে মহাজাগতিক যে বস্তুটি পৃথিবীকে আঘাত করছিল, তা ছিল মূলতঃ একটি ধূমকেতু কিংবা একটি ছোট এসটিরয়েড, যার ব্যাস ছিল মাত্র ১০ কিলোমিটার। এই দশ কিলোমিটার ব্যাসসম্পন্ন মহাজাগতিক বস্তুটি পৃথিবীকে আঘাত হানলে প্রায় সাত লক্ষ মেগাটন(৭০০,০০০,০০০,০০০) টিএনটির বিস্ফোরণ ঘটে। এতে সৃষ্টি হয় এক মহাবিকট শব্দ নিনাদ, আগুনের ঝিলিক আর উদগত হয় এক অসীম বিস্তার পারমাণবিক ধূলিরাশি। এই বিস্ফোরণের মহাশক্তির কারণে এই ধূলিরাশি অত্যন্ত মিহি ও সূক্ষ্ম ধূলির ভাসমান মেঘ সৃষ্টি করে। এই মেঘ ক্রমশই সুবিশাল আকৃতি লাভ করতে থাকে এবং পরিণামে সমস্ত পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলীয় বলয় ঘিরে পৃথিবীর উপর এক আচ্ছাদন তৈরী করে। সূর্য ঢেকে যায়। পৃথিবীর

www.pathagar.com

বুকে খাদ্য ভাণ্ডারের একমাত্র উৎস উদ্ভিদদের অনন্য চালিকাশক্তি সূর্যরশ্মি দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ও বৎসরের পর বৎসর এই মেঘে ঢাকা পড়ে যায়। সূর্যরশ্মি হতে বঞ্চিত হবার কারণে উদ্ভিদ কর্তৃক খাদ্য উৎপাদনের একমাত্র প্রক্রিয়া আলোক-সংশ্লেষণে চরম বিঘ্ন ঘটে। বিলুপ্ত হয় উদ্ভিদের প্রজাতি। একদিকে সকল মাংসভোজী ও তৃণভোজীদের খাদ্যে চরম ভাটা পড়ে, অন্যদিকে সূর্যোত্তাপ না থাকার কারণে সমস্ত পৃথিবী একটি বরফের টুকরায় পরিণত হয়। বিভিন্ন অবস্থান ও উচ্চতায় প্রাপ্ত 'ফসিল (fossil)'

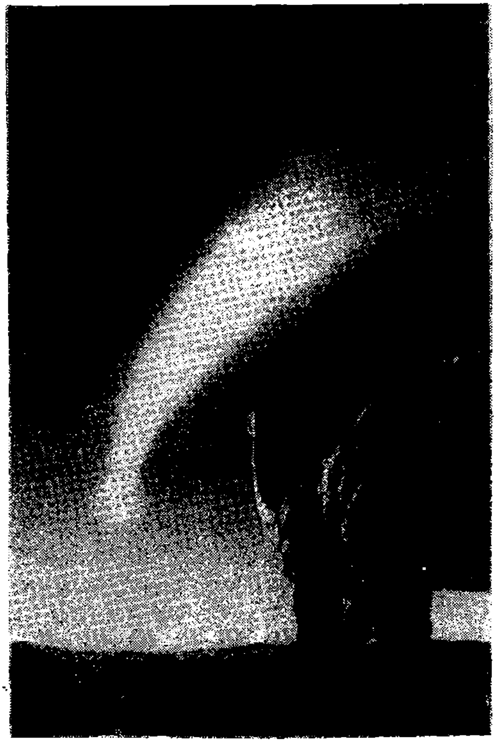

দুর্ভাগ্যের দর্শন! আজ হতে ৬৫০ কোটি বছর আগে দানব জীব ডাইনোসোর প্রজাতি একটি ১০ কিলোমিটার ধূমকেতুর আঘাতে এই পৃথিবী হতে অবলুপ্ত হয়েছিল।

পরীক্ষা করে আরো একটি সূত্র পাওয়া যায়— মহাজাগতিক বস্তুর এই সর্বনাশা আঘাতে সমুদ্রের জলে এক অতি উচ্চ প্রলয়ঙ্করী ঢেউ-এর সৃষ্টি হয় (প্রায় ৯০০ ফুট উচ্চ)। পানি চলে আসে

www.pathagar.com

ভূ–ভাগে। জলজ প্রাণীরা আটকা পড়ে ভূমির উপর। পরিণামে তাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়।

বিজ্ঞান আজ শংকিত প্রহরায় রয়েছে যে, এসটিরয়েড কিংবা ধূমকেতুরা যেমন অতীতে পৃথিবীকে আঘাত করেছে, ভবিষ্যতেও তাদের ছোবল এই পৃথিবীকে আবারো ধ্বংসের মুখোমুখি করতে পারে। এই ধ্বংসের মাত্রা ও তীব্রতা কতটা গভীর হতে পারে তার সামান্য ধারণা দেবার জন্যই আমরা ১৫০ ফুট মিটিওর আর ১০ কিঃ মিঃ ব্যাসসম্পন্ন ধূমকেতুর প্রসঙ্গ টেনেছি। ১০ কিলোমিটার ধূমকেতুর স্থলে যদি ১০০ কিলোমিটার কিংবা হাজার কিলোমিটার গ্রহাণু এই পৃথিবীকে আঘাত করে তবে এর সম্ভাব্য পরিণতি কি হতে পারে, তার একটি ধারণা আমরা এই উদাহরণ দুটি হতে পেতে পারি। আমাদের জানা দরকার যে, প্রায় লক্ষাধিক এসটিরয়েডের মজুদ মঙ্গল আর বৃহস্পতির মাঝখানে আমাদের দৃষ্টির বাইরে প্রতিনিয়ত সন্তরণ করে যাচ্ছে। কে জানে তারা আমাদের এই সুন্দর পৃথিবীর প্রতি কোনো মহাধ্বংসের হুমকি নয় কি! *"তোমরা কি নিশ্চিত হইয়াছ যে, যিনি আকাশে রহিয়াছেন, তিনি তোমাদের উপর পাথরবাহিত ধ্বংস প্রেরণ করিবেন না?" (৬৭:৭)।* প্রকৃতপক্ষে আজকের বিজ্ঞান সত্যিই নিশ্চিত নয়—বিজ্ঞানীগণ মনে করেন, পৃথিবী হয়তো পাথরবাহিত ধ্বংসের আশঙ্কায় নিত্যই প্রহর গুনছে। এই ধ্বংস সম্ভাব্যতার বিপরীতে প্রতিরোধ কি বিজ্ঞান তা সত্যিই জানে না।

পাঁচ

সূর্য ও চন্দ্রের গ্রহণ মানুষকে যুগে যুগে আকর্ষণ করেছে। বিগত ২৪ অক্টোবর ৯৫ একটি সূর্যগ্রহণ পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ উৎসাহী মানুষকে প্রতীক্ষা ও প্রাণচঞ্চলতায় পরিপূর্ণতা দিয়ে সৃষ্টির অমোঘ নিয়মে কালের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। এদেশের হাজার হাজার উৎসাহী মানুষ সুন্দরবনের কাছে হীরণপয়েন্টে ভিড় জমিয়েছে এই সূর্যগ্রহণের চূড়ান্ত মুহূর্তটি উপভোগ করার জন্য। সৃষ্টির বিশালতা আর বৈচিত্রের

www.pathagar.com

হিজলায় আটকে-পড়া যাত্রীবাহী লঞ্চ। বস্তুতঃ বড় জোয়ারে ঐ লঞ্চটি নদীতে প্রত্যাবর্তন করতে পেরেছিল ঠিকভাবেই।

আমরা সকলেই একটি সরল জনশ্রুতির সাথে পরিচিত যে, অমাবস্যায় কিংবা পূর্ণিমায় আঘাত বা ট্রমাজনিত ব্যথা বা 'দরদ' বৃদ্ধি পায়। সাধারণত ট্রমাজনিত আঘাত পাওয়া টিস্যুতে(মাংস/হাড়) রক্ত বা রক্তরস জাতীয় পদার্থ জমাট বাঁধে। দেহের স্বাভাবিক বিতরণ বিন্যাস হতে এই আঘাতপ্রাপ্ত অংশে আটকাপড়া রক্ত বা জলীয় পদার্থের ঘনত্ব বা সমাবেশ হয় বেশি। অমাবস্যা কিংবা পূর্ণিমায় আমাদের দেহের উপর যে আকর্ষী-টান পড়ে তা সারা দেহে হয় একরকম এবং ট্রমাযুক্ত স্থান কিংবা শরীরের যে অংশে অনুরূপ পরিবর্তন ঘটেছে, সে স্থানগুলিতে হয় অন্যরকম এবং স্বাভাবিক অঙ্গসমূহের উপর পতিত প্রভাব হতে বেশি। ঐ সব স্থানে রক্ত ও রক্তরস জমাট বাঁধার কারণে আঘাতপ্রাপ্ত ক্ষেত্রটির উপর যতটা বলীয় আকর্ষণ হবার কথা ছিল, অতিরিক্ত ভরের সমাবেশের জন্য (রক্ত/রক্তরস) তা কিছুটা বেশি হয়ে থাকে। এই যৎসামান্য ভরটিও একটি ব্যতিক্রম নিয়ে আকর্ষিত হয় চাঁদ/সূর্যের সম্মিলিত শক্তির দ্বারা। বাড়তি আকর্ষণ, বাড়তি ভরের উপর বাড়তি প্রভাবের সৃষ্টি করে বলে অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় 'দরদ' বৃদ্ধি পায়। আমরা দেখতে পাই সূর্য-চন্দ্রের যৌথ অভিকর্ষ সুবিশাল জলরাশিতেই কেবল ব্যতিক্রমধর্মী প্রভাব ফেলে তা নয়, দেহের ক্ষুদ্র কোষ-কলাতেও এই যৌথ বলের তীব্রতা অনুভব করা যায়। সুধী পাঠক, অনুগ্রহপূর্বক এই তথ্যটি মনে রাখবেন।

সাত

সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের আলোচনায় আবার আসছি। সূর্যের আলোতে পৃথিবী ও চাঁদের ছায়ার সৃষ্টি হয়। পৃথিবীর ছায়ার গড় দৈর্ঘ্য হলো ৮৫৯,০০০ মাইল আর চাঁদের ছায়ার দৈর্ঘ্য ২৩২১০০

www.pathagar.com

মাইল। চাঁদ যদি গ্রহণী সমতলে (ecliptic plane) অর্থাৎ সূর্য ও পৃথিবীর মাঝখানে সূর্য–চাঁদ–পৃথিবী এই বিন্যাসে একটি সরলরেখায় উপনীত হয়, তখন পৃথিবী চাঁদের পূর্ণ ছায়ায় পতিত হয়। চাঁদটি সূর্য ও পৃথিবীর মাঝখানে এমনভাবে থাকে যে, সূর্য আড়াল হয়ে যায়। তখন যে. গ্রহণ ঘটে, তা হলো সূর্যগ্রহণ। এ সময়টি হলো আবার অমাবস্যাকালীন পূর্ণজোয়ারের একটি সন্ধিক্ষণ। অন্যদিকে যখন সূর্য–পৃথিবী–চাঁদ বিন্যাসে পৃথিবী ও চাঁদ সূর্যের সাথে একটি সরলরেখা তৈরী করে, তখন পৃথিবীর ছায়া চাঁদের উপর পতিত হয় এবং একটি পূর্ণ চাঁদের গ্রহণ ঘটে। মূলতঃ চাঁদ ও পৃথিবীর বিন্যাস কৌশলটি এমন যে যেখানে প্রতিটি অমাবস্যায় ও প্রতিটি পূর্ণিমায় একটি করে সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ হবার কথা ছিল, সেখানে চাঁদ গ্রহণী সমতল হতে ৫°৮´ হেলে থাকার কারণে প্রতিমাসে দু'টি গ্রহণের মহাঘটনা পৃথিবীর পক্ষে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয়। বস্তুতঃ এই ৫°৮´ সৃষ্টিতে এঁটে দেয়া একটি নিরাপত্তা ব্যবস্থা যার কাছে পৃথিবীর জীবমণ্ডল সরাসরি ঋণের দায়ে আবদ্ধ।

বিজ্ঞানীরা সূর্যগ্রহণের (সূর্য–চাঁদ–পৃথিবী) বিষয়ে অধিকতর উৎসাহী। তারা মনে করেন, এটি তুলনামূলকভাবে বেশি বিজ্ঞান বিবেচনার দাবি রাখে। বিজ্ঞানীরা যে ভাবেই এর বিবেচনা করে থাকুক, আমাদের এ আলোচনাতেও সূর্যগ্রহণের ঘটনাটি একটি বিশেষত্বের কারণে গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের নিকট গুরুত্বের দিকটি হলো যে— সূর্যগ্রহণের সময় সূর্য, চন্দ্র ও পৃথিবী লাইন সৃষ্টি হয়, যার আকর্ষণ শক্তি তীরের গতিমুখ সূর্যের দিকে আর এই ত্রয়ীশক্তি লাইনের উন্মুক্ত দিকে পৃথিবী অবস্থান করে। এই ব্যবস্থাটি একটি অতিশয় নাজুক পরিস্থিতিরই নামান্তর, যা পরিণামে সর্বৈব ধ্বংসের কারণ হতে পারে। সূর্যকে কেন্দ্র বিবেচনা করলে যে চিত্র আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি, তা হলো— এসটিরয়েড ও মিটিওর বেল্ট, শনির পাথুরে বেল্ট, ওর্ট ক্লাউড এই সব অঞ্চলের অভিশপ্ত আগন্তুকগণের জন্য (যারা পৃথিবীর কক্ষপথ ছেদ করে) পৃথিবী হলো

www.pathagar.com

স্পর্শব্যাকুল মানুষেরা অল্পই জেনেছে, তারা যে প্রতীক্ষা আর উল্লাসের শিহরণে মেতেছিল— তা আদৌ আনন্দের হাতছানি ছিল, নাকি ভয়ঙ্কর দুঃসংবাদের! হিন্দু পৌরাণিক কাহিনীর রেশ ধরে এদেশের অনেককেই বিশ্বাস করতে শুনেছি, মাত্র একটি পয়সার ঋণের দায়ে রাহু এসে সূর্যকে গ্রাস করে খায়। মানুষের ভাবনাশক্তিকে ধন্যবাদ, সূর্যকে একটি পয়সার ব্যাঙ্কঋণের ব্যবস্থা করতে পারলে হয়তো একটা ভাল কাজ হতে পারত!

বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় সূর্যগ্রহণ সম্পর্কে বিভিন্ন প্রবন্ধ ও তথ্য ছেপেছে। ধর্মীয় প্রবন্ধগুলির কেন্দ্রীয় প্রস্তাব এসেছে এভাবে যে— আল্লাহ্ অসীম শক্তিশালী, তাই সূর্যের মতো এত বড় শক্তিধর অস্তিত্বকেও মুহূর্তে নিষ্প্রভ করে দিতে পারেন। সূর্যগ্রহণের সময় আল্লাহর ক্ষমতা প্রকাশের সূচক যদি সূর্যকে নিষ্প্রভ করে দেয়ার মধ্যে নিহিত থাকে— তবে ধরে নেয়া যায় যে, চন্দ্র সূর্যের উপর নিয়ন্ত্রণ করার সুযোগ আল্লাহর জন্য যথেষ্ট অল্পই; কারণ, এটুকু নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা প্রদর্শনের জন্য তাঁকে বৎসরের পর বৎসর অপেক্ষা করে থাকতে হবে। স্বভাবতই এমন একটি ধারণা গ্রহণযোগ্যতা হারায়। আমরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারি যে আমাদের এমন অনুভবগুলি প্রকৃত সত্যাসত্য হতে অনেক দূরবর্তী সীমানায় অবস্থান করে।

ইতিহাস হতে আমরা অবগত হই যে, সূর্যগ্রহণ কিংবা চন্দ্রগ্রহণের সময় রসুল পাক (সাঃ) সেজদাবনত হতেন। তিনি ঐ সময় বিশেষ নামাজ আদায় করতেন আর সৃষ্টিকুলের জন্য আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের নিকট 'পানাহ্' চাইতেন। সূর্য কিংবা চন্দ্রগ্রহণের সাথে মহানবীর এই শঙ্কিত অবস্থান ও সৃষ্টিকুলের জন্য পরিত্রাণ প্রার্থনার ঘটনাটির সারমূল সম্পর্কে আমরা বেশির ভাগ মানুষই অবগত নই। কিন্তু সতর্ক বিজ্ঞানমানস মাত্রই এই গ্রহণী সময়ে মহানবীর সেজদাবনত হওয়া ও পরিত্রাণ প্রার্থনায় অবশ্যই এক ভয়ঙ্কর তথ্যের সন্ধান পায়। সুধী পাঠক, মহানবী (সঃ) এর এই সেজদাবনত হওয়া আর পানাহ্ চাওয়ার বিষয়টি আজ আমাদের জন্য এক সত্য-শর্ত সৃষ্টি করে যে সম্ভবতঃ মহানবী (সাঃ) এই পৃথিবীর ধ্বংস ও বিলয় প্রক্রিয়া

www.pathagar.com

সম্পর্কে অবগত ছিলেন। আমরা এ আলোচনার ডালা মেলে ধরছি এ আশায় যে, এই প্রবন্ধের শেষভাগে এসে আপনিও হয়তো শ্রদ্ধাবনতশিরে স্বীকার করবেন— নবীজীর এই শঙ্কিত অবস্থানটি ঘুরে-ফিরে কেবল মহাধ্বংস বা রোজ-কিয়ামতের বাস্তবতার সামনাসামনি এনে মানব জাতিকে হাজির করে যায়! ঘোর অন্ধকার এক অ-বিজ্ঞানের যুগে বসে মহানবীর এই মহাবিজ্ঞানময় ইঙ্গিত আপনাকে শুধুমাত্র উপলব্ধির তীরে এনে আঙ্গুল দিয়ে নির্দেশ করে যে— *"বলিয়া দাও, আমি শুধু অনুসরণ করি যাহা আমার প্রভুর নিকট হইতে আমার প্রতি অবতীর্ণ হয়। ইহা তোমার প্রভুর নিকট হইতে প্রত্যাদেশিত জ্ঞানের কথা এবং বিশ্বাসীগণের জন্য উপদেশ ও দয়া"* (৭:২০৩)।

সুধী পাঠক! আমরা ক্রমে ক্রমেই আলোচনার গভীরতায় প্রবেশ করতে যাচ্ছি।

ছয়

ভাগ্যের বিড়ম্বনায় চাকরি ছাড়ার পর আমি অংশীদারিত্বের ব্যবসা করতে যাই বরিশালের হিজলা অঞ্চলে। সেখানে একটি ফিস ফ্রিজিং প্লান্টের কাজ হাতে নেই। এ কাজের সাথে সংশ্লিষ্টতার কারণে প্রায়ই আমাকে হিজলায় যাতায়াত করতে হতো। একদিন হিজলা-মূলাদী এলাকার একটি চরে একটি যাত্রীবাহী লঞ্চ এমনভাবে আটকা পড়ে যে প্রতিদিন প্রতিজোয়ারে অনেক লোক একসাথে টানাটানি করেও লঞ্চটিকে বিন্দুমাত্র নাড়াতে ব্যর্থ হয়। সকলে পূর্ণিমার জোয়ারের অপেক্ষায় থাকে। অবশেষে চার/পাঁচদিন পর পূর্ণিমার সয়লাব জোয়ারেই কেবল লঞ্চটিকে নামানো সম্ভব হয়। জোয়ার সম্পর্কে ইতিপূর্বে আমার কোনো সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। হিজলায় ব্যবসা করার সুবাদে আমি প্রকৃতির এই বিশেষ বিজ্ঞানময় তথ্যের সাথে পরিচিত হলাম। পূর্ণিমায় ও অমাবস্যায় বড় জোয়ার আসে— এই তথ্যটুকু পরবর্তীতে আমার জন্য প্রয়োজনীয় হয়ে দেখা দেয়, যদিও তা অর্জন করতে আমাকে অতি উচ্চমূল্য দিতে হয়েছে।

www.pathagar.com

আমাদের জানা রয়েছে যে, সৃষ্টির অতি দুর্বোধ্য শক্তি অভিকর্ষ বল মহাজাগতিক বস্তুনিচয়ের মধ্যে এক অতি জটিল আকর্ষণ শক্তি জাল বুনে রেখেছে। মহাবিশ্বের যে অংশে আমাদের বসবাস, এখানে চন্দ্র, সূর্য ও পৃথিবী এরাই হলো আমাদের জানা নিকটতম বিশাল বস্তুগুলির উদাহরণ। পৃথিবীকে বাদ দিলে আমাদের কাছে বাহ্যতঃ এবং কার্যতঃ চন্দ্র ও সূর্যই হলো সর্ববিশাল ও সর্বগণ্য মহাকাশীয় বস্তু।

অভিকর্ষের সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী চন্দ্র ও সূর্য উভয়ই পৃথিবীর উপর বলীয় প্রভাব বিস্তার করে। আমরা জানি, অভিকর্ষ বল দুটি বস্তুর দূরত্বের বর্গের বিপরীতে হ্রাস পায়। পৃথিবী হতে সূর্য-দূরত্ব চন্দ্রের দূরত্বের ৪০০ গুণ। এই দূরত্বের কারণে সুবিশাল ভরসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও সূর্যের চাইতে চাঁদের অভিকর্ষ প্রতাপ পৃথিবীর উপর বেশি পড়ে। উভয় গোলকের অভিকর্ষ প্রভাবের প্রত্যক্ষ ফলাফলে সমুদ্রে জোয়ার-ভাটার সৃষ্টি হয়। বিজ্ঞানীদের হিসাব অনুযায়ী সূর্যের এই প্রভাবটি চাঁদের আকর্ষী বলের ৪৫ ভাগ। পৃথিবী চন্দ্রের কম দূরত্বের কারণে চাঁদ-পৃথিবী অভিকর্ষ শক্তি সূর্য-পৃথিবী অভিকর্ষ শক্তির চাইতে বেশি।

জোয়ার ভাটার গতি-প্রকৃতি একটি জটিল বিষয়। আমরা এর অতি সাদামাটা চিত্রটি নিয়ে আলোচনা করতে চাই। চাঁদ বা সূর্য যখন পৃথিবীকে আকর্ষণ করে, এই আকর্ষী বলটি পৃথিবীকে সমগ্র বস্তুসমেত কাছে টেনে নিতে চায়। প্রকৃতির নিয়মের কারণে এটি সম্ভব হয় না। কঠিন বস্তুনিচয়ের উপরও এই বল কার্যকর হয় না— বলটির প্রভাব যখন জলবিস্তারের উপর পড়ে, তখন চাঁদের মাধ্যাকর্ষণজনিত টানের কারণে জলভাগ স্ফীত ও বলের দিকে নীত হতে চায়। বলটি এতটা শক্তিশালী নয় যে ভূ-ভাগের জলকে টেনে নিজের দিকে নিয়ে যেতে পারে, কিন্তু এর ততটা শক্তি রয়েছে যে বিপুল জলরাশিকে টেনে ধরে রাখতে সক্ষম। এই টানের দিকে

www.pathagar.com

জলের স্ফীতির সৃষ্টি হয়। পৃথিবী গোলাকার এবং কঠিন ও অনড়, তাই এ টানের প্রভাব ভূ-ভাগের সমস্ত জলরাশিতে পড়ে। ফলে জলবিস্তার স্থানচ্যুত হয়ে আসে বা আসতে চায়। ক্রমে ক্রমে জলীয় বলয়ে গতির সৃষ্টি হয় এবং জোয়ার আসে। চাঁদের মতো সূর্যও পৃথিবীর জলরাশির উপর পৃথক একটি আকর্ষণ প্রভাব সৃষ্টি করে। যখন সূর্যের এই আকর্ষণ চন্দ্রের আকর্ষণ রেখার উপর পতিত হয় কিংবা সমান্তরাল হয় তখন এই জোয়ারের তীব্রতা হয় সব চাইতে বেশি। সূর্য, চন্দ্র ও পৃথিবী যখন মোটামুটিভাবে একই সরলরেখায় উপনীত হয়, তখন পৃথিবীর জলীয়মণ্ডলে যে প্রভাব পড়ে তাকে বিজ্ঞানীরা নাম দিয়েছেন Spring tide। পূর্ণিমায় কিংবা অমাবস্যায় এই ধরনের জোয়ার সৃষ্টি হয়। প্রতিদিন আমরা যে জোয়ারের সাথে

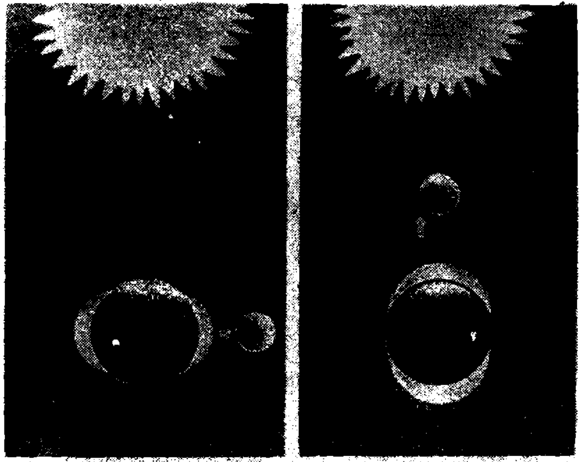

নতুন চাদ, সূর্য-চন্দ্র-পৃথিবী লাইনে ৫০ ডিগ্রী হেলে থাকে। এতদসত্ত্বেও পৃথিবীতে যে জোয়ার সৃষ্টি হয়, তা প্রদর্শিত অন্য চিত্রটির চাইতে বড়। কিন্তু চাঁদটি যখন শূন্য (০) লাইনে পতিত হয়— তখন পূর্ণ সূর্যগ্রহণ ঘটে। এই আকর্ষণ ও জোয়ারের প্রতাপ হয় আরো অনেক বেশি। তখন 'ত্রয়ী-বস্তুর-শূন্য লাইনে'র প্রসারিত প্রতিটি বিন্দুতে অভিকর্ষের আকর্ষণ বৃদ্ধি পায় যা ভয়ঙ্কর হতে পারে।

পরিচিত, অমাবস্যা কিংবা পূর্ণিমায় সে জোয়ার অপেক্ষাকৃত অধিকতর প্রভাবশালী। এমনি সময়ের অপেক্ষাতেই বসেছিল

www.pathagar.com

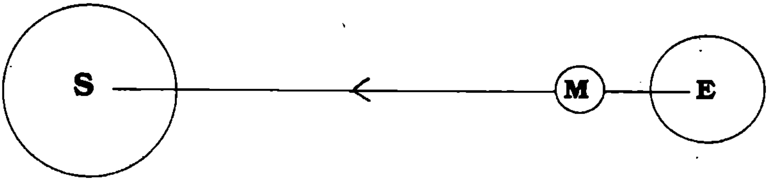

ত্রয়ী বস্তু শক্তি লাইন। চাঁদ যখন পৃথিবী ও সূর্যের শূন্য লাইনে উপস্থিত হয়; তখন ৩ বস্তুর শক্তি–ভেক্টরটি সূর্যের দিকে গতিমুখ করে থাকে। এই শক্তি–ভেক্টরটি সাধারণতঃ বেশি শক্তিশালী হয়। তখন কিন্তু সূর্যগ্রহণ; আর এটি হতে পারে এক মহা সংকটকাল! ৩ বস্তুর একত্রিত অভিকর্ষ শক্তি দূরে কোনো ধ্বংসের আগন্তুককে ডেকে আনবার রাস্তাটি দেখিয়ে দেয়। এ সময় মহানবী (সঃ) সেজদায় পড়ে সৃষ্টির জন্য পানাহ্ চাইতেন।

সর্বপ্রথম লক্ষ্যবস্তু। কোনো কারণে কোনো সময়ে সূর্য–চন্দ্র–পৃথিবী লাইন তৈরী হবার পর গতিটানের অনুকূল দিকে সন্তরণমান কোনো মহাকাশীয় বস্তু যদি ক্ষুদ্র কৌণিক দূরত্ব নিয়ে আপতিত হয়, তবে এ সর্বনাশের মুখে পৃথিবী হলো প্রথম পরিণামবাহী। পৃথিবীবাসীর জন্য এ হলো এক বড় দুঃসংবাদ।

সালে ২৪ অক্টোবর বাংলাদেশের আকাশে পূর্ণ সূর্যগ্রহণের অভিজ্ঞতাটি ছিল প্রায় ১ মিনিট সময়কালের। এক মিনিট সময় একটি সুদীর্ঘ সময়। একটি পূর্ণ গ্রহণকাল কয়েক সেকেণ্ড হতে কয়েক মিনিট দীর্ঘ হতে পারে। কয়েক মিনিটের একটি পূর্ণগ্রহণ, দর্শকগণের জন্য এক আনন্দদায়ক সংবাদ। তবে সত্য যে এই আনন্দ সংবাদের বিপরীত দিকেই রয়েছে এক ভয়ঙ্কর দুর্ভাগ্যজনক মহাধ্বংসের সংকেত। প্রতিটি গ্রহণই যেন পৃথিবীর উপর এক মহাদুর্যোগের নিঃশ্বাস ফেলে যায়। সুধী পাঠক, একটি গ্রহণীকাল এই পৃথিবী, এর জীবন বিস্তারের অস্তিত্ব ইত্যাদি সবকিছুকে চিরদিনের জন্য নিস্তব্ধ করে দিতে পারে। অনুগ্রহপূর্বক আলোচনার এ অংশটুকু স্মৃতিতে ধারণ করবেন।

www.pathagar.com

আট

আমরা ইতিমধ্যেই জেনেছি যে বড় বড় গ্রহাণুদের ব্যাস ১ কিঃ মিঃ হতে হাজার কিলো মিঃ পর্যন্ত এবং এরা সংখ্যায় লক্ষাধিক। আমরা ইতিপূর্বে টেঙ্গোস্কার অভিজ্ঞতার দিকে আলোকপাত করেছি যা ছিল মাত্র ৫০ গজ ব্যাসসম্পন্ন একটি ক্ষুদ্র ও ভঙ্গুর মিটিওর যার ধ্বংসক্ষমতা ছিল মাত্র ১২ মেগাটন টিএনটির ধ্বংস ক্ষমতার সমান (বায়ুমণ্ডলের ৮.৫ কিলোমিটার উচ্চতায় থাকতে পাথরটি ভেঙ্গে কয়েক টুকরা না হলে ও তার গতিবেগ ৩০ কিঃমিঃ/সেকেণ্ড হতে ১১ কিঃমিঃ/সেকেণ্ডে হ্রাস না পেলে এর তাণ্ডব হতো আরো অধিক— বড় আকারের পাথর বা এসটিরয়েডের জন্য বায়ুমণ্ডলীয় বাধা অকার্যকর হবে)। সেদিনের এই পতন টেঙ্গোস্কাবাসীদের চোখ ধাঁধিয়ে দেয়, ভূ-কম্পনের সৃষ্টি করে এবং মহাশব্দ আতঙ্কে পৃথিবীকে শঙ্কিত করে। এই আঘাতের ফলে হাজার হাজার বর্গ কিলোমিটার অঞ্চলের বনাঞ্চল ভূমিসাৎ হয়। যে এসটিরয়েডের ব্যাস ১ কিঃ মিঃ, তার ধ্বংস ক্ষমতা প্রায় ৫০ লক্ষ হিরোসিমা বোমার সমান, আর কয়েক কিংবা কয়েকশত কিলোমিটার গ্রহাণুর ধ্বংসমাত্রা কি এ হিসাব নেয়া আমাদের আদৌ প্রয়োজন পড়ে না। এ মুহূর্তে আমাদের জন্য প্রশ্ন হলো— আদৌ পৃথিবীতে এমন ঘটনা ঘটতে পারে কি?

এই গুরুতর প্রশ্নের উত্তর কি হ্যাঁ কিংবা না, তা বিজ্ঞানীদের জানা নেই। তবে তারা সাধারণ সম্ভাব্যতা হিসাব করে দেখেছেন, কমপক্ষে ১ কিঃ মিঃ ব্যাসসম্পন্ন এসটিরয়েডের পৃথিবীকে আঘাত করার সম্ভাব্যতা প্রতি তিন লক্ষ বৎসরে একটি। স্রষ্টা সৃষ্টিকে এমনভাবে ব্যবস্থিত করেছেন যে, এর মাঝেই বিধৃত করেছেন এর ধ্বংস ও নিরাপত্তাকে। তবে এই নিরাপত্তা ব্যবস্থাটি একদিকে যেমন অতিশয় মজবুত, অন্যদিকে তেমনি সাংঘাতিক স্পর্শকাতর। একটি মুহূর্ত কিংবা একটু বিচ্যুতি যা আপাতঃ কারণে গ্রহণযোগ্যতা পায়

www.pathagar.com

না, তেমন কোনো তুচ্ছ কারণ হতেই সৃষ্টি হতে পারে মহাধ্বংসের তাণ্ডব। মনে রাখা দরকার, যে সব উৎস বা কারণকে আমরা চোখে দেখতে পাই, সে কারণগুলি হতে আমরা পরিত্রাণ পেয়ে থাকি বলেই তা আমাদের অধিকতর দৃষ্টিগোচর হয়। নির্ঘাত ধ্বংস যে বয়ে আনবে, সে হবে অজ্ঞাত ও অদৃশ্য। ১৯৯১ সনে ৫০ ফুট ব্যাসের যে মিটিওরটি মাত্র এক লক্ষ মাইল দূর দিয়ে উড়ে গেল কিংবা ১৯৮৯ সনে ১৩০০ ফুট গ্রহাণু যা চাঁদের দ্বিগুণ দূরত্ব দিয়ে উড়ে চলে গেল, তারা পৃথিবী-চন্দ্র-সূর্য ইত্যাদির গ্রহণী তলে আসেনি কিংবা তারা পৃথিবী চন্দ্র বা পৃথিবী, চন্দ্র ও সূর্যের বেগ-গতিতীরের সাথে অনেক বড় কৌণিক দূরত্বে প্রবাহিত হয়েছে। ফলতঃ তারা পৃথিবীর জন্য কোনো ভয়ঙ্কর দুঃসংবাদ নিয়ে আসেনি।

অতীতে পৃথিবীর সঞ্চালন তলকে যে সব গ্রহাণুরা ছেদ করে গেছে, তাদের মধ্যে রয়েছে ইরোস (৩০ কিঃমিঃ), ১৯৩১ সনে পৃথিবী থেকে ২৭২০০,০০০ কিঃমিঃ দূরত্বে এসে পড়েছিল সে। অ্যালবার্ট (৫ কিঃমিঃ) ১৯১১ সালে ৩,২০,০০,০০০ কিঃমিঃ; অ্যামর (৮ কিঃমিঃ) এসেছিল ১,৬০,০০,০০০ কিঃমিঃ ; এপোলো এসেছিল ১,১২,০০,০০০ কিঃ মিঃ ; অ্যাদোনিস এসেছিল ২০০.০০০০ কিঃমিঃ হারমিস এসেছিল ৭,৭৬,০০০ কিঃমিঃ দূরত্বে। এদের মধ্যে অনেকেই বেশ বড় বড় গ্রহাণু (শত কিলো)। অনুরূপভাবে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধূমকেতুরা পৃথিবীর আকাশীয় অঞ্চলে আনাগোনা করে গেছে অতীতে। ওদের মস্তকের ব্যাস এক হতে কয়েক কিঃমিঃ পর্যন্ত জানা গেছে।

প্রশ্ন হতে পারে সমস্যাটি কোথায়? দূরত্বের হিসাবে চাঁদ মাত্র ৩০০,০০০ কিঃ মিঃ দূরে অবস্থিত। চাঁদ তো পৃথিবীর উপর আছড়ে পড়ছে না! সেখানে চন্দ্র হতে অনেক অনেক বেশি দূরত্ব দিয়ে উড়ে যাওয়া গ্রহাণু কিংবা ধূমকেতু কেন পৃথিবী বিলয়ের কারণ হতে যাবে? প্রকৃতপক্ষে এ জিজ্ঞাসা ও জবাবের মধ্যে মহাধ্বংসের

www.pathagar.com

রূপায়ন চিত্রের একটি সম্ভাব্য সার–দৃশ্য পাওয়া যেতে পারে। এই জবাবটি সহজ ও সুস্পষ্ট। চন্দ্র পৃথিবীকে কেন্দ্র করে পরিভ্রমণ করছে একটি সূক্ষ্ম ও মাপিত গতিবেগে যেমন সূর্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবী। এই গতিমাত্রাটি মহাবিশ্বের সৃজনকর্তা এমন সূক্ষ্ম ভারসাম্যে এঁটে দিয়েছেন— যার কোনো নিকটবর্তী ক্ষয় নেই। কোরআনের ভাষায়— *"সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় যে চন্দ্রকে নাগালে পায়, প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষে সঞ্চালনমান" (৩৬:৪০)।* মহাজাগতিক বস্তুদের ঘূর্ণন, এদের বলটান একটি নিখুঁত ভারসাম্যে বাঁধা, যার কারণে পৃথিবীর আকর্ষণ চন্দ্রকে যতটা নিজের উপর টেনে আনতে চায়, চাঁদের গতিশক্তি ততটা সে টানকে প্রতিহত করে। ফলতঃ চাঁদ কখনই পৃথিবীর অভিকর্ষের গ্রাসে পতিত হবার নয়। কিন্তু গ্রহাণুদের ক্ষেত্রে বিবেচনাটি একেবারে ভিন্ন। গ্রহাণুরা মূলতঃ সূর্য–কেন্দ্রিক সঞ্চালনে শাসিত। বৃহস্পতি এবং অন্যান্য গ্রহদের প্রভাব গ্রহাণুদেরকে মাঝে মধ্যে এসটিরয়েড বেল্ট হতে ছুড়ে ফেলে দেয়। প্রচণ্ড শক্তিতে নিক্ষিপ্ত হবার পর কোনো গ্রহাণু বৃহস্পতির বলয় আভ্যন্তরীণ সঞ্চালন হতে গতিপ্রাপ্ত হয়ে নতুন সুবিশাল উপবৃত্তে অনিয়মিত কক্ষপথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে থাকে। এই অনিয়মিত কক্ষের বিস্তৃতি ঘটে পৃথিবী কিংবা তার ভেতরের অঞ্চলের গ্রহদের রাজত্ব পর্যন্ত। এই চলনের সময় তাদের কেউ কেউ পৃথিবীর কক্ষতলকে অতিক্রম করে যা একটি ভীতিপ্রদ ঘটনা! উল্লেখ্য যে, অনিয়মিত ও অনিয়ন্ত্রিত চলনে সঞ্চালনশীল গ্রহাণুদের সংখ্যা সময়ের সাথে সাথে বেড়েই চলে, কখনই কমে না। তাদের বৃদ্ধি, আবির্ভাব, গতি–কক্ষ ইত্যাদি বিষয়ে সুনিশ্চিত কোনো পূর্বাভাসও সম্ভব নয়, এ ছাড়া অন্যান্য গ্রহদের অবস্থান ও দূরত্ব এই সব গ্রহাণুদের অস্থিরতা ও পথের পরিবর্তনের সূচনা করতে পারে একান্ত অনিশ্চিতভাবে। ফলতঃ এদের প্রত্যেকই এক একটি ভীতি ও আশঙ্কার কারণ হয়ে আবিভূত হতে পারে পৃথিবীর ভাগ্যাকাশে। এখন আমরা এই ভীতিপ্রদ ও শঙ্কাময় দিকটি নিয়েই আলোচনা করব।

www.pathagar.com

নয়

১৯৯৩ সন, মার্চ ২৩। ইউজিন সুমেকার ও তার স্ত্রী ক্যারোলিন সুমেকার তাদের ৪৫ সেঃ মিঃ টেলিস্কোপ দিয়ে তোলা ছবির ফিল্মে দৃষ্টি ফেলে দেখলেন যে, বৃহস্পতির নিকটবর্তী অঞ্চলে একটি মৃত ধূমকেতুর দেহাবশেষ মোট ২১টি অংশে বিভক্ত হয়ে উপবৃত্তাকার কক্ষে দ্রুত বৃহস্পতির দিকে ধাবিত হচ্ছে। সুমেকার দম্পতি বিগত দুই যুগ ধরে পৃথিবীর কক্ষ–ছেদকারী গ্রহাণু ও ধূমকেতুদের কক্ষপথ পর্যবেক্ষণ করে যাচ্ছিলেন। তারা তাদের তালিকায় ২000 বড় আকারের গ্রহাণুদের অন্তর্ভুক্ত করেন যারা পৃথিবীর খুব কাছ দিয়ে এসে গভীর আকাশে প্রত্যাবর্তন করে। এদের প্রায় ১০ ভাগ ১ কিঃ মিঃ হতে উর্ধ্বে কয়েকশত কিলোমিটার! সুমেকার ও তার দল এ কাজটিতে জীবন উৎসর্গ করেছেন, ফলতঃ তারা গ্রহাণুদের বিষয়ে সর্বোচ্চ যোগ্যতা অর্জন করার সুযোগ পেয়েছেন। তারা ফিল্মে প্রাপ্ত মৃত ধূমকেতুর ভগ্নাংশগুলি ও তাদের গতিপথ পর্যালোচনা করে দেখলেন যে, সর্ববৃহৎ গ্রহ জুপিটারের উপর আঘাত সুনিশ্চিত। সুমেকার লেভী–৯ নামের এই ধূমকেতু প্রায় ২০ বৎসর আগে সূর্যের অভিকর্ষে আটকা পড়ার কারণে এক অতিশয় উপবৃত্তাকার কক্ষপথে সঞ্চালিত হতে শুরু করে। একসময় বৃহস্পতির অভিকর্ষে আটকে যায় সে।

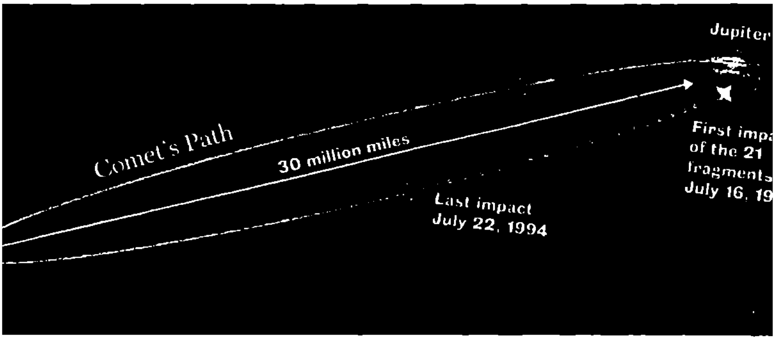

Shoemaker- Levy 9 এর কক্ষ পথ ও বৃহস্পতিতে আঘাত চিত্র।

www.pathagar.com

বৃহস্পতির অভিকর্ষ প্রভাবের কারণে একসময় ধূমকেতুটি টুকরা টুকরা হয়ে যায়। তারপর এই ভগ্নাংশরা একটি পাথরের 'ফ্লীটের' ন্যায় জুপিটার অভিমুখে চলতে থাকে ১,৩৪,০০০ মাইল/ঘন্টা গতিতে। ধূমকেতুটি একটি অতি উপবৃত্ত রচনার মধ্য দিয়ে বৃহস্পতিতে আঘাত করার সম্ভাব্যতা সৃষ্টি করে। এই অতিশয় উপবৃত্তাকার

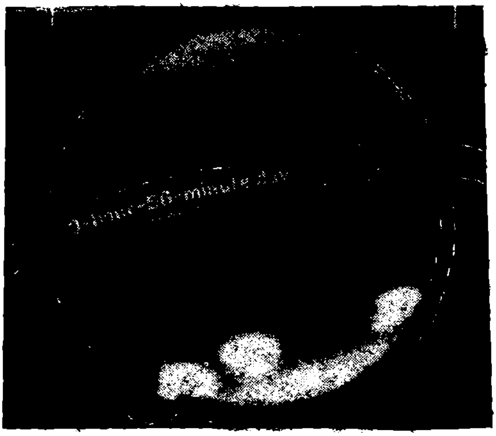

প্রথম ভগ্নাংশের আঘাত, এর শক্তি ছিল ৬০ লক্ষ মেগাটন টিএনটি –এর সমান।

গতিমুখটি বৃহস্পতির মাধ্যাকর্ষণ টানের অনুকূলে হওয়ার কারণে সুমেকার লেভী–৯ সরাসরি বৃহস্পতি লক্ষ্যে অগ্রসর হয়। অতঃপর ১৬ জুলাই, ১৯৯৪ এ প্রথম ভগ্নাংশটি বৃহস্পতিতে আঘাত করে (সর্বশেষটি ২২ জুলাই '৯৪), ২.৫ মাইল ব্যাসসম্পন্ন এই পাথরের আঘাতে বৃহস্পতির বুকে যে প্রলয়ের সৃষ্টি করে, তার মাত্রা ছিল ৬০ লক্ষ মেগাটন টিএনটির বিস্ফোরণের সমান। ২১টি ভগ্নাংশের মোট বিস্ফোরণ মাত্রা ছিল ২ কোটি মেগাটন টিএনটির বিস্ফোরণের সমতুল্য (পৃথিবীতে সর্ববৃহৎ বিস্ফোরণ ছিল ৫৮ মেগাটন, হাইড্রোজেন বোমা, রাশিয়া; বৃহস্পতিতে মোট বিস্ফোরণ পৃথিবীর সর্ববৃহৎ বিস্ফোরণের ৩৪৪৮২৮ গুণ)।

www.pathagar.com

বৃহস্পতির উপর এই আঘাত বিজ্ঞান জগতে এক আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে। শঙ্কিত প্রশ্ন জেগেছে— Will a similar cataclysm happen on earth as it apparently has in the past? এই প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন বিজ্ঞানীগণ— There is a one in 10,000 chance, every human life time. গ্রহাণু ও ধূমকেতু বিশেষজ্ঞ সুমেকারের মতে দেড় কিলোমিটার কিংবা বেশি ব্যাসসম্পন্ন গ্রহাণু কিংবা ধূমকেতুর পৃথিবীপৃষ্ঠে আঘাত করার সম্ভাব্যতা প্রতি তিন লক্ষ বৎসরে একটি। এ পর্যন্ত যতগুলি বড় গ্রহাণুর সন্ধান পাওয়া গেছে, তাদের কোনোটাই আধুনিক মানব সভ্যতাকালে তেমন বিপদ ঘটাবে বলে মনে হয় না। তবে কোনো অজ্ঞাত গ্রহাণু যদি এ কাজটি করে, সে সম্পর্কে এখনো কিছু বলা সম্ভব নয়। সে দিনটি কবে, সে সম্পর্কে অবশ্যই কেউ জানে না। সুমেকার লেভী-৯ যদি পৃথিবীকে আঘাত করত, তবে পৃথিবী একদলা ছাই বা ভস্মে পরিণত হতো শুধু। এই পৃথিবীর ইতিহাস এখানেই শেষ হয়ে যেত। এমনি একটি আঘাতের পরিণাম হতো মহাবিস্তৃত ধূলিমেঘ কুজ্ঝটিকার জন্ম, যা পৃথিবীর আকাশকে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর ঢেকে রাখত। পৃথিবী আদ্যপ্রান্ত হয়ে পড়ত একটি বিরাট বরফের টুকরা। এই ধূমকেতু যদি পৃথিবীর কোনো সমুদ্রকে আঘাত করত— তবে এর জলরাশিকে স্ফীত করে দিত কমপক্ষে এক কিলোমিটার উচ্চতায়। শত শত কিলোমিটারে প্লাবন নেমে আসত। শব্দ, কম্পন, জলোচ্ছ্বাস ও চন্দ্র-সূর্য আচ্ছাদিত হয়ে পড়ার সমস্ত ঘটনাই ঘটত এই পৃথিবীতে ঠিক তেমনিভাবে, যেভাবে কোরআন কিয়ামতের বর্ণনা দিয়েছে।

দশ

সুমেকার লেভী-৯ ধূমকেতুটি ছিল এক অজ্ঞাত জ্যোতিষ্ক বিজ্ঞানীগণ যাকে কেবল সহসাই সনাক্ত করতে পেরেছিলেন। অতিশয় উপবৃত্তাকার পথে অদৃশ্যভাবে চলতে চলতে একসময় এর গমনরেখা

www.pathagar.com

বৃহস্পতির অভিকর্ষটানের অনুকূলে পতিত হয়। এই আপাতনই ধূমকেতুকে বৃহস্পতির উপর আঘাত হানার সুযোগ সৃষ্টি করে।

গ্রহাণু কিংবা ধূমকেতুরা কিভাবে পৃথিবীর জন্য বিপদ ডেকে আনতে পারে তারও একটি চিত্র আমরা এখানে পর্যালোচনা করব। ধরি ক, খ ও গ তিনটি গ্রহাণু/ধূমকেতু বিভিন্ন সময় পর্যায়ে পৃথিবীর কক্ষপথের কাছাকাছি এসে হাজির হয় কিংবা পৃথিবীর কক্ষপথকে ছেদ করে।

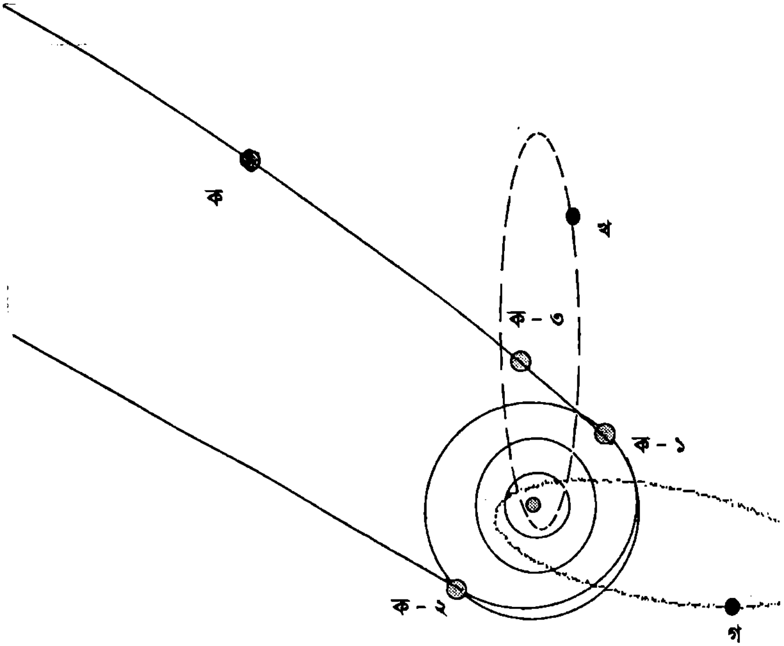

খ ও গ এর পৃথিবী কক্ষ ছেদনটি বৃহত্তর কৌণিক মানসম্পন্ন বিধায় এদের ছেদন বিন্দুতে কিংবা অতি নিকটবর্তী স্থানে পৃথিবীকে না পেলে এই দুই জ্যোতিষ্ক হতে পৃথিবীর জন্য ভয়ের বড় কোনো কারণ নেই। সহজেই বলা যায়— এমন সম্ভাব্যতা সঙ্গত কারণেই

www.pathagar.com

দুর্লভ। কিন্তু জ্যোতিষ্ক ক এর কক্ষপথটি একটি বিশেষত্ব বহন করে। লক্ষ্য করুন ক–১ ও ক–২ এ গ্রহাণুটি পৃথিবীর কক্ষপথকে ছেদ করছে। তারপর ক–১ হতে ক–২ পর্যন্ত এবং তার আরও দূরবর্তী অঞ্চলসমেত জ্যোতিষ্ক ক–এর কক্ষপথটি প্রায় সমান্তরালভাবে প্রবাহিত হয়েছে। দুই ছেদ. বিন্দুরই দুই পার্শ্বের অঞ্চলগুলির কৌণিক দূরত্ব দীর্ঘ অঞ্চল জুড়ে কমে এসেছে, ফলতঃ পৃথিবীর অবস্থান প বিন্দুটি ক–১ ও ক–২ এর মাঝে যেখানেই হোক, অগ্রসরমান আগন্তুক জ্যোতিষ্কের অবস্থান যদি ক–৩ বিন্দুতে হয়, তবে জ্যোতিষ্ক ক তার মূল অক্ষ হতে বিচ্যুত হয়ে পৃথিবীর অক্ষে প্রবাহিত হতে পারে এবং পৃথিবী প বিন্দুতে থাকার কারণে ক–৩ বিন্দুতে অবস্থানরত জ্যোতিষ্কের স্বাভাবিক গতিতে বাড়তি গতির সঞ্চার করতে পারে। গ্রহাণুটি যদি অপেক্ষাকৃত বড় ও নিকটবর্তী হয়, তবে বেগের তীব্রতা বৃদ্ধি পাবে এবং আঘাতের শক্তি হবে আরো অধিকতর। এমতবস্থায় ক–১ বিন্দু হতে ক–২ এর মাঝামাঝি এবং তাদের আগে–পরে যে কোনো বিন্দুতে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের জন্য জ্যোতিষ্কটি আছাড় খেয়ে পড়তে পারে। ডেকে আনতে পারে মহাধ্বংস! শুধু তা–ই নয়, এমনও হতে পারে যে কোনো গ্রহাণু/ধূমকেতুর আগমন কিংবা প্রত্যাগমন পথ পরিপূর্ণভাবে পৃথিবীর কক্ষপথের উপরই পতিত হয়েছে। এমন সম্ভাবনা দুর্লভ হলেও আগন্তুক জ্যোতিষ্কদের সংখ্যা কিংবা তাদের উপর অন্যান্য বড় গ্রহদের প্রভাব ইত্যাদি কারণে এর আশঙ্কা একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না। শুধু তা–ই নয়, এমনও হতে পারে যে পৃথিবীর গতিমুখের বিপরীত দিক হতে একই কক্ষতলে সমান্তরাল কিংবা একেবারে একই কক্ষে চড়ে ছুটে আসতে পারে কোনো গ্রহাণু কিংবা কোনো ধূমকেতু। এ ক্ষেত্রে একটি ছোট গ্রহাণুই অনেক অনেক বড় ধ্বংস সৃষ্টি করে বসবে। আগন্তুক জ্যোতিষ্ক এবং পৃথিবীর বিপরীতমুখী গতি উভয়ই সঙ্গত কারণে প্রতিমুখী ও প্রচণ্ড বেগবান হওয়া সত্ত্বেও অভিকর্ষ বল উভয়ের গতিতে আরো জোর সৃষ্টি করবে। এমন একটি ধ্বংসের চেহারা হবে সত্যিই ভিন্নতর!

www.pathagar.com

ইতিপূর্বে আমরা জোয়ার ভাটা এবং সূর্য/চন্দ্রগ্রহণ নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। কোনো কারণে কোনো গ্রহণী সময়ে সূর্য-চন্দ্র-পৃথিবী লাইন তৈরী হবার পর কোনো নিকটবর্তী অঞ্চলে যদি কোনো আগন্তুক জ্যোতিষ্ক স্বল্প কৌণিক মান নিয়ে আসতে থাকে, আর এই আগমনের 'ভেক্টর' বা তীর যদি সূর্য-চন্দ্র-পৃথিবীর আকর্ষণ ভেক্টরের অনুকূলে হয় কিংবা প্রথমটি দ্বিতীয়টির উপর পতিত হয় তখন ঐ আগন্তুক গ্রহাণু/ধূমকেতুকে সেই ত্রয়ী-বিন্দু-শক্তি-লাইন তীব্রভাবে আকর্ষণ করে বসতে পারে। এমন একটি পরিস্থিতি হতে রক্ষা পাবার উপায় আমাদের খুব অল্পই জানা রয়েছে। এই পরিস্থিতির রেখাচিত্রটি নিম্নরূপ দেখাবে ঃ

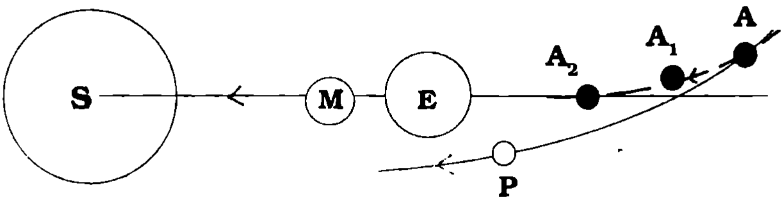

আগন্তুক গ্রহাণু (ধূমকেতুও হতে পারে) S-M-E লাইনের অনুকূলে স্বল্প কৌণিক মান সৃষ্টি করে ধাবমান হওয়ার সময় ত্রয়ী বিন্দু শক্তি লাইন দ্বারা বিচ্যুত হয়ে সোজাসুজি পৃথিবীর দিকে তীব্র গতিতে ছুটে আসবে। পৃথিবীর ইতিহাসে সমাপ্তি রেখা টেনে দেবার জন্য এমন একটি ঘটনা যথেষ্ট! সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণ মূলতঃ আগন্তুক জ্যোতিষ্ক কর্তৃক পৃথিবীকে আঘাত করার সম্ভাব্যতা উদ্বেগজনকভাবে বাড়িয়ে দেয়া। গ্রহাণু কিংবা ধূমকেতুরা ঐ সময় যতটা নিকটবর্তী থাকবে, পৃথিবীতে আঘাত আসার ততটা সুযোগ তখন সৃষ্টি হতে পারে। অর্থাৎ গ্রহণী সময়ে পৃথিবী ধ্বংস হবার আশঙ্কা রয়েছে খুব বেশি। এই দৃষ্টিকোণ হতে সূর্য কিংবা চন্দ্রগ্রহণের সময় মহানবীর সেজদাবনত হওয়া এবং সৃষ্টিকুলের জন্য পানাহ্ চাওয়ার মধ্যে আমরা একটি নিখুঁত বাস্তবতার সম্পর্ক খুঁজে পাই।

www.pathagar.com

এগার

এবার আমরা পবিত্র কোরআনের পাতায় ফিরে আসতে চাই। মহাধ্বংস দিবস সম্পর্কে কোরআনে অনেক আয়াতের অবতারণা ঘটেছে। তাদেরই কয়েকখানি নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো ঃ

"মহাপ্রলয়! মহাপ্রলয় কি? (১০১:১–২) মহাপ্রলয় সম্পর্কে তুমি কি জান? (১০১:৩)। সেদিন মানুষ বিক্ষিপ্ত হইবে পতঙ্গের ন্যায় (১০১:৪) এবং পর্বতসমূহ ধুনিত হইবে রঙ্গীন পশমের মতো" (১০১:৫)।

কিংবা

"যখন কর্ণবিদারী মহানিনাদ উপস্থিত হইবে (৮০:৩৩)
সূর্য যখন নিষ্প্রভ ও জ্যোতিহীন হইয়া যাইবে (৮১:২)
পর্বতসমূহকে যখন অপসারিত করা হইবে (৮১:৩)
যখন সমুদ্র স্ফীত হইবে (৮১:৬)
যখন আকাশের আবরণ উন্মোচিত করা হইবে (৮১:১১)
পর্বতসমূহ বহমান ধূলিরাশিতে পরিণত হইবে" (৭৩:১৪)

কিংবা

"যখন আকাশ বিদীর্ণ হইবে (৮২:১)
এবং যখন 'কাওকাব' বিক্ষিপ্তভাবে নিক্ষিপ্ত হইবে (৮২:৩)
যখন সমুদ্র উদ্বেলিত হইবে" (৮২:২–৩)

কিংবা

"শপথ মহাধ্বংস দিবসের (৭৫:১)
সে প্রশ্ন করে কিয়ামত দিবস কখন আসিবে (৭৫:৬)
তখন চক্ষু স্থির হইয়া যাইবে (৭৫:৭)
তখন চন্দ্র হইয়া পড়িবে জ্যোতিহীন (৭৫:৮)
যখন সূর্য ও চন্দ্রকে একত্রিত করা হইবে (৭৫:৯)
সেদিন মানুষ বলিবে আজ পালাইবার স্থান কোথায়?" (৭৫:১০)

www.pathagar.com

কিংবা

"তোমরা কি নিশ্চিত হইয়াছ যে যিনি আকাশে রহিয়াছেন— তিনি তোমাদের উপর প্রস্তরবর্ষী ঝঞ্ঝা প্রেরণ করিবেন না?" (৬৭:১৭)

"সেদিন আকাশ হইবে গলিত ধাতুর ন্যায়" (৭০:৮)

কিংবা

"যখন সিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হইবে— একটিমাত্র ফুৎকার (৬৯:১৩) তখন পর্বতমালা সমেত পৃথিবী উৎক্ষিপ্ত হইবে এবং ধাক্কায় উহারা চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া পড়িবে (৬৯:১৪)। সেদিন প্রথম সিঙ্গাধ্বনি প্রকম্পিত করিবে— উহাকে অনুসরণ করিবে পরবর্তী ধ্বনি (৭৯:৬–৭) ইহা তো কেবল একটিমাত্র মহাবিস্ফোরণের শব্দ" (৭৯:১৩)।

আমরা এ আয়াতগুলি পর্যালোচনা করলে যা পাই, তা হলো যে, মহাধ্বংস বা কিয়ামতের ক্ষণে মানুষ পৃথিবীতে বর্তমান থাকবে (১০১:৪), তখন কর্ণবিদারী মহানিনাদ সহসা উপস্থিত হবে (৮০:৩৩), আকাশ বিদীর্ণ করে (৮২:১)। তখন চন্দ্র ও সূর্যের আলোক মানুষের কাছে ম্লান বা জ্যোতিহীন মনে হবে আগন্তুক জ্যোতিষ্কের আঘাতে প্রকাশিত সূক্ষ্ম ধূলির ছাতা বিস্তৃত হবার কারণে (৮২:২/৭৫:৮), সমুদ্র উদ্বেলিত ও স্ফীত হবে (৮১:৬) কাওকিব অর্থাৎ গ্রহ জাতীয় পদার্থ (গ্রহাণু/ধূমকেতু) বিক্ষিপ্তভাবে নিক্ষিপ্ত হবে পৃথিবীর উপর (৮২:৩), সূর্য ও চন্দ্রকে একত্রিত করা হবে সেদিন (৭৫:৯) এবং নেমে আসবে এক প্রস্তরবর্ষী মহাপ্রলয় (৬৭:১৭)। সেদিন পর্বতমালাসমেত পৃথিবী উৎক্ষিপ্ত হবে এবং অনুভূত হবে এক বিরাট ধাক্কা (৬৯:১৪) সেদিন প্রথম একটি বিকট ধ্বনি (সিঙ্গাধ্বনি) শুনতে পাবে মানুষ— তাকে অনুসরণ করবে দ্বিতীয় ধ্বনি (৭৯:৬–৭) পুরো ধ্বংসটি শুরু হবে মূলতঃ এক মহাবিস্ফোরণের শব্দের মধ্য দিয়ে (৭৯:১৩)।

www.pathagar.com

এই সব আয়াতের প্রস্তাবগুলি দৃশ্যতঃ যে চিত্র তুলে ধরে তা হলো, কোনো মহাজাগতিক বস্তুপিণ্ডই কিয়ামত বা মহাধ্বংসের কারণ হবে। বড় কোনো মহাজাগতিক বস্তুপিণ্ড যা 'কাওকাব' সদৃশ— পৃথিবীকে আঘাত করার কারণে পৃথিবীর উপর প্রচণ্ড কম্পন, শব্দ, আলোক ও উত্তাপ, নিউক্লিয়ার ধূলিমেঘ, জলোচ্ছ্বাস, চাঁদ–সূর্যের আলো নিষ্প্রভ হবার মতো তথ্যগুলি যে কোনো বিজ্ঞান–সচেতন মানুষকে আকৃষ্ট করে। যদি কখনো এই পৃথিবীকে 'কাওকাব' সদৃশ কোনো বস্তু প্রকারান্তরে যা কোনো একটি বড় গ্রহাণু (কাওকাবের অর্থ হলো— গ্রহ বা জ্যোতিষ্ক) আঘাত করে বসে, তবে এর আঘাতের প্রচণ্ড ধাক্কায় পর্বতদল বহমান ধূলিতে পরিণত হতে পারে (আঘাতটি কোনো পার্বত্য এলাকায় না হলেও বড় বড় ফিচারগুলো ভেঙ্গে খানখান হয়ে পড়বে এবং নিউক্লিয়ার ভ্যাকুয়াম সৃষ্টি হবার কারণে ভগ্ন পর্বতদল সূক্ষ্ম ধূলিতে পরিণত হতে পারে)। এই ধূলির কারণে— চাঁদ–সূর্যের প্রভা ও তেজ পৃথিবী হতে আড়াল হয়ে যাবে, নক্ষত্ররা আর কোনো জ্যোতি প্রেরণ করতে সক্ষম হবে না কোনো পৃথিবীবাসীর কাছে। আঘাতের অতি দূরবর্তী অঞ্চলে যদি মানুষ জীবিত থাকে— তবে ধূলির কুজ্ঝটিকা ভেদ করে যদি দৈবাৎ সে আকাশ দেখতে পায়, তবে নক্ষত্ররাজিকে অতি ক্ষীণ দেখতে পাবে। এই আঘাতের অবশ্যম্ভাবী কারণ হিসাবে ঘটবে জলোচ্ছ্বাস! বৃহস্পতিতে সুমেকার লেভী–৯ আঘাত হানার সময় অবিরাম প্রস্তর–বৃষ্টি নেমে এসেছিল গ্রহটির উপর। তেমনি প্রস্তর–বৃষ্টি নেমে আসতে থাকবে স্বাভাবিক প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায়। এই মহাসংকটকে ডেকে আনার ভূমিকা পালন করবে সম্ভবতঃ আরো একটি ঘটনা— একটি সূর্যগ্রহণ (কিংবা চন্দ্রগ্রহণ) যা পৃথিবী, চন্দ্র ও সূর্যকে একটি সরল–লাইনে একত্রিত করবে (Gathering of Earth, Moon, Sun); এই লাইন তৈরী করবে একটি শক্তিশালী অভিকর্ষ টান যার ভেক্টর বা গতি–তীর হবে সূর্যের দিকে। এই অস্বাভাবিক শক্তি লাইনটি সম্ভবতঃ বিচ্যুত করে টেনে আনবে কোনো ভ্রাম্যমান গ্রহাণুকে যা হয়তো ঐ সময় নিকটবর্তী

www.pathagar.com

অঞ্চল দিয়ে চলমান। প্রচণ্ড গতি ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট হবে প্রচণ্ড অভিকর্ষ; এই শক্তি সম্মিলনে সঞ্চালিত গ্রহাণু স্বাভাবিকের চাইতে বেশি জোরে আঘাত হানবে পৃথিবীর পৃষ্ঠে! তখন শোনা যাবে শুধু একটি মাত্র মহানিনাদ কিংবা একটি মাত্র শব্দ। এই শব্দের পূর্বাহ্নে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে পৌঁছা মাত্র গ্রহাণুটি সৃষ্টি করবে প্রচণ্ড প্রজ্জ্বলন, মনে হবে সমস্ত আকাশ যেন আগুনে লাল কিংবা পোড়ানো তাম্রের মতো হয়ে গেছে। মানুষ দেখবে, যেন সমস্ত আকাশ পতিত হতে যাচ্ছে!

প্রশ্ন হতে পারে একটি কাওকাব বা গ্রহ সদৃশ বস্তুই যে পৃথিবীকে আঘাত করবে, তার কি যুক্তি দেয়া যায়? এর উত্তরে আমরা হয়তো ৮২:১,২,৩ ইত্যাদি আয়াতকে উদ্ধৃত করতে পারি যাদের প্রস্তাবে সরাসরি কাওকাব বিক্ষেপণের বিষয়টি সুস্পষ্ট। তার সাথে পাথরবর্ষী ঝঞ্ঝার প্রস্তাব (৬৭:১৭) মিলিয়ে পাঠ করলে আমাদের কাছে একটি সুস্পষ্ট গ্রহণযোগ্যতার সৃষ্টি হয়। কিন্তু তার চাইতে অধিকতর বলিষ্ঠ আর কোনো প্রস্তাব কোরআনে রয়েছে কি?

এর উত্তর, হ্যাঁ। একটি আগন্তুক গ্রহাণু/কাওকাব (জ্যোতিষ্ক/ধূমকেতু) কিংবা অনুরূপ কোনো মহাজাগতিক বস্তুপিণ্ড যে পৃথিবী ধ্বংসের সূচনা করবে তার সুস্পষ্ট প্রস্তাব রয়েছে কোরআনের পাতায়— *"শপথ আকাশের এবং সহসা আঘাতকারীর (৮৬:১)। তুমি কি জানো এই সহসা আঘাতকারী বস্তুটি কি? (৮৬:২) ইহা একটি প্রজ্জ্বলনমান জ্যোতিষ্ক" (৮৬:৩)।*

ব্যবহৃত শব্দ طرق এর অর্থ হলো turn time, once, blow, strike, beat, knock, hammer, fall upon at surprise. এই শব্দটির একটি রূপ طارقة এর অর্থ হলো calamity, disaster। طارق শব্দের অর্থ হলো রাতে যে আগমন করে। কিন্তু طارق শব্দটি দ্বারা طرق ক্রিয়ার সম্পাদককেও বুঝায়; অর্থাৎ طارق এর আরো একটি

www.pathagar.com

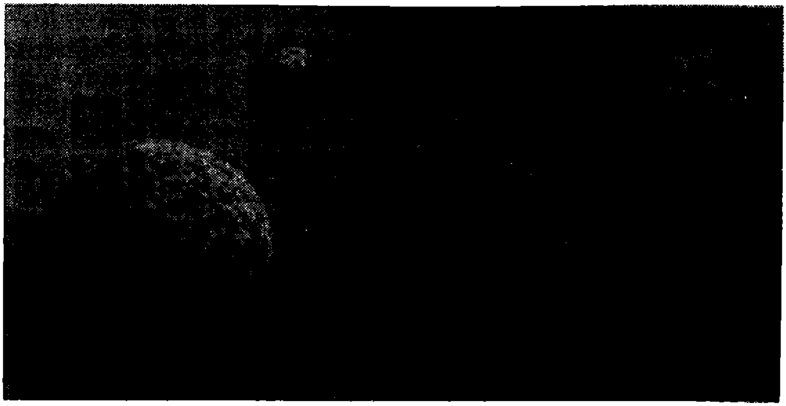

কিয়ামতের হাতিয়ার! গ্রহানুদের প্রতিনিধিত্বকারী বড় কয়েকটি 'কাওকাব'। হতে পারে এদের কোনটি কোরআনের বর্ণিত 'তারিক'-দের কেউ।

ব্যবহার থাকতে পারে যা হলো সহসা আঘাতকারী, পতন সংঘটনকারী ইত্যাদি। সবগুলি শব্দের অর্থের মূল্যায়ন করলে আমরা অনুভব করতে পারি যে, طارق শব্দ দ্বারা রাতের এমন আগন্তুকের সংবাদ দেয়া হয়েছে যার সাথে সংশ্লিষ্ট হয়েছে একটি পতন ও আঘাত হানার বিষয় এবং এই আঘাত হানার সময় জ্যোতিষ্কটি প্রকাশিত হবে অতিশয় উজ্জ্বলতার ভেতর দিয়ে। এর সাথে সংশ্লিষ্ট থাকবে একটি বিস্ফোরণ (blow) আর তার সাথে বিসংশ্লিষ্ট থাকবে একটি ধ্বংসাত্মক (calamity) প্রক্রিয়া। পরিবেশ দৃষ্টে বলা যায় যে, একটি গ্রহাণু বা কাওকাব কিংবা উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক (নাজমুস সাকিবুন) এর আগমনই একটি মহাধ্বংসের সূত্রপাত করবে।

এই ধ্বংসের আরো যে চিত্র-চরিত্র আমরা পাই তার অন্যতম আর একটি হলো ৭৫:৯ আয়াতের প্রস্তাব। এখানে বলা হয়েছে যে— ধ্বংসের মুহূর্তে চন্দ্র-সূর্যকে একত্রিত করা হবে। প্রকৃতপক্ষে এই একত্রীকরণ মূলতঃ একটি gathering এর চিত্র মাত্র! চন্দ্র-সূর্যকে একত্রিত করার বিপরীত প্রস্তাব হিসাবে কোরআনের ৩৬:৪০ আয়াত প্রণিধানযোগ্য। এই আয়াতে বলা হয়েছে—

www.pathagar.com

“সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চন্দ্রের নাগাল পাওয়া, প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষপথে সঞ্চালনমান”। সূর্য ও চন্দ্র যেখানে পরস্পরকে সান্নিধ্যে পেতে পারে না, সেখানে তাদের একত্রীকরণের প্রস্তাবটি গ্রহণযোগ্যতা হারায়। আমরা ধরে নিতে পারি যে, এই একত্রীকরণ অন্তত সান্নিধ্য বা নৈকট্যের কথা বলতে পারে না। তাহলে বিষয়টি কি? এর সম্ভাব্য উত্তর হতে পারে যে, আমাদের পূর্বাহ্নে আলোচিত সেই পৃথিবী চন্দ্র সূর্যের ‘শক্তি–লাইন’ এর আভাস

সৌরজগতের প্রেক্ষাপটে তৈরী হয়েছে ‘ত্রয়ী–বিন্দু অভিকর্ষ–শক্তি লাইন’। কেন্দ্রভাগে সূর্য, মাঝখানে চন্দ্র ও প্রান্তে পৃথিবী— এই লাইন তৈরী হলেই সূর্যগ্রহণ সংঘটিত হয়। এ সময়ে ঘটে যেতে পারে কোনো মহাঘটনা। এ সময়ে নবীজী (সঃ) আল্লাহর রাব্বুল আলামীনের কাছে সেজদাবনত হতেন আর সৃষ্টিকুলের জন্য পানাহ্ চাইতেন। সময়টি প্রকৃতপক্ষেই এক সংকটকাল।

হয়তো এই ৭৫:৯ আয়াতে প্রস্তাবিত হয়ে থাকতে পারে। হতে পারে এই আয়াত দ্বারা এই ত্রয়ী বস্তুর একটি শক্তি লাইনের gathering কে বোঝানো হয়েছে। আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি এ জন্য যে মহাজাগতিক নিয়মকানুন ৭৫:৯ আয়াতের জন্য এর চাইতে বেশি গ্রহণযোগ্য কোনো ক্ষেত্র দিতে পারে না। অতএব, আমরা ধরে নিতে পারি যে ৭৫:৯ আয়াতের প্রস্তাবটি উল্লিখিত ত্রয়ী–বস্তুর–শক্তি লাইনের সমানুপাতিক। মহাজাগতিক নিয়মনীতি ৭৫:৯ আয়াতের প্রস্তাবকে আমাদের এই ব্যাখ্যায় অনুমোদন করে।

www.pathagar.com

৭৫:৯ আয়াতটি শুধুমাত্র চন্দ্র ও সূর্যকে একত্রীকরণের প্রস্তাব করে থাকলেও এই একত্রীকরণটি পৃথিবীর ধ্বংসের সাথে সংশ্লিষ্ট বলে আমরা এখানে পৃথিবীর বিবেচনা না এনে পারি না। অর্থাৎ পৃথিবী ধ্বংসের সময় যখন চন্দ্র ও সূর্যকে একত্রিত করা হবে— তার সাথে বিবেচ্য হবে পৃথিবীও। চন্দ্র ও সূর্যের Gathering এর কথা বিবেচনা করা যায় না এই জন্য যে চন্দ্র ও সূর্য দু'টি সুনির্দিষ্ট বিন্দু বিধায় সকল সময়ই তারা একটি সরলরেখায় অবস্থান করতে পারে। Gathering এর প্রশ্নটি কেবলমাত্র তৃতীয় বিন্দুর বিবেচনাতেই আসতে পারে। আমরা ধরে নিতে পারি যে, পৃথিবীর ধ্বংসের সময় চন্দ্র ও সূর্যকে 'একত্রীকরণ' বা Gatheringটি কেবলমাত্র পৃথিবীকে নিয়েই বিবেচ্য। অর্থাৎ মহাধ্বংস সময়ে পৃথিবী, চন্দ্র ও সূর্য যে একটি শক্তি লাইনে একত্রিত হবে, তা-ই ৭৫:৯ আয়াতের প্রতিপাদ্য একত্রিত হবার বিষয়।

আমরা ৮৬:১, ২ ও ৩ আয়াতের রেশ টেনে বলতে পারি যে রাতের আগন্তুক একটি কাওকাব অর্থাৎ একটি গ্রহাণু যা প্রজ্জ্বলিত শিখা সৃষ্টি করে পৃথিবীতে আঘাত হানবে। এর সাথে ৭৫:৯ আয়াতটি যুক্ত করলে অবস্থাটি দাঁড়ায় যে, এই সময় একটি সূর্যগ্রহণের (কিংবা চন্দ্রগ্রহণও) ঘটনা ঘটতে পারে। এদের প্রভাবের ফলে আঘাতকারী 'কাওকাব' স্থির লক্ষ্যে অব্যর্থ আঘাত হানতে পারবে, এই আঘাতের পূর্বেই অভিকর্ষ প্রভাবের কারণে আগন্তুক গ্রহাণু/জ্যোতিষ্কটি ভেঙ্গে গিয়ে কিছু বাড়তি পাথরের বহর তৈরী করতে পারে, সেই পাথরগুলি ঝঞ্ঝার আকারে পৃথিবীতে পতিত হবে যত্রতত্র (৮২:১,২,৩,) ও (৬৭:১৭)। আঘাতটি সমাপ্ত হবে এক মহা প্রলয়ঙ্করী শব্দ নিনাদে (৭৯:১৩)। প্রকাশিত হবে পারমাণবিক ধূলির ছাতা যা চন্দ্র, সূর্য ও নক্ষত্রদের আলোকে নিষ্প্রভ করে ফেলবে দৃষ্টির কাছে (৭৩:১৪)। পৃথিবী বিদীর্ণ হবে ও আঘাতের কারণে পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ গলিত পদার্থ উৎক্ষিপ্ত হবে প্রচণ্ড শক্তিতে (৮৪:৪) এবং এই

www.pathagar.com

সমস্ত ঘটনাই ঘটবে ভূ-পৃষ্ঠে মানুষ বর্তমান থাকা অবস্থায় (৯৯:৩; ১০১:৪; ৭৮:৪০) বলা বাহুল্য যে কোনো জ্যোতিষ্ক বা গ্রহাণু বা ধূমকেতুর আঘাতে তাৎক্ষণিকভাবেই সমস্ত মানুষ জাতি লয়প্রাপ্ত হবে না। এই বিলয় ঘটবে একটি নাতিদীর্ঘ সময়ের পরিসরে যেভাবে অনুরূপ আঘাতের পরও ডাইনোসোরাসরা বেঁচে ছিল বেশ কিছুদিন (তুষার-মৃত্যু পর্যন্ত)। শেষপর্যন্ত এই ধ্বংসযজ্ঞ সৃষ্টিকারী গ্রহাণুটি হবে অজ্ঞাত, অজানা (৭৯:৪৪; ৬৭:২৬)। এটি সহসাই পৃথিবীর দুর্ভাগ্যাকাশে উদিত হবে সৃষ্টির মহাপরিকল্পনা অনুযায়ী। আর এই তথ্যটিও কোরআনের পাতায় রয়েছে (৪৩:৬৬) আয়াতে।

শুরুতেই আমরা যে নক্ষত্র খসে পড়ার প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলেছিলাম, তা মূলতঃ কাওকাব বা গ্রহ সদৃশ বস্তু— অর্থাৎ গ্রহাণু। কোরআন পৃথিবীর উপর গ্রহাণুদের পতনের ইঙ্গিত দিচ্ছে কেবল, কোনো নক্ষত্র নয়; যাদেরকে সুস্পষ্টভাবে كو كب শব্দেই পেশ করা হয়েছে যার অর্থ গ্রহ বা গ্রহ জাতীয় বস্তুই।

বার

আমার একজন প্রিয় সহকর্মী মেজর মোহাম্মদ জাকারিয়া কামাল জি 'মানুষ ও মহাবিশ্বের সৃষ্টি রহস্য' পুস্তকে মহাধ্বংস বা কিয়ামতের উপর একটি আলোচনা করেছেন। পুস্তকটিতে একটি প্রশংসনীয় অধ্যবসায়ের ছাপ রয়েছে। সেনাবাহিনীর বিরামহীন কর্মব্যস্ততা এবং 'যথেষ্ট অনুকূলে নয়' এমন একটি পরিবেশ হতে তার এই কাজটি লেখকের নিরলস পরিশ্রম ও নিবেদক মনেরই পরিচায়ক। আমি আমার প্রিয় অনুজসম অফিসারকে নিরন্তর উৎসাহ প্রদান করছি ও তার জন্য দয়াময়ের করুণাসিক্ত অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি যেন মেজর জাকারিয়া কামালের পরবর্তী আরো মূল্যবান সংযোজন দ্বারা জগৎবাসী উপকৃত হতে পারেন।

www.pathagar.com

যে কোনো গবেষণা কাজের কোনো না কোনো সীমাবদ্ধতা থাকতে পারে। আমি মেজর জাকারিয়া কামালকে সমালোচনা করতে নয়, একটি সংশোধন না হলে বড় রকমের ভ্রান্তি সত্যের পথে গতি রোধ করবে বলেই এখানে একটি প্রসঙ্গের বিষয়ে খোলামেলা আলোচনায় নিয়ে আসতে চাই।

তার পুস্তকের এই বিষয়টি নিয়ে আমি তার সাথে পূর্বেই আলোচনা করেছিলাম। বিষয়টি ছিল 'কিয়ামত' বা মহাধ্বংস। ইসলামিক ফাউণ্ডেশন কর্তৃক বইটি প্রকাশিত হবার আগেই আমি তাকে বিষয়টি সংশোধন করতে অনুরোধ করেছিলাম যা তিনি করতে সক্ষম হননি। এই সংশোধনের প্রয়োজনীয়তাটি কিছু ধর্মীয় মূল্যবোধ রক্ষার বিপত্তির সাথে বিজড়িত হয়ে যায়। কোরআন সম্পর্কে সচেতনতার দায়িত্ব আমাকে এ প্রবন্ধে এর সংশোধন দেবার নির্দেশ দিচ্ছে। আমি দয়াময়ের করুণা ভিক্ষা করি যেন কোনো ভুল ব্যাখ্যায় নিজেকে জড়িত না করি এবং আত্মশ্লাঘায় রাব্বুল আলামীনের বিরাগভাজন না হই। প্রকৃতপক্ষে কোরআনের ব্যাখ্যায় আমরা সকলেই জ্ঞানের ক্ষেত্রে অতিশয় দীন ও হীন এবং কোনো কারণেই আমরা কেউ কারো অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর নই। এই দৃষ্টিকোণ হতে মেজর জাকারিয়া কামাল জি এবং আমার অবস্থান এক ও অভিন্ন। আমি শুধু আমার সহকর্মীর পরিপূরক হিসাবে নিম্নের আলোচনা পেশ করতে চাইছি।

মেজর জাকারিয়া কামাল জি তার পুস্তকে এক 'একত্রিত ভূ–পিণ্ড' নামক মহাজাগতিক পরিস্থিতির অবতারণা করেছেন যা তার পুস্তকের ভাষ্য অনুযায়ী Big Crunch এর প্রতিশব্দ মাত্র। তিনি প্রস্তাব করেছেন এই 'একত্রিত ভূ–পিণ্ড' প্রকাশের মধ্য দিয়ে কিয়ামত ঘটবে। তার পুস্তকের ৫১ পৃষ্ঠায় চিত্র–১২ দ্বারা নতুন মহাবিশ্ব বা Big Bang-2 এর মধ্য দিয়ে এই একত্রিত ভূ–পিণ্ডের স্বরূপ সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়।

www.pathagar.com

Big Bang-2 কে বিজ্ঞানীগণ Big Crunch এর ফলরূপ প্রকাশ মনে করেন। বিজ্ঞানের উন্নতির এতটা সময়ে আমরা সন্তুষ্টচিত্তে বলতে পারি যে একটি Big Bang বা মহাবিস্ফোরণের ভেতর দিয়ে এই মহাবিশ্বের সৃষ্টি হয়। পদার্থ, তাদের গতি–প্রকৃতি ও সম্ভাব্য সকল বস্তুধর্মকে এক করে দৃষ্টিপাত করলে একটি আদি একক হতে এই মহাবিশ্ব জন্মেছিল— এই সত্যটি বেরিয়ে আসে। সে একক সত্তা হতে মহাবিশ্বের ইতিহাসে কথিত একটি মহাবিস্ফোরণের ফলস্বরূপ এক মহাসম্প্রসারণ শুরু হয়ে যায়। মহাবিশ্বের এই সম্প্রসারণ চরিত্র বিজ্ঞানীদেরকে মহাবিশ্বের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে দুটি সিদ্ধান্তে পৌঁছতে সাহায্য করছে। তার একটি Open Universe যার কেন্দ্রীয় প্রস্তাব হলো— চিরদিন সম্প্রসারণমান এই মহাবিশ্ব গতির দুঃশাসনে উড়ে যেতে যেতে একদা এর বিভিন্ন অংশ অসীম অজানায় (Void) হারিয়ে যাবে। এ অবস্থাটি তখন হবে যখন অভিকর্ষ বলের নিয়ন্ত্রণ 'ক্রিটিক্যাল ভ্যালুর' নীচে হবে। দ্বিতীয়টি হলো যে, অভিকর্ষ বল যদি 'ক্রিটিক্যাল ভ্যালুর' উপরে হয়, তাহলে এই সম্প্রসারণ একদিন নিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়বে। গ্যালাক্সি ও মহাবিশ্বের দৃশ্যমান, অদৃশ্য সকল অংশ আজকের চলার গতিমুখ পরিবর্তন করে বাহিরের দিকের পরিবর্তে কেন্দ্রের দিকে ধাবিত হতে থাকবে। পদার্থ বিস্তার নিজেরাই মহাবিশ্বের একটি প্রাকৃতিক কেন্দ্র খুঁজে নিয়ে এতে পতিত হতে থাকবে। এ হবে এক মহাপতন–পাত। তীব্রগতিতে সমগ্র মহাবিশ্বের পদার্থ–দল একটি একক প্রাকৃতিক বিন্দুতে পতিত হবার কারণে এক মহা কালো–বিবরের জন্ম নেবে। এই কালো–বিবরের চরিত্র হবে অতিশয় ভিন্নতর। সে পরিণামে নিজের উপর নিজে চুপসে পড়তে থাকবে। পদার্থবিদ্যার সকল নিয়মকানুন লঙ্ঘিত হবে সেই মহাকালো–বিবরের অঞ্চলে। নিজের ভর ও অভিকর্ষে নিজে সংকুচিত হতে হতে একসময় পরিণত হবে অতিক্ষুদ্র বিন্দুতে; এর নাম Big Crunch. একটি Big Crunch এর পিঠে অবশ্যম্ভাবী ফলাফল হিসাবে জন্ম নেবে একটি Big Bang— দ্বিতীয় মহাবিস্ফোরণ বা দ্বিতীয় মহাবিশ্ব (আমাদের মহাবিশ্বকে প্রথম বিবেচনা করে)। এই Big Crunch এর মহাকালো–বিবরীয় অঞ্চলকে মেজর জাকারিয়া কামাল 'একত্রিত

www.pathagar.com

ভূ-পিণ্ড' হিসাবে নাম দিয়েছেন এবং সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে এই একত্রিত ভূ-পিণ্ডে সংঘটিত হবে হাসরের মাঠ। বিষয়টির কোনো বিজ্ঞানযোগ্যতা নেই এবং মেজর জাকারিয়া কামাল কেন এমন একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন— তাও বোধগম্য হবার মতো নয়। তার একত্রিত ভূ-পিণ্ডে যদি হাসরের মাঠ হতে হয়, তবে স্রস্টাকে এই কাজ করবার জন্য কমপক্ষে 10^{30}yrs বা একশত কোটি কোটি কোটি কোটি বৎসর পর্যন্ত অপেক্ষা করে বসে থাকতে হবে (যেহেতু Big Crunch 10^{30} বৎসরের পূর্বে ঘটার সম্ভাবনা নেই। কারো কারো মতে মহাবিশ্বে সংকোচন সময় ৩০ মহাপদ্ম বৎসরের পূর্বে নয়)। প্রস্তাবটি মেজর জাকারিয়া কামালের লেখায় যেভাবে এসেছে— "উপরোল্লিখিত আয়াত (৮১:২ এবং ৮২:২) থেকে বোঝা যাচ্ছে কিয়ামতের দিন মহাবিশ্বের সমস্ত গ্রহ, নক্ষত্র, মুক্ত গ্যাস ও ধূলিকণা একত্রিত হয়ে যাবে এবং মিলিত হয়ে একটি একত্রিত ভূ-পিণ্ড তৈরী করবে। কিয়ামতের দিনের এই একত্রিত ভূ-পিণ্ডকেই হাদিসে সাত স্তর যমীন বলা হয়েছে। কারণ সাত স্তর আসমান যমীনের সমস্ত যমীন (সমস্ত গ্রহ, নক্ষত্র, মুক্ত গ্যাস, ধূলিকণা) মিলিত হয়ে সেটি গঠিত হবে। অতএব মিলিত অবস্থায় তাকে সাত স্তর যমীন বলাই যুক্তসঙ্গত। এটিই কিয়ামতের দিন। একত্রিত ভূ-পিণ্ডের উপর সমস্ত প্রাণী পুনরুজ্জীবিত হবে। একত্রিত ভূ-পিণ্ডের উপর যে স্থানটুকুতে তাদেরকে শেষ বিচারের জন্য একত্রিত করা হবে— সে স্থানটুকুই হাসরের মাঠ।"

আমার কেন যেন মনে হয়— লেখক তার বক্তব্য রচনা করার জন্য নিজেকে মাত্রাতিরিক্ত স্বাধীনতা দান করেছেন যা বিপত্তিকর। আমি বা কেউ যা খুশি তা-ই লিখতে পারি না। আমি লেখককে তার পুনঃমুদ্রণের পূর্বে অন্তত এই স্থানটিকে সংশোধন করে দেবার জন্য বলেছিলাম। তার প্রস্তাবে যে অলঙ্ঘনীয় বিপত্তির জন্ম নিয়েছে, তা হলো ঃ

ক। কিয়ামতের দিবস সম্পর্কে সময়ের একটি স্থির মাপ পাওয়া গেল যা 10^{30} বৎসরের স্কেলের এক দীর্ঘকাল পার হবার পর।

www.pathagar.com

খ। Big Crunch পর্যন্ত এই পৃথিবীর মানুষ ও অন্যান্য জীবরা ধ্বংস হবার নয়— কারণ কিয়ামত দিবসটি মানুষের সাক্ষাৎ উপস্থিতিতে ঘটবে।

গ। হাসরের মাঠ হবে খুবই স্বল্পকালীন সময়ের; সেখান হতে সকলকেই আগুনে যেতে হবে; কেহ বেহেস্তে ঢুকতে সক্ষম হবে না। এই হাসরের মাঠে কেহই সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াতে পারবে না, পুনর্জীবনের প্রশ্ন অবান্তর এবং স্রষ্টার সিংহাসনটিও এই একত্রিত ভূপিণ্ড হজম করে ফেলতে পারে ইত্যাদি।

কিয়ামত কখন হবে এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআন একটি সময়ের মান দিয়েছে— *"উহারা প্রশ্ন করে তোমাকে কিয়ামত সম্পর্কে উহা কখন ঘটিবে? (৭৯:৪২)। ইহার চরম জ্ঞান শুধু তোমার প্রতিপালকের নিকট (৭৯:৪৪) উহারা বলে এই প্রতিশ্রুতি কখন বাস্তবায়িত হইবে? (৬৭:২৫) বলো ইহার জ্ঞান কেবল আল্লাহর নিকট বিদ্যমান— আমি তো সতর্ককারী মাত্র (৬৭:২৬)। বলো আমি জানি না, তোমাদিগের যে শাস্তির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে তাহা কি আসন্ন না আমার প্রতিপালক ইহার জন্য কোনো দীর্ঘ মেয়াদ স্থির করিয়াছেন" (৭২:২৫)।* অন্য কিছু কিছু আয়াতে কিয়ামতের আসন্নতার কথা বলা হয়েছে, যেমন *"কিয়ামত আসন্ন— চন্দ্র বিদীর্ণ হইয়াছে" (৫৪:১)।* আমরা দেখতে পাচ্ছি, আল্লাহপাক যেখানে কিয়ামতের সময় সম্পর্কে তাঁর সর্বোৎকৃষ্ট প্রেরিত পুরুষ মুহাম্মদ (সাঃ) কেও একটি নিশ্চিত ধারণা দেন নি, সেখানে মেজর জাকারিয়া কামাল এই ঘটনার উপর সময়ের একটি মাপ ও বাধ্যবাধকতা পরিয়ে দিয়ে ভুল করেছেন। অন্যদিকে কোরআন যেখানে কিয়ামতকে আসন্ন বলে সনাক্ত করেছে, সেখানে মেজর জাকারিয়া কামাল একে সব চাইতে বেশি দূরবর্তী ঘটনা বলে প্রস্তাব করেছেন। প্রথম ক্ষেত্রে তার প্রস্তাবটি কোরআনের প্রস্তাবের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তা বিরোধিতাও বটে। ফলতঃ এই ধরনের প্রস্তাব

www.pathagar.com

'শিরিকের' দোষে দুষ্ট হয়ে যায়। অন্যদিকে Big Crunch এ কিয়ামত হলে এই পৃথিবীতে দূরের কথা, সমগ্র মহাবিশ্বে কোথাও কোনো জীবনের স্পন্দন থাকবে না। তাত্ত্বিকভাবে এই পৃথিবীতে মাত্র এক হতে দেড় কোটি বছর পর আর কোনো জীবন থাকতে পারবে না, পৃথিবীকে সৃষ্টির স্বাভাবিক নিয়মে একটি 'জীবাশ্মে' পরিণত হতে হবে। সেখানে Big Crunch কোনো প্রসঙ্গেরই যোগ্যতা পায় না। অথচ কোরআন দাবি করে যে, কিয়ামতের দিন পৃথিবীতে মানুষ থাকবে এবং তারা একটি মহাধ্বংসের চরিত্র প্রত্যক্ষ করার সুযোগ লাভ করবে— *"যখন আকাশ বিদীর্ণ হইবে (৮২:১) যখন কাওকিব বিক্ষিপ্তভাবে যত্রতত্র পতিত হইবে, যখন সমুদ্র উদ্বেলিত হইবে (৮২:২–৩) এবং মানুষ বলিবে— ইহার (পৃথিবীর) কি হইল? (৯৯:৩); সেই দিন মানুষ বিক্ষিপ্ত হইবে পতঙ্গের ন্যায় (১০১:৪) সেই দিন মানুষ বলিবে— হায় আজ পালাইবার স্থান কোথায়?"* (৭৫:১০) কোরআনের বর্ণনা স্বাভাবিকভাবে চলমান পৃথিবীর উপর সহসাই দুর্যোগময় কিয়ামত নেমে আসার তথ্য দেয়। Big Crunch এ মেজর জাকারিয়া কামাল জি যে হাসরের মাঠের বর্ণনা দেন, তার পূর্বাহ্নে হয়ে যাওয়া কিয়ামতটি হলো একটি যুগপৎ ঘটনা; একটির অব্যহতির পরপরই অন্যটি। ফলতঃ Big Crunch এর পরিবেশে যদি কিয়ামত সংঘটিত হয় তবে সেই কিয়ামতের ক্ষণে মানুষ কিংবা খোদ পৃথিবী তো দূরের কথা, তাবৎ ছায়াপথটিরও অস্তিত্ব থাকার কথা নয়। যে পরিবেশে মানুষ বা পৃথিবী বর্তমান নয় সে পরিবেশে কিয়ামতের কথা আল্লাহপাক কখনই বলেন না। মেজর জাকারিয়া কামাল এ তথ্যটুকু কেবল নিজেই উদ্ভাবন করে থাকবেন। তার প্রস্তাব আল্লাহর প্রস্তাবের বিপরীতে চলে যায়। একইভাবে একত্রিত ভূ–পিণ্ড যাকে তিনি Big Crunch এর প্রতিশব্দ মনে করেন, সেখানে যে হাসরের মাঠ হবে, তার অভিকর্ষ বল এত হবে যে, সেখানে পদার্থ তো দূরের কথা, কোনো আলোকের রশ্মিও মুক্ত হয়ে অবস্থান করতে সক্ষম হবে না। স্রষ্টার জন্য যদি সিংহাসন পেতে দেয়া যায়— এটিকেও এই একত্রিত ভূ–পিণ্ড গ্রাস করে ফেলবে।

www.pathagar.com

তারপরও যদি সেখানে হাসরের মাঠ হয়েই যায়— তবে এর স্থায়িত্ব হবে অতিক্ষুদ্র সময়ের— মুহূর্তের কোটি কোটি ভাগের একভাগ, আর এমন স্থানে যদি বিচার করে স্রষ্টা কাউকে স্বর্গেও যেতে দেন, তার পক্ষে কেবলমাত্র নরকে যাওয়াই সম্ভব হবে— কারণ Big Crunch এর পরিবেশে যুগপৎ ক্রিয়ার দ্বিতীয় মহা বিস্ফোরণে দ্বিতীয় মহাবিশ্বের জন্ম হবে— আর এই জন্মের পর লক্ষ লক্ষ বৎসর কেবল আগুনের লেলিহান শিখা ছাড়া মহাবিশ্বে অন্য কোনো পরিবেশ বিরাজ করতে পারবে না এবং তার পরেরটি হবে চরম শাস্তিদায়ক। শীতল, জমাটবাঁধা ঠাণ্ডা ও চরম শৈত্যের পরিবেশ যেখানে কোনো পদার্থই তার স্বাভাবিক অস্তিত্বে থাকতে পারে না। স্রষ্টাকে অবশ্যই কোনো গরীব রাষ্ট্রের সরকার প্রধানের মতো প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে হবে। কারণ, তিনি যদি তাঁর ভাল বান্দাগণের জন্য নতুন করে স্বর্গ গড়ে দিতে চান, তবে সে Big Crunch উত্তর নব মহাবিশ্বের Stelar era শুরু না হওয়া পর্যন্ত এ কাজটিই তিনি হাতে নিতে পারবেন না। ফলতঃ ঐ সব সৎ বান্দাগণের অদৃষ্টে কেবল এদেশের জনগণের মতোই অপেক্ষা আর অপেক্ষা ছাড়া কিছুই থাকবে না। আর এ অপেক্ষাটি হলো প্রায় ১৫+১৫ = ৩০ মহাপদ্ম বৎসর। সঙ্গত কারণেই স্রষ্টাকে একজন অতিব্যর্থ স্রষ্টাই বলতে হবে সে কারণে!

আমরা দেখছি— মেজর জাকারিয়া কামালের এই 'একত্রিত ভূপিণ্ড' ধারণাটির কোনো বৈজ্ঞানিক ও ধর্মীয় ভিত্তি নেই। শত হাজার লক্ষ কোটি বৎসর পর স্রষ্টা কিয়ামত দিয়ে কোনই লাভবান হবেন না যার স্থায়িত্ব হবে সেকেণ্ডের কোটি কোটি ভাগের এক ভাগ— এবং সৃষ্টির এমন একটি স্কেলকে অনন্ত বলে মনে করলে স্রষ্টারও কিছু করার থাকবে না। কারণ 10^{30} বৎসরের স্কেলটি (কিংবা ৩০ মহাপদ্ম বৎসর) একটি অস্বাভাবিকভাবে বড় সময়ের পরিমাপ যার বিষয়ে পৃথিবীর তথা এই মহাবিশ্বের নিজেরও কোনো জ্ঞান নেই। আমি বিনীতভাবে বলতে চাই যে মেজর জাকারিয়া কামালের

www.pathagar.com

এই একত্রিত ভূপিণ্ডে হাসর/কিয়ামত ধারণাটি মীমাংসিত কারণে বাতিলযোগ্য এবং ইসলামিক ফাউণ্ডেশন যেন এই গুরুতর খোদা বিরোধিতামূলক প্রস্তাবের সংশোধনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়।

একই সাথে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত Scientific Indicalions in the Holy Quran গ্রন্থে ৮১:১–৩; ৫৬:৪,৫,৬; ৭৭:৮; ৮১:৬ ও ৮২:২–৩ ইত্যাদি আয়াতের যে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে, তাতেও উপরে বর্ণিত সীমাবদ্ধতার অনুরূপ ত্রুটি প্রত্যক্ষ করা যায়। এই পুস্তকেও কিয়ামতের সময়টির প্রশ্নে আল্লাহপাকের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করা হয়েছে যা একেবারে অনাকাঙ্ক্ষিত। ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের এই পুস্তকে স্রষ্টার উপর সাত মহাপদ্ম বৎসরের একটি বাধ্যবাধকতা চাপিয়ে দিয়েছে— অর্থাৎ আল্লাহকে কিয়ামত সংঘটিত করার জন্য সাত মহাপদ্ম (বিলিয়ন) বৎসর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। মেজর জাকারিয়া কামাল জি ও ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের শ্রদ্ধের গবেষকগণকে বিনীতভাবে অনুরোধ করব যে, তারা অসাবধানতাবশতঃ যে ভুল করেছেন, সেটাকে যেন যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি সংশোধন করেন। অন্যথায় যারা অবহিত নন ও বিষয়টির উপর সুস্পষ্ট জ্ঞান রাখেন না, সেই সত্যসন্ধানী পাঠকমন খোদা–বিরোধী শিক্ষায় বিভ্রান্ত হয়ে পড়বে যা আমরা গ্রহণ করতে পারি না।

তের

নক্ষত্রের জীবন–ইতিহাসের কথা পর্যালোচনা করলে সুপারনোভা শব্দটি চলে আসে। সুপারনোভা হলো মহাতারকা— সূর্যের চাইতে ১০–১০০ গুণ ভরসম্পন্ন হতে পারে। তারাদের ভর যত বেশি— তাদের আয়ুষ্কাল তত কম। আমরা জেনে থাকব— তারাদের জীবন ও শক্তি বলতে যা বোঝায়, তা হলো তার ভর আর সে কারণে আভ্যন্তরীণ হাইড্রোজেন হিলিয়ামের মজুদ। আমরা জানি, ভরের অনুপাতে অভিকর্ষ বল কার্যক্ষম হয়। একটি মহাতারকায় এই বলের

www.pathagar.com

পরিমাণ মহাবিস্তৃত বিধায় সমস্ত তারাটি এর কেন্দ্রের দিকে চুপসে পড়তে চায়। এর জন্য সংকোচন ও ফলস্বরূপ তাপের সৃষ্টি হয়। এই তাপ ও চাপের পরিস্থিতিতে নক্ষত্র কেন্দ্রে জন্ম নেয় পারমাণবিক চুল্লি। এই চুল্লি ক্রমশঃ হাইড্রোজেন পুড়ে হিলিয়াম তৈরী করতে থাকে এবং উদগত তাপশক্তি অভিকর্ষ টানের বিপরীতে নক্ষত্রের ভারসাম্য রক্ষা করে চলে। একসময়ে হাইড্রোজেনের মজুদ পুড়ে শেষ হয়ে যায়— ভারসাম্য হারিয়ে নক্ষত্রটিতে আবার ধ্বংসপতন শুরু হয়। এবার হিলিয়াম হাইড্রোজেনের স্থলাভিষিক্ত হয়। পূর্বের ন্যায় অভিকর্ষ-মহাসংকোচন হিলিয়াম কোরকে প্রজ্জ্বলিত করে। নক্ষত্রকেন্দ্রের থার্মোনিউক্লিয়ার চুল্লি চালু হলে নক্ষত্রে আবার ভারসাম্য ফিরে আসে। হিলিয়াম হতে এবার কার্বন ও অক্সিজেন তৈরী হয়। একসময় হিলিয়াম কোরটি শেষ হয়ে যায় (দ্রষ্টব্য অভিকর্ষ বল/ব্ল্যাক হেবল, মহাকাশ পর্ব-১)। এরপর নক্ষত্রের কোরে কার্বন ও অক্সিজেনের রি-একটর চালু হয়। এবার কার্বন ও অক্সিজেন হতে তৈরী হয় সিলিকন। এইভাবে একের পর এক নক্ষত্র সিঁথি বা কোর স্থলাভিষিক্ত হতে থাকে এবং সৃষ্টি হতে থাকে নতুন নতুন মৌল। এই সৃষ্টিধারার শেষ পর্যায়টি হলো— লৌহ। নক্ষত্রের কেন্দ্র যখন লৌহ মৌলে পরিপূর্ণ হয়ে যায় তখন নক্ষত্রটির সর্বশেষ বিপর্যয় কেবল সময়ের অপেক্ষা মাত্র! লৌহ কোরের ধর্ম হলো অন্যান্য মৌলদের মতো অভিকর্ষ চাপের মুখে আভ্যন্তরীণ তাপকে বের করে দেয়ার পরিবর্তে শোষণ করে নেয়া। আর লৌহ-মৌলের এই বিশেষ ধর্মটিই ডেকে আনে বিপর্যয়। লৌহসমৃদ্ধ কোরে পূর্বের ন্যায় অভিকর্ষ বলের চাপ অব্যাহত থাকে। অন্যান্য মৌলদের মতো ভারসাম্য তাপ এই লৌহ মৌলের সিঁথি হতে বের হয়ে আসে না। একদিকে অভিকর্ষের চাপ ক্রমাগতই বৃদ্ধি পায়, ফলে এটি নক্ষত্র কোরে চাপ সৃষ্টি করে, এই চাপে কোরের তাপমাত্রা ক্রমশই বৃদ্ধি পেতে থাকে। নিউক্লিয়ার রি-একটর চালু হয়ে যায়। এইবার যে পারমাণবিক চুল্লি তৈরী হয়— তার তাপমাত্রা পূর্বের অন্যান্য চুল্লিদের তাপমানের চাইতে

www.pathagar.com

অনেক অনেক বেশি। এই সময় এক বিস্তৃত সংখ্যক মৌল তৈরী হয়ে যায় অতি অল্প সময়ে। একসময় লৌহ-মৌলের চুল্লিতে প্রায় ৩৫০০ মিলিয়ন ডিগ্রী কেলভিন উত্তাপের সৃষ্টি হয়। এই উত্তাপ ডেকে আনে এক মহাবিস্ফোরণ! এই বিস্ফোরণ প্রকম্পিত করে লক্ষ-আলোক বৎসর ব্যাসসম্পন্ন এক একটি গ্যালাক্সিকে। দিনের পর দিন এই মহাউত্তাপের আভা স্থায়ী হয়। বিস্ফোরণ হয়ে গেলেও এই মহাউত্তপ্ত অবস্থা হতে বস্তুদের ঠাণ্ডা হতে সময় লাগে মাসের পর মাস। (এই কারণে অতীতের সুপারনোভা বিস্ফোরণের আভা প্রায় কয়েকমাস পর্যন্ত দেখা গেছে)।

এই বিস্ফোরণের শক্তি মহাতারকাদের দেহকে বাইরের দিকে নিক্ষেপ করে দেয় অতি সূক্ষ্ম ধূলির আকারে। প্রচণ্ড উত্তপ্ত এই পদার্থ বিস্তার বিস্তীর্ণ ধূলি মেঘের আকারে গড়ে ২০ মাইল/সেকেণ্ড গতিতে (রকেটের ৩ গুণ গতিতে) ছড়িয়ে পড়ে দিগ্বি. াক। বছরের পর বছর এই উত্তাপ আর গতি ধরে রেখে সুপারনোভা বিস্ফোরণের এই জঞ্জাল অতিক্রম করে যায় সহস্র সহস্র কোটি মাইল। তাদের এই চলার পথে কোনো কারণে আমাদের পৃথিবীর মতো কোনো জীবনময় সভ্যতা যদি পতিত হয়, তবে উত্তপ্ত ধূলিমেঘ সজোরে মাধ্যাকর্ষণ বলয়ে প্রবিষ্ট হবার সাথে সাথে সূর্য, চন্দ্র তারাদেরকে ঢেকে দেবে দৃষ্টি হতে। তখন মনে হবে যেন কোরআন এমনি কোনো পরিস্থিতির কথা বলেছে— *"যখন সূর্য নিষ্প্রভ ও জ্যোতিহীন হইয়া পড়িবে (৮১:১); যখন জ্যোতিষ্কসমূহ মলিন হইয়া পড়িবে (৮১:২); যখন আকাশের আবরণ উন্মোচিত করা হইবে (৮১:১১), যখন আকাশ বিদীর্ণ হইবে (৮৪:১) যখন নক্ষত্ররাজির আলোক নির্বাপিত হইবে" (৭৭:৮)।*

আকাশের আবরণ বলতে সুস্পষ্টতায় আমরা জানি যে, বায়ুমণ্ডলের প্রতিরোধী হাল্কা গ্যাস-বিস্তার যা তার পুরুত্ব দিয়ে সবেগে পতনশীল উল্কা/মিটিওরাইটদের পুড়িয়ে ভস্ম করে দেয়।

www.pathagar.com

এই গ্যাস–কম্বল বা protective blacnket of air-ই হলো পৃথিবীর জীবনের মূল রহস্য। সুপারনোভা গ্যাস–বিস্তার কোনো কারণে পৃথিবী বা অনুরূপ জীবনময় গ্রহের জগতে প্রবেশ করলে বিপুল গতি ও উত্তাপের কারণে একটি তীব্র ঝলকে পুঞ্জীভূত গ্যাসমালার একটি বিপুল মজুদ নিঃশেষ হয়ে যাবে। অবশিষ্ট থাকবে আগুনঝরা উত্তাপের সুপারনোভা ধূলিমেঘ। তারা তাপগত অবস্থার কারণে এবং বায়ুমণ্ডলীয় পদার্থের উপর মহাগতিতে প্রবিষ্ট হবার কারণে অনতিবিলম্বে পৃথিবী বা অনুরূপ জগতের আকাশকে ধূসর বা তামাটে বা লালচে রঙের করে দিতে পারে। ধূলি আর গ্যাসের ঘর্ষণে প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠবে সমস্ত আকাশ। আকাশময় দেখা যাবে শুধু আগুন আর আগুন। বহিরাগত মেঘ–ধূলিরা তাপগত অবস্থার কারণেই প্রদর্শিত হবে গলিত ধাতুর ন্যায়। দুর্ভাগ্যের উত্তরাধিকারীগণ এই অসহায় পরিণাম নিজেরাই দেখার সুযোগ পাবে। সত্য হয়ে যাবে কোরআনের বাণী— *"সেই দিন আকাশ হইবে গলিত ধাতুর ন্যায় (৭০:৮)। সেই দিন মানুষ বলিবে— হায়, আজ পালাইবার স্থান কোথায়?" (৭৫:১০)।*

অনুরূপ আরো একটি মহাজাগতিক ব্যবস্থার কথা এখানে বিবেচনা পায়। এটি হলো কোয়াসার। কোয়াসার হলো একটি সুবিশাল গ্যালাক্সির কেন্দ্রে অবস্থিত গ্যালাক্সির প্রায় শীর্ষভাগ বস্তুভরে গঠিত অতি সঙ্কুচিত মহাজাগতিক অস্তিত্ব যা অতিশয় উজ্জ্বল, প্রায় সূর্যের দশ ট্রিলিয়ন গুণ! একটি কোয়াসার লক্ষ–কোটি নক্ষত্র ভর নিয়ে গঠিত হয়। সুপারনোভার বিস্ফোরণের মতো কোয়াসারও বিস্ফোরিত হতে পারে। কোয়াসারের একটি বিস্ফোরণ তাবৎ গ্যালাক্সিকে ধ্বংস তাণ্ডবে আন্দোলিত করবে। এমন একটি বিস্ফোরণে সহস্র সহস্র সভ্যতা সময়ের ইতিহাস হতে মুছে যায়। কার্ল সেগানের ভাষায় Qusar explosions probably decimate the nuclei of galaxics. It seems likely that every time a quasar

www.pathagar.com

explodes, more than a million worlds are obliterated and countless forms of life, some of them are intelligent are utterly destroyed.

চৌদ্দ

আমরা কেউ জানি না ধ্বংসের কোন ফর্মুলাটি সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক আরোপিত হবে। এই পৃথিবী ধ্বংস করার জন্য স্রষ্টা হয়তো ধূমকেতু, গ্রহাণু কিংবা সুপারনোভা বিস্ফোরণের অস্ত্রগুলির সমষ্টি কিংবা এককভাবে যে কোনো একটি গ্রহণ করতে পারেন। অথবা হয়তো কোয়াসার বিস্ফোরণের মতো মহা ঘটনা ঘটতে পারে যা একসাথে মিলিয়ন মিলিয়ন জীবনময় সভ্যতাকে মহাবিশ্বের স্মৃতি থেকে মুছে ফেলতে পারে। অথবা স্রষ্টা এমন কিছু ব্যবহার করতে পারেন, যা এখনো আমাদের জ্ঞানাত্ত হয়নি।

অবশ্য এখানে একটি যুক্তির আশ্রয় নেয়া যায়। সৃষ্টিতে আমরা যা দেখতে পাই, তা হলো— স্রষ্টা তাঁর কাজগুলি সৃষ্টির প্রচলিত আইনকানুনেই ব্যক্ত করে থাকেন। তিনি 'সৃষ্টির' শাসন ব্যবস্থা পরিচালনার কাজে তাঁর সৃষ্টি নিয়মকানুনকে লঙ্ঘন করেন না। প্রকৃতপক্ষে স্রষ্টার চাইতে বেশি নিয়মানুবর্তিতা পালনকারী আর কেউ নেই। আমরা হয়তো আশা করতে পারি যে সম্ভবতঃ স্রষ্টার পরিকল্পনায় এই পৃথিবীর ধ্বংস প্রক্রিয়াটি তাঁর সৃষ্ট আইনকানুনের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হবে। আমাদের জিজ্ঞাসু মন প্রশ্ন তুলতে পারে— কোন প্রক্রিয়াটি স্রষ্টা গ্রহণ করতে পারেন?

এ বিষয়ে আমাদের কোনো সঠিক উত্তর জানা নেই। এর সর্বময় ক্ষমতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা শুধমাত্র স্রষ্টার নিজের জন্যই সংরক্ষিত। তবে আমরা এখানে যুক্তি ও

www.pathagar.com

বিবেচনায় কিছু নিকটবর্তী অনুমান বা সম্ভাব্যতার সীমানায় পৌঁছতে পারি যা দোষের নয়। মহাধ্বংস বা কিয়ামত 'সৃষ্টির' মতোই এক অনন্য ঘটনা যা অন্ততঃ স্রষ্টার নিজের কাছেই একটা মহাজাগতিক পট পরিবর্তন। সুতরাং আশা করা যায় যে মহাধ্বংসের ঘটনা অনন্যতায় মণ্ডিত। ফলতঃ অনুমান করা যায় যে স্রষ্টা এই ঘটনার জন্য তাঁর সর্বময় ও অনন্যতার বিবেচনাই খাটাবেন। সম্ভবতঃ তিনি ধ্বংসের সবগুলি প্রক্রিয়াকে একসাথেই নিয়োগ করতে পারেন (আমি আমার নিজস্ব মতামত দিয়ে কোনো শিরক করার অপরাধ হতে রাব্বুল আলামীনের নিকট পানাহ্ চাই)। যদি তাঁর বিবেচনায় বিষয়টি এভাবেই স্থান পেয়ে যায়— তবে মহাধ্বংসের প্রেক্ষাপটে সামগ্রিক চিত্রটি দাঁড়াবে নিম্নরূপ ঃ

ক। একটি কাওকাব সদৃশ বস্তু অর্থাৎ একটি গ্রহাণু (কিংবা বড় ধূমকেতু) পৃথিবীকে সহসা আঘাত করে পৃথিবী ধ্বংসের সূচনা করতে পারে।

খ। এই আঘাতের কাজটি নিশ্চিত করার জন্য হয়তো একটি সূর্যগ্রহণ (চন্দ্রগ্রহণও হতে পারে) ঐ সময় ঘটে থাকতে পারে।

গ। একই সময়ে পৃথিবীর আকাশ লক্ষ-কোটি মাইল দূরে হয়তো বহু অতীতে বিস্ফোরিত সুপারনোভার জঞ্জাল দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে পড়তে পারে।

ঘ। একই সময়ে মাতৃ-গ্যালাক্সি কেন্দ্রে কোয়াসার বিস্ফোরণও ঘটতে পারে যা আমাদের পৃথিবীর অনুরূপ সভ্যতাকে নিশ্চিহ্ন করে দেবার কাজ সম্পন্ন করতে পারে।

আমরা এই সামগ্রিক পরিস্থিতিটির বিবেচনা করতে চাইছি কতগুলি জরুরী কারণে। মহাধ্বংসের যে চিত্র কোরআন প্রদান করে,

www.pathagar.com

তা পৃথকভাবে আয়াতগুলিকে বিশ্লেষণ করলে এক একটি খণ্ডিত চিত্র প্রকাশ পায়; আবার সামগ্রিকভাবে চিন্তা করলে এক একটি আয়াত বা খণ্ডিত চিত্র পরস্পরের পরিপূরক হয়ে কিংবা সামগ্রিকভাবে একটি মূলচিত্রের বিভিন্ন অংশ হয়ে আমাদের সামনে হাজির হয়। ফলতঃ দেখতে পাই যে, প্রত্যেকটি আয়াত যেন একটি একক প্রস্তাব চিত্রের এক একটি অপরিহার্য উপাদান মাত্র।

মহাধ্বংসের প্রস্তাবের সাথে সংশ্লিষ্ট আয়াতগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে 'কাওকিব' এর বিক্ষেপণ (৮২:২), পৃথিবীর প্রকম্পন (৯৯:১), সহসা আঘাতকারী জ্যোতিষ্কের আবির্ভাব (৮৬:১; ৮৩:৩), একটি মহা আওয়াজ (৭৯:১৩), সমুদ্রের উদ্বেলিত হবার তথ্য (৮১:৬/৮২:৩), আঘাতজনিত কারণে পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ গলিত লাভাদির উৎক্ষেপণের তথ্য (৮৪:৪) চন্দ্র ও সূর্য একটি শক্তিলাইনে (পৃথিবীর সাথে) একত্রিত (gathering) হবার তথ্য (৭৫:৯) আকাশ বিদীর্ণ হবার তথ্য (৮৪:১, ৮২:১), সূর্য নিষ্প্রভ ও জ্যোতিহীন হয়ে পড়ার তথ্য (৮১:২), আকাশ গলিত ধাতুর ন্যায় দেখা যাওয়ার তথ্য ইত্যাদি একটি সমগ্রিক চিত্র দান করে যা আপাতদৃশ্যে স্রষ্টার সমস্ত ধ্বংস উপকরণ একত্রে ব্যবহার করার একটি পরিচ্ছন্ন ধারণাকে প্রশ্রয় দেয়। মূলতঃ আমরা জানি না—তা কি শুধুমাত্র একটি সহসা আগমনকারী কাওকাব এই পৃথিবীর ধ্বংস রচনা করবে, এর সঙ্গে বিসংশ্লিষ্ট থাকবে সুপারনোভার জঞ্জাল যা সৃষ্টির নির্ধারিত নিয়মে অনেক পূর্ব হতেই প্রক্রিয়ারত, কেবল একটি ধার্যকৃত দিন ক্ষণে সকল দিক হতে সকল ঘটনাগুলি একত্রিত হবার অপেক্ষায়। অথবা আমরা জানি না— শুধুমাত্র একটি পৃথিবী নাকি পাশাপাশি এমন শত সহস্র পৃথিবী একই নিয়মে একই ধারায় ধ্বংস হবে যার সর্বশেষ ইন্ধন আসবে একটি কোয়াসারের বিস্ফোরণ হতে। তবে আয়াতের প্রস্তাব ও বিজ্ঞানের সামর্থ্যে আমরা কেবল এ ধরনের ঘটনার কথাই ভাবতে পারি।

www.pathagar.com

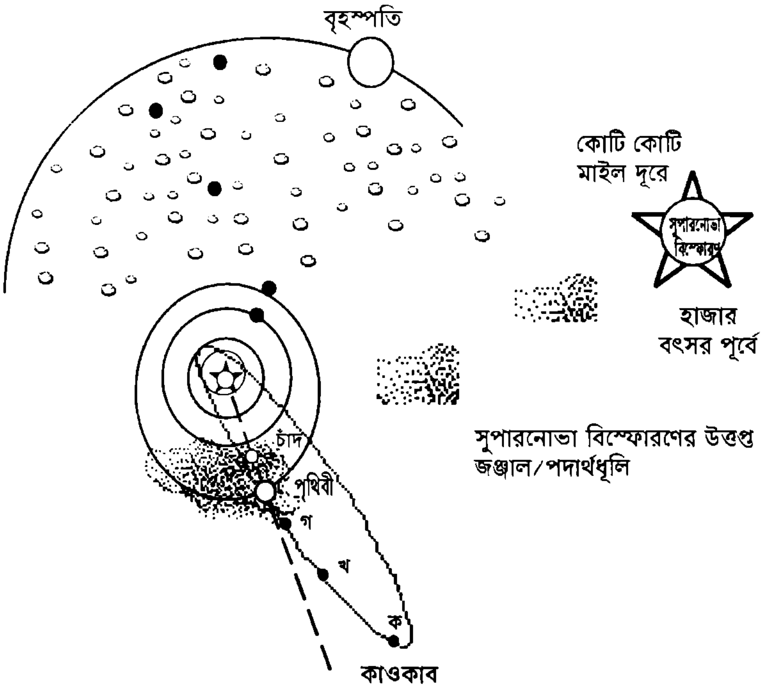

চিত্রে সূর্য-চন্দ্র-পৃথিবী একটি শক্তি-লাইনে একত্রিত হয়েছে। আগন্তুক কাওকাব-এর অতি-উপবৃত্তাকার কক্ষপথ এই ত্রয়ীবস্তু শক্তি-লাইনকে এমনভাবে ছেদ করেছে যে পৃথিবী হতে ঐ কাওকাবের অবস্থান আকর্ষণ কার্যক্ষম দূরত্বে এসে পড়েছে; ফলত কাওকাবের গতি বৃদ্ধি পাবে এবং সে তার মূল কক্ষপথ হতে বিচ্যুত হয়ে শক্তি-লাইনে চড়াও হবে; তখন পৃথিবীতে আঘাত নিশ্চিত। একই সময় হয়তো কোটি কোটি মাইল দূরে হাজার বৎসর পূর্বে বিস্ফোরিত হয়ে যাওয়া সুপারনোভার উত্তপ্ত জঞ্জাল ঠিক ঐ মুহূর্তে পৃথিবীর আকাশকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। জঞ্জালগুলি পৃথিবীর আকাশে প্রবেশমাত্র সুপ্রসারিত আগুনের ঝিলিক দেখা দেবে এবং আকাশ সূক্ষ্ম পদার্থ ধূলিতে আচ্ছাদিত হবার কারণে সূর্য-চন্দ্র-নক্ষত্র

www.pathagar.com

ইত্যাদি সব আলোক উৎসগুলি ম্লান হয়ে পড়বে দৃষ্টির কাছে। উত্তপ্ত পদার্থ–ধূলি আকাশকে তামাটে কিংবা গলিত ধাতুর রং–এ লেপে দেবে।

শিল্পীর চোখে মহাধ্বংসের জ্বলন্ত পৃথিবী। নীচে সহসা আঘাতকারী 'কাওকাব'। সেদিন দুর্ভাগ্যের অধিবাসীরা আকাশকে দেখবে রক্তাক্ত চর্মের ন্যায় আর চন্দ্র–সূর্যকে দেখবে অতিম্লান। সেদিনটি আসলেই ভয়ঙ্কর!

"ওহে জ্ঞানী সকল! আল্লাহকে ভয় করিয়া চলিও— যাহাতে তোমরা নাযাত পাইতে পার (৫:১০০)। তুমি কি লক্ষ্য কর নাই যে আসমান যমীনে যাহা কিছু আছে তাহার সবই আল্লাহ্‌ জানেন? (৫৮:৭) যেখানেই তোমরা অবস্থান কর— আল্লাহ সকলকে টানিয়া আনিবেন (২:১৪৮) বস্তুতঃ আল্লাহ কঠোর শাস্তি প্রদানকারী (৫:২) বল অদৃশ্যের জ্ঞান শুধু আল্লাহরই। সুতরাং তোমরা প্রতীক্ষা কর এবং আমিও প্রতীক্ষা করিতেছি" (১০:২০)।

আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আ'লামীন।

www.pathagar.com

সময় দূরত্ব ধারাবাহিকতা
ও
আপেক্ষিক বাদ

সৃষ্টিতে পরম ও চরম (absolute) অস্তিত্ব বলতে যা বোঝায়, তা শুধু একটিই । তাঁর কোনো তুলনা নেই; আর তাঁর গুণাবলীতেও কোনো অংশীদারিত্ব নেই। তিনি স্রষ্টা; পরম প্রতিপালক। আমরা তাঁর পরিচয় আল্লাহ্ কিংবা রহমান এই সব সুন্দর নামেই জেনেছি। সৃষ্টিতে কেবল তিনিই চরম এবং তিনিই পরম— আর কিছুই এই গুণাবলী নিয়ে বিরাজ করে না।

বিজ্ঞান একদিন চরম ও পরম সময় দূরত্বের (absolute time & space) অনড় ও দুর্ভেদ্য দেউল গড়েছিল। মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন এসে সে দেয়ালে পদাঘাত করলেন। যে চরমতার গুণ কেবল স্রষ্টাকেই সাজে— সে পরম চরিত্র পদার্থ কিংবা সময় ধারণ করে রয়েছে, অতটা আশা করাও শোভন নয়। ফলতঃ কালের প্রবাহে সত্যের প্রকাশে তা খড়কুটার ন্যায় ভেসে গেছে। প্রত্যয়ন হয়েছে— সময়, দূরত্ব কিংবা পদার্থ–ভর এরা কিছুই চরম নয়; ওরা শুধু আপেক্ষিক। এই ধারণার উপর ভর করে আইনস্টাইনের সর্বশ্রেষ্ঠ সফলতার ফসল $E = mc^2$ প্রকাশ হলো। সময়–দূরত্ব ধারাবাহিকতায় কোথাও কোনো চরম বলতে কিছু নেই ; পদার্থের ভর

www.pathagar.com

কিংবা জায়গার বেড় অথবা সময়ের বিষয়ে চূড়ান্ত বলতে কিছু থাকা সম্ভব নয়। এই কথাগুলি আইনস্টাইন প্রকাশ করলেন তার আপেক্ষিকবাদ নামক তত্ত্বে ; আর $E = mc^2$ হলো এই তত্ত্বেরই বিস্ময়কর ফসল।

সময় একটি মাত্রা (Dimention) যা অন্যান্য সব মাত্রারই মতোই অতীব জরুরী ; আপেক্ষিকতাবাদের জরুরী প্রস্তাবগুলিতে এই ভাবধারাটি এক অনন্যতায় স্থান করে নিয়েছে। এই বাদ অসীম–সসীমতার একটি নিষ্পত্তিও করেছে। এতদিন মানুষ যে

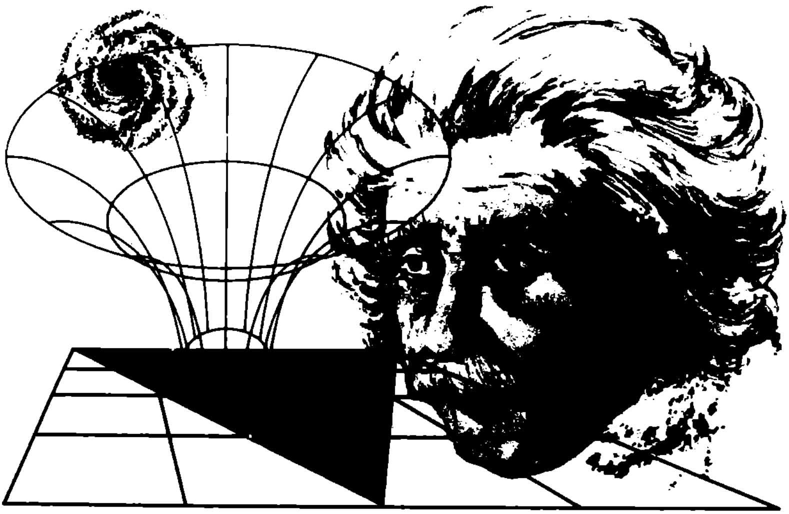

স্রষ্টাভীরু আইনস্টাইন ও আপেক্ষিকবাদ— দুটি একই নামের ভিন্ন প্রকাশমাত্র! থিওরি অব রিলেটিভিটি আল্লাহর তাওহীদিবাদকেই দৃঢ়তায় প্রকাশ করে যদি তার সঠিক বিশ্লেষণ করা যায়।

মহাবিশ্বকে অসীম বলে জানত, আইনস্টাইন একে সসীমতার শৃঙ্খল পরিয়ে দেয়। এই মহাবিশ্ব সময় ও দূরত্বে অনন্ত বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও সসীমতার সীমাবদ্ধতায় আটকা পড়ে যায়। একমাত্র স্রষ্টাই

www.pathagar.com

অসীম— তাঁর এই অসীমতার তুল্যে আর কিছু নেই, এই সত্যটিও এই আপেক্ষিকতাবাদের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে মানুষের কাছে।

অবশ্য এই তত্ত্ব একটি বিষয়কে অসীম হিসাবে দর্শন করেছে— তা হলো পদার্থে আটকে পড়া শক্তির ভাণ্ডার ; আর এ শক্তির পরিমাণ আসলেই অসীম। মহাকাশ পর্ব–১ এ আমরা দেখেছি— মাত্র ১ কিলোগ্রাম পদার্থ ধ্বংস করলে প্রাপ্ত শক্তির পরিমাণ দাঁড়ায় 9×10^{16} Joules বা প্রায় 10^{17} Joules বা ১০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০ বা ১০০ মিলিয়ন বিলিয়ন জৌল যার অনুপাত $1:10^{17}$ । এর তুলনা শুধু অসীমতায় (কারণ তুচ্ছ পরিমাণ হতে অতি বিশাল শক্তির সরবরাহ)। আমাদের পৃথিবীর ভর $5{\cdot}977 \times 10^{24}$ কিলো বা ৫,৯৭৭,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০ কিলোগ্রাম। এই পৃথিবী কতটা শক্তি বন্দী করে রেখেছে তার হিসাব নিতে হলে এই ভরকে গুণ করতে হবে একশত মিলিয়ন বিলিয়ন দিয়ে যার ফলাফল হবে $5{\cdot}977 \times 10^{41}$ জৌল। সৌরজগতের সমস্ত গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু, গ্রহাণু ও অন্তবর্তী মেঘমালা একসঙ্গে কেবল সূর্যের ভরের ১%। সূর্যের নিজ দেহে আটকা পড়েছে সৌরজগতের ৯৯% পদার্থ। সে সূত্রে সূর্যের মাঝে আটকানো পদার্থের শক্তির মাত্রা কত কিংবা সৌরজগতের পদার্থে আটকে পড়া শক্তির পরিমাপ কত হবে তা হিসাব করে দেখানোর প্রয়োজন পড়ে না (কারণ তার পরিমাণ এত চিন্তনীয় ও বেশি)। ছায়াপথ গ্যালাক্সিটিতে শুধু নক্ষত্রের সংখ্যা হলো ১০ হাজার কোটি ; তার বাইরেও রয়েছে আন্ত–নাক্ষত্রিক মেঘপুঞ্জ, কালোবিবর ইত্যাদি। এমন তারাজগতের সংখ্যা এই মহাবিশ্বে রয়েছে ন্যূনতঃ ১০০ মহাপদ্ম ; আর তার বাইরেও রয়েছে দুর্বোধ্য জ্যোতিস্ক কোয়াসার অগণিত সংখ্যায় যাদের ভর ও শক্তির পরিমাপ একটি সুবিশাল গ্যালাক্সির মতই। আমরা এই উপাত্তগুলিকে কাজে লাগিয়ে মহাবিশ্বের পদার্থ ভাণ্ডারে আটকে পড়া শক্তির একটি গাণিতিক প্রকাশ পেয়ে যেতে পারি। তা অবশ্যই আরকোনোভাবে সসীমতার স্কেলে আটকা পড়ে না ; এই মহাবিশ্বের

www.pathagar.com

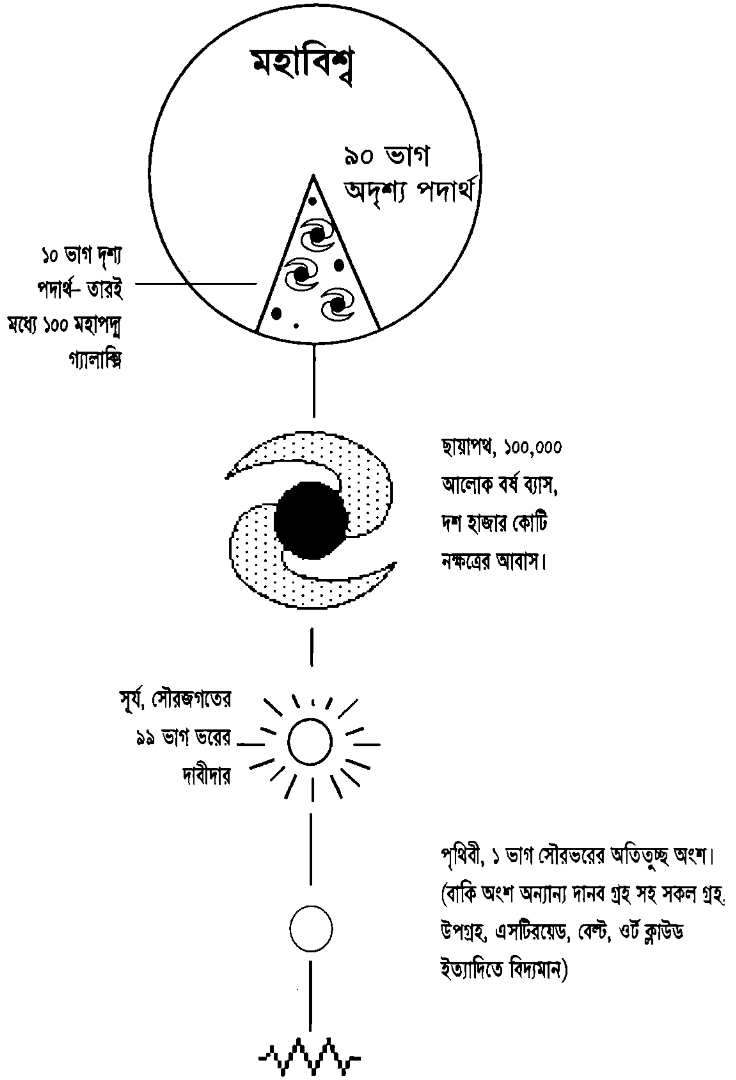

শুধুমাত্র পৃথিবীর পদার্থে যতটা শক্তি আটকা পড়েছে, তার পরিমাণ হলো ঃ

৫৯৭০০, ০০০, ০০০, ০০০, ০০০, ০০০, ০০০, ০০০, ০০০, ০০০, ০০০, ০০০, ০০০, ০০০, ০০০, ০০০ জৌল।

www.pathagar.com

শক্তির পরিমাপটি অসীমতার পরিমাপে প্রসারিত রয়েছে বলে গ্রহণ করা যায়। আমাদের জ্ঞানে শঙ্কিত সংকেত দিয়ে বিজ্ঞান জানায়, মহাবিশ্বের এই অসীম পদার্থ-বিস্তারের যে তালিকা আমরা পেয়েছি, তা মাত্র ১০% দৃশ্যমান পদার্থ-বিস্তারের; বাকি ৯০ গুণ পদার্থ অর্থাৎ আরো ৯০টি দৃশ্যমান মহাবিশ্বের পদার্থ অদৃশ্য আকারেই রয়ে গেছে। এদের বিবেচনায় আনলে আমরা এই সসীম মহাবিশ্বেও এক অসীমময় অসীম (order of infinitely infinite) শক্তির সন্ধান পাই। মহাবিশ্বের শক্তিপুঞ্জ তাহলে কি স্রষ্টার অসীমতার অনুপাতেই বিরাজ করে? কোনো পদার্থ বা শক্তি স্রষ্টার তুল্যতায় আসতে পারে না। অথচ আমরা এই মহাবিশ্বের পদার্থ বিস্তারে আটকানো সমুদয় শক্তিকে অসীম বলতে বাধ্য হই। আমরা কি কোনো অংশীবাদিত্বের প্রশ্নের সামনাসামনি দাঁড়িয়ে পড়েছি?

বিনীতভাবে জানাব যে— এর উত্তরটি, না। এমন শঙ্কা চিন্তার মাঝে কোরআনের স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হারিয়ে যান না। তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠত্বেই বিরাজ করেন। আমরা যথাসময়ে তা এই অধ্যায়েই অবগত হব।

দুই

আইনস্টাইনের বিস্ময়কর সাফল্যটি হলো সময়কে একটি জরুরী ডাইমেনশন হিসাবে দাঁড় করানো। সময় একটি মাত্রা বা ডাইমেনশন— এ সচেতনতাটি তখনো কোনো বিজ্ঞান বিবেচনায় প্রকাশ পায়নি। কিংবা তখনো কেউ জানত না যে আলোর গতিতে চলমান পদার্থের জন্য সময় অনড় দাঁড়িয়ে পড়ে।

আজ আমরা Time dilation বা সময় প্রলম্বিতকরণ, এই শব্দটির সাথে পরিচিত হতে পেরেছি আপেক্ষিকবাদের কল্যাণে। মহাবিশ্বে আন্ত-নাক্ষত্রিক কিংবা আন্ত-গ্যালাটিক যাত্রার জন্য মানবিক

www.pathagar.com

জীবন যতটা সময়ের সুযোগ দেয়, তা এত তুচ্ছ যে শত সহস্র পুরুষের জীবনকে একত্র করেও একটি আন্ত–গ্যালাটিক যাত্রাকে সম্ভব করে তোলার কোনো সম্ভাবনা থাকে না। Time dilation হলো প্রযুক্তিতে অতি–অগ্রসর আন্ত–নাক্ষত্রিক বা ভিন জগতের অধিবাসীগণের একটি উপায় বা technique যার অবশ্যম্ভাবী শর্ত হলো কোনো ব্ল্যাক–হোলের ব্যবহার; আমরা আমাদের আজকের জ্ঞানে বিষয়টিকে পরিষ্কার করে বুঝতে পারি না, তবে এর ফলাফল যে এইরূপ, বিজ্ঞান তার বলিষ্ঠ আভাস দেয়। কোনো আন্ত–নাক্ষত্রিক যাত্রী বা ভিন জগতের অধিবাসী একটি গ্যালাক্সি হতে অন্য গ্যালাক্সিতে ভ্রমণ করতে চাইলে আলোর গতিতে চলে কোনো লাভ নেই, কারণ তাতেও সে দূরত্বের সমস্যা কয়েক শত বা সহস্র পুরুষের বয়স নিয়েও সমাধান করতে পারবে না। Black-hole ও Time dilation পদ্ধতির সমন্বয়ে এই বিপত্তিকে কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হতে পারে। এর জন্য স্পেসশীপকে Black-hole এর tunnel দিয়ে প্রবাহিত হতে হবে— Tunnel এর অপর প্রান্তে এসে স্পেস শীপটি তার মাতৃগ্যালাক্সি ছেড়ে নতুন কোনো গ্যালাক্সি অথবা মহাবিশ্বের রাজ্যে চলে আসতে সক্ষম হতে পারে। গণিতের হিসাব এতদূরকেই সমর্থন দেয়; কিন্তু দুর্বোধ্য প্রশ্নটি থেকে যায়— Time dilation এর জন্য যদি Black-hole এ ঢুকতে হয়, তবে ঐ Space Ship এর কিংবা তার যাত্রীর অস্তিত্ব আর কখনো খুঁজে পাওয়া যাবে না। Tunnel এর অপর প্রান্তে পৌঁছে যাবার অনেক আগেই Space-shipটি কিংবা তার যাত্রী কমপক্ষে 10^{-17} অর্থাৎ এক হাজার লক্ষ বিলিয়ন ভাগের এক ভাগে সংকুচিত হয়ে আদি অস্তিত্বে বিলীন হয়ে যাবে। এই সংকুচনকে রোধ না করা গেলে কখনই আন্ত–মহাজাগতিক যাত্রীর স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেয়া সম্ভব হবে না। অথচ, ব্ল্যাকহোলের সংকুচন রোধ করার স্বপক্ষে কোনো জ্যামিতি, গণিত কিংবা অন্য কোনো উৎপাদকের কোনো সম্ভাব্য অবদান থাকতে পারে বলে মনে হয় না একবারেই। অথচ বিজ্ঞান মননে জিজ্ঞাসার বিস্ময় এঁকেছে 'ইউএফও' তাদের আনাগোনা আমাদের বলে যে time dilation এর

www.pathagar.com

সম্ভাব্যতাটি কার্যতঃ ঘটছে, কিন্তু কিভাবে হচ্ছে তা আমরা ব্যাখ্যা করতে সক্ষম নই। অবশ্য এটি বড় কোনো সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত হবার কারণ নেই— কারণ আমরা আশা করতে পারি যে সময়ের সাথে সাথে এই বিপত্তির নিষ্পত্তি হতে পারে।

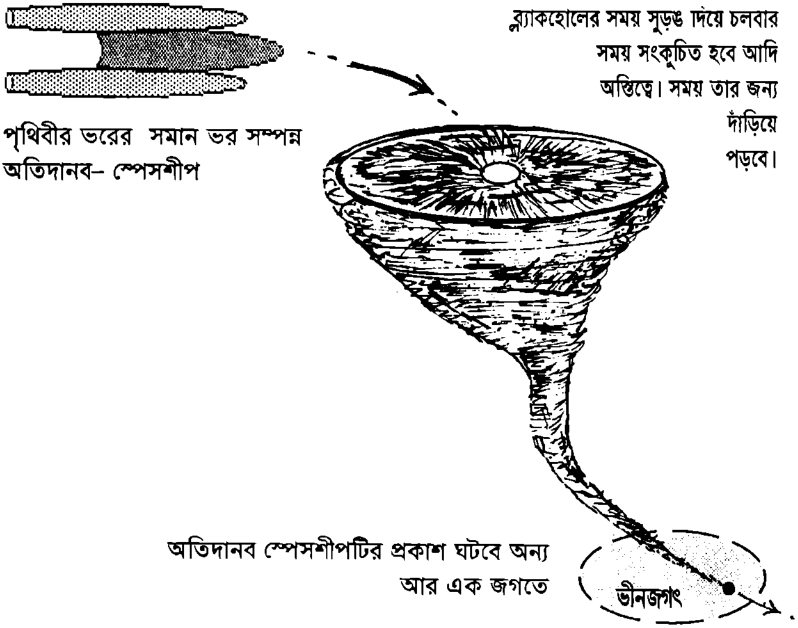

আপেক্ষিকবাদ সময়কে একটি ডাইমেনশন হিসেবে প্রস্তাব করেছে— এই বিস্ময়কর তথ্যটি মানুষের দৃষ্টি কেড়েছে কেবল তত্ত্ব ও তার ফলাফল প্রকাশ পাবার পরপরই। সৃষ্টিতে সময়ের মতো দুর্বোধ্য আর কিছুই নেই এবং বিজ্ঞানীরা মনে করেন, তারা যদি সময়কে বুঝতে সক্ষম হতেন, তবে তারা স্রষ্টাকেও বুঝতে পারতেন। তবে সময়ের কোনো চরমতা নেই, চরম বা পরম সময়

www.pathagar.com

বলতে কিছু নেই ; সময় কেবল একটি আপেক্ষিক মান। স্থান ও কালের যে ধারাবাহিকতার সাথে আমরা পরিচিত, তার এক স্থানের সময় অন্য স্থানের সময়কে প্রভাবিত করে না ; একটি ঘটনা অন্য দূরবর্তী স্থানের ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত নয় ; অথচ সম্পূর্ণ পৃথক সত্তা হওয়া সত্ত্বেও তারা সবই যেন একটি সমষ্টিগত সময়েরই অভিন্ন অংশ হিসাবে সৃষ্টিতে বিরাজ করে। সময়ের চেহারার দিকে তাকিয়ে বলা দুস্কর যে সময় একটি একক অস্তিত্ব নাকি অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানা বিশিষ্ট। সময় কি প্রবাহমান নাকি স্থির, আমরা জানি না। সময় কি অসীম অনন্ত নাকি তার শুরু ও শেষ রয়েছে। সময় এমন অস্তিত্ব যা আসলেই কোনোভাবে বোঝা সম্ভব নয়। সৃষ্টিতে যত কিছু দুর্বোধ্যতা রয়েছে— তাদের মধ্যে সময়ের দুর্বোধ্যতা হলো সর্বাধিক ও সর্ব জটিল। আমরা সময়কে কেবল 'অনন্য'ই বলতে পারি।

অন্যদিকে সৃষ্টিতে কোনো প্রকৃত মাপের একক নেই, সময়েরও নেই। আমরা কেবল নিজেদের সুবিধার জন্য এদেরকে পরিমাপের একক দিয়ে প্রকাশ করছি। আপেক্ষিকবাদ স্থান-কাল পরিমাপের বিষয়ে যে বিবেচনাটি দেয়— তা হলো অনির্দিষ্টতা। অর্থাৎ স্থান ও সময় মাপনের জন্য প্রাকৃতিকভাবে কোনো একক নির্ধারণ করা হয়নি। স্থান ও কাল কেবল অনির্দিষ্ট।

সময়ের আর একটি বিশেষ ধর্ম হলো যে, একই স্থানে একই সাথে তা যে কোনো ক্ষুদ্র বা বৃহৎ পরিমাপে পরস্পরের পাশাপাশি চলতে পারে! এবং দুটি বা ততোধিক সময়-অস্তিত্ব একই স্থানে একই কালের বলয়ে একাধিক সময়-মিতি প্রকাশ করে চলমান হতে পারে!

তিন

তাত্ত্বিকভাবে সময়কে স্থানের সঙ্গে একসাথে পারস্পরিক বুননে আবদ্ধ বলে ধরে নেয়া হয়। এই বুননটি জীবন ও জগৎকে বিকাশে সাহায্য করে। আমরা অবগত রয়েছি দ্বিমাত্রিক জগৎ কখনো কোনো

www.pathagar.com

বস্তুর গঠনকে অনুমোদন দিতে পারে না। বস্তু গঠনের জন্য একটা তৃতীয় মাত্রা অর্থাৎ দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের সাথে ভেদটি যোগ দিতে হয়— অন্যথায় কোনো জড় পদার্থের আবির্ভাব হতো না। এই ত্রিমাত্রিক জগৎই শেষ নয়; এর পিছনে সময় হলো সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ মাত্রা। একটি ত্রিমাত্রিক জগতে কোনো জীবনের উদ্ভব হতে পারে না; হলেও তা তাৎক্ষণিকভাবে মৃত্যুকে বরণ করবে বাধ্য হয়েই। তাই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনাটি হলো 'সময়'— যা জীবন ও সুখময়তাকে সম্ভব করে তোলে এবং বংশের ধারাকে সফল করে রাখে। ১৫ মহাপদ্ম বৎসর পূর্বে যে মহাবিশ্বের জন্ম হয়েছিল, তার ব্যাপ্তি ছিল একটি পরমাণুর প্রোট্রনের আকৃতির চাইতেও কয়েক সহস্র মহাপদ্ম গুণ ক্ষুদ্র। আজ আমরা ২০ মহাপদ্ম আলোকবর্ষ ব্যাসসম্পন্ন যে সুবিশাল মহাবিশ্বে বসবাস করি— সেটি কেবল সময়ের এক অনন্য অবদান। ফলতঃ দেখতে পাই— সময় এক অনন্যতার বৈশিষ্টে মণ্ডিত। "What is time?"— Replied nobel laureate Richard P. Feynman, "We physicists work with it every day, but don't ask me what it is. It is just too difficult to think about'— সময়টি কি, তা ভাবনায় আনা অত্যন্ত সুকঠিন, যদিও এ সময়কে নিয়েই বিজ্ঞানীগণের প্রাত্যহিক কাজকর্ম! একজন পদার্থবিদের কাছে সময় হলো সৃষ্টিতে দুটি প্রধান বিল্ডিং ব্লকের একটি, একজন ঘড়ির মেকারের কাছে এ হলো এক টিকটিক শব্দ, সাইন্স ফিকশনিস্টের কাছে সময় একটি আভ্যন্তরীণ সুপ্ত ঘড়ি যা উদ্ভিদ ও প্রাণীকে প্রকৃতির সাথে সঙ্গত রাখে, ব্যাঙ্কারের জন্য তা টাকা আর বুদ্ধিস্ট মং এর কাছে Eternally Returning Cycle of Nature, নিউটন মনে করতেন, সময়ের প্রবাহধারা চিরন্তন ও নদীর প্রবাহের মতো— কেবল আইনস্টাইনই বললেন, সময় হলো চতুর্থ ডাইমেনশন, এর সচেতনতা হলো স্থানীয়।

সময়ের চরিত্র প্রকাশের জন্য আমাদের উদ্যোগ যা-ই হোক, সৃষ্টিগতভাবে তা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। ব্যাখ্যাশূন্যতার এমন আর একটি বিষয় আমরা দেখেছি 'প্রাণ' বা জীবন সম্পর্কে। *"উহারা প্রাণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে? বল প্রাণ বা রুহ আমার প্রতিপালকের*

www.pathagar.com

আদেশঘটিত ব্যাপার এবং এ বিষয়ে তোমাদেরকে অতি অল্পই জ্ঞান দেওয়া হইয়াছে" (১৭:৮৫)। প্রাণের অস্তিত্বটি আল্লাহপাকের সরাসরি আদেশজাত— তাই তাকে বোঝা যায় না; তার সম্পর্কে জ্ঞানও বৃদ্ধি পায় না এবং এ কারণে বিজ্ঞানের এতটা অগ্রগতিতেও এই প্রাণ এক অব্যাখ্যাত শূন্যতা।

কিন্তু সময় কি প্রাণের মতো? সময়ের ক্ষেত্রেও এই ব্যাখ্যা অগ্রসর হয় না কেন? Gernot Winkler, Director of Time Services, (US Observatory,Washigton DC) এর ভাষায় 'Time remains an abstruction, a riddle that exists only in our mind'-- সময়ের সম্পর্ক পদার্থবিজ্ঞানের সাথে যতটা গভীরই হোক, এর অনুভূতির বিচরণ ক্ষেত্রটি হলো মন, বস্তুজগৎ নয়। সময়ের নিভৃত ঘড়ি আর পঞ্জিকা পদার্থ, জীব, উদ্ভিদ ও সমস্ত সৃষ্টি জুড়ে তাদের মূলে প্রোথিত হওয়া সত্ত্বেও তার অস্তিত্বটি অনুভব করতে হবে হৃদয় বা অনুভূতি নামক আর এক অজ্ঞেয় সত্তা দিয়ে। সময়ের সর্ব আপেক্ষিকতা সত্ত্বেও আমাদের পদমূল হতে ২০ মহাপদ্ম আলোকবর্ষ দূরের কোয়াসার পর্যন্ত একটি সময় অনুভূতি তীব্রতরভাবে বিরাজমান। এই সময় বিস্তৃতি অতি ক্ষুদ্র পদার্থে অতি ক্ষুদ্র মাত্রায় বিরাজ করে। 'Physicists tracking motion inside an atomic nuclers reckon in picosecond (trillionths of a second) and even in femtoseconds (thousandths of a picosecond)'. অতি ক্ষুদ্র পদার্থের কণায় সময় সেকেণ্ডের জিলিয়ন ভাগের একভাগ দৈর্ঘ্যেও বিরাজ করে; দৈর্ঘ্যের বিস্তৃতিতে তা কোয়ার্কের সমানুপাতিক অবস্থান কিংবা তার চাইতেও সূক্ষ্ম। অন্যদিকে এই সময় ২০ মহাপদ্ম আলোক বৎসর ব্যাসসম্পন্ন মহাবিশ্বের সংগঠন সৃষ্টিরও একটি মৌলিক ভিত্তিমূল। আমরা ধরে নিতে পারি— সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়নের জন্য স্রষ্টা যে কয়টি গুরুতর উপাদান ব্যবহার করেছেন, সে উপাদানগুলির একটি 'সময়' সর্ব মৌলিকতা হতে সর্ব বৃহত্বতায় বিরাজমান। এই বিরাজমানতার চরিত্রটি কিন্তু এক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যেরই আভাস মাত্র!

www.pathagar.com

চার

আমার বয়স তখন অল্প, প্রাইমারি স্কুলে পড়তাম। সময়, বিজ্ঞান ও ধর্ম সচেতনতার পরিমাপ ছিল শূন্যে। অনেকটা গল্পের ছলেই একটি পুস্তক পাঠ করেছিলাম— "হাদিস আল কুরসী", হাদিস আল কুরসী হলো অতি গুরুত্বপূর্ণ হাদিস পুস্তক। আমার মনে আছে, সেখানে পড়েছিলাম— *"মানুষ কালকে (সময়) গালমন্দ করে, অথচ আমিই কাল"* ; আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন নিজেই কাল কিংবা তিনি কাল বা সময়ে বিলীন রয়েছেন এ ভাবনার সূত্রটি আমাদের কাছে অতি মূল্যবান।

বিজ্ঞানীদের অনেকেই মনে করেন— স্রষ্টা অভিকর্ষ বা Gravity এর মধ্যে প্রকাশমান। সৃষ্টিতে সর্বদুর্বোধ্য শক্তি হলো অভিকর্ষ ; বিজ্ঞানীগণ মনে করেন, এই শক্তিকে যদি তারা বুঝতে পারতেন, তবে স্রষ্টাকে ও তাঁর সৃষ্টিকে পূর্ণতায় বুঝতে সক্ষম হতেন। আমরা এখনো জানি না Space time Continuum এর প্রশ্নে আমরা সময় ও দূরত্বকে (Time and Space) পারস্পরিক বুননে (inter-woven) আবদ্ধ দেখি, তা কি সত্য না সত্য হলো Time এবং Gravity পারস্পরিক বুননে এই সৃষ্টিকে সম্ভব করে তুলতে পেরেছে— এই উপাত্তটি। এর সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ আমরা দেখতে পাই Black-hole –এর দিকে দৃষ্টি ফেললে। Black-hole হলো সংকুচিত Space ; অথচ সেখানে সময়ের চরিত্র প্রকাশের দুর্লভ সুযোগ রয়েছে। Black-hole এ সময় দাঁড়িয়ে পড়ে। এই সময়কে গতিহীন করে দেবার জন্য যে উৎপাদকের অবদান সর্বাগ্রে বিবেচ্য, সে হলো অভিকর্ষ বা Gravity ; Space বা দূরত্ব নয়। অতএব সময়ের Inter-woven বা আন্ত–বুনন চরিত্রটি স্পেসের সঙ্গে নাকি অভিকর্ষের সঙ্গে এ বিষয়ে বিজ্ঞানীরা নতুন করে ভাববেন কি তার একটি প্রস্তাব আমরা এখানে রেখে যেতে চাই। এখানে আমাদের একটি লাভ রয়েছে ; তা হলো স্পেস–টাইমের যে বুননশীলতার কথা

www.pathagar.com

আমরা জানি, তা যদি সময়–অভিকর্ষ বা Time-gravity এর বুননশীলতা হয়, তবে এটি আমাদের জন্য কিছু শর্ত পূরণ করবে। অবশ্য আমরা অনুসন্ধানের এমন একটি দিগন্তে যে, সৃষ্টিতে সৃষ্টিগতভাবে স্রষ্টার পক্ষ হতেই আরোপিত রয়েছে এক সীমাবদ্ধতা যার সম্পূর্ণ চিত্র মানবিক জ্ঞানে অবলোকন বা ধারণের সম্ভাব্যতা যথেষ্ট কম। আমরা আমাদের এ সীমাবদ্ধতার জন্য দুঃখিত হওয়া ছাড়া অন্য কোনো উপায়ের কথা জানি না।

Time-gravity বুননটি বাস্তব হলে আমাদের আলোচনাটি একটি বিশেষত্বে প্রকাশ করা যায় (অবশ্য সময়–দূরত্ব বুননেও এই প্রস্তাবের বৈপরীত্য নেই) যা সৃষ্টিতে দয়াময় আল্লাহের অবস্থানের চরিত্রটিকে ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রটিকে প্রভূতভাবে সাহায্য করে। (আমি দয়াময়ের শর্তহীন কৃপাপ্রার্থী। আমি শুধুমাত্র পরিষ্কার মনে আমার বোধ–সাধ্যে এ আলোচনা করার চেষ্টা করছি এ ভরসাটিতে যে, গবেষণার ক্ষেত্রে ভুল তথ্যের জন্য (অনিচ্ছাকৃত) আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের ক্ষমা ও দয়ার প্রতিশ্রুতি রয়েছে। আমি এখন যে বিষয়ে আলোচনা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি, তার কোনো প্রামাণিকতা হয় না, সম্ভব হবে না এবং এ বিষয়ে কোনো মানবিক জ্ঞান পরিশুদ্ধতার সীমায় পৌঁছুবে না। আমি বিনীতভাবে তাঁর অসীম জ্ঞানের আশ্রয় চাইছি যিনি একটি নির্গুণ কদলী বৃক্ষের দ্বারা তাঁর জ্ঞান প্রকাশ করতে পারেন। এ ক্ষেত্রে আমি যদি ভুল প্রমানিত হই, তবে এর দায়ভার আমার, এ দায় কোরআনের নয়। অনিচ্ছাকৃত যদি ভুল করেই ফেলি, সে ভুলের জন্য আমি দয়াময় আল্লাহর ক্ষমা প্রার্থী ; যদি এর মধ্যে সঠিকতার বিষয় থাকে, তবে তার অহঙ্কার শুধুমাত্র রাব্বুল আলামীনেরই)।

আমরা সময় ও অভিকর্ষ বুননের কথা বলছিলাম। আলোচনাটি প্রসারিত করার পূর্বে আমরা কোরআনের ক'টি আয়াতের দিকে মুখ ফেরাতে চাই। "*তিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তদ্ব্যতীত তাঁহার জ্ঞানের কিছুই তাহারা আয়ত্ত করিতে পারে না। তাঁহার আসন আকাশসমূহ*

www.pathagar.com

ও পৃথিবী (পৃথিবীসমূহ) ব্যাপিয়া বিস্তৃত ; ইহাদের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁহাকে ক্লান্ত করে না ; তিনি মহান, শ্রেষ্ঠ" (২:২৫৫)। এই আয়াতাংশটি 'আয়াত আল-কুরসীর' অংশ বিশেষ। এখানে আল্লাহপাকের অবস্থান ও সৃষ্টিতে তাঁর ভূমিকা এ দু'য়ের বিষয়ে একটি সম্পর্ক নির্ণিত হয়েছে। লক্ষ্য করুন كرسيه وسع এই দুটি শব্দের প্রতি। وسع শব্দের অর্থটি হলো— be wide, spacious, be spacious enough, hold, be possible, be in one's power, widen, enlarge, amplify, make room, penetrate deeply into, extended for, capacity, extent, plenteousness ইত্যাদি। অন্যদিকে كرسى শব্দের অর্থ হলো thorne, armed chair, thorne of God, highest heaven, base of a column, setting of a ring, residence, seat ইত্যাদি। আমরা শব্দ দুটির সহজ ও সাধারণ অর্থগুলি গ্রহণ করলে বলতে সক্ষম হই যে, একটি অতি প্রসারিত কিংবা সৃষ্টিতে অতি গভীরভাবে প্রোথিত একটি সিংহাসন, কিংবা স্তম্ভের মূলভিত্তি কিংবা আসন কিংবা বসবাসের স্থান কিংবা গভীরে বা মূলে প্রোথিত প্রভাব ; আর আয়াতের পরিবেশে যার বিস্তৃতি আকাশসমূহে (যতগুলি আকাশ রয়েছে, সর্বত্র) এবং পৃথিবীতে (কিংবা পৃথিবীসমূহে) বিস্তৃত রয়েছে বলে ধারণা দেয়। আল্লাহপাকের আসন বা অবস্থানটি একটি অতি বিশাল পরিব্যাপ্তি নিয়ে বিদ্যমান। স্বভাবতই প্রশ্ন আসে— এ কেমন আসন যা মহাবিশ্বের সর্বত্র সমস্ত السموات। বা আকাশসমূহ বা গ্যালাক্সিসমূহ জুড়ে বিস্তৃত রয়েছে এবং একই সময়ে পৃথিবী কিংবা পৃথিবীসমূহ জুড়ে রয়েছে? আমাদের জ্ঞান এমন তথ্যকে গ্রহণযোগ্য বলে নির্বাচন দেয় না। সৃষ্টিতে আমরা cosmic limit দেখতে পাই যা বলে—কোন শক্তিই আলোর গতির 99.9% এর বেশি গতি নিয়ে চলতে পারে না। স্রষ্টার নির্দেশ কিংবা প্রভাব কি cosmic limit মেনে চলে? নাকি তা এমন কিছু যা ব্যাখ্যা যোগ্য নয়?

স্রষ্টার নির্দেশ ও তা বাস্তবায়িত হবার বিষয়টি আমাদের প্রথম প্রশ্নটির অনুসারী নয়— তিনি cosmic limit দ্বারা সীমাবদ্ধ নন, এটা আমরা কোন প্রমাণ ছাড়াই বলতে পারি। স্রষ্টার আদেশ আলোর

www.pathagar.com

গতিতে চলমান হতে হলে তাঁকে 20 বিলিয়ন বৎসর বসে থাকতে হবে একটি আদেশ দিয়ে— তবেই সে আদেশ সর্ব প্রান্তিক জ্যোতিষ্ক জগতে পৌছতে সক্ষম হবে। স্রষ্টাও সৃষ্টি কারো জন্য এতটা দীর্ঘকাল বসে থাকার সুযোগ নেই। এমন পরিস্থিতিতে স্রষ্টা ও সৃষ্টি পরস্পর পরস্পরকে হারিয়ে ফেলত প্রকৃতির শাসনে। স্রষ্টার এই অধঃপতন রক্ষা করা কারো পক্ষে আর সম্ভব হতো না। ঘটনটি এমন হলে সৃষ্টি-জুড়ে তার প্রভাবও আমরা দেখতাম। সে প্রভাবটি হতো একজন হতাশ স্রষ্টার ক্ষমতা হারিয়ে যাবার পূর্বে একজন হতাশ এক নায়ক রাজার ক্ষমতা হারানোর মতোই ধ্বংসাত্মক। সৃষ্টিতে এক সর্ব কল্যাণের স্পর্শ আমাদের জানিয়ে যায়— স্রষ্টা রয়েছেন, অন্ততঃ এমন একজন স্রষ্টা, যিনি cosmic limit জয় করতে সক্ষম এবং তাৎক্ষণিকভাবে সর্বত্র বিরাজমান হতে পারা যাঁর বহিঃপ্রকাশের একটি জরুরী শর্ত।

এই আয়াতের আরো একটি বিশেষত্ব হলো যে— আল্লাহপাকের মহাবিস্তৃতি এই মহাবিশ্বের রক্ষণাবেক্ষণের সাথে বিসংশ্লিষ্ট। "ইহাদের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁহাকে ক্লান্ত করে না— তিনি মহান, শ্রেষ্ঠ" এই আয়াতাংশটি ৫৫:২৯ আয়াতকে ডেকে আনে "প্রতিক্ষণ তিনি সৃষ্টির নিয়ন্ত্রণে সুপ্রতিষ্ঠিত"। যে স্রষ্টা প্রতিটি মুহূর্তেই সৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণ করেন, সে স্রষ্টা এমন কোনো সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হতে পারেন না যা বিগত যুগের সম্রাট-সম্রাজ্ঞীদের সিংহাসনের মতো। আমরা ফলতঃ একটা অচলাবস্থা কিংবা বৈপরীত্যের মুখোমুখি এসে দাঁড়াই।

কোরআনের ৭:৫৪; ৩২:৪; ৫৭:৪ ইত্যাদি আয়াতের দিকে তাকালে দেখতে পাব— "আল্লাহ, তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং উহাদের অন্তবর্তী সবকিছু সৃষ্টি করিয়াছেন ছয়টি কালের পর্যায়ে। অতঃপর তিনি 'আরশে' সমাসীন হন।" ২:২৫৫ আয়াতে এই আরশের বিস্তৃতি মহাবিশ্বের সকল আকাশসমূহ ও পৃথিবী জুড়ে রয়েছে বলে প্রস্তাবিত হয়েছে। আমরা বলতে পারি, আল্লাহ এমন এক আসনে সমাসীন নহেন, যা কোনো মোঘল সিংহাসনের অনুরূপ ধারণার নিকটবর্তী ; তাঁহার সিংহাসনটি আকাশসমূহ ও পৃথিবী ঘিরে

www.pathagar.com

সৃষ্টির সর্বত্র বিরাজমান। ঐখানে তিনি আরামে বসে পা দুলিয়ে বুদ্ধিজীবিদের মত অলস সময় কাটাচ্ছেন না; তিনি প্রতিটি ক্ষণে সৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণ করে চলেছেন ৫৫:২৯ আয়াত অনুযায়ী। এই পরিস্থিতিতে আমরা আর তাঁকে সিংহাসন শোভাময় স্রষ্টা ভাবতে পারি না ; অতিব্যস্ত কর্মময় স্রষ্টা হিসাবেই ভাবতে বাধ্য হই। আয়াতগুলির পরিবেশ বিশ্লেষণে প্রাপ্ত সিদ্ধান্ত আমাদেরকে আরো জটিল সমস্যায় নিমজ্জিত করে !

এই মহাবিশ্বের সকল বিস্তৃতি জুড়ে তাঁর সিংহাসন বা নিয়ন্ত্রণ অবস্থান— এটি প্রকারান্তরে আমাদেরকে সূক্ষ্ম পদার্থবিদ্যার রাজ্যে প্রতিটি পরমাণু–মূলে প্রতিক্ষণের অজ্ঞাত ও বিস্ময়কর শক্তির ইন্ধন যোগানকারী হিসাবে আল্লাহর অবস্থানকে আবিস্কার করতে সক্ষম হই। "ইহাদের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁহাকে ক্লান্ত করে না" (২:২৫৫), এই আয়াতাংশ আমাদেরকে যে অবস্থানে নিয়ে যায়, তাতে স্পষ্ট ধরা যায় যে, আল্লাহপাক সিংহাসনময় আরশে বসে না থেকে মহাবিশ্বের প্রতিটি স্থানে প্রতি কণায় কণায় কিভাবে নিজে বিস্তৃত রয়েছেন, আর সেখানে থেকে কিভাবে দুর্বোধ্য আন্তঃপারমাণবিক ক্রিয়াগুলি নিয়ন্ত্রণ করেছেন, তারই আনুপাতিক তথ্য আমরা পেয়ে যাই (আন্তপারমানবিক জগতের বিস্ময়কর শক্তিভাণ্ডার ও নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক আলোচনাটি 'আইনস্টাইনের সমীকরণ' মহাকাশ পর্ব–১ এ আলোচিত হয়েছে)।

পাঁচ

সময়ের বুনন স্থানের চাইতে অভিকর্ষের সাথে বেশি প্রকাশিত এবং 'সত্য' কিনা সে প্রসঙ্গে আমাদের জিজ্ঞাসা ছিল। আয়াতের প্রস্তাব ও তাদের আবেগ হতে আমরা ধরে নিতে পারি যে মহাবিশ্বে সর্বত্র আল্লাহপাক একই সময়ে বিরাজমান। এই সমস্যাটির অনুকূল ব্যাখ্যার জন্য পদার্থবিদ্যার আজকের কোনো প্রচেষ্টা গ্রহণযোগ্য মানের হবে বলে প্রতীয়মান হয় না। কোয়ান্টাম বিদ্যা কিংবা

www.pathagar.com

কম্পিউটারের বিস্ময়কর প্রযুক্তি–সাফল্য আমাদেরকে অনেকটা বিপথে ঠেলে দিতে পারে ; আমরা মনে করতে পারি যে আমরা অনেক কিছুই জেনে গেছি। মূলতঃ এমনটি হবার সুযোগ একেবারে নেই। একই কালে একই প্রভু একই সময়ে মহাবিশ্বের সর্বত্র বিরাজমান থেকে প্রত্যেক ক্ষেত্রের প্রতিটি ক্ষুদ্র পদার্থ কণার আভ্যন্তরীণ শক্তি–মজুদকে এতটা নিশ্চিতির সাথে পরিচালনা করছেন যে জীবন ও অন্যান্য অতিপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী ও তাদের প্রবাহ প্রক্রিয়া নির্ভুলভাবে সম্পন্ন হচ্ছে! আমরা মহাকাশ পর্ব–১, 'আইনস্টাইনের সমীকরণ' প্রবন্ধটিতে এর বাস্তবতা দর্শন করেছি।

প্রশ্ন হলো— যদি দয়াময় এভাবেই সর্বত্র বিরাজমান থেকে থাকেন, তবে তিনি কি করে তা সম্ভব করেন? আমরা নির্ঘাত এ প্রশ্নের জবাব দেয়ার জন্য প্রস্তুত নই; আমাদের জ্ঞান তা সমর্থন করে না। কিন্তু অভিকর্ষ বা সময় এ দুই এর কোনো ভূমিকা এই প্রসঙ্গে কার্যকর কিনা তা ভেবে দেখবার একটা সুযোগ রয়েছে। ধরে নেয়া হয়— মহাবিশ্বের এক অংশের অভিকর্ষীয় পরিবর্তন, তাৎক্ষণিকভাবে মহাবিশ্বের বাকি অন্যান্য অংশে প্রতিফলন সৃষ্টি করে। দয়াময় কি মহাকর্ষীয় শক্তির বিস্তৃত অদৃশ্য যানে পরিব্যাপ্ত হয়ে এই জগৎময় রক্ষণাবেক্ষণের কাজটি করে থাকেন? অথবা দুর্বোধ্য অভিকর্ষ বল যা বিজ্ঞান মস্তকে বিস্ময়ের বিশালতায় বিরাজমান, সে ব্যবস্থাটিই কি দয়াময়ের আরশ কিংবা বাহন কিংবা এমন কিছু যা আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি না? অভিকর্ষ বল তাৎক্ষণিকভাবে মহাবিশ্বের যে কোনো অবস্থানে প্রতিফলিত হতে পারে; এটি সৃষ্টিতে সর্ব দুর্বোধ্য বল, এর উৎপত্তি, প্রকৃতি সবই বিস্ময়কর ও জ্ঞানবুদ্ধির অগম্য। বলটির এই চরিত্রগুলি আমাদেরকে ভিন্নরূপ ভাবনার নিকটবর্তী করে ফেলে।

অন্যদিকে সময় হলো আর এক অতি দুর্বোধ্য অস্তিত্ব। সময় প্রবাহমান না স্থির; খণ্ডিত নাকি অখণ্ড, একক নাকি ভিন্ন ভিন্ন–এ

www.pathagar.com

সবের কিছুই সমাধান জানা নেই। সময়কে বুঝলে আমরা স্রষ্টাকেও বুঝে যেতে পারতাম। সময়ের এই জটিল ধর্ম দুর্বোধ্য অভিকর্ষের মতোই আমাদেরকে স্রষ্টার সাথে সঙ্গত কিনা— এ ভাবনারও নিকটবর্তী করে। হাদিস আল-কুরসীতে বর্ণীত 'আমিই কাল বা আমিই সময়'— এই সূত্রটি আমাদেরকে ভাববার ইন্ধন যোগায় যে, সময়ের এই দুর্বোধ্যতা স্রষ্টার অস্তিত্বের সাথে কোনো না কোনো যোগসূত্র রক্ষা করে। আর স্রষ্টা সৃষ্টিতে তাঁর সাফল্যকে প্রসারিত করার জন্য এই দুই দুর্বোধ্য অস্তিত্ব অভিকর্ষ ও সময়কে বুনে বুনে সৃষ্টির গোড়াপত্তন করেছেন; প্রকৃতিতে অভিকর্ষ আর সময়ই (Gravity and time) সৃষ্টির বুননে সৃষ্টি করে চলেছে যদিও তার দৃশ্যমান প্রকাশটি সময় ও স্থানের (Time and space) বলেই আমাদের চোখে উদ্ভাসিত হয়। সৃষ্টিতে যে দুটি বিল্ডিং ব্লক রয়েছে, তা আমরা এতদিন সময় ও স্থানকেই জেনে এসেছি; এর মধ্যে একটি দুর্বোধ্য; অন্যটি বোধগম্য। কিন্তু আমাদের নতুন দর্শনটি আমাদেরকে নির্দেশ দিয়ে দেখিয়ে দেয়, একটি দুর্বোধ্য মহাবিশ্ব গড়ার বিল্ডিং ব্লক কেবল শর্তহীনভাবেই দুর্বোধ্য হওয়া উচিৎ। এ দুটি বিল্ডিং ব্লক— সময় ও অভিকর্ষ, নাকি তা সময় ও স্থান। সে বিষয়ে চুড়ান্ত রায় পাবার মতো যথেষ্ট জ্ঞান আমাদের হাতে মজুদ রয়েছে বলে মনে হয় না।

যে স্রষ্টা নিজেই সর্বোতভাবে দুর্বোধ্য ; যাঁর সৃষ্টি (মহাবিশ্ব) ধারণার অতীত দুর্বোধ্যতায় বিরাজমান, সে সৃষ্টিতে দুটি বিল্ডিং ব্লক বা মৌলিক উপাদান অবশ্যম্ভাবীভাবে দুর্বোধ্যতার গুণাগুণে বিরাজমান থাকা উচিৎ (A reasonable assumption)। আর সে কারণেই আমরা এই মহাবিশ্বকে স্থান ও কালের তৈরী না বলে কাল ও অভিকর্ষের তৈরী বলে প্রস্তাব করব। আমাদের স্বল্পজ্ঞান ও অস্বীকৃত সত্তা এতবড় দাবি কিংবা বিরোধিতার জন্য কোনোভাবেই বিবেচনা পেতে পারে না; তবে ভাবার জন্য সূত্র হতে কোনো আপত্তি থাকার কথা নয়, কারণ বিজ্ঞানের অনেক জরুরী তত্ত্বই অনেক অখ্যাতজন কর্তৃক প্রস্তাবিত হয়েছে যা অনস্বীকার্য।

www.pathagar.com

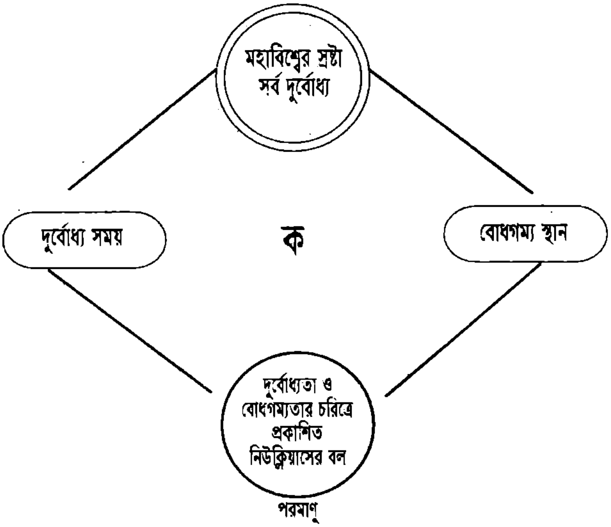

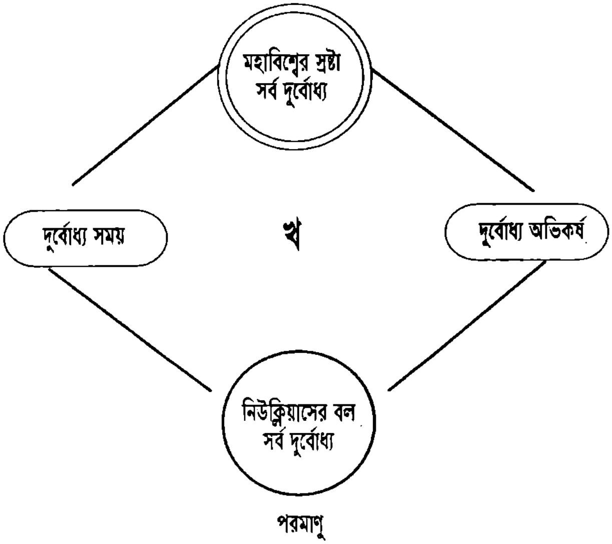

ক চিত্র অপেক্ষা খ চিত্রটি আমাদের জ্ঞানের অধিক নিকটবর্তী

www.pathagar.com

আমরা এই প্রস্তাবের পেছনে একটি কোরানিক অনুমোদন পাই। আমাদের স্রষ্টাকে (আল্লাহ্) তাৎক্ষণিকভাবে সৃষ্টির সর্বত্র বিরাজ করতে হয় এমন একটা উপায়ে যা মানবীয় জ্ঞানে বোধগম্য হবার উর্ধ্বে। এমন একটি অবস্থার জন্য সময় ও অভিকর্ষ (Time and Gravity) জুটি সময় ও স্থান (Time and Space) জুটির চাইতে অধিকতর গ্রহণীয় ও অধিকতর কার্যোপযোগী এবং সর্বতভাবে আনুকূল্যতায় প্রসারিত।

প্রশ্ন হতে পারে— অভিকর্ষ হলো স্থানেরই একটি ফসল ; পদার্থের অস্তিত্ব হতে এর উদ্ভব ; সুতরাং যেখানে পদার্থ নেই, সেখানে অভিকর্ষ নেই ; অতএব সময়–অভিকর্ষ (Time & Gravity) জুটির প্রস্তাব টিকতে পারে না। আমরা বিনীতভাবে পেশ করব যে Big Bang এর পরিবেশে পদার্থ সৃষ্টির বহু বহু পূর্বে এবং অন্যান্য interaction শুরু হবার আগেই সৃষ্টির এই দুর্বোধ্যতম বল অভিকর্ষ পৃথক হয়ে পড়েছিল। সুতরাং অভিকর্ষ কখনই স্থানের উপর নির্ভরশীল নয় যদিও স্থানে পদার্থের ভরের তারতম্যে অভিকর্ষ বলের তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। আমাদের মহাবিশ্বের ধর্মটি এমন যে পদার্থের সমাবেশ ঘটলেই অভিকর্ষের উদ্ভব ঘটে ; কিন্তু সৃষ্টির ইতিহাসে আদি মহাবিশ্বে অভিকর্ষই পদার্থ তৈরী করেছিল।

ছয়

সময় ও দূরত্ব (Time & Space) মিলে এই মহাবিশ্ব গড়েছে— এই হলো আমাদের বিজ্ঞানের অতি আদরের মতবাদ। সৃষ্টির দু'টি বিল্ডিং ব্লকের একটি হলো সময় ও অন্যটি হলো স্থান। এই মতবাদে বিজ্ঞান এখন পর্যন্ত কোনো সংশয় পোষণ করে না।

কিন্তু তার পরেও সংশয় দেখা দিতে পারে—আমাদের মনের শত জিজ্ঞাসার কোনো একটি হয়তো বিজ্ঞানের যে কোনো মতবাদের জন্য

www.pathagar.com

বড় রকমের বিপত্তির জন্ম দিতে পারে। সময় ও স্থান— এই দুইকে সৃষ্টির মৌলিক উপাদান কিংবা Building Block হিসাবে যে পরিচিতি দেয়া হয়েছে, তার উপর আমাদের আস্থাটি আর ধরে রাখব কি না!

সৃষ্টির একটি উপাদান বা building block যে সময়— তাতে আমাদের কোনই সন্দেহ নেই। ত্রি-মাত্রিক জগৎ অবশ্যই স্থবিরতায়, নিস্তব্ধ অন্ধকারাচ্ছন্ন ও অগম্য থাকত যদি সময়ের অস্তিত্বটি না বিরাজ করত। কিন্তু অপর একটি উপাদান বা building block যাকে স্থান বা Space বলে আমরা জানি—সে কি আদৌ কোনো মৌলিক উপাদান বা building block কিনা সে বিষয়ে আমরা একটু খুঁটিয়ে দেখতে চাই।

একটি সম্প্রসারণশীল মহাবিশ্ব ব্যবস্থাই কেবল বস্তুকে বিকাশ হতে সাহায্য করে যা আমরা Big Bang এর গোড়ার দিকে নজর দিলেই বুঝতে পারি। সাব এটমিক পার্টিক্যাল প্রোটনের চাইতেও লক্ষ কোটি গুণ ক্ষুদ্র একটি মহাবিশ্ব পরিণামে ২০ মহাপদ্ম আলোকবর্ষ ব্যাসসম্পন্ন হতে পেরেছে এবং তার মধ্যে গ্যালাক্সি, নক্ষত্র ও জীবনময় গ্রহদের জন্ম হয়েছে— এটিই এর সবচাইতে ভাল প্রমাণ। মহাবিশ্বটি যত ক্ষুদ্র ছিল, তার ভর-ঘনত্ব (mass-concentration) ছিল তত বেশি; ব্ল্যাকহোলের অবস্থা দেখে আমরা এ ঘটনাটি সহজেই বুঝতে পারি। ফলতঃ মহাবিশ্বটি যতই সম্প্রসারিত হবে— অভিকর্ষ বা Gravity'-র তীব্রতা ততই কমে আসবে, অর্থাৎ অভিকর্ষ বলটি দুর্বল হয়ে আসতে থাকবে। অভিকর্ষ বল যতই দুর্বল হয়ে এসেছে (মহাবিশ্বের গোড়ার দিক হতে)—স্থান বা Space ততই বিকশিত হবার সুযোগ পেয়েছে। উদাহরণ দিয়ে বলা যায় যে, একটি ব্ল্যাক-হোলের অভিকর্ষকে দুর্বল করে দিতে পারলে এর বস্তুভর ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়বে অসীম বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে। আমরা সম্প্রসারমান মহাবিশ্বে অভিকর্ষ বলের ভূমিকা কি এ প্রশ্নের জবাবে অন্তত বলতে পারি যে— স্থান বা Space--কে সময়ের সাথে সাথে

www.pathagar.com

বিকশিত হবার জন্য সাহায্য করাই হলো অভিকর্ষ বা Gravity'–র কাজ। অর্থাৎ অভিকর্ষ Space বা স্থানের জন্ম দেয়, বিকাশ ঘটায় আর অভিকর্ষের সূতিকাগারেই পদার্থের জন্ম ও বিকাশ ঘটে! সুতরাং আমরা কি সঙ্গত কারণে বলব না যে Space বা স্থান সৃষ্টির কোনো মৌলিক উপাদান নয়, বরং যে শক্তিটি স্থানকে (Space) অর্থাৎ সৃষ্টিতে বর্তমানে কথিত একটি বিল্ডিং ব্লককে এককভাবে জন্ম দিয়ে যাচ্ছে, সেই শক্তিটিই জরুরীভাবে এই মহাবিশ্বের একটি বিল্ডিং ব্লক বা উপাদান আর অন্যটি (স্থান) হলো তার উৎপাদক মাত্র? আমরা জানি, এই উপাদানটি হলো অভিকর্ষ বা Gravity আর স্থান হলো সময় ও অভিকর্ষের একটি একক ফসল। স্থান কখনই মহাবিশ্বের একটি মৌলিক উপাদান নয়— এ হলো আমাদের প্রস্তাব।

মনে করুন, সময় ও অভিকর্ষের 'সুপে' এই মহাবিশ্বের সমস্ত পদার্থ ভর ভাসছে। এই 'সুপে' সময় একটি অদৃশ্য, অজ্ঞেয় ও দুর্বোধ্য অস্তিত্ব। একইভাবে অভিকর্ষও একটি অদৃশ্য, অজ্ঞেয় ও দুর্বোধ্য বল। অভিকর্ষ হলো একটি সর্বস্বাধীন অস্তিত্ব যা প্রতিটি প্রাকৃতিক ঘটনাকে প্রভাবিত করে যেমন সময় হলো একটি সর্ব স্বাধীন অস্তিত্ব যা প্রতিটি ঘটনা প্রবাহের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অভিকর্ষ কখনো শোষিত হয় না, প্রতিবিম্বিত হয় না, এর কোনো দ্রুতি কিংবা বেগের চরিত্র প্রকাশ করে না (যদিও অনেকে মনে করেন যে, অভিকর্ষ প্রভাব আলোর গতিতে চলমান হতে পারে; আলোর গতি এ কারণে যে, এটি হলো একটি 'কসমিক লিমিট' কিন্তু বিষয়টি আর সত্য নয়। বিজ্ঞানীগণ কোনো কোনো শক ওয়েভের গতি আলোর গতির চাইতে বেশি— এ তথ্য আজ অবহিত রয়েছেন। আপনি কোনো বস্তুকে পুড়িয়ে, গলিয়ে, উবিয়ে দিয়ে, তড়িতাহত করে, চৌম্বকত্ব দিয়ে—যা কিছু দিয়েই প্রভাবিত করতে প্রয়াস নিন— অভিকর্ষ বস্তুটির সাথে সমান ব্যবহারই করবে; একটুও ভিন্ন নয়। অভিকর্ষ সৃষ্টির সকল কিছুর উপর তাৎক্ষণিক প্রভাব বিস্তার করে (তা অতিশয় ক্ষুদ্র হলেও), এর চরিত্র সর্বত্র একই অভিন্ন। William de Sitter তার Kosmos পুস্তকে মন্তব্য করেছেন যে, পদার্থবিদ্যার সকল রাজ্যে 'প্রকল্পিত জ্ঞান' বা

www.pathagar.com

hpotheses অত্যন্ত উল্লেখযোগ্যভাবেই কৃতকার্য ফলাফল নিয়ে আসে— শুধুমাত্র অভিকর্ষ ছাড়া। অভিকর্ষকে একবারে নির্বিকার (Immune to other natural phenomena) মনে হয়। In the course of history, a great may number of hypotheses have been proposed in order to explain gravitation, but not one of these has ever had the least chance, they all have been failures....... (Gravity) frastrates all our attempts to penetrate into its internal mechanism. অভিকর্ষ সম্পর্কে কোনো জ্ঞানই দানা বাঁধে না, অভিকর্ষের ভেতরে কোনোভাবে প্রবেশ করা যায় না। জ্ঞানের এ অঞ্চলটি কেবল দুর্বোধ্যতায় সুরক্ষিত।

সময়ের দুর্বোধ্যতা ও অভিকর্ষের দুর্বোধ্যতা সম শ্রেণীরই মনে হয়। এ কারণে উপাদান হিসাবে সময় ও অভিকর্ষের নৈকট্য যতটা হতে পারে, বিষম শ্রেণীর জুটিটি সময় ও স্থান-এর নৈকট্য ততটা হবার মতো নয়। যেমন সূক্ষ্ম সিমেন্ট ও সূক্ষ্ম বালিতে তৈরী করা মিশ্রণটি যতটা কার্যোপযোগী ও যতটা শক্তিশালী, সূক্ষ্ম সিমেন্ট ও বড় বোল্ডার দিয়ে ততটা উপযোগিতা আশা করা যায় না। আমাদের এই মহাবিশ্ব অতি নিখুঁত সৃষ্টি ; এর সূক্ষ্মতা ও নিখুঁততার চরিত্র বলে যে সৃষ্টির দুটি বিল্ডিং ব্লক কেবল সূক্ষ্ম ও সমরূপ-চরিত্রে গঠিত হওয়ার সম্ভাবনাটি সূক্ষ্ম ও স্থূল উপাদানে গঠিত হওয়ার সম্ভাবনার চাইতে বেশি। চরিত্রের সমরূপতা এবং প্রকাশিত চরিত্রের ঐক্যে আমাদের দাবি করার সুযোগ রয়েছে যে— এই মহাবিশ্ব যে দুটি বিল্ডিং ব্লকে তৈরী, তার একটি হলো সময় ও অন্যটি অভিকর্ষ। অর্থাৎ আমরা Time and Space এর জুটির চাইতে Time and Gravity-এর সম্ভাবনা অধিকতর গ্রহণীয় দেখতে পাই।

আমাদের এই প্রস্তাব কিন্তু আইনস্টাইনের স্থান-কাল চরিত্রের সঙ্গে কোনোরূপ বৈপরীত্য (Contradiction) সৃষ্টি করে না। Time ও Space এর পরিবর্তে মহাবিশ্বের বিল্ডিং ব্লক Time ও Gravity হলেও সময় ও স্থান পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে অদৃশ্য বুননেই (inter-woven) বিরাজ করবে। Gravity যদি দুটি building block এর

www.pathagar.com

একটি হয়ে পড়ে— তাতে সময়ের মাত্রিকতার (dimentional character of time) কোনো ক্ষতি বা ঘাটতি পড়ে না। আমাদের নতুন দর্শনেও সময় একটি ডাইমেনশন হিসাবে বিরাজ করে।

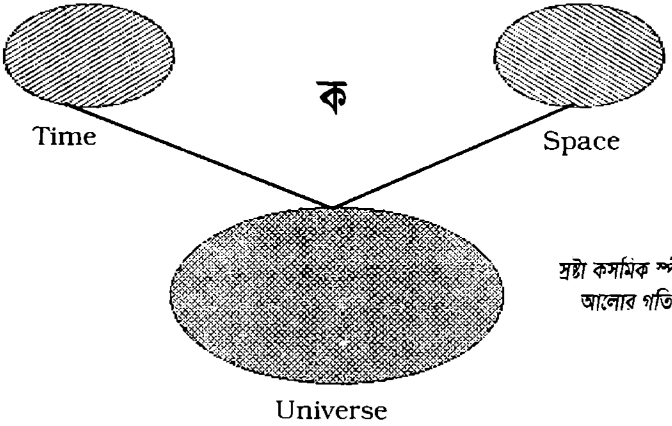

স্রষ্টা কসমিক স্পীড লিমিট বা আলোর গতিতে সীমাবদ্ধ।

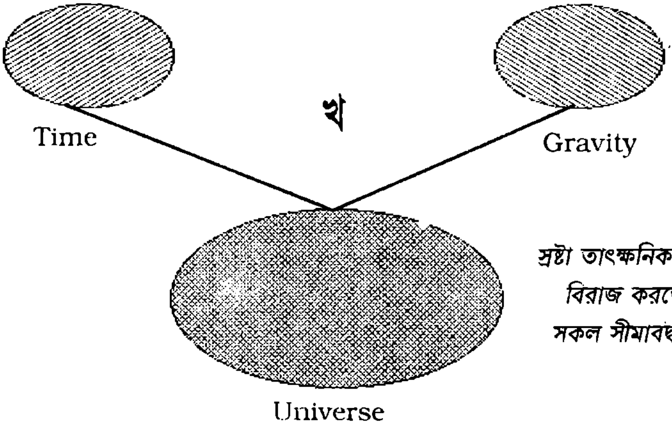

স্রষ্টা তাৎক্ষনিকভাবে সর্বত্র বিরাজ করতে সক্ষম ও সকল সীমাবদ্ধতা উর্ধ্বে।

আমরা চিত্র ক –এর স্থলে চিত্র খ –এর প্রস্তাব রাখছি।

প্রকৃতপক্ষে Space হলো সময় ও অভিকর্ষের সুপে ভাসমান একখণ্ড বুদবুদ! অনেকটা যেন পানিতে ভাসমান একখণ্ড বরফের

www.pathagar.com

সীট। একজন সাধারণ মানুষ প্রত্যক্ষ করবেন যে— তাপীয় অবস্থা ও পানি মিলে এই বরফের জন্ম হয়েছে। বরফ তৈরীর জন্য বিল্ডিং ব্লক হিসাবে আমরা যদি বিবেচনা করতে চাই, তবে তাপীয় পরিস্থিতিকে অবিচ্ছেদ্যতার গুণে প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ থাকে; কিন্তু পানিকে নয়। পানি একটি যৌগ, যার নিজস্ব বিল্ডিং ব্লক হলো হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন ; অনুরূপভাবে মহাবিশ্বের বিল্ডিং ব্লক Space এর উপাদান হলো সময় অভিকর্ষ। এ দৃষ্টিকোণ হতে Time and Space এর চেহারা দাঁড়ায়— সময় + (সময় + অভিকর্ষ)। ফলতঃ এই দর্শনটিতে কোথাও না কোথাও একটি ত্রুটি রয়েছে, এ উপলব্ধিটি আমাদের মাঝে স্বাভাবিক কারণেই জন্ম নিতে বাধ্য! অতএব সঙ্গত কারণেই মহাবিশ্বের বিল্ডিং ব্লক বলতে 'সময় + সময় + অভিকর্ষ' নয় বলে আমরা 'সময় + অভিকর্ষ' এই সিদ্ধান্তটিতেই এসে স্থির হবার সুযোগ লাভ করি।

যদি প্রশ্ন করা যায়— Gravity কি কোনো Dimention, তবে আমাদের উত্তর কি হতে পারে? এখানে আমরা কেবল এইটুকু সম্ভাবনা দেখতে পাই যে— স্থান ও কালের চারটি ডাইমেনশনকেই Gravity গলাধঃকরণ করে ফেলতে সক্ষম ; ব্ল্যাক-হোল, কসমিক স্ট্রীং কিংবা প্লাঙ্ক-ইউনিভার্স এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সে দৃষ্টিকোণ হতে Gravity কোনো ডাইমেনশন হবার স্থলে ডাইমেনশনের উৎস হিসাবে চিহ্নিত হতে পারে। Houghton Mifflin এর Investigating the Earth এর একটি ক্ষুদ্র উদ্ধৃতি— We donot yet know what causes gravity, but we know what gravity does-এর মধ্যে অভিকর্ষ সম্পর্কে যে চরিত্র ভেসে ওঠে, তাতে স্পষ্টতই বোঝা যায় যে— এখনো আমরা এই দুর্বোধ্যতাকে যেভাবে দেখতে চাই, আমাদের প্রত্যাশা অনুসারে তা বাস্তবে প্রতিফলিত না-ও হতে পারে।

সাত

এরিস্টোটল যে স্রষ্টাকে rio faine ant, unmoved prime mover বলে আখ্যায়িত করেছিলেন— কার্ল সেগানের হাতে সে স্রষ্টা হলেন,

www.pathagar.com

A Do Nothing King, an outsized, light skinned male with a long white beard, sitting on a throne some where up there in sky, busily tallying the fall of every sparrow– নিস্কর্মার বাদশা আর নদীর ঢেউগুনা স্রষ্টা জ্ঞানী–বিজ্ঞানীদের হাতে এতটা হীনভাবে লাঞ্ছিত হবেন সেটাও মেনে নেয়া যায়। কিন্তু প্রশ্নটি হলো— কার্ল সেগান বিজ্ঞান ভাল বুঝেছেন, আর তার দৃষ্টিতে স্রষ্টাকে নিস্কর্মা হওয়া ছাড়া অন্য কোনো পথ খোলা থাকার কথা নয়— কারণ বস্তুর সাব–এটমিক প্রাণচঞ্চলতায় কেউ স্রষ্টাকে দেখতে পারার কথা নয়; স্রষ্টা আছেন কিংবা স্রষ্টা নেই এই বিতর্কের কাছে সূক্ষ্ম পদার্থ কণা নির্বিকার ও আবেগহীন। বিজ্ঞানীগণের এ বাণী বা দাবিকে যদি আমরা মেনে নেই— তবে ধরে নিতে হবে যে, জ্ঞানটি চরম ও নির্ভুল এবং এরপরে আর কোনো জানার সম্ভাবনা নেই।

আপেক্ষিকবাদ আমাদেরকে এমন কোনো চরম জ্ঞানের সপক্ষে কোনোরূপ স্বীকৃতিই দিতে পারে না। আমরা Luther W. Skelton এর ভাষায় শুধু এটুকুই নিবেদন করতে চাই যে, Our awarenss does not extend beyond these clear and vital perceptions of satisfying simple, immediate demands. যদিও তার these clear and vital perceptions স্রষ্টা বিষয়ক আলোচনার সাথে প্রাসঙ্গিক নয়— তথাপিও, মানুষ যে তার নিকটবর্তী চাহিদার চাইতে বেশি কিছু জানতে পারে না অনেকটা সৃষ্টিগতভাবেই, সে চরিত্রটির দিকে ইঙ্গিত করতে চাই। এতটা সীমাবদ্ধতা যে মানুষের— যে স্রষ্টাকে নিস্কর্মার বাদশা বলে স্রষ্টার পিণ্ডি উদ্ধার করলে তাঁর কতদূর যায় আসে, আমরা সে বিষয়টি নিয়ে মাথা ঘামাতে রাজি নই। কিন্তু কোরআনের স্রষ্টা এই Do Nothing King হবার দোষে মুহ্যমান নন তা তাঁর আয়াতসমূহে স্পষ্টভাবে পাঠ করার সুযোগ রয়েছে— *"তিনিই আল্লাহ্, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং উহাদের অন্তর্বর্তী সবকিছু সৃষ্টি করিলেন ছয়টি কাল–পর্যায়ে। অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হইলেন (৩২:৪) তাঁহার এই আসন আকাশসমূহ ও পৃথিবী*

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মহাবিশ্বের সর্বদূর ও সর্ব নিকটবর্তী সকল বৃহৎ কিংবা ক্ষুদ্র অস্তিত্বে একই সাথে প্রতিফলিত হবে যদিও তা হতে পারে অতিশয় দুর্বল কিংবা ক্ষীণ! অভিকর্ষের এই বিশেষ গুণটি এর অন্যান্য দুর্বোধ্য গুণাগুণের সাথে বিসংশ্লিষ্ট থেকে একটি নির্দিষ্ট আসনে কিংবা আরশে উপবিষ্ট স্রষ্টার জন্যও এই মহাবিশ্বের সর্বত্র সমভাবে একই সময়ে কার্যকর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার বিষয়টিকে সত্য ও সম্ভব করে তুলতে পারে। এর জন্য যা প্রয়োজন, তা হলো মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তুকণাকে 'অভিকর্ষ সুপে' কিংবা অভিকর্ষ সমুদ্রে ডুবিয়ে রাখা, যেন প্রতিটি ক্ষুদ্রতম বস্তুকণাও যেন স্রষ্টার সঙ্গে যোগাযোগের ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমটি হতে হারিয়ে না যায়। এমন একটি ব্যবস্থা স্রষ্টার জন্য সর্বক্ষুদ্র কণিকা হতে সর্ববৃহৎ সুপার গ্যালাক্সির নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাটি এক-কেন্দ্রিক ও অতি সহজসাধ্য করে তুলতে পারে।

ইতিপূর্বে আমরা 'হাদিস আল-কুরসীর' প্রসঙ্গ টেনেছিলাম। বলা হয়ে থাকে— কোরআনে বিশেষ কারণে যে সকল তথ্য স্থান পায়নি, তারা 'হাদিস আল-কুরসী' হয়ে মানুষের কাছে পৌঁছেছে। হাদিস আল-কুরসীর মাঝে সেই তথ্য— *"আমিই কাল"* যাতে আল্লাহপাক নিজেকেই সময় হিসাবে ঘোষণা দিচ্ছেন। আমরা যদিও তত্ত্বের খাতিরে সময়কে আপেক্ষিক বলে জেনেছি, তথাপিও সত্য যে সকল খণ্ডিত ও স্থানীয় সময়গুলি একটি আদি-সময় ধারার স্রোতে প্রবাহিত একক অখণ্ডতার মাঝে সমর্পিত ; এ সত্যটি বিজ্ঞানে অপ্রমাণিত থাকা সত্ত্বেও আমাদের নিজেদের বোধশক্তি দিয়ে বুঝতে পারি— যেমন আমরা বুঝতে পারি, আমরা কিছু বিশ্বাস কিংবা অবিশ্বাস করি, বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা না থাকলেও বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের অনুভূতি প্রতিটি মানুষ ও প্রাণীতে প্রত্যক্ষ করা যায়।

নিউটন একটি চরম (absolute) সময়ের প্রস্তাব করেছিলেন— আইনস্টাইন এসে ঐ বিশ্বাসকে ভেঙ্গে দিয়ে খণ্ডিত ও স্থানীয় সময়ের তত্ত্ব দান করলেন। আমরা এখনো নিশ্চিতভাবে বলার যোগ্যতায় নেই যে নিউটন মিথ্যা এবং আইনস্টাইন সত্য। তবে সকল খণ্ডিত সময়গুলি যদি আদি সময় ধারার মহাসমুদ্রে ভাসমান থাকে— তবে

www.pathagar.com

আইনস্টাইনবাদটি এখন যেমন দেখায়, তেমনি দেখাবে। অগভীর জ্ঞানে আইনস্টাইনের ধারণা সত্য হবে এবং গভীরতার প্রশ্নে সত্য হবে নিউটন। কিন্তু একই সাথে যদি উভয় বিজ্ঞানীর তত্ত্ব বিচার্য হয়— তবে দৃশ্যতঃ নিউটনকে মিথ্যা ও আইনস্টাইনকে সত্য বলে মনে হবে। কিন্তু এমন একজন দর্শকের কথা যদি ভাবতে পারা যায় যিনি মহাবিশ্বের সকল ঘটনাকে একত্রে প্রত্যক্ষ করবার ক্ষমতা রাখেন, তবে, তিনি আইনস্টাইন ও নিউটন উভয়কেই অনুমোদন করতে পারেন। আশা করা যায়— তিনি খণ্ডিত ঘটনাগুলি একটি অখণ্ড সময়ের সমুদ্রে ভাসমান দেখতে পাবেন। তবে আল্লাহ্ নিজেই যদি সময় হয়ে যান— কিংবা সময়ের সমুদ্রটি যদি আল্লাহরই একটি ক্ষমতার অবিচ্ছিন্ন অংশ হয়— তবে নিউটনকেই আমরা অধিক গভীর দৃষ্টিসম্পন্ন বলে ধরে নিতে বাধ্য হব। এ ক্ষেত্রে আমাদের জন্য সুবিধা হবে যে— আমরা স্রষ্টা ও সৃষ্টিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যতটা অসুবিধায় পতিত হই— সেখানে একটা আলোর ঝলক দেখতে পাই। সময় যদি আল্লাহ্র শক্তির নিরবচ্ছিন্ন ধারা ও অস্তিত্বের অংশ হয়, তবে সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়নের দুটি বিল্ডিংব্লকের একটি 'সময়'কে তিনি সর্বত্র তাঁর নিজ স্বাধীনতায় নিয়োগ ও ব্যবহার করতে সক্ষম হবেন কারণ, তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। অন্যদিকে অভিকর্ষের মতো একটি ব্যাখ্যার সাধ্যাতীত অস্তিত্বও তাঁর শক্তির নিরবচ্ছিন্ন অংশ কিনা এ সম্পর্কে আমাদের ভাববার একটি সূত্র সৃষ্টি হয়। তবে সত্য যে, যেহেতু তাঁর 'আসন' কিংবা 'আরশ' কিংবা 'বাহন' মহাবিশ্বের সর্বত্র ও ক্ষুদ্রতম কণিকা পর্যন্ত বিস্তৃত বলে আমরা কোরআনের আয়াত হতে অবগত হই, সেহেতু, আমাদের ভাবার সুযোগ থাকে যে, হয়তো এই 'অভিকর্ষ'ই তাঁর আরশ কিংবা আরশের ধারক। আমাদের এ অনুমান যদি সত্য হয়, তবে যে স্রষ্টার হাতে সময় ও অভিকর্ষ, এমন দুটি সর্বশক্তিশালী হাতিয়ার রয়েছে— সে স্রষ্টা যা ইচ্ছা, যেভাবে ইচ্ছা সৃষ্টি করার সামর্থে রয়েছেন। সে স্রষ্টা এক বা একাধিক মহাবিশ্ব তৈরী করে ফেলতে পারবেন খেলনা তৈরী করার মতো করে!

'মহাবিশ্ব তৈরী করার মুহূর্তে স্রষ্টার অবস্থানটি কোথায় ছিল?" —স্টিফেন হকিংস সহ অনেক বিখ্যাত বিজ্ঞানী এ জিজ্ঞাসাটির

www.pathagar.com

অবতারণা করেছেন। এখন আমাদের হাতে এর উত্তর মজুদ রয়েছে যথার্থই। তিনি সময় ও অভিকর্ষের তৈরী বাহনে চড়ে তৈরী হওয়া মহাবিশ্বটির দিকে তাকিয়েছিলেন— আর ভাবছিলেন, কখন বাঁদরের দল লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে বলবে— মানুষ হয়ে গেছি আর তাদের বংশধর স্টিফেন হকিংস হুইল চেয়ারে বসে আকাশের দিকে তাকিয়ে এ প্রশ্নটি করবে— স্রষ্টা কোথায় ছিলো? স্রষ্টার স্বাধীনতা ছিল কি না ইত্যাদি।

"তাঁহার আসন মহাবিশ্বের সর্বত্র (আকাশসমূহে) ও জীবনময় জগৎ (সমূহে)-এর সর্বত্র ব্যাপিয়া বিদ্যমান"। এই আয়াত আমাদেরকে যে চিত্র দেয় তাও প্রকারান্তরে স্মরণ করিয়ে দেয় যে— হয়তো রহমানের আরশ অভিকর্ষ ও সমজাতীয় কোনো অস্তিত্বে বাহিত। ফলতঃ তিনি একসাথে সর্বত্র সর্বখানে সমভাবে প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ মেনে থাকতে সক্ষম রয়েছেন। আমরা দেখতে পাই, কোরআনের স্রষ্টা আলোকময় সাদা শ্মশ্রুমণ্ডিত হাতলযুক্ত চেয়ারে বসা বৃদ্ধ নিস্কর্মার বাদশা নন, তিনি নদীর ঢেউ গুনছেন না ; তিনি প্রতিটি মুহূর্তে সৃষ্টির সর্বত্র সমভাবে বিরাজ করছেন, নিয়ন্ত্রণ করছেন যদিও তিনি মহাসম্মানিত আরশেই সমাসীন ! তাঁর আরশটি সর্বত্রই বিদ্যমান !

আট

আমরা এখন আমাদের শুরুর দিকের আলোচনায় ফিরে যেতে চাই। সৃষ্টিতে চরম বলতে কেবল এক স্রষ্টাই রয়েছেন, আর বাকি সমস্ত কিছুই আপেক্ষিক; একটির তুল্যে অন্যটি। তুল্যতার এই পরিবেশে সময়ও চরম নয়, স্থানও চরম নয় যা আগে বিশ্বাস করা হতো। সেই চরমতা বোধটি আর সত্য নয়। আপেক্ষিকবাদ যতগুলি সত্য প্রকাশ করছে— তাদের মধ্যে সবচাইতে বেশি বলিষ্ঠতায় প্রস্তাব করছে আরো একটি বিষয়ঃ স্রষ্টার অনন্যতা বা তাওহীদবাদ। স্থান ও কালের প্রকারে কোনটিই অনন্য নয়, কোনটিই চরম বা

www.pathagar.com

absolute নয় এবং এই সৃষ্টিতে absolute বলে আর কিছুই নেই। সমস্ত সৃষ্টি জুড়ে যেখানে একটি কিছুও চরম নয়— সেখানে কোরআন এক চরমতার দাবি নিয়ে এসেছে— *"ইহার উপর অবস্থিত যাবতীয় বস্তুই লয়শীল— আর কেবল তোমার সম্মানিত প্রভুর সত্তা লয়হীন ও অনন্তস্থায়ী (৫৫:২৬/২৭)। আল্লাহ্। তিনি তো সমুচ্চ সর্বমহান (৩১:৩০) তোমার প্রতিপালক! তিনি তো সর্ব পরাক্রমশালী দয়ালু (২৬:১৭৫) তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত আর কোনো উপাস্য নাই; দুনিয়া ও আখিরাতের প্রশংসা শুধু তাঁহারই; বিধান শুধু তাঁহারই, তোমরা কেবল তাঁহার দিকেই প্রত্যাবর্তন করিবে" (২৮:৭০)।*

আল্লাহ্পাকের চরম অনন্যতার প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই ২:২৫৫ আয়াতেও, *"আল্লাহ! তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ্ নাই। তিনি চিরঞ্জীব, স্বাধিষ্ঠ বিশ্বধাতা। তন্দ্রা অথবা নিদ্রা তাঁহাকে স্পর্শ করে না। আকাশ ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সমস্তই তাঁহার।...... তাঁহার অবস্থান আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সর্বত্র ব্যাপৃত; ইহাদের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁহাকে ক্লান্ত করে না। তিনি মহান, শ্রেষ্ঠ"।*

একটি সর্ব আপেক্ষিক মহাবিশ্বে শুধুমাত্র একজন সর্বচরম স্রষ্টার বিবেচনাটি আপেক্ষিকবাদের নির্দেশ হতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন তাকে আমরা কোরআনের আয়াতের সাথে বিবেচনা করি। আমাদের স্রষ্টা একজন সর্বচরম স্রষ্টা, একজন সমকক্ষহীন স্রষ্টা এবং একজন অনন্য স্রষ্টা— এই তথ্য আমাদেরকে কোরআন দান করে। সর্ব আপেক্ষিকতার পরিবেশে একজন অনন্য ও চরম স্রষ্টার আসনটি চমৎকারভাবে সৃষ্টিতে একক স্রষ্টার একক নিয়ন্ত্রণের বৈশিষ্টের প্রতি ইঙ্গিত দেয়। *"যদি আল্লাহ্ ব্যতীত বহু ইলাহ্ থাকিত এই মহাবিশ্বে কিংবা পৃথিবীতে, তবে সকলেই ধ্বংস হইয়া যাইত (ক্ষমতার দ্বন্দ্বে) অতএব, উহারা যাহা বলে, তাহা হইতে আরশের অধিপতি অতি পবিত্র" (২১:২২)।* আপেক্ষিকবাদের জ্ঞান বিস্ময়করভাবে আমাদেরকে এই অনন্ত সৃষ্টি জুড়ে এক ও অভিন্ন প্রভুর একত্ব বা তাওহীদ বুঝতেও সাহায্য করে।

www.pathagar.com

আপেক্ষিকবাদের একটি বিশেষ অবলোকন হলো যে সৃষ্টিতে প্রকৃত পরিমাপের একক বলতে কিছু নেই। আমরা আমাদের সুবিধার জন্য কোনো কোনো মানকে একক হিসাবে বিবেচনা করি। সময়ের ক্ষেত্রেও তা–ই। ঘন্টা, বৎসর, কাল ইত্যাদি সবই শুধু আপেক্ষিক ও অনির্দিষ্ট সময়ের মাপ। আল–কোরআনের আয়াতে এ চিত্রটি অতি সফলভাবে প্রস্ফুটিত হতে দেখা যায়; *"যেদিন তিনি উহাদিগকে একত্রিত করিবেন, সেদিন তাহাদের মনে হইবে যেন উহাদিগের অবস্থিতি দিবসের মুহূর্তকাল ছিল মাত্র— উহারা পরস্পরকে চিনিবে" (১০:৪৫)। কিংবা "তোমরা তোমাদের গৃহে তিন দিন জীবনভোগ করিয়া লও" (১১:৬৫)।* উভয় আয়াতেই আমাদের বিশাল পৃথিবী জীবনটি যে ক্ষুদ্র কিছু, তার প্রস্তাব পাওয়া যায়। অথবা— *"আল্লাহ্ বলিবেন, তোমরা পৃথিবীতে কত সময় অবস্থান করিয়াছিলে? (২৩:১১২) উহারা বলিবে— আমরা অবস্থান করিয়াছিলাম একদিন অথবা দিনের কিছু অংশ (২৩:১১৩) আল্লাহ্ বলিবেন— তোমরা অল্পই অবস্থান করিয়াছিলে যদি তোমরা জানিতে" (২৩:১১৪)।* আমরা দেখতে পাই, বিচার দিবসে দয়াময়ের জিজ্ঞাসায় প্রার্থীদের উত্তরে পৃথিবীর জীবনটি মনে হবে একটি দিন বা দিনের কিছু অংশ! আল্লাহ্পাকের ভাষায় এ সময়–দৈর্ঘ্যটি আরো অল্প বলেই বিবেচিত হয়ে থাকবে। সময়ের অনির্দিষ্টতা প্রকাশ পেয়েছে আরো কিছু আয়াতে—

"অতঃপর একদিন সমুদয় কিছুই তাঁহার কাছে উত্থিত হইবে— সেদিনের হিসাব তোমাদের গণনার সহস্র বৎসরের সমান" (৩২:৫) কিংবা ফিরিস্তারা ও রূহ আল্লাহর দিকে উর্ধ্বগামী হয় এমন এক দিনে যাহা পার্থিব ৫০ হাজার বছরের সমান" (৭০:৪)। সময়ের একক যে একটি অনির্দিষ্ট মান (যা আপেক্ষিকবাদ বলে), এটি স্থির নয়— আপেক্ষিক এ সত্যটি আমরা কোরআনের এ আয়াতগুলি হতে উপলব্ধি করতে পারি। আপেক্ষিকবাদের মূলধারা কোরআনের আয়াতের সাথে এক ও অভিন্ন হয়ে যায়।

www.pathagar.com

নয়

আপেক্ষিকবাদের অনন্য অবদানটি ছিল সময়কে একটি ডাইমেনশন হিসাবে পরিচয় করানো। সময় স্থানীয় এবং একই সাথে সময়ের অগণিত পৃথক পৃথক প্রবাহ চলতে পারে— মানুষ এ বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত ছিল না। মানুষের কাছে সময়ের জ্ঞানটি এমন ছিল যেন একটি যন্ত্রের মতো সূর্য ঘুরে ঘুরে সময়কে বাড়িয়ে দিন মাস, বৎসর আর কাল তৈরী করে। সময় একটি প্রবাহমান নদীর মতো অতীতের প্রান্ত হতে ভবিষ্যতের সীমানার দিকে এগিয়ে যায়।

জ্ঞানের এই মনোবৃত্তি হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর মেরাজ ভ্রমণের ঘটনাকে গল্প বলে বিরুদ্ধবাদীগণের কাছে সে যুগে মনে হয়েছে। অযুর পানি গড়িয়ে যাওয়া অবস্থার মধ্যে অর্থাৎ কয়েক সেকেণ্ড সময়ের মধ্যে মহানবী (সঃ) সপ্তাকাশ ভ্রমণ করেছেন এবং আল্লাহপাকের প্রত্যক্ষ দর্শন পেয়ে এসেছেন। এ ঘটনাটি বিশ্বাসীগণ বিশ্বাস করেছেন শ্রদ্ধায় ও ঈমানে; অবিশ্বাসীগণ সম্ভাব্যহীনতার দিকটিকে নিয়ে এর সত্যতার প্রতি সমর্থন না দিয়ে সমালোচনা করেছেন। এর কারণ ছিল— সে যুগের মানুষ Time dilation এর সম্ভাব্যতা সম্পর্কে কিছুই জানত না যা আজকের শত শত ছবি দেখে অভিজ্ঞ একটি শিশুও জানে। যদিও আমাদের পৃথিবীর প্রযুক্তিতে এখনো সশরীরে এবং pico/femto second এ ক্রিয়াশীলতার কিংবা দ্রুতির বিষয়টি আয়ত্তে আনা সম্ভব হয়নি, তথাপি এর ফলাফলটি যে এমন বা এমন ঘটনা যে সম্ভব, এ তথ্যটি আজ আমাদের জানা। এই time dilation এর প্রযুক্তি ঘটিয়ে UFO রা আন্তঃনাক্ষত্রিক/আন্তঃগ্যালাটিক ভ্রমণে আমাদের পৃথিবীতেও আনাগোনা করে বলে বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস। UFO রা লক্ষ লক্ষ বৎসরের পথে চলার সময় এই প্রযুক্তি বা অনুরূপ কিছুতে সময়ের কার্যকারিতাকে নিজেদের উপরে শূন্য করে রাখতে কিংবা তাদের সময়কে প্রলম্বিত করতে সমর্থ্য বলে মনে হয়। Time dilation এর

www.pathagar.com

প্রক্রিয়াটি এমন যে, একটি সময় তীর যখন ঘটনাকে এক দিকে প্রবাহিত করে নিয়ে যাচ্ছে, সেই প্রবাহে বসেই অন্য একটি সময় তীর অতিশয় দ্রুততায় সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ ঘটনার প্রবাহ সৃষ্টি করেছে; মূলতঃ এ দুটি ঘটনাই যেন দুই দুটি পৃথক মহাবিশ্বে আলাদাভাবে ঘটা উচিৎ ছিল। সময় কেবল চতুর্থ ডাইমেনশনই নয়; তার মাঝে আরো rolled up ডাইমেনশন রয়েছে, এমন একটি আচরণের সাথে আমরা এ ধরনের ঘটনায় পরিচিত হই।

সময়–সুড়ং এ কালের আপেক্ষিকতা দর্শন করছেন আপনি। ধরুন টেলিস্কোপ দিয়ে ভিনজগতের দৃশ্য অবলোকন করবার সময় একটি সুর্দশন বালক আপনার স্নেহের দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছে। আপনার প্রযুক্তি যদি ততটা যোগ্যতাসম্পন্ন হতো যে আপনি ত্রি–কাল দর্শন করতে পারেন, তবে দেখতেন— বালকটি একদিন যুবক ছিল, তারপর সে থুরথুরে বৃদ্ধ !

কোরআন সময়ের এ চরিত্রের প্রতি নিখুঁত ইঙ্গিত করেছে। ‘আসহাবুল কাহ্‌ফ’ এর ঘটনার বর্ণনাকারী আয়াতসমূহে time dilation এর চিত্রটি প্রস্ফুটিত হয়েছে এভাবে— *“তোমারা কত কাল অবস্থান করিয়াছ?— কেহ কেহ বলিয়াছিলেন, একদিন অথবা এক দিনের কিছু অংশ” (১৮:১৯)।* আসহাবুল কাহ্‌ফ এর দলটি ধর্ম গ্রহণ করার পর বিপাকে পতিত হয়। আল্লাহ্‌পাক তাদেরকে এক নির্জন গুহায় নিদ্রিত করেন। তারা যখন উত্থিত হয়, তখন কত সময় তারা ঘুমে ছিলেন এ বিষয়ে কোরআন তথ্য দেয়— *“উহারা উহাদিগের গুহায় ছিল তিনশত বৎসর ও আরো নয় বৎসর” (১৮:২৫)* অথচ এত দীর্ঘকাল পার হবার পর তারা পরস্পরের মধ্যে বিতর্কে লিপ্ত ছিলেন যে, তারা ঘুমে কাটিয়েছেন মাত্র একটি দিন কিংবা তার একটি অংশ মাত্র! সময় প্রবাহের এ চরিত্রটি

www.pathagar.com

অপেক্ষিকবাদের time dilation এর চিত্রই অঙ্কিত করে! যদিও আমরা black-hole এর ব্যবহার ছাড়া সময়কে দাঁড় করিয়ে দেয়ার প্রযুক্তি বা সম্ভাব্যতার কথা ভাবতে পারি না, কিন্তু আল্লাহপাক ঘটনাটি এমনিতে ঘটিয়ে দিতে পারেন, কারণ তিনি সর্ব বিজ্ঞানময়। এই ঘটনাটি দিয়ে কোরআন বোঝাতে চায় যে মেরাজে ভ্রমণের ঘটনাটি অনুরূপ সম্ভাব্যতায় উদ্ভাসিত। তবে দুঃখজনক যে, আমরা এ প্রযুক্তির কোনো কিছুই অর্জন করতে সক্ষম হইনি, ফলতঃ এ বিষয়ে পরিষ্কার কিংবা ব্যবহারিক জ্ঞান না হওয়ার শূন্যতায় আমাদের চিন্তাশক্তি সীমাবদ্ধতার দোষে দুষ্ট থাকাই স্বাভাবিক।

দশ

মহাবিশ্বে শক্তির পরিমাপ অসীম! এই শক্তি পদার্থে নিহিত শক্তিভাণ্ডার। পূর্বে উল্লেখ করেছি, পদার্থ ও শক্তির অনুপাত 1:1017 বা ১ গুণ পদার্থের ধ্বংসে ১০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০ গুণ শক্তি তৈরী হয়। এ হলো সবচাইতে সরল অনুপাত; শক্তির অপচয় এই আনুপাতিক চিত্রে বিবেচনা করা হয়নি।

আমরা পূর্বেই আমাদের মহাবিশ্ব সম্পর্কে একটি ধারণা পেয়েছি। একশত মহাপদ্ম সংখ্যক গ্যালাক্সিতে অধ্যুষিত এই মহাবিশ্বের যে বিশাল বস্তু সম্ভারের চিত্র পাওয়া যায়; তা হলো প্রদর্শিত ১০%; বাকি ৯০% হলো কালো পদার্থ বা অদৃশ্য পদার্থ (Dark matter)। এ সুবিশাল পদার্থ হতে যে বিপুল শক্তি উৎপন্ন হবে তা কেবল আমাদেরকে অসীমতার স্কেলে নিয়ে যায়। ২০ মহাপদ্ম আলোকবর্ষের যে বিস্তৃতি, তা সকল অর্থেই সীম হওয়া সত্ত্বেও বিজ্ঞানের পরিভাষা একে সসীম মহাবিশ্ব হিসাবে চিহ্নিত করেছে।

www.pathagar.com

এটি আমাদের কাছে কোনো সমস্যা নয়। আমরা, এ মহাবিশ্বে অসীম শক্তি পদার্থে আটকা পড়েছে— এ তথ্যটির ন্যায্যতা বিধান করতে চাইছি।

'কুন ফা-ইয়াকুন' প্রবন্ধের উদ্ধৃতি দিয়ে এখানে বলতে চাই যে, সৃষ্টির ক্ষেত্রে স্রষ্টাকে অসীম শক্তি একটি অতি ক্ষুদ্র বিন্দুতে ঘনায়ন করে একটি বিস্ফোরণ ঘটিয়ে এবং তার সাথে এক পরিমিত মাপের সম্প্রসারণ জুড়ে দিয়ে এই মহাবিশ্বের গোড়াপত্তন করতে হয়েছিল। আমরা বিখ্যাত আয়াত ৫১:৪৭ এর চিত্রে শক্তি বা Energy হতে মহাবিশ্বের সৃষ্টির তথ্যটি অবগত হই। আমরা ২৪:৩৫ আয়াতটির দিকে দৃষ্টি ফেললে দেখতে পাই যে— *"আল্লাহ এই মহাবিশ্ব ও পৃথিবী (পৃথিবীসমূহ)-এর আলো"।* আমরা এ আয়াতের বক্তব্যের আলোকে হয়তো আশা করতে পারি যে— ৫১:৪৭ আয়াতে শক্তি হতে যে মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে, হয়তো বা তা আল্লাহ-জাত শক্তি (আল্লাহর নিজস্ব শক্তি হতে মহাবিশ্ব সৃষ্টি হতে হবে এ ভাবনা জরুরী নয়, তিনি ইচ্ছা করলে অন্যভাবেও তা সৃষ্টি করে থাকতে পারেন)।

মহাবিশ্বের সৃষ্টিতে আদি কাঁচামাল যদি কোনো কারণে আল্লাহ জাত কিংবা তাঁর নূর হতে হয়ে থাকে, তবে একটি কারণে মহাবিশ্বের পদার্থে কিংবা শক্তিতে অসীমতার স্বাদ পাওয়া যাবে; সে কারণটি হলো— তিনি নিজেই এক অসীম স্রষ্টা। তাঁর নিজস্ব অসীমতার অবস্থান অবশ্যম্ভাবীভাবে তাঁর সৃষ্টিকে অসীমতার গুণে গুণান্বিত করবে। সম্ভবতঃ এই কারণেই আমরা মহাবিশ্বের আদি আকৃতিতে এক অসীম ক্ষুদ্রত্ব (প্রোটনের চাইতে সহস্র লক্ষ বিলিয়ন গুণ ক্ষুদ্র) এবং পরিণাম আকৃতিতে এক অসীম অসীমত্ব (২০ মহাপদ্ম আলোকবর্ষ ব্যাসসম্পন্ন মহাবিশ্ব)— এই দুই এর সমাবেশ দেখি। শুধুমাত্র আজকের দৃশ্যপটেই আমরা দুই দিকে দুই অসীমের

www.pathagar.com

সীমানা দেখতে পাই। স্রষ্টা সৃষ্টিতে তাঁর অসীমতার নিদর্শন রাখার জন্যই হয়তো এ ব্যবস্থা করে থাকতে পারেন।

"বস্তু নিচয়ের শপথ, যাহা তোমরা দেখিতে পাও (৬৯:৩৮); শপথ সেই সব বস্তুর যাহা তোমরা দেখিতে পাও না (৬৯:৩৯) প্রত্যেক ক্ষুদ্রতম ও প্রত্যেক বৃহত্তম লিপিবদ্ধ রহিয়াছে" (৫৪:৫৩)। ক্ষুদ্রতমের ও বৃহত্তমের বিবেচনা আল্লাহপাকের সৃষ্টিতে প্রবলভাবেই রয়েছে— আমরা এ তথ্যটি এ আয়াতে অবগত হই।

এ অবস্থানে এসে আমরা কোরআনের স্থান ও কালের আপেক্ষিকতার আর একটি পরিস্থিতির সামনাসামনি হতে পারি। একটি কোয়ার্কের চাইতে ক্ষুদ্র স্থান কালের শাসনে একটি সুবিশাল মহাবিশ্বে পরিণত হয়েছে— এটিকে রেখাচিত্রে সাজালে আমরা কোরআনের নিজস্ব আপক্ষিকবাদ বোধিতার বিষয়টি প্রত্যক্ষ করতে পারি।

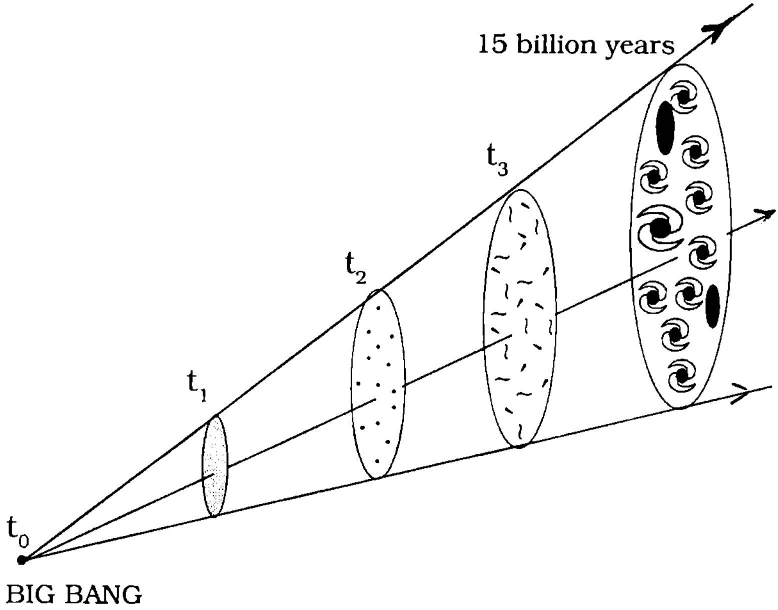

www.pathagar.com

চিত্রে t_0 হতে t_{15b} পর্যন্ত ১৫টি মহাপদ্ম বৎসর বিগত হয়েছে। এর মধ্যবর্তী অনেকগুলি ধাপ যেমন t_1, t_2 ইত্যাদি অবস্থানগুলি আমরা কল্পনা করতে পারি। *"আকাশ বা মহাবিশ্বকে আমরা সৃষ্টি করিয়াছি শক্তি (Energy) দ্বারা ইহাকে আমরা সম্প্রসারণ করিতেছি" (৫১:৪৭)* কিংবা *"তিনি আকাশকে করিয়াছেন সম্প্রসারিত"* (সমুন্নত ছাড়া সম্প্রসারিত চরিত্রও রয়েছে ৫৫:৭, দ্রষ্টব্য সেফিড, শিফ্‌ট ও অনন্তের অনন্য তত্ত্ব)। এ ছাড়াও আরো কিছু আয়াত এই সম্প্রসারণ গুণাগুণকে তুলে ধরে। বিজ্ঞানীগণের এককালের 'স্টিডি স্টেট' তত্ত্ব আজকের Big Bang দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবার পরই কেবল আমরা এই উল্লিখিত আয়াতগুলির মর্যাদাময় অবস্থানটি অনুভব করতে সক্ষম হয়েছি। কিন্তু এ প্রবন্ধে আমরা যে বিজ্ঞানময়তার দিকটিকে তুলে ধরার প্রয়াস নিতে চাইছি, তা হলো যে মধ্যযুগীয় অনড় কিংবা নিখুঁত–পরিবর্তনহীন (Perfect sky) মহাবিশ্বের অন্ধত্ব হতে বেরিয়ে আসার জন্য কোরআনের এ দুটি আয়াতই যথেষ্ট ছিল সে সময়ে আমরা t_0 হতে t_{15b} পর্যন্ত প্রতিটি অবস্থানে প্রতিটি প্রকল্পিত মহাবিশ্বের পরিবর্তনের ধর্মটিকে পরিপূর্ণভাবে আপেক্ষিকবাদের অনুকূল ও এই তত্ত্বের একটি ফলাফলের ক্ষেত্র হিসাবে বিবেচনা করতে পারি।

এগার

মহাকাশ পর্ব–১ এ আকাশ সম্পর্কে বিশ্লেষণ দেবার প্রতিশ্রুতি ছিল। দয়াময়ের করুণা ভিক্ষা করে আমরা সাধ্যমত চেষ্টা করব যে আপেক্ষিকবাদের প্রস্তাবের সাথে কোরআনে 'সামায়া' বা আকাশের প্রস্তাবের কি অন্বয় বা বিরোধ রয়েছে তা নির্ণয় করতে।

সর্বপ্রথম আমরা ৫১:৪৭ আয়াতের প্রতি নজর দেব। *"আকাশ আমরা সৃষ্টি করিয়াছি শক্তির দ্বারা; আমরা ইহাকে সম্প্রসারণ*

www.pathagar.com

করিতেছি।” এই আয়াত চিত্রটি মূলতঃ আদি মহাবিশ্বের সমানুপাতিক। এখানে ব্যবহৃত শব্দ السماء যে আকাশের কথা বোঝায় তা সন্দেহাতীতভাবে মহাবিশ্বের কথা বলে। এই মহাবিশ্বের একদিকে আদি মহাক্ষুদ্র বিশ্ব এবং অন্যদিকে সম্প্রসারণশীল মহাবৃহৎ বিশ্ব বিরাজ করে। সময়ের শাসনে একটি অতি ক্ষুদ্র বিন্দু একটি সর্ববৃহৎ সম্প্রসারণমান মহাবিশ্বতে উঠে আসার দৃশ্যটি এই আয়াতে অঙ্কিত হয়েছে।

কোরআনের ৪১:১১ আয়াতে السماء শব্দটিকে আমরা প্রত্যক্ষ করি— *“অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করিলেন যাহা ছিল ধূম্রপুঞ্জময়। তিনি উহাকে এবং পৃথিবীকে বলিলেন— তোমরা উভয়েই আস ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়। উহারা বলিল— আমরা আসিলাম অনুগত হইয়া।”* আমরা ৫১:৪৭ এর পরিবেশটিকে শক্তির পরিবেশ হিসাবে দেখেছিলাম। ৪১:১১ এর পরিবেশ পক্ষান্তরে ধূম্রপুঞ্জে অধ্যুষিত দেখতে পাই! এর অর্থ হলো ৫১:৪৭ আয়াতটি Hadros are এর প্রতিচ্ছবি আঁকে যেখানে ৪১:১১ এর পরিবেশটি Staler era কে চিত্রায়িত করে। আমরা জানি— একমাত্র স্টেলার ইরাতেই কেবল ধূম্র বা ‘দুখান’ এর পরিবেশ বিরাজ করছিল। এই ধূম্রময় অঞ্চলকে এই আয়াতে আকাশ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এখানে যে আকাশের প্রস্তাব এসেছে, সে আকাশটি এমন যা পৃথিবীর সাথে যুগপৎ জন্মের সূত্রে বিরাজ করে। *“তোমরা আস ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায়; উহারা উভয়ে বলিল— আমরা আসিলাম অনুগত হইয়া”* এই আয়াতাংশ একটি এমন চিত্র অঙ্কিত করেছে যেখানে পৃথিবীর জন্ম ঘটেছে একটি আকাশের বা السماء এর সাথে। এখানে এই السماء টি কি? আমরা জানি, পৃথিবীর সঙ্গে যুগপৎ জন্মের ইতিহাস কেবল সূর্যের— তাহলে সূর্যই কি সে ‘সামায়া’?

www.pathagar.com

সম্প্রসারণশীল মহাবিশ্ব। ১৫ মহাপদ্ম বৎসর আগে এর আকৃতি ছিল পদার্থের ভিত্তি প্রোটনের চাইতে সহস্র লক্ষগুণ ক্ষুদ্র ! আজ তার আকৃতি ২০ মহাপদ্ম আলোকবর্ষ। মানুষের জ্ঞানের সামনে একমাত্র কোরআনই সর্ব প্রথম সম্প্রসারণশীল মহাবিশ্ববাদ প্রস্তাব করেছিল।

এর উত্তর, হ্যাঁ। প্রশ্ন হতে পারে— সূর্য একটি অতি নগণ্য নক্ষত্র, তার জন্মকালে তাকে السماء হিসাবে চিহ্নিত করার যৌক্তিকতা কোথায়? এর উত্তরটি কঠিন নয়। সূর্যের ন্যায় নক্ষত্র তৈরী হবার শর্ত হলো যে, সুর্যের ভরের সমান পুঞ্জিভূত মেঘ বা ধুয়া সদৃশ পদার্থ যদি কমপক্ষে অর্ধ-আলোকবর্ষ ব্যাসের মধ্যে

www.pathagar.com

অবস্থান করতে সক্ষম হয় তবেই এমন নক্ষত্র তৈরী হতে পারে। অর্ধ–আলোক–বর্ষের সুবিশাল গ্যাস–বিস্তারকে 'সামায়া' বা আকাশ হিসাবে কোরআনের এই চিহ্নিতকরণটি একটি আকাশেরই সমানুপাতিক। এখানে ব্যবহৃত السماء টি কেবলমাত্র একটি সূর্যভরে বিস্তৃত সুবিশাল অঞ্চল (অর্ধ আলোকবর্ষ)–কে চিত্রায়িত করে যার চিত্রটি নিম্নে প্রদর্শন করা হলো ঃ

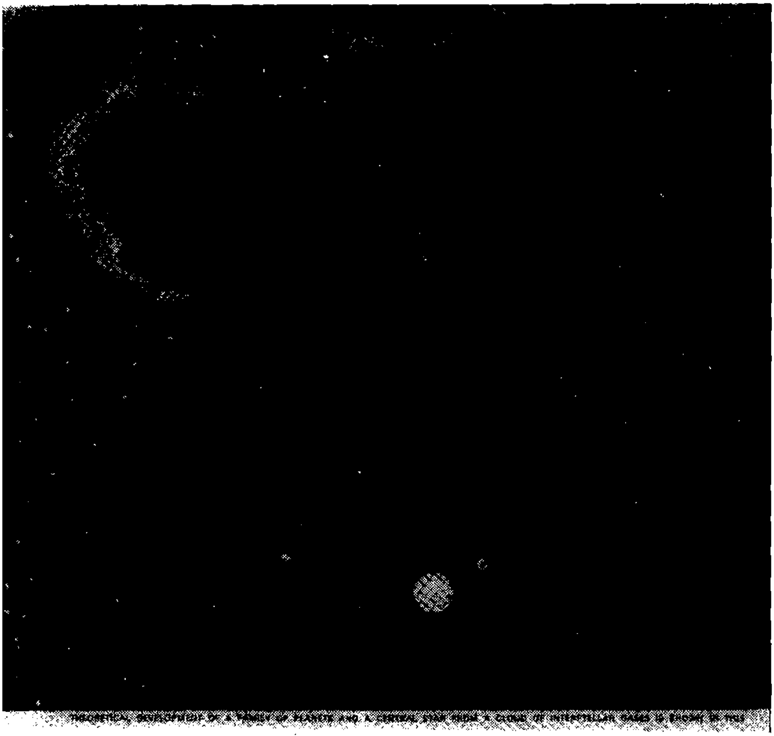

৬৭:৫ আয়াতে প্রস্তাব এসেছে— *"আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করিয়াছি প্রদীপমালা দ্বারা এবং উহাদিগকে রাখিয়াছি শয়তানের প্রতি নিক্ষেপের উপকরণ।"* رجوما শব্দটি সরাসরি আমাদেরকে এসটিরয়েড ও মিটিওরের উৎসমূলের সন্ধান দেয়; ফলতঃ নিকটবর্তী আকাশটি পৃথিবীর অঞ্চল হতে দূরবর্তী গ্রহাঞ্চলের সীমানা পর্যন্ত ব্যাপ্ত হতে পারে। ৬:৯৯ আয়াতে *"তিনিই আকাশ*

www.pathagar.com

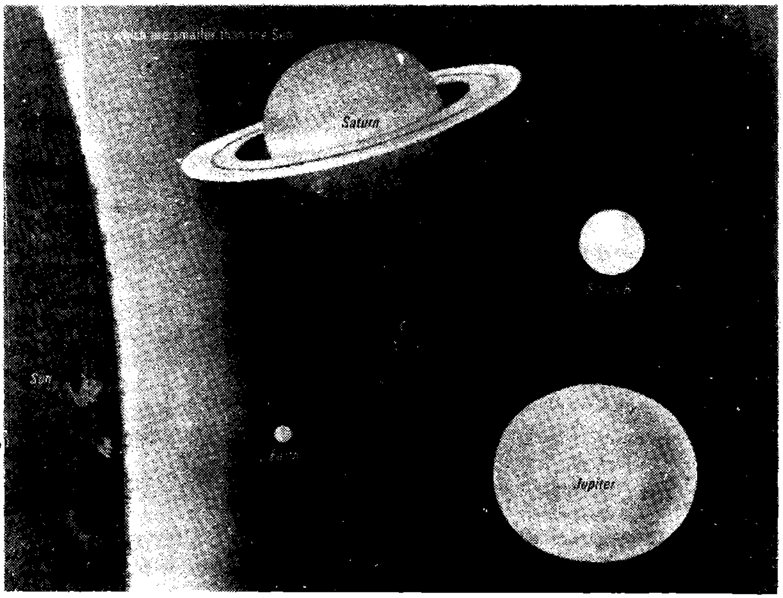

সূর্য ও অন্যান্য গ্রহ শোভিত নিকটবর্তী আকাশ (ছবিটিতে চন্দ্র বাদ পড়েছে)। এরা পৃথিবীর নিকটবর্তী অঞ্চলের জন্য আলোকবর্তিকা। মঙ্গল ও বৃহস্প্রতি এবং এবং শনির অঞ্চল জুড়ে রয়েছে লক্ষ পৃথিবী ধ্বংস করার মতো নিক্ষেপযোগ্য পাথুরে উপকরণ 'রুজুমান'। কোরআন এ অঞ্চলকেও 'সামায়া' নামে অভিহিত করে থাকে।

হইতে বারি বর্ষণ করেন..." এই আয়াতটিতে السماء শব্দটি ব্যবহার পেয়েছে নিকটবর্তী বা পৃথিবী সংলগ্ন শূন্য যা মেঘমালা ধারণ করে এবং বৃষ্টি বর্ষায়।

"তিনি আসমান ও যমীনের স্রষ্টা, তাঁহার সন্তান হইবে কিরূপে" (৬:১০১)। এই আয়াতে ব্যবহৃত শব্দ السموات এর মান নির্ণীত হয়। আসমান ও যমীনের স্রষ্টার পরিচয় দেয়ার জন্য আশা করা যায় السماء শব্দটি এখানে মহাবিশ্বেরই প্রতিশব্দ। কিন্তু প্রশ্ন হতে পারে الأرض শব্দটি আসবে কেন যদি পূর্বের শব্দ

www.pathagar.com

নিকটবর্তী আকাশের পৃথিবী সংলগ্ন অংশ যেখান হতে বৃষ্টি বর্ষিত হয়। কোরআন একেও 'সামায়া' নামে আখ্যায়িত করে।

السموات একটি মহাবিশ্বের সমানুপাতিক হয়? আমাদের এখনো নিশ্চিত উত্তর দেবার মতো প্রয়োজনীয় তথ্য হাতে নেই। তবে মনে হয়, এই السموات শব্দটি অনেক আকাশসমৃদ্ধ বা অনেক গ্যালাক্সিসমৃদ্ধ মহাবিশ্বের ধারণা দেয় যেখানে الأرض বা পৃথিবী কেবল অনন্যতার বৈশিষ্ট্যেই সম্পৃক্ত রয়েছে। অন্যদিকে আমরা 'সম্মানিত পৃথিবী' এই প্রবন্ধে السموات الأرض এই সমাসবদ্ধ প্রস্তাবটির ন্যায্যতা সম্পর্কে বিশদ ব্যাখ্যা করেছি যেখানে দেখানো হয়েছে যে পরিসংখ্যানগত দিক দিয়ে এই শব্দগুচ্ছ অন্যায্য নয়।

"আকাশে আমি বুরুজ বা গ্যালাক্সিসমূহ সৃষ্টি করিয়াছি, এবং শোভামণ্ডিত করিয়াছি তাহাদের জন্য যাহারা (বিশেষ দৃষ্টিসম্পন্ন) দর্শক" (১৫:১৫)। এই আয়াতে السماء শব্দটি মহাবিশ্বের সে অংশের ইঙ্গিত দেয়, যে অংশে মহাবিশ্বের রূপ ও সৌন্দর্যের

www.pathagar.com

মহাবিস্তৃতি ঘটেছে ; আর তা কেবলমাত্র বিশেষ দর্শক النظرين দের জন্যই উন্মুক্ত। মনে রাখা দরকার যে نظرين এর সাথে ال যুক্ত হয়ে এই বিশেষত্বের গুরুত্বটিকে বোঝানো হয়েছে। ফলতঃ আমরা অনুভব করি যে, কেবলমাত্র সৃষ্টি অনুসন্ধানী বিজ্ঞানীগণের কথাই এখানে বলা হয়েছে। মহাকাশ পর্ব-১, মহাবিশ্বের অপরূপ প্রবন্ধটির আলোকে আমরা বলতে চাই— মহাবিশ্বের রূপের অপরূপতা বিস্ময়কর এবং তা কখনো সকলের জন্য উন্মুক্ত নয়— সময় ও দূরত্ব বিজয়ী বিজ্ঞানীগণই কেবল এ রূপ-সৌন্দর্যের দর্শন সৌভাগ্য লাভ করতে পারেন। আমরা ১৫:১৬ আয়াতে মহাবিশ্বের গভীরতম প্রদেশে কিংবা ছায়াপথদের গ্লোবিউল বা গ্লোবুলা ক্লাস্টারের দিকে ধাবিত হই। এ আয়াতে মহাবিশ্ব বা ছায়াপথ এদের অংশবিশেষ বা গভীরতম প্রদেশকে বোঝানো হলেও তার জন্য السماء শব্দটিই ব্যবহৃত হয়েছে।

"তোমরা কি নিদর্শন দেখিতে পাও না যে আল্লাহ কেমন করিয়া অগণিত আকাশ سبع السموات-কে স্তরে স্তরে সৃষ্টি করিয়াছেন? (৭১:১৫) তিনি স্তরসমূহের অধিপতি" (৭০:৩)। আমরা এ আয়াতগুলিতে এক একটি মহাজাগতীয় স্তর বা গ্যালাক্সিকে এক একটি السماءএর অনুপাতে দেখি। ৭১:১৫ আয়াতে আমরা السموات এর অর্থ গ্যালাক্সিসমূহ হিসাবে পাই। سبع السموات এর অর্থ অগণিত গ্যালাক্সি সমষ্টি হিসাবে বুঝে নিতেও কষ্ট হয় না— কিন্তু এই 'সাবয়া সামাওয়াতি' বা গ্যালাক্সিসমষ্টি কোনো কারণেই মহাবিশ্ব নয়— এ ধারণাও এ শব্দগুচ্ছ হতে পাওয়া যায়। কারণ গ্যালাক্সি সমষ্টির বাইরেও অদৃশ্য পদার্থ মহাবিশ্বের অধিবাসী হয়ে বিরাজ করে। কোরআনের ভাষায় ঃ *"বস্তুনিচয়ের শপথ যাহা দেখিতে পাও (৬৯:৩৮); শপথ যাহা দেখিতে পাও না" (৬৯:৩৯)* অতএব, কোনো কারণে কোনো অবস্থানে কোরআন السموات والأرض কিংবা سبع السموات والأرض এ জাতীয় শব্দগুচ্ছে মহাবিশ্বের কোনো সামষ্টিক চিত্র অঙ্কিত হয় না।

www.pathagar.com

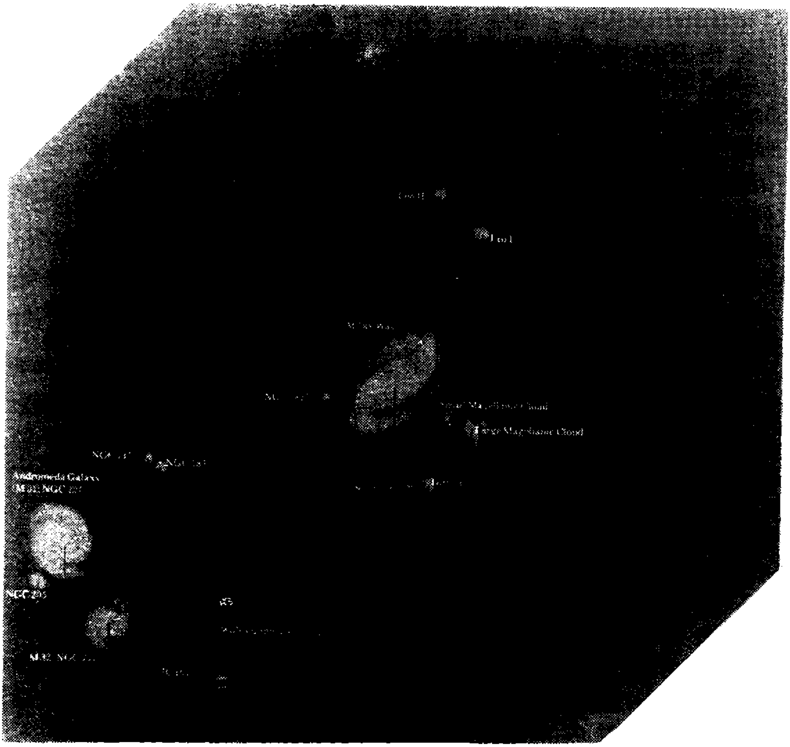

এই ত্রি–মাত্রিক ছবিটির প্রতি পার্শ্বের দৈর্ঘ্য হলো ৪০ লক্ষ আলোক বৎসর। এর মাঝে পূর্ণ Local Group প্রদর্শিত। মাঝখানের স্পাইরাল গ্যালাক্সিটি আমাদের ছায়াপথ। বামপাশের বড় স্পাইরালটি 'এন্ড্রোমিডা' (M31 : NGC 224) যা ছায়াপথের ৩ গুণ নক্ষত্র ধারণ করে। প্রতিটি ক্ষুদে ও বামন (dwarf) গ্যালাক্সিতে কমপক্ষে ১০ লক্ষ নক্ষত্র রয়েছে যেখানে ছায়াপথে তারার সংখ্যা দশ হাজার কোটি। এদের প্রতিটিই ভিন্ন মাপের আকাশীয় স্তর।

অনেক গবেষক মনে করেন ২২:৩০ আয়াতের পরিবেশে মহাবিস্ফোরণ উত্তর মহাবিশ্বের তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। এই আয়াতে كانتا رتقا ففتقنهما একটি আদি মহাবিশ্বের অবস্থার দিকে ইঙ্গিত দেয় (বিশ্লেষণ দ্রষ্টব্য মহাজাত পর্ব–১)। বলা দরকার এখানে আকাশ বোঝাতে যে শব্দটি ব্যবহার পেয়েছে, তা হলো السموات অথচ আদি মহাবিশ্বের পরিবেশের বর্ণনায় السماء শব্দটিই ব্যবহৃত হওয়া উচিৎ

www.pathagar.com

ছিল। কিন্তু এখানেও যুক্তি অত্যন্ত গ্রহণযোগ্যতায় প্রসারিত যে— আদি মহাবিশ্বের এই পরিবেশ বোঝানোর জন্য যদি السماء শব্দটি ব্যবহার পেত, তবে একটি বিপত্তি ঘটত— সেটি হলো, একটি মহাবিশ্বের বিপরীতে একটি বা অনেকগুলি পৃথিবীর। আমরা এ পরিস্থিতিকে গ্রহণ করতে পারি না— কারণ, পৃথিবীর অবস্থানটি গ্যালাক্সি এবং একটি মেইন সিকুয়েন্স নক্ষত্রের বিপরীতেই কেবল গ্রহণযোগ্য হতে পারে। এই মহাবিশ্ব কখনো পৃথিবীর জন্ম দেয়নি— পৃথিবীর জন্মদাতা হলো ন্যূনতঃ গ্যালাক্সির পরিবেশ। পৃথিবীর জন্মের জন্য যেমন মেইন সিকুয়েন্স নক্ষত্রের ভূমিকাটি জরুরী, তেমনি জরুরী হলো একটি গ্যালাক্সি তার পেছনে থাকা। এই গ্যালাক্সি তাকে সময়ের ভিন্ন ভিন্ন ধাপে স্থানের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চল হতে এক এক করে সুপারনোভা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে এক এক মৌল-বিস্তার প্রেরণ করবে যা না হলে পৃথিবীকে কখনই পৃথিবী বলা যাবে না। অতএব, পৃথিবীর বিপরীতে আকাশের স্কেলটি হলো 'গ্যালাক্সি' ; শুধুমাত্র মেইন সিকুয়েন্স নক্ষত্রও নয় কিংবা এককভাবে মহাবিশ্বও নয়। ফলতঃ এখানে কোরআন এক বাচনিক 'সামায়া' শব্দটি ব্যবহার না করে বহু বাচনিক 'সামাওয়াতে' ব্যবহারের মধ্যে গ্যালাক্সিদের চিত্রকে তুলে ধরেছে যা নায্যতার সূক্ষ্ম মাত্রায় গ্রহণযোগ্য এক বিকল্পহীন প্রস্তাব।

মহাবিশ্বের কাঁচামাল হলো হিলিয়াম ও হাইড্রোজেন— এই হিলিয়াম ও হাইড্রোজেনে কখনো জীবনময় পৃথিবী সৃষ্টি হতে পারে না। ফলতঃ ২১:৩০ আয়াতে, *"সত্য প্রত্যাখ্যানকারীগণ কি প্রত্যক্ষ করে না যে আকাশসমূহ ও পৃথিবী (সমূহ) একে অপরের সাথে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত ছিল কঠিন, শক্ত ঘন ও শক্তিময় গোলক সদৃশ্য পরিবেশে— অতঃপর আমি উভয় অস্তিত্বকে পৃথক করিয়া দিলাম"*— এ আয়াতে আমরা মহাবিশ্বের জন্মের এক সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পেয়ে থাকি। ইতিহাসটি হলো— 'প্রাইমোরডিয়াল ফায়ার বলে' গ্যালাক্সিরা ছিল না, ছিল শক্তি ; সময়ের ধাপে ধাপে তা ধুঁয়া-মেঘ সদৃশ্য হাইড্রোজেন-হিলিয়ামের জন্ম দেয়; সৃষ্টি হয় গ্যালাক্সির

www.pathagar.com

অণুবীজ। ঐ সব গ্যালাক্সির মধ্যে পৃথিবী সুপ্ত অবস্থায় ছিল। ততক্ষণে মহাবিশ্বের আকৃতি সম্প্রসারিত আকাশীয় বিশালতায় রূপ নিয়েছে। গ্যালাক্সি হতে মেইন সিকুয়েন্স নক্ষত্র এবং গ্রহরা একই সময় সৃষ্টি হয়। ففتقنهما শব্দটি সরাসরি আমাদেরকে 'স্টেলার ইরা' এর শেষ কালের পরিবেশে নিয়ে আসে যেখানে পৃথিবীর গঠন সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু আয়াতে তার পূর্বের অংশটি (রাতকান পর্যন্ত) অবশ্যম্ভাবীভাবে যে চিত্র দেয় তা আদি মহাবিশ্বের শক্তি পরিস্থিতিরই প্রকাশক। আমরা ২১:৩০ আয়াতটিতে মহাবিশ্বের শুরু হতে শেষ পর্যন্ত একটি একক পূর্ণ চিত্র অংকিত হতে দেখি। আর এই আয়াতে ব্যবহৃত السموات শব্দটি অনেকগুলি আকাশ বা গ্যালাক্সির কথাই বলে। বলা দরকার এ আয়াতের পরিবেশে الأرض শব্দটিকে অবশ্যই বহুবচন হিসাবে ধরে

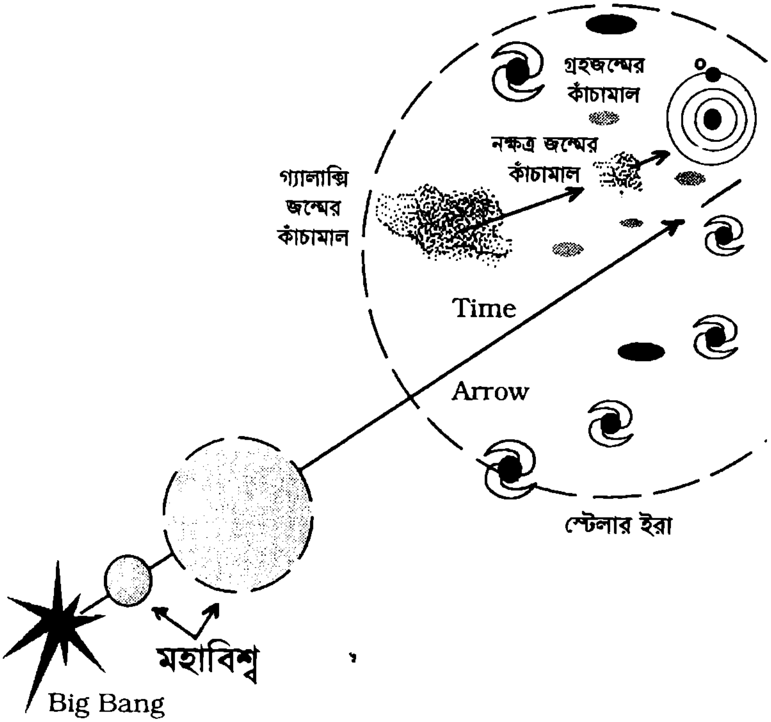

www.pathagar.com

নিতে হবে। প্রকৃতপক্ষে الأرض শব্দটি যে একটি বহুবচন ও তা আমরা ৬৫:১২ আয়াতের বিশ্লেষণ হতে পূর্বেই জেনেছি (মহাকাশ পর্ব–১ ভিনজগতে জীবন দ্রষ্টব্য)।

এভাবে বহু স্থানে বহুভাবে السموات والأرض কিংবা والأرض سبع السموات এই শব্দগুলি ব্যবহার পেয়েছে। বিজ্ঞানে আপেক্ষিকবাদ যেমন দেখায়— স্থানের পরিমাপে কোনো নির্দিষ্ট একক নেই, স্থানের কোনো চরম পরিমাপ নেই, তা আপেক্ষিক ; তেমনি কোরআনও দেখায় যে মহাবিশ্ব বোঝাতে ব্যবহৃত শব্দ السماء টি নিকটবর্তী আকাশকেও বোঝায় আবার السموات শব্দ দিয়ে যেখানে গ্যালাক্সিকে বোঝানো হয়েছে সেখানে সমস্ত মহাবিশ্বের কথা বর্ণনা করতে গিয়েও এই السموات শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। আমরা পরিস্কারভাবে বুঝি যে, 'সামায়া' বা স্থান বা Space এর বিষয়ে কোরআন সুস্পষ্ট অনির্দিষ্ট মাপের ধারণা দিয়েছে যেমন করেছে সময়ের ক্ষেত্রেও— আর তা পরিপূর্ণভাবে আপেক্ষিকবাদের চিত্রকেই প্রকাশ করে রেখেছে। তবে বিজ্ঞান আর কোরআনের এই বিজ্ঞতার পার্থক্যটি হলো যে আপেক্ষিকবাদ বিজ্ঞানে জন্ম নেবার দেড় হাজার বছর আগেই কোরআন এই বাদের পূর্ণ তথ্যচিত্রকে নিখুঁত সঠিকতায় প্রকাশ করে রেখে দিয়েছে। এগুলি বিস্ময়কর নয় কি?

বার

আপেক্ষিকবাদের বিস্ময়কর সাফল্যটি হলো ভর–শক্তির তুল্যতা সমীকরণ $E = mc^2$। পদার্থে অসীম শক্তি ; সে শক্তির পূর্ণ প্রকাশ সম্ভব হয় যদি তাকে চলমান করা যায় আলোর গতিতে। কোরআন বিস্ময়করভাবে এ সমীকরণকে সমর্থন করে ; আমরা মহাকাশ পর্ব–১ এ (আইনস্টাইনের সমীকরণ) দেখতে পেয়েছি যে, $E = mc^2$ যেমন পদার্থে অসীম শক্তির কথা বলে, তেমনি কোরআনের আয়াতের তথ্যে পদার্থে আল্লাহর শক্তি $E^A = \alpha$ (অসীম)— এই ধারায়

www.pathagar.com

প্রকাশ করা যায়। মূলতঃ পদার্থে আবদ্ধ শক্তি $E = E^A = mc^2 = \alpha$ এই হলো কোরআনিক ও আপেক্ষিকবাদ সমীকরণের অনুমোদন যা সর্বোতভাবে এক ও অভিন্ন। কোরআনের এই অনুমোদন আপেক্ষিকতা সম্পর্কে সচেতন প্রভুর উৎস হতে এর অবতীর্ণ হবার তথ্যটি আমাদেররে জনিয়ে যায়।

সেনাবাহিনীতে একজন ইঞ্জিনিয়ার কলিগ ভরশক্তি সমীকরণের প্রতিবিম্ব সমীকরণটি যা আমরা কোরআনের আয়াত হতে পাই (দ্রষ্টব্যঃ 'আইনস্টাইনের সমীকরণ' মহাকাশ পর্ব–১) তার $E^A = {}^{m}/_{m^0}$ এর পরবর্তী ধাপ $E^A = {}^{m}/_{0}$ এর সমালোচনা করে যুক্তি দেখিয়েছেন যে, এ সমীকরণে $E^A \times 0 = m$ এই শর্তটি বস্তুর মান m কে শূন্য বলে প্রকাশ করে ; অথাৎ $m = 0$ হয়ে যায় যা সত্য নয়। সুতরাং এ সমীকরণ গ্রহণ করা যায় না বলে তিনি যুক্তি দেখান।

এই প্রশ্নটি অনেকের মনেই উঁকি দিতে পারে। আমার সমালোচক কলিগের যুক্তিটি আমি গ্রহণ করি এবং গণিতের বিবেচনায় এই সত্যকে এড়িয়ে যাবার কোনো পথ নেই। কিন্তু এ বিষয়টি এতটা সাদামাটা গণিতের মধ্যেই আবদ্ধ নয়। আমরা আলোচনাটি প্রসারিত করেছিলাম একটি প্রাকৃতিক ভিত্তি নিয়ে যা ছিল ঃ **উপযোগিতা বিবর্জিত বস্তুর নিরেট ভর × আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ শক্তি = উপযোগী বস্তুসম্ভার**। এই মহাবিশ্বে আমরা যাবতীয় উপযোগী বস্তুসম্ভারকে বিবেচনা করছি। আমাদের মহাবিশ্বের সমস্ত বস্তুর ভরকে যদি m ধরা হয়, আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ শক্তিকে যদি E^A ধরি, তবে

$m^\circ \times E^A = m$ (যখন m° উপযোগ বিবর্জিত নিরেট বস্তু)

$E^A = {}^{m}/_{m^\circ}$ (এই ছিল পর্ব–১ এ আমাদের প্রাপ্তি)। যেহেতু সত্যিকারের উপযোগহীন পদার্থ সৃষ্টিতে নেই সেজন্য $m^\circ = 0$; হলে ঃ

$E^A = {}^{m}/_{0}$

www.pathagar.com

$E^A = \alpha$ (শূন্য দ্বারা যে কোনো সংখ্যা ভাগ করা হলে তার ফলাফল হবে অসীম)

কিন্তু সমীকরণটির চিত্র যদি এমন হয় যা আমার ইঞ্জিনিয়ার কলিগ দেখাতে চেয়েছিলেন $E^A \times 0 = m$ অর্থাৎ $m = 0$, তাহলে আমাদের উত্তর কি হবে?

আমাদের উত্তরটি হবে যে— এটি হলো মহাবিশ্বের প্রকৃত ও আদি অবস্থা। আমরা জানি যে মহাবিশ্বের আদি পদার্থ যা 10^{-43} Sec বা প্লাঙ্ক সময়ের সমসাময়িক— তার মান ছিল o ; এবং এ সৃষ্টি শুরুই হয়েছিল একদম শূন্য হতে। এ কারণে $m = 0$ এই ফলাফলে দাঁড়ালে আমরাও যেমন দুঃখ পাব না, তেমনি আমাদের সমীকরণের ফলাফল যদি $E^A = \alpha$ হয় তাও ক্ষতিগ্রস্ত হবে না ; কারণ সৃষ্টিতত্ত্বে এই m বা পদার্থের মান ছিল শূন্য যা আমরা সকলেই জানি এবং কোয়ান্টাম তত্ত্ব কখনই এই পরিস্থিতির বিপরীতে অবস্থান নেয় না।

আমি আমার ইঞ্জিনিয়ার সেনা-কলিগকে এবং অন্যান্য যারা সমীকরণটির একটা সস্তা ব্যর্থতার চিত্রটিকে অঙ্কন করতে প্রয়াসী হতে পারেন, তাদের জন্য উপরের তথ্যটি বিনীতভাবে পেশ করে বলতে চাই যে, কোয়ান্টাম কার্যকারণ একদম শূন্য অর্থাৎ $m = 0$ অবস্থা হতে শুধু একটি মহাবিশ্বের জন্মের সম্ভাব্যতার কথা বলে না; একদম শূন্য হতে অসীম সংখ্যক মহাবিশ্বেরও জন্ম হতে পারে বলে বিজ্ঞান আজ নিশ্চিত আস্থার অবস্থান নিয়েছে। অতএব, কোন ব্যাক্তির জন্যই এ ক্ষেত্রে আর মাথা খাটিয়ে এ গরিব ও স্বল্প জ্ঞানসম্পন্ন লেখকের কোথায় কি ভ্রান্তি রয়েছে তা নির্ণয় করার প্রয়াসে অন্ততঃ আইনস্টাইনের সমীকরণ ও কোরআনের অনুমোদন বিষয়ক সঙ্গতিটির বিরুদ্ধাচরণ করবার অবকাশ নেই। আমরা যথার্থ দৃঢ়তার সাথেই বলতে পারি যে, কোরআন 'ভর-শক্তি তুল্যতার সমীকরণটিকে' সত্যতার সাথেই অনুমোদন করে।

www.pathagar.com

কোরআনের এই অনুমোদনের সুর আইনস্টাইনের সমীকরণের আলোকে কোরআনকে সত্যতার আসন দেয়, বিষয়টি কখনই এমন নয়। আমরা শুধু দেখতে প্রয়াস নিচ্ছি যে— কোরআন এই প্রাকৃতিক আইনকে অনুমোদন দেয়ার মধ্যে সে তার নিজ বাস্তবতার অবস্থানটির বিষয়ে আমাদেরকে অবগত হতে সাহায্য করে যেন আমরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারি যে— কোরআন সত্য।

তের

আপেক্ষিকবাদের আর একটি প্রায়োগিক ক্ষেত্র হলো কালো-বিবর বা Black hole. Black hole-এ স্থান ও কাল অস্তিত্ব হারায় এবং সময় দাঁড়িয়ে পড়ে। Black-hole এর আবিষ্কার আপেক্ষিকবাদকে প্রভূতভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করেছে।

৭:৪০ আয়াতের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে যে— কোরআন একটি উটকে সুঁই এর সামান্য ছিদ্রপথে প্রবেশ করানোর চিত্র অঙ্কন করেছে। খ্রীষ্টীয় সপ্তশতকে এ ঘটনা যাদু-মায়ার মতো মনে হলেও এখন এটি একটি জরুরী ও সত্য সম্ভাবনার বিষয়। এমনি একটি আয়াতে পদার্থ তার আকৃতি ও ভরে নিত্য নয়— এ সত্যটি প্রকাশ পায় যা কেবল আপেক্ষিকবাদকেই তুলে ধরে।

কোরআনের ৫৬:৭৫/৭৬ আয়াত দুটির দিকে তাকিয়ে দেখুন, *“শপথ যে মহাজাগতিক স্থান-কালের যেখানে নক্ষত্রসমূহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়— তোমরা যদি জানিতে উহা অবশ্যই এক মহা গুরুত্বপূর্ণ শপথ”।* নক্ষত্রসমূহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হবার স্থান Black hole সচরাচর নিকটবর্তী কিংবা ‘বাইনারী’ ব্যবস্থার নক্ষত্রদেরকে খেয়ে ফেলে এবং দৃষ্টির বাইরে ফেলে দেয়। বিশেষভাবে গ্যালাক্সি-কেন্দ্রে বড় দানবীয় ব্ল্যাকহোল মিলিয়ন মিলিয়ন সূর্যের ভর নিয়ে বিরাজ করে। এই সব ব্ল্যাকহোল সময় ও দূরত্বকে সংকুচিত ও শূন্য করে দেয়। কোরআন

www.pathagar.com

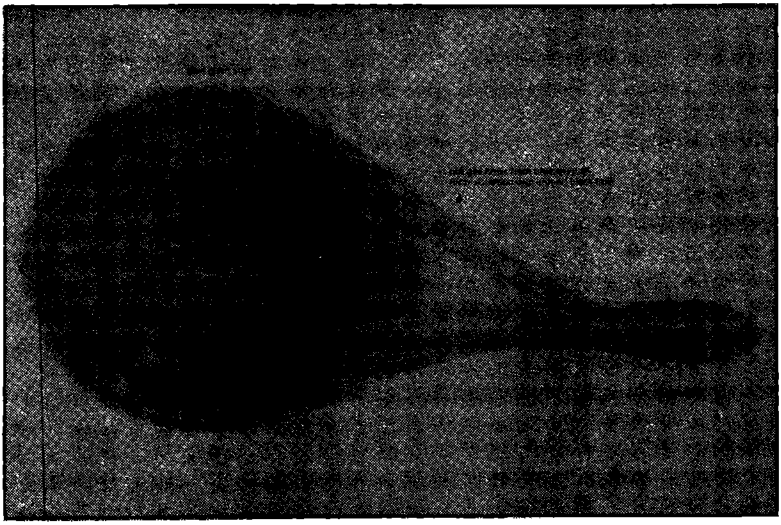

৫৬:৭৫ ও ৭৬ আয়াতে ব্ল্যাকহোলের একটি পরিপূর্ণ চিত্র অংকন করে যাতে বিস্ময়করভাবে এর গতি-প্রকৃতি ও অন্যান্য চরিত্রের সূক্ষ্ম তথ্য প্রকাশ পায়। (দ্রষ্টব্য মহাকাশ পর্ব-১, ব্ল্যাকহোল)। ব্ল্যাকহোলের সর্বচরিত্রকে সঠিক মাত্রায় প্রকাশ ও এর অস্তিত্বের অনুমোদনে আপেক্ষিকবাদকেই তুলে ধরা হয়। অপেক্ষিকবাদের আজকের ঘটনা চরিত্র কোরআন অনেক অনেক পূর্বে প্রকাশ করে রেখেছিল— এ তথ্যটি আমাদেরকে সত্যই বিস্মিত করে।

চৌদ্দ

Secand Law of Thermodynamics জানায় যে কেবল বিশৃঙ্খলার দিকে প্রসারমান এই মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হয়ে হয়ে চলার কথা অনন্তকাল— এর ফলে সময়ের তীর শুধু একমুখী হবার কথা। কিন্তু Oscillating Universe বাদীদের বক্তব্যটি ভিন্ন। তারা বলেন, Critical Mass এক সময় মহাবিশ্বের সম্প্রসারণকে জয় করবে। সংকুচিত হতে থাকবে এই মহাবিশ্ব; উল্টে যাবে সময়ের তীর।

www.pathagar.com

কিন্তু বিজ্ঞানীগণের অবলোকন, গ্যালাক্সিদের চারিপাশে পদার্থের অবস্থান ও প্রকৃতি দেখে মনে হয় যে মহাবিশ্বের এই অদৃশ্য Critical Mass টি কখনই এই সম্প্রসারণ জয় করতে সক্ষম হবে বলে মনে হয় না। কার্ল সেগানের লিখায়—"That there is not enough matter to slowdown the expansion"—পরিস্থিতিটি বোঝার জন্য আমাদেরকে নির্ভরযোগ্য তথ্য দিয়ে যায়।

ডঃ স্টিফেন ডব্লিও হকিংস আশাবাদী যে সম্প্রসারণ একদিন থেমে গিয়ে সংকুচনের ধারা নেমে আসবে; তখন সময়-তীরটি হবে বিপরীতমুখী। কোরআন কখনই এমন ব্যবস্থার অনুমোদন দেয় না। আমরা ৫১:৪৭ আয়াতটিতে সম্প্রসারণের চিত্র পাই; আর এই চিত্রটির চরিত্র বর্ণনা করে 'লামুসিওনা' এর শব্দমান। انالموسعون-এর انا এবং মুসিওনার উপর ব্যবহৃত ل অক্ষর 'তাকীদের' উপর 'তাকীদ' বা গুরুত্বের উপর গুরুত্ব দেয়। অন্যদিকে 'লামুসিওনা' শব্দটি বর্তমান ও ভবিষ্যৎবাচক। বর্তমানে ও ভবিষ্যতে মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ যে একটি জরুরীর উপর জরুরী বিষয়— তা এ শব্দগুলির দিকে তাকালেই বোঝা যায়। ফলতঃ অনুভব করা সহজ হয় যে, কোরআন মনন কখনই সম্প্রসারণের বিপরীতমুখিতার কথা বলেনি; বরং এই সাম্প্রসারণ সদা সর্বদাই সম্মুখ ও ভবিষ্যৎমুখী। Alan Mac Robcrt এর ভাষায়– the universe created by the scheme is open and will expand for ever. এই সম্প্রসারণ critical mass –এর স্বাদে ও স্বপ্নে বিভোর স্টিফেন হকিংস এর কথামত উল্টা পথে হাঁটতে শুরু করবে না, কারণ সে critical massটি কোথায় এবং কিভাবে আছে, সে প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা হকিংসের জন্যও অত্যন্ত ক্রিটিক্যাল।

কাল সম্পর্কিত জ্ঞান কোরআনের বর্ণনায় যেভাবে প্রকাশিত হয়েছে তা হলো ইহকাল, পুনরুত্থান ও অনন্ত পরকাল। *"ইহা চিরস্থায়ী জান্নাত, যে অদৃশ্য বিষয়ের প্রতিশ্রুতি দয়াময় তাঁহার বান্দাদিগকে*

www.pathagar.com

দিয়াছেন (১৯:৬১) সেথায় উহারা অনন্ত স্থায়ী হইবে— উহা হইতে স্থানান্তর কামনা করিবে না (১৮:১০৮) তাহাদিগের প্রতিপালকের নিকট আছে তাহাদিগের পুরস্কার স্থায়ী জান্নাত; সেথায় তাহারা চিরস্থায়ী হইবে" (৯৮:৮)। এভাবে একটি কালের স্থায়িত্ব বা দীর্ঘসূত্রীতা কিংবা অনন্ততা কিংবা চিরস্থায়িত্ব— এই অনুভবগুলি সময় সম্পর্কে আমাদেরকে যে ধারণা দেয়, তা অবশ্যম্ভাবীভাবে একটি একক গতিমুখী সময়-তীরকে পরিষ্কারভাবে তুলে ধরে যার চিত্রটি নিম্নরূপ ঃ

Unidirectional Time Arrow →

ইহকাল → পুনরুত্থান → পরকাল → অনন্তকাল।

সময়ের গতিতীরকে উল্টোমুখী প্রবাহিত করার বিষয়ে যে সব বিজ্ঞানীদের একান্ত দায়, তারা একটা সংকুচনশীল মহাবিশ্বের স্বপ্নে বিভোর। মহাবিশ্ব সংকুচিত হলে তাদের লাভ এইটুকুই যে, সময়ে এই মহাবিশ্বের পদার্থ সম্ভার হারিয়ে যাবার ভয় থাকে না; Oscillating মহাবিশ্বে বার বার নতুন মহাবিশ্ব জন্ম নেবার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু বিষয়টি তা নয়। একটি সম্প্রসারণশীল মহাবিশ্ব Oscillating মহাবিশ্বের চাইতে নতুন মহাবিশ্ব জন্ম দেবার ক্ষেত্রে আরো অধিকতর সম্ভাবনাময়। আমরা এ পুস্তকের 'মহাবিশ্বের ধ্বংস' প্রবন্ধটিতে Fitz Gerald Contraction এবং আপেক্ষিকবাদের উপাত্তকে কাজে লাগিয়ে দেখিয়েছি যে— যে সমস্ত গ্যালাক্সিরা আলোর গতি অর্জন করতে পারবে (৯৯·৯%), তাদের সুবিশাল স্থান বা Space কিংবা তাদের দৈর্ঘ্য হয়ে যাবে শূন্য কিন্তু ভর হবে অসীম; ফলত শূন্য পরিসরে অসীম বস্তুভরের জন্য একমাত্র গত্যন্তর হবে একটি মহাবিস্ফোরণ, যা আমাদের মহাবিশ্বের গোড়ার দিকে যে Big Bag এর অস্তিত্ব রয়েছে— এমনই সৃষ্টির ইতিহাসের অনুরূপ। ফলস্বরূপ আজকের মহাবিশ্বের একশত মহাপদ্ম গ্যালাক্সিরা সময়ের সুবিশাল প্রান্তে এসে একশত মহাপদ্ম নতুন মহাবিশ্ব সৃষ্টি করবে। এই সৃষ্টির ধারাটিকে আমরা Burst of Creation তত্ত্ব হিসাবে প্রস্তাব করেছি। দর্শক যদি এমন

www.pathagar.com

যোগ্য কেউ হন যিনি আমাদের মহাবিশ্বের সমস্ত পরিসীমাটি একসাথে অবলোকন করবার ক্ষমতা রাখেন, তিনি দেখবেন যে একটি আনুমানিক অন্ধকার মহাবৃত্তের পরিধিতে একটির পর একটি মহা বিস্ফোরণ ঘটে যাচ্ছে। মনে হবে যেন একসাথে অনেকগুলি স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র বিস্ফোরক জাতীয় গোলা বর্ষণ করছে! আর জন্ম হচ্ছে অসংখ্য নূতন মহাবিশ্ব!

Burst of Creation তত্ত্বের কথা কোরআনে আছে কি? এর উত্তর— না। কিন্তু কোরআনে সৃষ্টির পুনরাবৃত্তির কথা রয়েছে। এ পুনরাবৃত্তির প্রস্তাব কখনই Oscillating Universe তত্ত্বের অনুমোদন দেয় না; সময় তীরের বিপরীতমুখিতার প্রস্তাব করে না। কোরআনের সময় তীর সদাসর্বদা সম্মুখের দিকে, প্রত্যাবর্তনের পানে নয়। সে দৃষ্টিকোণ হতে মহাবিশ্বে যদি ক্রমাগত সম্প্রসারণ হয়ে চলে, তবে Fitz Gerald Contraction ও Relativity অনুযায়ী আমরা Burst of Creation তত্ত্বের বাইরে অন্য কোনো কিছু ভাবতে পারি না।

কোরআন যে সময় তীরের সন্ধান দেয়, সে সময় তীর স্টিফেন হকিংস এর সময়তীরের মতো নয়, এ সময় তীরের কোনো প্রত্যাবর্তন নেই, বিপরীতমুখিতা নেই।

আমরা দেখতে পাচ্ছি— কোরআন আপেক্ষিকবাদের সকল ক্ষেত্রকে পরিপূর্ণভাবে ঘিরে রেখেছে। কোরআন দেখিয়েছে, কাল কিংবা স্থান কোনোটাই নিত্য নয় ; এদের মাপার কোনো স্থির একক বলতে সৃষ্টিতে কিছু নেই, স্থান ও কাল অভিকর্ষের গ্রাসে পতিত হলে বিলীন হয়ে পড়ে, অস্তিত্বে বর্তমান থাকে না। কোরআন দেখিয়েছে, আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ববাদী সমীকরণ $E = mc^2$ একটি অনুমোদনযোগ্য গাণিতিক প্রকাশ। কোরআন দেখায়— সময়ের তীরের সাথে সঙ্গতি রেখে এই মহাবিশ্বের আকার আকৃতি ধাপে ধাপে বেড়ে চলেছে। কোরআন 2nd Law of Thermodynamics এ প্রদর্শিত সময় তীরকে অনুমোদন করে যায়।

www.pathagar.com

এই সঙ্গে কোরআন Time and Space প্লাটফর্মটিকে বদলিয়ে দিয়ে Time and Gravity প্লাটফর্ম তৈরী করে— যা আজকের অবস্থানে শুনতে যেমনি দেখাক, হয়তো অদূর ভবিষ্যতেই বিজ্ঞান মস্তিষ্ককে আন্দোলিত করবে। আন্দোলিত করবে তেমনিভাবে কোরআনের ভাবধারা অনুযায়ী Burst of Creation তত্ত্বটি; হয় আগামীতে কিংবা কোনো এক নিকটবর্তী সদূরে। অন্যদিকে আপেক্ষিকবাদটি যে গুরুতর সত্য প্রকাশ করে যায়, তা হলো 'তাওহিদীবাদ'— "আকাশ ও পৃথিবীতে একমাত্র তিনিই স্রষ্টা, তিনি ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নাই"।

"মহাকালের শপথ" (১০৩:১)

"আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অতিক্ষুদ্রতম কিছুও তোমার প্রতিপালকের অগোচরে নহে এবং তদাপেক্ষা ক্ষুদ্রত্তর অথবা বৃহত্তর কিছুই নাই যাহা সুস্পষ্ট কিতাবে নাই (১০:৬১)। এই কোরআন আল্লাহ ব্যতীত অপর কাহারো রচনা নহে। পক্ষান্তরে ইহার পূর্বে যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহার সমর্থন ও ইহা বিধানসমূহের বিশদ ব্যাখ্যা। সন্দেহ নাই যে উহা জগৎসমূহের প্রভু আল্লাহর পক্ষ হইতেই অবতীর্ণ" (১০:৩৭)। আর সে কারণেই সম্ভবতঃ আপেক্ষিকবাদ ও অন্যান্য গুরুতর বৈজ্ঞানিক তত্ত্বসমূহ ব্যাখ্যায় কোরআন এতটা প্রসারিত।

আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন

www.pathagar.com

শেষের কথা—১

আমাদের জ্ঞানের মাহাত্ম্য সম্পর্কে আমরা সদাসর্বদা সজাগ থাকতে পছন্দ করি। আমরা নিশ্চিতই জ্ঞানী— এ সংবাদটুকু আমাদেরকে আনন্দিত করে। আমরা সে আনন্দের গুরুগাম্ভীর্যে ক্রমে ক্রমে কক্ষচ্যুত হতে থাকি। অতিশয় জ্ঞানী হবার কারণে এক পর্যায়ে অতি ক্ষুদ্র অঙ্কেও আমরা ভুল করে বসি।

জ্ঞান ও জ্ঞানীর গুণের মাত্রা নিরূপে আজ হিড়িক লেগে রয়েছে আমাদের জ্ঞানের পাঠশালায়। জ্ঞানীর এক ডিগ্রী উচ্চে আরোহণ করে রয়েছেন আজ একটি দল—বুদ্ধিজীবি। বিশেষ অর্থে, বিশেষ স্বার্থে ও বিশেষ বলয়ে ব্যবহৃত এ শ্রেণীর একটি লক্ষ্যও যেন বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে—স্রষ্টা ও তাঁর অনুসারীদের দুর্বলতা খুঁজে বার করা, ধর্মে কটাক্ষ করা, অপসংস্কৃতিকে আবাদ করা ইত্যাদি আরো অসংখ্য দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন তারা।

টেলিভিশনের পর্দায় নাটকের ছলে বলতে দেখেছি এক বুদ্ধিজীবিকে—অলৌকিক কিছুই নেই। যা আছে, সবই প্রাকৃতিক। যুক্তিতর্কে শ্রুতিমধুর এ সব বুদ্ধিজীবিগণের বক্তব্যকে সহসা খন্ডাতে গিয়ে অনেকেই হিমসিম খেয়ে যান।

ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচন রাঁধতে রাঁধতে রাধুনী কিংবা গাইতে গাইতে গায়েন জাতীয় অতি সাদামাটা প্রস্তাবটিকে টিকিয়ে রাখতে বিশ্বজোড়া অসংখ্য সাধ্য সাধনা ঘটেছে। উদ্দেশ্য—অলৌকিক নয়, প্রাকৃতিকভাবে ক্ষুদে অনুজীবি হতে ডাইনোসোর ও জটিল মানুষ সৃষ্টি হয়েছে। জেনিটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এসে তাঁদের মাথায় হাঁড়ি ভাংলো, এরপর আর এই অথর্ববাদে বিশ্বাস করার কিছুই থাকলো না। তথাপিও বাদটি প্রিয় হয়ে রয়েছে অনেকের কাছেই। এরও কারণ, এটি অলৌকিক বাদকে প্রতিহত করবে—এই প্রত্যয়!

আমাদের দেশের একজন স্বনামধন্য যাদুকর লক্ষ টাকার চ্যালেঞ্জ হাঁকিয়ে কয়েক বছর আগে বলেছিলেন—কেহ যদি অলৌকিক কিছু প্রমাণ দেখাতে পারেন, তবে তিনি লক্ষ টাকা পুরস্কার দেবেন। এ অঙ্কের টাকা ঘোষণায় প্রকাশ্য অলৌকিক পবিত্রতার যে বিরুদ্ধবাদ ধ্বনিত হয়েছে—তাকে প্রতিহত করতে কেহই আসেন নি। অনেকেই আশাহত হয়েছেন—একজন যাদুকরের কথাই কি তাহলে সত্য?

www.pathagar.com

বিনীতভাবে বলছি—সে যাদুকর সত্য নয়। তিনি কেবল একটা অসার আহবান করেছেন, যা সস্তা ফেরিওয়ালাদের মতো; যেনো কোটিপতির নন্দনকে পুরাতন জুতার বদলে 'কটকটি' মিঠাই (পঁচা ও উচ্ছিষ্ট গুড় দিয়ে তৈরী) ফেরি করতে আহ্বান করেছেন। আসলে ঐ জুতোর বদলে মিঠাই কেনার কাজটি ঐ নন্দনের জন্য নিয়োজিত পরিচারকও করতে প্রস্তুত নয়; কারণ তারা সর্বদাই তার চাইতে উৎকৃষ্ট উপদেয় খেয়ে অভ্যস্ত। ফেরিওয়ালার এ আহ্বানে পরিমাণের অংকটি যতই বড় হতে থাকুক, কোটিপতির নন্দনের কাজে নিয়োজিত পরিচারক এতে কোনভাবেই আকৃষ্ট হবার কথা নয়। যাক সে ফেরিওয়ালার কথা! পুরাতন জুতা ক্রয়ের স্বার্থে সে অনেক কিছুই বলতে পারে।

আমরা অলৌকিকতার বিষয়ে আলোকপাত করতে চাই। যারা বলেন, অলৌকিক বলে কিছু নেই, তারা কেবল না জেনে মিথ্যা বলেন। তারা যেন মহাবিশ্বের অতি অন্ধকার ও অতিশীতল পরিবেশে কিভাবে একটা আলোকময় ও উষ্ণ আবাস স্থলে আনন্দে বসবাস করেন—সে প্রশ্নের উত্তরটি খুঁটিয়ে দেখতে চেষ্টা করেন। তাদের জানা দরকার—এই লৌকিক, জাগতিক ও প্রাকৃতিক জীবনময়তা কেবল একটুখানি অলৌকিক ব্যবস্থারই অতিক্ষুদ্র দান! নাজুকতায় ও সূক্ষ্মতায় তা এমন যেন একটি চুলের উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া একজন পথিকের বাঁ দিকে পতিত হবার অর্থ হলো—আগুনের সর্বগ্রাসী মহাকুণ্ডে আত্মাহুতি দেয়া আর ডান দিকে পতিত হবার অর্থ হলো চরম শূন্য উত্তাপের সর্বনাশী ছোবলের বিষে তৎক্ষণাৎ প্রাণ বিয়োগ হওয়া। পথচারীকে এ চুলের উপর পা ফেলে ফেলে অতি দ্রুত যেতে হবে, ভুল করলে চলবে না। কারণ, তার গতিতে কমতি হলে হবে আরেক সর্বনাশ। ধ্বংসের রাহুটান তাকে গ্রাস করবে মুহূর্তেই। আপনি জানেন কি যে এই পথিকটি আর কেহ নয়—আপনারই সুখের এই পৃথিবী! অদৃশ্যের শাসন এর বায়ুমণ্ডলে বেঁধে দিয়েছে এক মহা অলৌকিক ব্যবস্থা, যার সামান্য ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র তারতম্য চিরসর্বনাশের ঠিকানার সন্ধান দেখিয়ে দেবে। অদৃশ্য ও অলৌকিক শাসনের ফলস্বরূপ পৃথিবীর মত মূলতঃ একটি প্রাণ ধারণে অক্ষম গ্রহে জন্মেছে প্রাণের অফুরন্ত সম্ভার! শুধু তা-ই নয়; এই অদৃশ্য অলৌকিকতাই প্রতিটি অলৌকিক বিরুদ্ধবাদীর প্রতিটি নিঃশ্বাস, নিজের জিহ্বার প্রতিক্ষণের রসনা, ক্ষুধার অন্ন, পিপাসার পানি আর মনের সকল আনন্দের যোগান দিয়ে যাচ্ছে নিশ্চিতভাবে। এই আকাশেই অলৌকিকভাবে সৃষ্টি যার রয়েছে এক অদৃশ্য অলৌকিক জীবনলীলার কারখানা! তারা কি দয়া করে বুঝবেন যে, অলৌকিক বলতে কিছু

www.pathagar.com

নেই;—এই মিথ্যাবাদটি কেবল তাদের না জানা হতেই উৎসরিত? যারা জানে না, বড় সিদ্ধান্তগুলো কেবল তারাই সহজে নিয়ে ফেলতে পারেন।

যে অলৌকিক স্পন্দন ডিমের অভ্যন্তরে নবজাতক পাখির অক্সিজেনের মজুদ কতটা রয়েছে তা যাচাই করে সৃষ্টি হয়নি, সে স্পন্দনটি মাতৃগর্ভে এক অজ্ঞাত ক্ষণে শুরু হয়ে শেষ-নিঃশ্বাস পর্যন্ত এই লৌকিক জগতেই মহা অলৌকিকতার নিদর্শন ঘোষণা করে—সে স্পন্দনজাত নিঃশ্বাস টেনে এই অলৌকিকতা—তথা রুবুবিয়াতের মহামালিক আল্লা জাল্লা শানুহুর অস্তিত্বের অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করতে যারা সদানিয়ত ব্যস্ত, তারা যখন কোন শুভ মুহূর্তে নিজ সীমাবদ্ধতার কথা বুঝবেন, হয়তো তখনই অবলোকন করবার সুযোগ পাবেন যে, তাদের দেহের প্রত্যেক কোষে কোষে প্রতি মুহূর্তে জীবনের এক অবর্ণনীয় হৈ চৈ হাঁক ডাক লেগে রয়েছে। যা ঘটছে, তার সবটাই ব্যাখ্যার অসাধ্য! কি করে মৃত এমিনু এসিড জীবনের ভিত্তি স্থাপন করে, কি করে প্রাণহীন ভাইরাস লক্ষ লক্ষ বছর ধরে আন্ত নাক্ষত্রিক পথ পরিক্রম করে পৃথিবীতে এসে জীব ও জীবনের মহা হুমকির কিংবা কল্যাণের অসামান্য ভূমিকা রাখতে পারে, তা ভাববার বিষয় নয় কি? অতিপরিচিত নাম ভাইরাসের প্রাণ বলতে কিছুই নেই—শুধু তার শুকনো ডি এন এ ফিতাটিতে লিখে দেয়া আছে কিছু নির্দেশ, লক্ষ লক্ষ বছর পরও সে নির্দেশ কার্যকর হয়ে যাবে। এ নির্দেশকে আগুনে পুড়িয়ে শেষ করা যায় না, পানিতে ডুবিয়ে ক্ষতি করা যায় না। কোন 'প্রাকৃতিক' আইন দ্বারা জ্ঞানহীন বুদ্ধিজীবি (বিশেষ দলটি) সাহেবরা তার ব্যাখ্যা দেবেন? প্রাকৃতিক আইন তো কখনোই জীবনকে সমর্থন করে না, সে বুদ্ধিজীবির দল তা জানেন কি? অতএব, যা তারা বলেন, তা না বুঝেই বলেন, যা তারা শেখান, না জেনেই শেখান।

সমস্ত বুদ্ধি ও সমস্ত জীব সবকিছুর পেছনে এক মহাশক্তিধর অদৃশ্য প্রভু তাঁর অলৌকিক মহিমাতেই বিরাজ করে আছেন। বুদ্ধিজীবিরা হয়তো জানেন না যে স্রষ্টার অলৌকিক মহিমাটি মানবিক জ্ঞানের বাইরেই ফেলে রাখা হয়েছে। স্রষ্টা অলৌকিক মহিমাতে উদ্ভাসিত! সৃষ্টিজোড়া মহাকর্ষ বলয়কে একজন বুদ্ধিজীবি যতই প্রাকৃতিক ঘটনা হিসাবে সনাক্ত করতে চান না কেন—মহাকর্ষ বিদ্যায় যিনি পারদর্শী ও বিশেষজ্ঞ, তাঁর কাছে বুদ্ধিজীবি সাহেবের ঐ মতামতটি একটি ফেলনা খেলনা তুল্যই কেবল। সে বিশেষজ্ঞ কিন্তু দ্বিধাহীনভাবেই বলছেন—"We do not yet know what causes gravity, but we know what gravity does."

www.pathagar.com

অথচ বুদ্ধিজীবি সাহেব কিন্তু অন্ধের মতই বলবেন- অভিকর্ষ একটি প্রাকৃতিক ব্যাপার। হায়রে বুদ্ধিহীন বুদ্ধিজীবি!

আসলে সকল পরজীবির মত বুদ্ধিজীবিও একটি পর রক্ত চোষা মধ্যবর্তী সুবিধাভোগী রাজনৈতিক দল মাত্র। ওরা প্রকাশ পায় কখনো কবিতায়, নাটকে, সাহিত্যে, চিত্রকর্মে, সঙ্গীতে এবং এই সবেই। রাজনৈতিক বিশেষ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য এদের রয়েছে সরকারী ব্যবহার। আর তাদের মদদদাতা উৎসমূলটি ইসলাম বিরুদ্ধবাদীতায় অত্যন্ত বলিষ্ঠ। এ কারণেই আজানের ধ্বনিকে বেশ্যার খদ্দের যোগানোর চিৎকারের সাথে তুলনা করা সত্ত্বেও জনৈক কবি এখন মোড়ল কবির দেশজোড়া মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। আরেক অধ্যাপকও দীর্ঘক্ষণ আযানকে 'ঝালাপালা' মন্তব্য করেও বহাল তবিয়তে রয়েছেন এ দেশে। উভয়ই এ দেশের সরকারী স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বুদ্ধিজীবি—সরকারের গভীরতায় এদের যাতায়াত। এরা কারা, কে এদের বিলাশ বহুল জীবনের অর্থ যোগায়—এ সব প্রশ্ন এদেশে এখন বাতুলতা মাত্র। তবে আমি কেবল সত্য বলবার জন্যই প্রসঙ্গটি আনলাম। জোর গলায় বলে দিতে চাই, জ্ঞানহীন বুদ্ধিজীবিরা কখনোই ইসলামের প্রতিপক্ষ নয়। তারা বড় বেশী তুচ্ছ!

ইসলাম এবং কোরআন আপন মহিমায় পথ চলে। সময়ের ছকে বেঁধে রাখা হিসাবে দয়াময় তাঁর নিজস্ব পরিচালনায় তাকে ব্যক্ত করবেন—এ কথা কোরআনেই সুস্পষ্টভাবে উচ্চারিত রয়েছে। মানুষকে সময়ের মাঠে ছেড়ে দেয়া হয়েছে শুধু! সিদ্ধান্তগুলো তো ব্যক্তিকেই নিতে হবে তার জ্ঞানের প্রকৃত বিবেচনায়। জানাতে চাই—আমরা এমন এক ভিত্তিভূমিতে দাঁড়িয়ে যার নাম ইসলাম। আমরা এমন এক অবলম্বন নিয়ে যার নাম কোরআন—অব্যয় এবং অক্ষয়। কোন বুদ্ধিজীবির কোন মন্তব্যে অমরা দুঃখিত নই। আমরা তো তাদেরকেও বলি—"বল. প্রশংসা আল্লাহরই যিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেন নাই, তাঁহার সার্বভৌমত্বে অংশী নাই এবং যিনি দুর্দশাগ্রস্ত হন না যে কারণে তাঁহার অভিভাবকের প্রয়োজন হইতে পারে। সুতরাং সম্ভ্রমে তোমরা তাঁহার মাহাত্ম্য ঘোষণা কর।"

www.pathagar.com

শেষের কথা-২

স্টিফেন হকিং ও প্রমুখের উঁচু বাকযন্ত্রটিকে সম্ভবতঃ সহজেই স্তব্ধ করে দেয়ার মত উপযুক্ত হাতিয়ার আমাদের হাতে রয়েছে। যদি কখনো মহাকাশ পর্ব-৩ লেখার সুযোগ দয়াময় দান করেন, তবে প্রতিশ্রুতি থাকলো, ইনশাআল্লাহ্ প্রত্যক্ষ করার সুযোগ থাকবে আপনাদের জন্য—কি করে মহা বিজ্ঞানীগণের মহাতত্ত্বগুলো কত সহজে তাদের নিজ অবস্থানকে কত শক্তভাবে প্রতিহত করে। বিজ্ঞানী যখন স্রষ্টার বিষয়ে বিভ্রান্তিকর প্রস্তাব রাখে, সে মূলতঃ স্ব বিরোধিতাই করে। বিজ্ঞান যে কত সাফল্যকরভাবে স্রষ্টাকে আবিষ্কার করে ফেলেছে, তারই প্রতিশ্রুতি নিয়ে হয়তো একদিন মহাকাশ পর্ব-৩ এর প্রস্তাবটি জগৎজোড়া স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীগণের দ্বন্দ্বের সীমারেখা টেনে দেবে। অবিশ্বাসীগণের জন্য সম্ভবতঃ এটি হতে পারে এক অনন্য দুঃসংবাদ।

এ মুহূর্তে আপনাদের দোয়া এবং দয়াময়ের দয়াই আমার একমাত্র পাথেয়। জীবনে যে প্রত্যয় ও প্রতিজ্ঞা নিয়ে এগিয়ে এসেছিলাম—তার উপর কুঠারাঘাত করেছিলেন জনৈক ব্রিগেডিয়ার শাহাবুদ্দীন। এ প্রসঙ্গে প্রকৃত ঘটনার কিছু চিত্র তুলে ধরেছিলাম মহাবিশ্ব পর্ব-২ এর শেষের কথায়। আমলা শ্রেণীর গুটিকয়েক পাঠক মনঃক্ষুণ্ন হয়ে মন্তব্য করেছেন যে—এটি অপ্রাসঙ্গিক! তারা কেউ আমার জীবনের ক্ষতির পরিমাণ এবং বিশেষভাবে আমার এ কাজে কতটা পিছিয়ে যেতে হয়েছে, তার প্রতি সহানুভূতিশীল হতে পারেন নি। এ ধরনের মানুষগুলোর ভাবটি অনেকটা এমন যে—সরকার কিংবা অন্য কোন উৎস যেন আমার পারিবারিক দায় দায়িত্ব পালন করবেন! ক্ষতির বিষয়ে প্রতিবাদ না করে মাথা নীচু করে মেনে নেয়ার জন্য তাদের কেউ কেউ মন্তব্য পাঠিয়েছেন। তবে গুটিকয়েক ব্যক্তি ছাড়া সকলেই "শেষের কথা" এর সপক্ষে দৃঢ় অবস্থান ও তাদের সহমর্মিতার কথা প্রকাশ করেছেন। আমি তাঁদের কাছে এ জন্য কৃতজ্ঞ।

ব্রিগেডিয়ার শাহাবুদ্দীন হায়দার প্রতিরক্ষা গোয়েন্দাবাহিনীতে কর্মরত উপ-মহাপরিচালকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন পুস্তকটি প্রকাশ হবার পর। উক্ত সংস্থা হতে আমার বিষয়ে গুরুতর প্রতিশোধমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর ২৮ এপ্রিল ৯৮ তারিখে সেনাসদর জিএস শাখা

www.pathagar.com

(এমআই পরিদপ্তর) কে নির্দেশ প্রদান করলে উক্ত পরিদপ্তর ২৯ এপ্রিল ৯৮ তারিখে এবং পরবর্তীতে সেনাসদর এজি শাখা, পিএস পরিদপ্তর ০৫ মে ১৯৯৮ তারিখে জারীকৃত নির্দেশ দ্বারা আমাকে সেনাবাহিনীর নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ আখ্যায়িত করে "অবাঞ্ছিত" ঘোষণাপূর্বক সকল সেনানিবাস প্রবেশ পথে ও স্থাপনাসমূহে আমার ছবি প্রদর্শন করে রেখেছে। এতে করে অবসরপ্রাপ্ত হিসাবে প্রাপ্ত সমুদয় সুযোগ সুবিধাও বন্ধ হয়ে যায়। আল্ কোরআন দ্য চ্যালেঞ্জ পুস্তক সমূহের রচনার জন্য এ তো অবশ্যই উপযুক্ত পুরস্কার!

সেনানিবাস ও সেনাবাহিনী ভীতি কিংবা প্রীতি কোনটাই আমার জন্য জরুরী নয়। আমি কেবল সত্য প্রকাশ করেছি। অবহিত করতে চেয়েছি, যে দেশের ৯৫% মানুষ মুসলমান, যে দেশের সেনাকর্তৃপক্ষগণ একজন কোরআন সেবকের প্রতি কতটা বিরুদ্ধ আচরণ করতে পারেন। গণতন্ত্রের ধূপ উড়ানো দেশে সত্য কথা বলার অধিকার সেনাবাহিনী খর্ব করতে পারে না—এ বিশ্বাসটি এখন মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়েছে।

আল্লাহে যার অবিচল আস্থা—ভীতি কিংবা প্রীতি তাকে সামান্যও বিচলিত করে না। আমি কেবল এমন সিদ্ধান্তটির জন্য খোদায়ী সিদ্ধান্তের অপেক্ষা করেই আছি এবং সত্যের প্রয়োজনে সত্যের সপক্ষে একটি সত্য প্রতিবাদ করেছি মাত্র।

www.pathagar.com
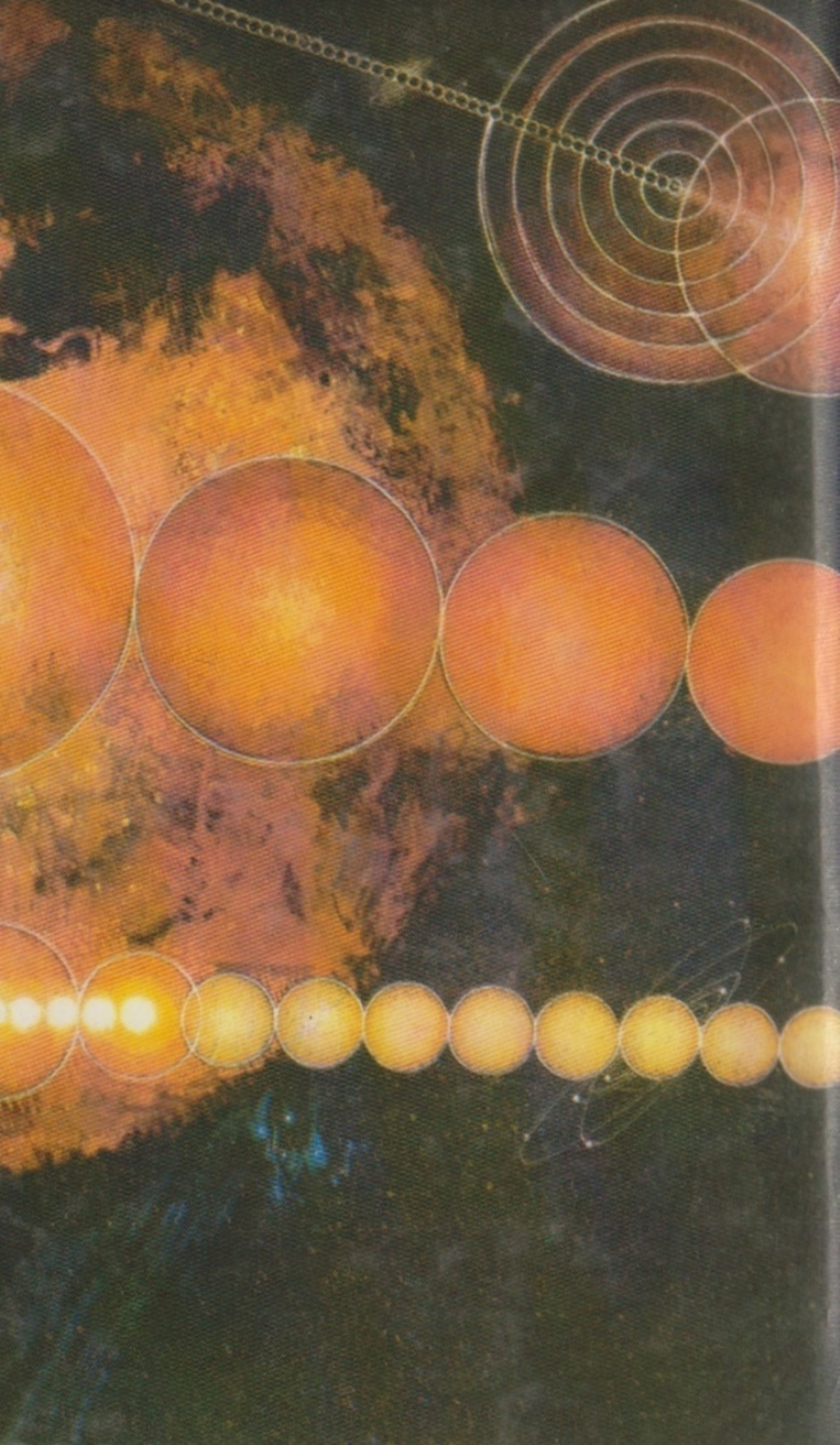
www.pathagar.com